বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার
[তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান কাসেমী
শিক্ষাসচিব, জামিয়া মাদানিয়া নবাবকাটারা
নিমতলী, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিছ, মাদরাসাই ইশা'আতুল উলূম,
লুধুয়া, রায়পুর, লক্ষীপুর।

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত



দারুল উলূম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০





প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৫

প্রকাশক : মাওলানা শহীদুল ইসলাম
দারুল উলূম লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭

বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ : দি ব্রাইট

মূল্য : ৪৫০ টাকা মাত্র

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-৩

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-৪

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-৩

কুরআনের মর্যাদা /২২১

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-৪

আল্লাহর অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা৩৩১

ইল্‌মের দর্শন /৩৪৭

খুতুবাতে যুলফিকার

তৃতীয় খণ্ড

আল্লাহর ভালোবাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত ইরশাদ করেন–



كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا.

আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম।

فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ.

পরে আমার ইচ্ছা হলো, আমি পরিচিত হই।

فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ.

তারপর আমি মাখলুক সৃষ্টি করলাম।

অর্থাৎ– যে বিষয়টি মাখলুক সৃষ্টি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল, অনুপ্রাণিত করল, তা ছিল মহব্বত-ভালোবাসা। তাহলে বলা যায়, ভালোবাসা-ই এ পৃথিবীর সৃষ্টির প্রথম কারণ।

এসব হাদীস নয় ১/৭৩ পৃষ্ঠা

আল্লাহর পছন্দ

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের নিকট কী চান? ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ.

ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহকে ভীষণ ভালোবাসে।[১]

---

১. সূরা বাকারা : ১৬৫

আল্লাহও চান, আমার বান্দারা এমনভাবে থাকুক যে, আমার ভালোবাসায় তাদের হৃদয়গুলো হবে সজীব। তাদের অন্তরগুলোর ওপর আমার ভালোবাসার ছায়া বিস্তার করে থাকবে। অর্থাৎ– আমি তাদের অন্তরে জায়গা করে নিব। আমার স্মরণে তারা সারাক্ষণ বিভোর হয়ে থাকবে।

পরিপূর্ণ মুমিনের নিদর্শন

মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের কোনো-না-কোনো কাজ রয়েছে। চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোনা, মুখের কাজ বলা এবং অন্তরের কাজ ভালোবাসা। এই অন্তর হয় আল্লাহকে ভালোবাসবে, নাহয় কোনো মাখলুককে ভালোবাসবে। তার হৃদয়ে হয় আখেরাতের মহব্বত থাকবে কিংবা দুনিয়ার মহব্বত। আখেরাতের মহব্বত অন্তরে নেকী ও পুণ্যের আগ্রহ সৃষ্টি করে। আর দুনিয়ার মহব্বত এর বিপরীত। যেমন- হাদীছে এসেছে–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ.

'দুনিয়ার মোহ সব পাপের মূল।'

বিজ্ঞ আলেমগণ এর সঙ্গে একটি বাক্য সংযুক্ত করে বলেন–

وَتَرْكُهَا مِفْتَاحُ كُلِّ فَضِيْلَةٍ.

'দুনিয়ার মোহ বর্জন করা সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।'

সুতরাং নশ্বর এ পৃথিবীর ভালোবাসা অন্তর থেকে বিদূরিত হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা হৃদয়ে স্থান করে নেওয়া পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার নিদর্শন।

বিশেষ কিছু গুণ ও গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা

পবিত্র কুরআনে মুমিনদের বিশেষ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, যা আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের নিকট এতই প্রিয় যে, গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'আমি তাদের ভালোবাসি'। যেমন- একস্থানে তিনি ইরশাদ করেন–

وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

'তোমরা সৎ ও পুণ্যবান হয়ে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীল ও পুণ্যবানদের ভালোবাসেন।'[১]

---

১. সূরা বাকারা : ১৯৫

আরেক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন–

يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

'আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভালোবাসেন।'[১]

অন্যত্র আছে–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ.

'নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।'[২]

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

'এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষাকারীদের ভালোবাসেন।'[৩]

বোঝা গেল, মহান আল্লাহ উল্লিখিত গুণাবলিকে (সৎকর্ম, তাকওয়া অবলম্বন, তাওবা ও পবিত্রতা) পছন্দ করেন। যেসব মানুষের মধ্যে এই গুণগুলো এসে যাবে, তারাও আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দের পাত্র হয়ে যাবেন।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এসব গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে সেগুলো পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। সে কারণেই তিনি আল্লাহর খুবই প্রিয় ছিলেন। এমনিভাবে আজও যদি কোনো বান্দা উল্লিখিত ভালো গুণগুলো দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তাকেও ভালোবাসবেন, তাকেও প্রিয় বানিয়ে নেবেন। চাই সে কালো হোক কিংবা ফর্সা, আরব হোক কিংবা অনারব মহান সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে এসবের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। তিনি তো কেবল অন্তরের অবস্থা দেখেন। নাম বিলাল, ঠোঁট মোটা, আকৃতি কুৎসিত, রং কালো; কিন্তু অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ভরপুর। সেই ভালোবাসা বুকে ধারণ করেই তিনি লোকালয়ে ঘুরে বেড়ান। পা পড়ে যমিনে আর সেই পদধ্বনি শোনা যায় জান্নাতে। আল্লাহু আকবার!

শির্ক পরিহার করতে হবে

আল্লাহর কাছে বংশ-বর্ণ, যশ-খ্যাতির কোনো মূল্য নেই। তাঁন কাছে মূল্য আছে মহব্বতের। মূল্য আছে ভালোবাসার। এর জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, তিনি

---

১. সূরা তাওবা : ৭

২. সূরা বাকারা : ২২২

৩. সূরা বাকারা : ২২২

শির্ক তথা অংশীবাদকে ঘৃণা করেন। এতই ঘৃণা যে, এ সম্পর্কে তাঁর প্রিয় হাবীবকে পর্যন্ত কঠিন ভাষায় সতর্ক করেছেন। বলেছেন, 'হে প্রিয় রাসূল!

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'যদি আপনিও শির্কের পাপে লিপ্ত হন, তাহলে আপনার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি হয়ে যাবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।'[১]

যেহেতু উল্লিখিত গুণাবলি আল্লাহ রব্বুল ইয্যত পছন্দ করেন আর সেই গুণগুলো যদি কারো থেকে বেরিয়ে যায় এবং সেখানে জায়গা করে নেয় বিপরীত কিছু মন্দগুণ, তাহলে এমন মন্দ গুণধারী লোকদের আল্লাহ অপছন্দ করেন। সুতরাং কোনো বান্দা যদি চায়, আল্লাহর মমতামাখা দৃষ্টি তার ওপর পড়ুক, তাহলে সে যেন উল্লিখিত গুণগুলো অর্জন করার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের উপায়

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সুন্নাতের সাথে একটি নির্ধারিত ভালোবাসা সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। যখনই কেউ একটি সুন্নাতের ওপর আমল করে, আল্লাহর দরবারে সেই পরিমাণ মাগফিরাত ও ভালোবাসা তার নামে বরাদ্দ হয়ে যায়। সুন্নাতের অনুসরণ যে পরিমাণ হবে, সেই পরিমাণ গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সুন্নাতের ওপর আমলকারী প্রতিটি নর-নারী আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। এবার বিচার আমাদের হাতে; আমরা কী পরিমাণ সুন্নাতের অনুসরণ করি এবং আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের নিকট কতটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারি। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, 'হে নবী! আপনি ঘোষণা করুন-

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ.

'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো; বিনিময়ে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।'[২]

একটি জিজ্ঞাসা ও তার জবাব

এক্ষেত্রে হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আল্লাহ বান্দাদের ভালোবাসেন, মহব্বত করেন, এর প্রমাণ কী? তাঁর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যেমন- তিনি

---

১. সূরা যুমার : ৬৫

২. সূরা আলে ইমরান : ৩১

'রাহীম' (দয়াবান), তিনি 'কারীম' (করুণাময়), তিনি খালিক (সৃষ্টিকর্তা) ইত্যাদি; কিন্তু তিনি 'মুহিব' (মহব্বতকারী-ভালোবাসাকারী) এমন গুণবাচক কোনো নাম তো সেখানে নেই; তাহলে কিভাবে বুঝব, তিনি ভালোবাসেন? এ প্রশ্নের জবাবে ওলামায়ে উম্মত চমৎকার কিছু যৌক্তিক ও দলিলভিত্তিক উত্তর পেশ করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে সরল ও সহজ উত্তর হলো, যখন কোনো মানুষ অপর কোনো মানুষকে ভালোবাসে, তখন সে তার প্রিয়জনকে হাদিয়া দেয় এবং সেই উপহার যত মূল্যবানই হোক, একে নগণ্য মনে করে এবং বলে, এ তো অতি নগণ্য উপহার; আমার মন চায়, তোমাকে আরও দামী উপহার দেই; এমন কেন হয়? কারণ, ভালোবাসা আছে, মহব্বত আছে; তাই প্রিয়জন যদি তাকে সামান্য উপহারও দেয়, সে তাকে অনেক দামী মনে করে। হোক-না তা অতি নগণ্য; কিন্তু প্রিয়জনের উপহার বলেই এর এত মূল্য।

এ তো হলো দুনিয়ার নিয়ম। ঠিক এই নিয়মটিই কুরআনের বর্ণনাশৈলীতে দেখুন, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত বান্দাদের প্রতি দুনিয়ার মধ্যে অগণিত নেয়ামত ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান করেছেন। দিয়েছেন সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি। এত কিছু দেওয়ার পরও তিনি বলেন, مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. বান্দা! দুনিয়ার নায-নেয়ামত নিতান্তই সামান্য। পক্ষান্তরে বান্দা যখন তার পালনকর্তাকে স্মরণ করল, শুয়ে হোক, বসে হোক এই আমল যদিও অতি নগণ্য, কিন্তু তা প্রিয় বান্দার পক্ষ থেকে এসেছে বলে তাকে মূল্যবান অভিহিত করে তিনি ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.

'হে বান্দা! তুমি আমাকে বেশি-বেশি স্মরণ করো, বেশি-বেশি যিকির করো।'[১]

সুবহানাল্লাহ! লক্ষ করুন, প্রিয় বান্দার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র আমলের ক্ষেত্রে তো তিনি كَثِيرًا (বেশি) শব্দটি ব্যবহার করেছেন আর নিজে যে অগণিত নেয়ামত দান করলেন, তার জন্য ব্যবহার করলেন قَلِيل (কম) শব্দটি! এতে কি প্রমাণিত হয় না, তিনি বান্দাকে ভালোবাসেন এবং ভীষণ ভালোবাসেন?

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ রব্বুল ইয্যতও এই ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

---

১. সূরা আহযাব : ৪১

ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.

'আল্লাহ্ ঈমানদারের বন্ধু।'[১]

যোগ্যতার বিচারে এভাবে বলাই যথাযথ ছিল। কিন্তু ভালোবাসার দাবি ছিল ভিন্ন। আর ভালোবাসার সেই অব্যক্ত দাবি পূরণ করতেই আল্লাহ কথাটা উল্টো করে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, 'আল্লাহ্ ঈমানদারের বন্ধু।'

সুবহানাল্লাহ! কী অসীম করুণা সেই পালনকর্তার! তিনি এই নগণ্য বান্দাদের কত ছাড় দিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন! বান্দা কালেমা পাঠ করে ঈমান আনছে, অপর দিকে মহান সৃষ্টিকর্তা তার প্রতি ভালোবাসার ঘোষণা দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ!!!

অবিশ্বাসী কাফেরের প্রতি ভালোবাসার নিন্দা

ঈমানের সঙ্গে আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের এক ধরনের সত্তাগত মহব্বত রয়েছে। আর অবিশ্বাস বা কুফরির সঙ্গে রয়েছে শত্রুতা। সুতরাং কাফেররদের বেশভুষা ও জীবনপদ্ধতি যারা গ্রহণ করবে, তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হলো–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায় ও কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, (হাশরের মাঠে) সে উক্ত সম্প্রদায়ের সাথেই উত্থিত হবে।'

যে কাফেরদের স্বভাব-চরিত্র, রসম-রেওয়াজ, বেশভুষা ভালোবাসল, সে যেন আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের ভালোবাসা হতে বঞ্চিত হয়ে গেল। একবার হিন্দুদের দেওয়ালীর উৎসবে মেতে ছিল গোটা হিন্দু সমাজ। দোকান-পাট বন্ধ করে সবাই মিলে রং ছড়াছড়ি করে ফুর্তি করছিল। একজন অপরজনকে রং মেখে রঙিন করে দিচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে-দেখে এক বৃদ্ধ একটি গাধার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। মুখে পান ছিল। মুখ থেকে পানের রং মিশ্রিত কিছু থুতু গাধার গায়ে নিক্ষেপ করে কৌতুক ভরে বলল, 'এ গাধা! হিন্দুরা কেউ তো তোর গায়ে রং ছিটাল না; এই নে; আমি তোকে রং ছিটিয়ে দিচ্ছি।'

বৃদ্ধের মৃত্যুর পর স্বপ্নযোগে তার কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। কুশল জিজ্ঞাসা করতেই বলল, 'আমি বড়ই কষ্টে আছি। কঠিন শাস্তি হচ্ছে

---

১. সূরা বাকারা : ৩৫৭

আমার। একদিন হিন্দুদের সাদৃশ্য অবলম্বনে কৌতুকভরে গাধার গায়ে পানের পিচকী নিক্ষেপ করেছিলাম। আর এতেই আল্লাহ তা'আলা ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কাফেরদের সঙ্গে এতটুকু স্বাদৃশ্যও বরদাশ্‌ত করলেন না। আল্লাহু আকবার!

আল্লাহর কোনো বিকল্প নেই

পৃথিবীতে যেকোনো জিনিসের কোনো-না-কোনো বিকল্প আছে। প্রত্যেক সম্পদ ও অর্থ-কড়ির বিনিময় যদি খোঁজ করা হয়, তবে তাও পাওয়া যাবে। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যতের না কোনো বিকল্প আছে, না কোনো বিনিময়। আরব কবি বলেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ * وَلَيْسَ لِلّٰهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ.

'পৃথিবীর যেকোনো বস্তু থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হও; তার বিকল্প পেয়ে যাবে; কিন্ত যদি আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হও, তবে এর কোনো বিকল্প পাবে না। তাঁকে হারালে এর ক্ষতিপূরণ কোনোদিন হবে না।'

আল্লাহকে ভালোবাসার দুটি মৌলিক কারণ

আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যতের ভালোবাসা মানুষের অন্তরে থাকা কেন অপরিহার্য? এর বেশ কয়েকটি কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি কারণ যথেষ্ট তাৎপর্য বহণ করে।

প্রথম কারণ : মানবসমাজের স্বীকৃত একটি নিয়ম হলো, কারো প্রতি যখন কেউ কোনো ধরনের দয়া বা অনুগ্রহ করে, তার প্রতি ইহসান বা উপকার করে, তখন সেই অনুগ্রহকারী ও উপকারকারী ব্যক্তির প্রতি সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং অন্তর থেকে তাকে ভালোবাসে। বন্ধুরা আমার! ঠিক তদ্রূপ আমরাও কি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহগুলো হিসাব করে দেখব না? যদি তা করতে যাই, তখন কী অবস্থা হবে সে ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত নিজেই বলেছেন–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا.

'যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও, তাহলে তা পারবে না।'[১]

---

১. সূরা ইবরাহীম : ৩৪

গণনা শুরু করতে পারবে; কিন্তু গুণে শেষ করতে পারবে না। একটু ভেবে দেখুন! বৃষ্টির ফোঁটাগুলো কি কেউ গুণতে পারে? না। সমুদ্রের ফেনারাশি কি কেউ গুণতে পারে? না। সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত গাছের পাতাগুলো যদি কেউ গণনা করতে চায়, পারবে? না। সুবিশাল আকাশের তারাগুলো যদি কেউ গণনা করতে চায়, পারবে? না। তারপরও এই অধম (বক্তা নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলছেন) বলছে, এগুলো সব গণনা করা সম্ভব। আকাশের তারাগুলো গণনা করা সম্ভব। সমুদ্রের ফেনারাশি গণনা করা সম্ভব। সারা পৃথিবীর সমস্ত বালিরাশি যদি কেউ গণনা করতে চায়, তাও সম্ভব। তবে বন্ধুরা আমার! আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যতের নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ গণনা করে শেষ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পারবেই না।

সেই মহাসত্তা যদি আমাদের দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, তাহলে আমরা থাকতাম অন্ধ। যদি তিনি বাকশক্তি না দিতেন, তাহলে হতাম বোবা। যদি শ্রবণশক্তি না দিতেন, থাকতাম বধির। যদি পা না দিতেন, হতাম পঙ্গু, লেংড়া, লুলা। যদি সুস্থতা না দিতেন, থাকতাম অসুস্থ রুগী। যদি সম্পদ না দিতেন, তাহলে হতে হতো পথের ভিখারী। যদি সম্মান না দিতেন, তাহলে হতে হতো অপমাণিত, মর্যাদাহীন। যদি সন্তান না দিতেন, থাকতাম নিঃসন্তান। যদি প্রশান্তি না দিতেন, থাকতাম পেরেশান।

বন্ধরা আমার! এই যে আমরা মর্যাদার সাথে জীবন-যাপন করছি, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর করুণায়ই তো তা সম্ভব হচ্ছে। আমাদের নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব কি আছে এখানে? না। এ তো কেবল তাঁরই কুদরত ও মহিমা। যদি তিনি বাস্তবেই গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেন, তাহলে কারুর মর্যাদা-ই অক্ষুণ্ন থাকবে না। কে আছে এমন, যে হিসাব-নিকাশের জন্য নিজেকে আল্লাহর দরবারে পেশ করতে পারবে?

এক বুযুর্গ 'ইকমালুশ শিয়াম' নামক গ্রন্থে একটি উপদেশ লিখেছেন। স্বর্ণাক্ষরে লেখে রাখার মতো একটি উপদেশ। তিনি লিখেছেন, বন্ধুরা! যে তোমার প্রশংসা করল, সে মূলত তোমার প্রতিপালকের 'সাত্তারী'র (পাপ গোপন রাখার গুণের) প্রশংসা করল।'

যাহোক, মানবসমাজের সাধারণ নিয়ম হলো, মানুষ তার উপকারী ও হীতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে ভালোবাসে। তাই আমাদের উচিৎ, আল্লাহ তা'আলার অগণিত নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা ভেবে তাঁকে অন্তর থেকে ভালোবাসব। প্রবাদ আছে 'যার খাই তার গুণ গাই'। আল্লাহর ব্যাপারে আমাদেরও তেমন

হতে হবে। সদা-সর্বদা তাঁর স্মরণে অন্তরকে সজীব রাখব এবং তাঁরই বিধানমতো জীবন পরিচালনা করব।

দ্বিতীয় কারণ : মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা বিরাজ করা অপরিহার্য হওয়ার দ্বিতীয় যে মৌলিক কারণ আছে, তাহলো আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মহাপরাক্রমশালী। তিনি فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. যা ইচ্ছে তা-ই করতে সক্ষম। কেন? আপনারা কি দেখেননি, সায়্যিদুনা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম চেয়েছিলেন, আমার সন্তান আযাব থেকে বেঁচে যাক। এজন্য তিনি তাকে খুব বুঝিয়েছিলেন, তার জন্য দু'আ করেছিলেন, কিন্তু ঘটনা সেভাবেই ঘটেছিল, যেভাবে আল্লাহ চেয়েছিলেন। তার চোখের সামনেই প্রাণপ্রিয় সন্তান আযাবে নিমজ্জিত হয়ে মারা গেল।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম উভয়ে কুরবানির স্থানে পৌঁছে গেলেন। পিতা জবাই করার জন্য প্রস্তুত আর পুত্র জবাই হওয়ার জন্য।

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ.

পুত্র মাটিতে শুয়ে যাচ্ছে আল্লাহর নামে কুরবান হওয়ার জন্য। আর পিতা চোখ বন্ধ করে একমাত্র কলিজার টুকরার গলায় ছুরি চালাচ্ছেন আল্লাহর বিধান পালন করার জন্য। কিন্তু আল্লাহ চাননি, ইসমাঈলের গলায় ছুরি চলুক। তাই ছুরির নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসমাঈল (আ.)-এর গলা ছিল, ছুরি অকেজো ছিল। যেই সেখানে একটা প্রাণীর গলা রাখা হলো, সঙ্গে-সঙ্গে তা কাজ করতে লাগল। কারণ, এটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছুই সংগঠিত হতে পারে না।

এমনিভাবে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও চেয়েছিলেন, প্রিয় চাচা আবুতালিব ঈমান নিয়ে আসুক। এর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টাও করেছিলেন। এমনকি শেষ মুহূর্তে অন্তিম শয্যায় চাচার মুখের কাছে কান নিয়ে বলেছিলেন, 'চাচাজান! আপনি আমার কানে-কানে একবার হলেও কালিমা পাঠ করুন; কিয়ামতের দিন আমি আপনার নাজাতের পক্ষে সুপারিশ করব। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তাই তিনি প্রিয় রাসূলকে ডেকে বললেন, হে রাসূল!

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ.

'আপনি যাকে চাইবেন তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না।'[১]

---

১. সূরা কাসাস : ৫৬

বরং হেদায়াত সে-ই পাবে যাকে আল্লাহ চাইবেন.। অনুরূপ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধুর সঙ্গে পানি মিশিয়ে পান করা পছন্দ করতেন। পারিবারিক কোনো বিষয়ের জের ধরে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আজকের পর আর কখনও মধুর সাথে পানি মিশিয়ে পান করব না।' কিন্তু এখানেও আল্লাহর ইচ্ছা নড়ে চড়ে উঠছে। আল্লাহও চান না, এমন হোক। সুতরাং আয়াত নাযিল করে দিলেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيمٌ.

'হে নবী! আল্লাহ যে জিনিস আপনার জন্য হালাল করেছেন, স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তা কেন হারাম করছেন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।'[১]

প্রিয় বন্ধুরা! যখন সব আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এবং সায়্যিদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের সামনে পরাজিত, তাঁদের মতো মহান ব্যক্তিগণও শুধু তা-ই করতে পারেন, যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তখন আমরা কেন সেই মহান প্রতিপালকের ভালোবাসা দিয়ে হৃদয় সিক্ত করব না? এ সৌভাগ্য হাতছাড়া করা কি কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

ঈমান পূর্ণতা লাভের মাপকাঠি

আমাদের কর্তব্য হলো, যাকে আমাদের প্রতিপালক ভালোবাসেন, আমরাও তাকে ভালোবাসব, যার সাথে তাঁর শত্রুতা থাকবে, আমরাও তাকে শত্রু মনে করব। আল্লাহর জন্যই শত্রুতা এবং আল্লাহর জন্যই মিত্রতা। এই মনোভাবটিই ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার নিদর্শন।

হাদীছে এসেছে–

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসল, আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ রাখল, আল্লাহর জন্য দান করল এবং আল্লাহর জন্যই বিরত থাকল, সে নিজের ঈমানকে পূর্ণ করে নিল।'

তো সহজ যে বিষয়টি আমাদের বুঝে এল, তা হলো, মহান প্রতিপালকের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক বন্ধন ও গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে

---

১. সূরা তাহরীম : ১

হবে। এই বন্ধন ও ভালোবাসা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের প্রকৃত স্বাদ নসিব হবে না।

মানুষের স্বভাবজাত পাঁচটি ত্রুটি

এ বিষয়টি এবার একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বোঝার চেষ্টা করুন। মনে করুন, একটা মেশিন; এর ব্যবহারপদ্ধতি ও কার্যকারিতা সম্পর্কে নির্মাতারই বেশি জ্ঞান থাকবে। তদ্রূপ মেশিনটার দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কেও ধারণা তাঁরই বেশি হবে। ঠিক এভাবেই বুঝুন, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত হলেন মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানব-অমানব, জীব-প্রাণী ইত্যাদির তিনিই নির্মাতা। সুতরাং এদের যাবতীয় সক্ষমতা ও অক্ষমতাগুলো সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। এ কারণেই কুরআনে মাজীদে যেমন মানুষের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি সেখানে তাদের পাঁচটা স্বভাবজাত দুর্বলতা ও ত্রুটির আলোচনাও এসেছে। যেমন-

এক. মানুষ অত্যাচারী : একটা স্বভাবজাত দুর্বলতা হলো, মানুষ বড়ই অত্যাচারী। সে অন্যের ওপর যুলুম করে, নিজের ওপরও যুলুম করে

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا.

'সে অত্যাচারী।'[১]

তবে একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, যার মধ্যে যুলুম করার যোগ্যতা আছে, তার মধ্যে ইনসাফ করার যোগ্যতাও বিদ্যমান আছে। তাই নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই।

দুই. মানুষ মূর্খ : দ্বিতীয় ত্রুটি হলো, মানুষ মূর্খ – জাহেল।

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

'সে বড়ই জাহেল, বোকা।'[২]

এখানেও লক্ষ করুন, যেলোক জাহেল – মূর্খ, তার মধ্যে জ্ঞানার্জনের যোগ্যতাও আছে। তাহলে বলা যায়, এ দুটি শব্দ (যালেম ও জাহেল তথা অত্যাচারী-মূর্খ) যেভাবে মানুষের ত্রুটি প্রকাশ করছে, তেমনি অপর দুটি যোগ্যতার দিকেও ইঙ্গিত করছে। সুতরাং এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি

---

১. সূরা আহযাব : ৭২

২. সূরা আহযাব : ৭২

মানুষ সাধনা করে, তাহলে অত্যাচারী গুণকে জয় করে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং মূর্খতাকে পদদলিত করে বিদ্বান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। অন্যথায় সে যালিম-মূর্খ উভয়টাই থেকে যাবে।

তিন. মানুষ অতি দুর্বল : তৃতীয় ত্রুটি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল ইয্যত বলেন–

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১]

একারণেই মানুষকে. ضَعِيفُ الْبُنْيَانِ (দুর্বল গঠনবিশিষ্ট) বলা হয়। এত দুর্বল যে, তার মস্তিষ্কে একটা Fear of unKnown (অজানা আতঙ্ক) সব সময় ঘুরে বেড়ায়। দেখুন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন নিজে সুপার পাওয়ার হওয়ার দাবি করে। কিন্তু প্রতিদিনই কোনো জ্যোতিষীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, 'দেখো তো আমার আগামী কালটা কেমন যাবে?' যান্ত্রিকভাবে এতটা শক্তিধর যে, রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু সৃষ্টিগত দুর্বল হওয়ার কারণে ভিতরে-ভিতরে অজানা আতঙ্কও কাজ করছে যে, কি জানি, আগামী দিনগুলো কেমন কাটবে?

মানুষ এতই দুর্বল যে, একটা ছোট্ট ভাইরাস তাকে অসুস্থ করে দেয়। ডাক্তার হাকীমগণ বলেন, এটা দুরারোগ্য ব্যাধি; এর কোনো চিকিৎসা নেই। অথচ সেই ভাইরাস ও জীবাণুটা এতই ক্ষুদ্র যে, চোখেও দেখা যায় না। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র জীবাণুই মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

চার. মানুষ তাড়াহুড়াপ্রবণ : চতুর্থ ত্রুটি আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا.

'মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াপ্রবণ।'[২]

عَجُولًا এর অর্থ হলো, যেকোনো কাজে অনর্থক তাড়াহুড়া করা। এটা মানুষের একটা স্বভাবজাত ত্রুটি। দু-চার দিন নফল নামায পড়েই আশা করে যে, শিবলী-জুনাইদ (রহ.)-এর মতো আমার দু'আও কবুল হওয়া উচিৎ। আরে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ রব্বুল ইয্যত নামাযের আদেশ করেছেন

---

১. সূরা নিসা : ২৮

২. সূরা ইসরা : ১১

সাতশবারের বেশি। নামায কায়েম করো, নামায কায়েম করো। তা তো এক কানে শুনে অন্য কানে বের করে ফেলেছ। যখন নিজে কাউকে একই কাজের জন্য তিনবার আদেশ কর, তখন চতুর্থবারের সময় ক্রোধান্বিত হয়ে বল, তুমি কি শোননি; তোমাকে তিনবার বলেছি। তাহলে যিনি সব বাদশার বাদশা, সকল ক্ষমতার অধিকারী, যার হাতে আসমান-জমিনের চাবিকাঠি, তিনি সাতশবারের চেয়েও বেশি নামাযের আদেশ দিলেন আর আমরা আযানের শব্দ শুনেও মসজিদে হাজির হই না। তাহলে বলুন! আমরা তাঁর আদেশের প্রতি কতটা আনুগত্য প্রদর্শন করলাম? তাঁর আহ্বানের কী মর্যাদা দিলাম? এটাই সেই তাড়াহুড়াপ্রবণতা, যা মানুষের স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে। শ্রম-সাধনা তো সামান্য; কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা পাহাড়সমান।

পাঁচ. মানুষ সংকীর্ণহৃদয় : পঞ্চম যে ত্রুটিটার কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তা হলো–

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا.

মানুষকে সংকীর্ণহৃদয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১]

আরবী ভাষায় هَلُوعًا শব্দের অর্থ হলো 'সংকীর্ণহৃদয়' বা 'ছোট মনের মানুষ' ইত্যাদি। এ কারণেই সে সামান্য আনন্দ পেলেই ফুলে ওঠে আর অল্প কষ্টেই ভেঙে পড়ে। যদি কোনো ধরনের সফলতা অর্জন করে, তবে তাকে নিজের কৃতিত্ব বলে প্রচার করে। ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হয়ে বলে, হ্যাঁ, তিনি আমাকে প্রশ্ন করার পরে আমি এই উত্তর দিয়েছি। তিনি যখন এভাবে প্রশ্ন করলেন, আমি এভাবে উত্তর দিয়েছি। অবশেষে আমি ইন্টারভিউতে টিকে গেছি। পক্ষান্তরে যদি ইন্টারভিউ ভালো না হয়, আর কেউ প্রশ্ন করে, বৎস! কেমন হলো ইন্টারভিউ? তো উত্তরে বলে, 'জি আল্লাহ যেমন চেয়েছেন!'

অর্থাৎ– সফলতার কৃতিত্ব তো নিজের জন্য সাব্যস্ত করল যে, আমি এমন করছি, অমন করছি আর ব্যর্থতার দায় ফিরিয়ে দিল আল্লাহর দিকে, জি, আল্লাহ যেমন চেয়েছেন! নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করে না। জনাব! ব্যর্থতা যদি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়, তাহলে সফলতা যে এসেছিল, তা কি আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ছিল? আমরা সফলতার কৃতিত্ব কেন আল্লাহকে দিতে পারি না? কারণ, তখন আমরা নফসে আম্মারার গোলামিতে লিপ্ত থাকি। খাহেশাত আমাদের ঘাড়ে সাওয়ার থাকে। অথচ উচিত ছিল, সকল কৃতিত্ব ও

১. সূরা মা'আরিজ : ১৯

প্রশংসা আমরা আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের দিকে ফিরাব আর যত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তা নিজের দিকে ফিরাব।

আল্লাহর সঙ্গে বেচা-কেনা

এবার বলুন! মানুষের মধ্যে কত বড়-বড় ত্রুটি রয়েছে! যে যন্ত্রে এত ত্রুটি, তা কি কেউ কিনতে চাইবে? না; কেউ কিনতে চাইবে না। কিন্তু কবি বড়ই বিস্ময়কর কথা বলেছেন–

تو بہ علم ازل مرا دیدی * دیدی آنگہ بعیب بخریدی.

تو بہ علم آں و من بعیب ہماں * در مکن آنچہ خود پسندیدی.

'তুমি আমাকে চিরস্থায়ী জ্ঞানসহ দেখেছ। সব ত্রুটি জেনে-শুনেই ক্রয় করেছ। আপনি মহাজ্ঞানী আর আমি মহাপাপী। হে আল্লাহ! যাকে তুমি পছন্দ করেছ, তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না।'

হে আল্লাহ! আপনি চিরস্থায়ী জ্ঞানসহ আমাকে দেখেছিলেন, আমার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি, পাপ-পঙ্কিলতাসহই আমাকে দেখেছিলেন; তারপর ক্রয় করেছেন। আপনি সেই জ্ঞানে জ্ঞানী আর আমি সেই ত্রুটিযুক্ত পাপী। হে আল্লাহ! যাকে আপনি পছন্দ করে ক্রয় করেছেন, তাকে ফিরিয়ে দেবেন না। এখানে পছন্দ করার অর্থ হলো ত্রুটি ছিল প্রচুর। তারপরও আল্লাহ রব্বুল ইয্যত শত ত্রুটি সত্ত্বেও নিজের পক্ষ থেকে বেচা-কেনা চূড়ান্ত করে ঘোষণা দিলেন–

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জীবন ও সম্পদকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।'[১]

এখানে বিনিময়স্বরূপ যদিও জান্নাতের নাম নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা জান্নাতী উদ্যান উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার দিদার উদ্দেশ্য। আর তাঁর বহু কাঙ্ক্ষিত দিদার যেহেতু জান্নাত ছাড়া অন্য কোথাও হবে না, তাই বলা যায়, মূলত আল্লাহ রব্বুল ইয্যত এ চুক্তির বিনিময়ে জান্নাতও দেবেন, দিদারও নসিব করবেন।

সুবহানাল্লাহ! কেমন বরকতময় বেচা-কেনা!

---

১. সূরা তাওবা : ১১১

কবি বলেন,

جب تک بکے نہ تھا کوئی پوچھانہ تھا * تونے خرید کر ہمیں انمول کردیا.

'যতক্ষণ বিক্রি হইনি, কেউ জিজ্ঞেসও করেনি। তুমি ক্রয় করে আমায় অমূল্য রত্ন বানিয়ে দিয়েছ!'

আল্লাহর ভালোবাসার আবেগ-জযবা

মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে ত্রুটি তো অনেকই রয়েছে; কিন্তু একটি বিস্ময়কর আবেগ-জযবাও তার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই আবেগ-জযবা যখন জাগ্রত হয়, তখন মানুষ তার দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে, তার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে চারিত্রিক গুণে রূপান্তরিত করতে পারে, যার ফলে সে জান্নাতে অধিকারী হয়ে যায়। সেই আবেগ-জযবার নাম 'মহব্বতে ইলাহী' তথা 'আল্লাহর ভালোবাসা'। এই আবেগ-জযবা মানুষের মধ্যে তেমনই ভূমিকা রাখে, যেমন ছোট চারা গাছের জন্য পানির ভূমিকা। পানির সংস্পর্শ না পেলে সজীব-শ্যামল চারা গাছটি মলিন হয়ে যায়, পাতাগুলো শুকিয়ে ঝরে ঝরে মাটিতে পড়ে যায়। যদি সেই মলিন চারা গাছে পানির ছোঁয়া লাগে, তখন তা পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে। মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসার জযবার দৃষ্টান্তও এরূপ যে, যার মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসার আবেগ-জযবা জেগে উঠবে, তার মধ্যে বিশেষ-বিশেষ গুণাবলিও ফুটে উঠবে এবং তার থেকে ঈমানের সৌরভও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। মুগ্ধতায় থমকে দাঁড়াবে আশপাশের পরিবেশ।

প্রেম ও বিবেকের দ্বন্দ্ব

অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ সর্ব বিষয়ে বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে জীবন যাপন করে। আবার কখনও দেখা যায়, তারা প্রেম-ভালোবাসার আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে জীবন কাটায়। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিৎ, মানুষের বিবেক হলো মহা নির্লজ্জ। কবি বলেন−

عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے * عشق بے چارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب.

'বিবেক হলো মহা নির্লজ্জ। শত-শত বেশ পরিবর্তন করে, বহুরূপী সাজে। আর প্রেম বেচারা এতই সরল যে, না সে মোল্লা হতে পারল, না বক্তা, না খতীব।'

যে বান্দার মধ্যে আল্লাহর প্রেমের জযবা থাকবে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের দরবারে তার খুব মূল্যায়ন ও সমাদর হবে। যদি বিবেকের জোরে ইবাদত করতে থাকি, তাহলে ইবাদত তো লেখা হবে; কিন্তু এমন ইবাদত হবে ভীত্তিহীন ও দুর্বল।

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں * عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ.

'বিবেকের তো অবসর নেই দোষ তালাশ করার। তুমি ভালোবাসার ওপর আমলের ভিত্তি রাখো।' কবি বলেন–

نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی * اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی.

پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل * عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی.

عشق فرمودۂ قاصد سے سبک گام عمل * عقل سمجھی ہے نہیں معنیٔ پیغام ابھی.

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق * عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی.

'হে হতভাগা বুলবুল! তোমার প্রেম এখনও অপরিপক্ক। একে আরো একটু বুকে চেপে ধরে রাখো। বিবেক যখন দূরদর্শী হয় এবং প্রেম যখন কল্যাণময় হয়, তখন তা পরিপক্ক হয়। কিন্তু তুমি তো এখনো কাঁচা। ইশক তো প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষুদ্র পদক্ষেপ। বিবেক তো এখনো প্রেমবার্তার মর্মই বুঝতে সক্ষম হয়নি।'

বিবেক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে এবং চিন্তা করে সামনে এগুবে কিনা। অথচ ভালোবাসা ততক্ষণে সেই দুর্গম পথে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। একসময় তা অতিক্রমও করছে। ভালোবাসা তো নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর বিবেক তখন এই তামাশার যুক্তি খুঁজে ফিরছে। বিবেকের উড্ডয়ন সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না, যেখানে মানুষ ভালোবাসার ডানায় ভর করে উড়ে যেতে পারে।'

আল্লাহর ভালোবাসার তাৎপর্য

কোনো কবি বলেছেন–

عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدۂ تصورات.

'ভালোবাসা যদি না থাকে, তাহলে এই দীন নিষ্প্রাণ ছবির মতো হয়ে যায়। না তাতে প্রাণ থাকে, না প্রাণবন্ততা।'

তবে দীন ও শরীআয় তখনই প্রাণ সঞ্চারিত হয়, যখন অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসার জযবা জেগে ওঠে। তারপর তো তার আমলের মধ্যেও প্রাণবন্ততা ফিরে আসে। এ কারণেই আল্লাহর বিশেষ বান্দারা ইশ্ক ও ভালোবাসার চূড়ান্ত পর্যায়টাই আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাইতেন।

تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں * میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں.

چھوٹا سا دل ہوں مگر شوخ اتنا * وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں.

'আমি তোমার ভালবাসার সর্বোচ্চ শিখর কামনা করছি। দেখো না আমার সরলতা; আমি কী চাই। ছোট্ট একটা হৃদয় চাই আমি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা কত বিশাল যে, তোমার মুখে 'লান তারানী' শুনতে চাই।'

এ তো ভালোবাসা-ই, যা দীন ও শরীআতকে রাঙিয়ে দিয়েছে, আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসাই যদি না থাকল, তাহলে অবশিষ্টই বা কি রইল? হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়গুলো তোমার ভালোবাসায় রাঙ্গিয়ে দাও। তোমার ভালোবাসাই যেন হয় জীবনের সাধনা, মনের বাসনা, স্বপ্নিল আরাধনা।

আল্লাহর কাছে আল্লাহকেই প্রার্থনা করো

এই ইশ্কে ইলাহী ও আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের জন্যই আমাদেরকে এই দীর্ঘ হায়াত দান করা হয়েছে। তাই মানুষ যখন আল্লাহর নিকট কিছু চাইবে, তখন আল্লাহকেই চাইবে। আজ আল্লাহর নিকট সম্পদের প্রার্থনাকরী তো অনেক আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ির প্রার্থনাকারীও কম নেই, কিন্তু আল্লাহর কাছে আল্লাহকে প্রার্থনাকারীদের সংখ্যা অতি সামান্য। অতি স্বল্পসংখ্যক লোক এমন পাওয়া যাবে, যারা হাত তুলে দু'আ করে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি চাই, আপনার ভালোবাসা চাই।'

বন্ধুরা আমার! যদি কেউ আল্লাহর নিকট ঘর-বাড়ি চায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার-পরিজন, টাকা-পয়সা চায়, তাহলে বিশ্বাস করুন, সে আসলে কিছুই চায়নি। তার চাওয়া অসম্পূর্ণ। আর যদি সে আল্লাহর ভালোবাসা চায় তাহলে সে দুনিয়ার সব কিছুই চাইল। কারণ, আল্লাহর ভালোবাসার সামনে দুনিয়ার সকল ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কোনো মূল্য নেই। তাই একে কামনা-বাসনা বানিয়ে প্রার্থনা করুন, 'হে দয়াময় আল্লাহ! আপনার এমন ভালোবাসা প্রার্থনা করছি, যার দ্বারা আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা থেকে, কল্পনার প্রতিটি রন্দ্র থেকে পাপের কালিমা বিদূরিত হয়ে যায়।

فَلَيْتَكَ تَحْلُوْ وَالْحَيَاةُ مَرِيْرَةٌ * وَلَيْتَكَ تَرْضٰى وَالْاَنَامُ غِضَابٌ.

وَلَيْتَ الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ عَامِرٌ * وَبَيْنِيْ وَبَيْنَ الْعَالَمِيْنَ خَرَابٌ.

'হায়! যদি তুমি আমার জন্য মিষ্টি হয়ে যেতে, চাই দুনিয়া আমার জন্য তিক্ত হয়ে যাক, যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে যেতে, চাই সবাই আমাকে ঘৃণা করুক, যদি তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন সুদৃঢ় হতো, চাই গোটা পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হোক, কত ভালো হতো! আমি এটা-ই চাই।'

আল্লাহর প্রতি রাবেয়া বসরীর ভালোবাসা

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের পর দু'আ করছিলেন, 'হে আল্লাহ! সূর্য অস্ত গেছে। পৃথিবীময় রাত ছেয়ে গেছে। আকাশের তারাগুলো ঝলমল করছে। দুনিয়ার বাদশারা নিজ-নিজ দরজাগুলো বন্ধ করে ফেলেছে। এখন শুধু তোমার দরজা খোলা আছে, তাই তোমার দরবারে আঁচল বিছিয়ে বসেছি, আমার হাত দুটি খালি ফিরিয়ে দিও না ... ।'

আহ্! সত্যিই, আল্লাহর কাছে চাওয়ার প্রকৃত স্বাদ তাঁরাই পেয়েছিলেন। আল্লাহ আমাদেরও সেই দৌলত নসিব করুন। আমীন।

মিথ্যা ভালোবাসা

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে বললেন, দাউদ! আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, ওই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, যে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে, অথচ শেষ রাতে চোখ বুঝে ঘুমিয়ে থাকে। প্রেমিক কি তার প্রিয়জনের নির্জন সান্নিধ্য চায় না? অবশ্যই চায়। তাহলে যে আমার সঙ্গে ভালোবাসার দাবি করে, সে যেন রাতের গভীরে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং আমার সঙ্গে গোপন অভিসারে ধরা দেয়।

শাহ্ ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রহ.-এর ভালোবাসা

হযরত শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাবাদী (রহ.) একজন উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। একবার হযরত থানবী (রহ.) তাঁর কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে তিনি কাছে বসিয়ে কথায়-কথায় বললেন, আশরাফ আলী! আমি যখন সিজদা করি, তখন এমন অনুভব হয় যে, স্বংয় আল্লাহ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর দিচ্ছেন। আশরাফ আলী! আরও কী হয় জান? যখন

কুরআন তেলাওয়াত করি, তখন মনে হয়, আমি আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের সঙ্গে কথা বলছি। আমার তখন এত ভালো লাগে যে, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না! জান্নাতে যখন হুররা আমার কাছে আসবে, তখন বলব, বিবি সাহেবা! একটু কুরআন পড়ে শোনাও তো! সুবহানাল্লাহ! তিনি নকশবন্দী সিলসিলার একজন বড় মাপের শায়খ ছিলেন। মুরাকাবাকে তিনি 'প্রেমপেয়ালা' বলতেন। মুরাকাবায় এত বেশি স্বাদ পেতেন যে, যখন মুরাকাবায় বসতেন, তখন মুরীদদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'এসো! এক সাথে বসে প্রেমপেয়ালায় চুমুক দেই'।

আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ

হযরত ইমাম রাযী (রহ.) খুব বিস্ময়কর কথা বলতেন। একবার তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! তোমার স্মরণ ব্যতীত দিন ভালো লাগে না, তোমার সঙ্গে কথপোকথন ব্যতীত রাত ভালো লাগে না। সুবহানাল্লাহ!

জি হ্যাঁ! আল্লাহর প্রেমে বিভোর যারা, তারা রাতের নিঝুম প্রহরের জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকে ঠিক নতুন দুলা যেমন নববধূর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষায় থাকে। কেন? কারণ, নিঝুম প্রহরে আল্লাহর সঙ্গে কথপোকথনের মজাই ভিন্ন। এর ধরন বলে বোঝানো যাবে না। দেখুন! এক ধরনের স্বাদ মানুষ জিহ্বা দিয়ে আস্বাদন করে। স্বাদ পায় যে, কখনও মিস্টার বার্গারের দিকে ছোটে, কখনও বা মিস্টার চাইনিজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

মোটকথা, স্বাদ মানুষের জিহ্বার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এমনিভাবে কিছু স্বাদ মানুষের চোখের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে। যেমন- কখনও খুব সুন্দর বা দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য চোখে পড়ল, তখন চোখ খুব মজা করে তা উপভোগ করে। এমনিভাবে কিছু স্বাদ কানের সাথে জড়িত আছে। কেউ সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করছে, কারী আব্দুল বাসেত, কারী আব্দুস সামাদ কেরাত পড়ছে, তখন খুব ভালো লাগে। মন চায়, আরও শুনি, শুনতেই থাকি। এমনিভাবে কিছু স্বাদ এমনও আছে, যা মানুষের অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই স্বাদের নাম হলো ইশ্কে এলাহীর স্বাদ।

এবার চিন্তা করুন, অন্তর যেহেতু সকল অঙ্গের মধ্যে সেরা অঙ্গ, তাই অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বাদও সকল অঙ্গ-সম্পৃক্ত স্বাদের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হবে, বেশি উপভোগ্য হবে। স্বাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণাইবা কী আছে।

যারা ইশ্‌কে ইলাহী বা আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ পেয়ে গেছেন, তারা তো এভাবেই কথা বলেন–

اللہ اللہ ایں چہ شیریں است نام * شیر وشکر می شود جانم تمام.

'আল্লাহ, আল্লাহ এ কেমন মধুর নাম, যা মুখে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার দেহ-মন এমনভাবে মধুময় হয়ে গেছে, যেভাবে দুধের মধ্যে চিনি পড়লে দুধ মিষ্টি হয়ে যায়।'

ইশ্‌ক-ভালোবাসা একটি অগ্নিশিখা

اَلْعِشْقُ نَارٌ يُحَرِّقُ مَاسِوى اللهِ.

'ভালোবাসা একটি অগ্নিশিখা, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।'

ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) এ বিষয়ে খুবই চমৎকার কিছু কবিতা লিখেছেন। একটি কবিতার কিছু অংশ একজন উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا * ماسوی معشوق سب کچھ جل گیا.

تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا * دیکھئے پھر بعد اس کے کیا بچا.

پھر بچا اللہ باقی سب فنا * مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا.

'ইশকের আগুন যখন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল, মাশুক ছাড়া সব কিছু পুড়ে গেল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তরবারি দিয়ে সব হত্যা বৈধ হয়ে গেল! দেখো; তারপর আর কী-ইবা বাকি রইল! তারপর শুধু আল্লাহ বাকি রইলেন। অবশিষ্ট সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল। হে ইশক! তোমাকে মারহাবা! মরাহাবা তোমাকে হে প্রেম!'

যখন ভালোবাসা হৃদয়ের গভীরে বিরাজ করে, তখন অত্যন্ত দাপট নিয়ে গাইরুল্লাহর মহব্বতের ওপর শাণিত তরবারী হয়ে আঘাত হানে এবং মানুষের মধ্যকার হিংসা, বিদ্বেষ, আমিত্ব, অহংকার ইত্যাদি মন্দ স্বভাবগুলোর মূল উৎপাটন করে ফেলে।

شاد باد اے عشق خوش سودائے ما * اے طبیب جملہ علت ہائے ما.

اے دوائے نخوت وناموس ما * اے کہ افلاطون وجالینوس ما.

'হে ইশক! তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমার অন্তরের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা দিলে, তুমি বিরল ও অভিনব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে, আমার জন্য আফলাতুন ও জালিনুসের ভূমিকা রাখলে!'

এই ইশক ও ভালোবাসা তখন বান্দার ক্ষেত্রে আফলাতুন ও জালীনূস-এর মতো বিখ্যাত ডাক্তার হয়ে যায় এবং অন্তরের সকল রোগ-ব্যাধির সকল চিকিৎসা করে।

আল্লাহর ভালোবাসা চরমভাবে উপেক্ষিত

বন্ধুরা আমার! আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা না থাকার কারণে আমাদের সকল আমল, ইবাদত, বন্দেগী নিস্প্রাণ হয়ে গেছে। কবি ইকবাল বলেন–

محبت کا جنوں باقی نہیں ہے * وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے.

نماز وروزہ وقربانی وحج * یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے.

'ভালবাসার পাগলামি অবশিষ্ট নেই। সেই হৃদয় আর সেই আবেগ আর বাকি নেই। নামায-রোযা, কুরবানি ও হজ সবই তো আজও তেমনই আছে; কিন্তু তুমি তো আগের মতো নেই!'

এক সময় মানুষের মধ্যে আল্লাহর ইশ্ক ও মহব্বতের যে আবেগ ও জযবা পাওয়া যেত, যার কারণে মানুষ সর্বদা চঞ্চল ও প্রাণবন্ত হয়ে চলা-ফেরা করত, সেই ইশক্-মহব্বত আজ আর নেই। একটা সময় অতীত হয়েছে যে, এই অন্তর আল্লাহর ইশ্ক ও মহব্বতের আগুনে তপ্ত হয়ে উঠত আর আজ সেই অন্তরগুলো পুড়ে যাওয়া ছাইয়ের মতো নিরুত্তাপ পড়ে আছে। আরও একস্থানে তিনি লিখেছেন–

حقیقت خرافات میں کھو گئی * یہ امت روایات میں کھو گئی.

لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب * مگر لذت شوق سے ہے بے نصیب.

عجم کے خیالات میں کھو گیا * وہ سالک مقامات میں کھو گیا.

بجی عشق کی آگ اندھیر ہے * مسلماں نہیں راکھ کا ڈھیر ہے.

'বাস্তবতা আজ মন্দের খরায় বিলীন হয়ে গেছে। এই উম্মত আজ প্রথা-প্রচলনের পেছনে হারিয়ে গেছে। খতীবের বয়ান তো মন কাড়ে; কিন্তু

জযবার স্বাদ থেকে সব বঞ্চিত হয়ে গেছে। অনারবদের চিন্তা-চেতনায় বুঁদ সবাই। সাধকরাও তাদের গৌরব হারিয়েছে। ইশকের অগ্নিও নিভে গেছে। সব কিছু অন্ধকার লাগছে। এরা তো মুসলমান নয়; যেন ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হয়ে গেছে।'

আজকের মুসলমানরা সব নিরুত্তাপ ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। বুকে আল্লাহর ভালোবাসার সেই আগুন নেই যা তার হৃদয়কে উত্তাপ্ত করবে। তাকে নামাযে দাঁড় করাবে, স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে হাঁটু গেড়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে।

আল্লাহর প্রতি নবীজির ভালোবাসা

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা এতো গভীর ছিল যে, আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, 'যখন আযানের আল্লাহু আকবার ধ্বনি নবীজির কানে পড়ত, তখন তিনি এমন ভাব করতেন, যেন আমাদের চেনেনই না। আমি কয়েকবার তাঁর সামনে আসতাম আর তিনি বলতেন, 'তুমি কে? আমি বলতাম, 'আমি আয়েশা'। জিজ্ঞাসা করতেন, আয়েশা কে? আমি বলতাম, 'আবুবকরের কন্যা'। জিজ্ঞাসা করতেন, 'আবুবকর কে?' তখন আমি বুঝতে পারতাম, এই মুহূর্তে একটিমাত্র নাম তাঁর দেহ-মন এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, দুনিয়ার কাউকেই তিনি এখন আর চিনতে পারবেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ যুলবিজাদাইন ও খোদাপ্রেম

যাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও খোদাপ্রেম থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের খুব মূল্যায়ন করেন। আল্লাহর ভালোবাসায় আমরা যেন সাহাবী আব্দুল্লাহ যুলবিজাদাইনের মতো হতে পারি সেই চেষ্টা করা উচিৎ। তার একটি ঘটনা শুনুন।

হযরত আব্দুল্লাহ যুলবিজাদাইন একজন তরুণ সাহাবী ছিলেন। মদীনা তাইয়্যিবা হতে কিছুটা দূরত্বে অবস্থিত ছোট্ট এক বস্তিতে তার বসবাস ছিল। বন্ধুদের কাছে শুনলেন, মদীনায় আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূল তাশরীফ এনেছেন। তিনি কৌতূহলী হয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গেলেন এবং কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে ঘরে ফিরলেন। ঘরের সবাই তখনও অবিশ্বাসী কাফের ছিল। ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তখন প্রকাশ করা চরম বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু ভালোবাসা তো এমন জিনিস, যা

লুকিয়ে রাখা যায় না। নিজের পক্ষ থেকে লুকানোর চেষ্টা করছেন, কাউকে বুঝতে দেননি; কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম কারো মুখে শুনলেই তৎক্ষণাৎ সেদিকে মনোযোগ দিতেন। নবীজির নামে কেউ মন্দ কথা বললে তিনি ব্যথিত হতেন, প্রতিবাদ করতেন। এতে ঘরের লোকদের বুঝতে বাকি রইল না, সে মুসলমান হয়ে গেছে।

একদিন চাচা দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কালেমা পড়েছ? মুসলমান হয়েছ? তিনি বললেন, জি। চাচা বলল, ঠিক আছে। এবার তোমার সম্মুখে দুটি পথই খোলা আছে। একটি হলো, যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও, তাহলে এখনই বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে এসো এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করো। অপরটি হলো, ইসলাম যদি ত্যাগ করতে না পার, তাহলে এই বস্তি ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। হযরত আব্দুল্লাহ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন তো ত্যাগ করতে পারব, কিন্তু আল্লাহর দীন ছাড়তে পারব না।

এ কথা শুনে চাচা প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন। উন্মাদের মতো তাকে মার-পিট করলেন। দেহ থেকে কাপড় খুলে নিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলেন। মা-বাবা দাঁড়িয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। থেকে-থেকে মা কেঁপে উঠছে, কিন্তু স্বামীর সম্মুখে মুখ খোলার সাহস পায়নি। বুকের ধন প্রিয় সন্তানের সঙ্গে এমন নির্মম পাশবিক আচরণ দেখে তার মাতৃসুলভ মমতা উৎলে উঠল। গোপনে একটি লম্বা চাদর তাকে দিয়ে বললেন, যাও বাবা, সতর ঢেকে নাও। তিনি চারদটা দুটুকরা করে এক টুকরা পরিধান করলেন এবং অপর টুকরা গায়ে জড়ালেন।

এ কারণেই তাকে 'যুলবিজাদাইন' অর্থাৎ দুই চাদরওয়ালা বলেই সবাই জানতেন। এবার তিনি কোথায় গেলেন? কোথায় আর যাবেন? যেখানে জীবনের সওদা হয়ে গেছে, সে দিকেই চললেন। ধীর-স্থির কদমগুলো মদীনা তাইয়্যিবার দিকে ছুটে চলল। রাতভর পায়দল সফর করে সকালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজি যখন তাকে দেখলেন, তাঁর চেহারা মুবারকে এক বিস্ময়কর আনন্দ ও তৃপ্তি ফুটে উঠল। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অপলক নেত্রে দেখছেন, কে এল? কে সে, যাকে দেখে নবীজির চেহারায় এমন আনন্দের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল?

নবীজির খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব কিছু ছেড়ে এসেছি। আপনার কদমে ঠাঁই দিন।' নবীজি তাঁকে অত্যন্ত

আন্তরিকতার সাথে বরণ করে নিলেন এবং সুফ্ফায় অবস্থানকারী সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গী হয়ে সেখানেই থাকতে শুরু করলেন।

যেহেতু অনেক বড় মাপের ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, সর্বস্ব উৎসর্গ করে নিজের জীবনটাকে বাজি রেখে আল্লাহর ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাই পুরস্কারও তেমনই পেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন হালত দান করলেন যে, আল্লাহর ভালোবাসায় কখনও-কখনও তিনি 'ওয়াজ্দ' (আত্মভোলা)-এর হালতে চলে যেতেন। আজকাল কেউ-কেউ প্রশ্ন করে, "জি জনাব! ওয়াজদ কী জিনিস? আরে ভাই! হাদীছ অধ্যয়ন করো; সেখানে প্রমাণ মিলবে, কোনো-কোনো সাহাবীর ওপরও 'ওয়াজদ'-এর হালত তৈরি হতো। হাদীছ শরীফে এসেছে, এই সাহাবী (হযরত আব্দুল্লাহ যুলবিজাদাইন) কখনও-কখনও মসজিদের দরজায় বসে থাকতেন। হঠাৎ এমন 'ওয়াজ্দ' আসত যে, চিৎকার করে আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ বলে উঠতেন। একবার হযরত ওমর (রাযি.) দেখে খুব বকাঝকা করলেন, 'কী করছ এসব?' তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমরকে বললেন, 'ওমর! আব্দুল্লাহকে কিছু বলো না। এ যা কিছু করছে, পূর্ণ ইখলাসের সাথেই করছে।

ঈর্ষণীয় দুনিয়াত্যাগ

কিছুদিন পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত আব্দুল্লাহও তাঁর সফরসঙ্গী হলেন। পথে একস্থানে তার প্রচণ্ড জ্বর হলো। নবীজি জানতে পেরে সঙ্গে-সঙ্গে আবুবকর ও ওমর (রাযি.)কে সাথে করে তার কাছে ছুটে এলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাযি.)-এর তখন অন্তিম মুহূর্ত। নবীজি তাঁর মাথাটা তুলে নিজের কোলে রাখলেন। ইনিই সেই ভাগবান সাহাবী, অন্তিম মুহূর্তে যার দৃষ্টি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারার ওপর স্থির ছিল এবং তাঁর মমতার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাসগুলো নিচ্ছিলেন। অবশেষে ওই অবস্থায়ই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। মহান সৃষ্টিকর্তা তার ভালোবাসার পাত্রকে নিজের কাছে তুলে নেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মাননা

ইন্তিকালের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আব্দুল্লাহর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করো। তিনি নিজের চাদরখানা বিছিয়ে দিয়ে বললেন, আব্দুল্লাহকে এই চাদর দিয়ে কাফন পড়াও।

সুবহানাল্লাহ! বাহ! কী চমৎকার তোমার শান? কী চমৎকার তোমার কদরদানি? যে দেহটি তোমার ভালোবাসায়, তোমার পথে বিবস্ত্র করা হয়েছিল, আজ সেই দেহখানা ঢাকার জন্য তোমার প্রিয়তম রাসূলের চাদরকে নির্বাচন করেছ! সুবহানাল্লাহ!

তো বন্ধুরা! বেচা-কেনা করেই তবে দেখুন! তারপর আল্লাহ কত বড় কদরদান ও মূল্যায়নকারী তাও দেখতে পাবেন। আমাদের কথা আর কী বলব? আমরা তো বড়ই অকৃতজ্ঞ, যার কারণেই স্বয়ং আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে বলেন–

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ.

'তারা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি।'[১]

যাহোক! স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহর জানাযা পড়ালেন। তারপর জানাযা নিয়ে কবরস্তানে পৌঁছলেন। শরীয়তের মাসআলা হলো, মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে নিকটের আত্মীয় যে হবে, সে তাকে কবরে রাখার জন্য নামবে। তখন হযরত আবুবকর ও ওমর (রাযি.) দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবীজি নিজেই কবরে নামলেন। বললেন, তোমাদের ভাইকে আমার হাতে তুলে দাও, সাবধান আদবের সাথে দিয়ো। তারপর তাঁকে হাতে নিয়ে কবরের অন্তিম শয্যায় শুইয়ে দিলেন। এক সত্যিকারের খোদাপ্রেমী এভাবেই দুনিয়া ত্যাগ করলেন।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর আক্ষেপ

বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আব্দুল্লাহ জুলবিজাদাইনকে কবরে রাখছিলেন, তখন বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি আব্দুল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট; আপনিও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।' এই শব্দগুলো শুনে হযরত ওমর (রাযি.) এর মধ্যেও 'ওয়াজ্‌দ' এসে গিয়েছিল। তিনি বললেন, 'আহ! কী সৌভাগ্য! আজ নবীজির মোবারক হাতে যদি আমার মৃতদেহ থাকত, তাহলে কতই-না ভালো লাগত!

তো বন্ধুরা! দেখতেই পেলেন, যারা আল্লাহর জন্য ত্যাগ স্বীকার করে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, তাদের তিনি কিভাবে মর্যাদা দান করেন! একটু চিন্তা করুন, সেই মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর দুর্বল বান্দাদের জন্য ঘোষণা দিচ্ছেন-

---

১. সূরা আন'আম : ৯১

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ.

'ইহসানের বিনিময় ইহসান ব্যতীত অন্য কিছু হয় নাকি?'[১]

অর্থাৎ না, এমন হয় না। সেই সৃষ্টিকর্তার নামে যখন কেউ ত্যাগ স্বীকার করে, আত্মনিবেদন করে, তার প্রতি কি তিনি অবিচার করতে পারেন? তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যায়ন কি তিনি করবেন না? অবশ্যই করবেন। সুবহানাল্লাহ!

হযরত যুনাইরা (রাযি.) ও তার খোদাপ্রেম

হযরত যুনাইরা (রাযি.) একজন নারী সাহাবী ছিলেন। কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। আবুজাহ্ল বিষয়টি জানতে পেরে ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কি মুহাম্মাদের কালেমা পড়েছিস'? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

হযরত যুনাইরার বয়স হয়েছিল। নির্যাতন সহ্য করার মতো ধৈর্য এখন আর নেই। আবুজাহ্ল তার বন্ধুদের উপস্থিতিতে তাঁকে বেদম প্রহর শুরু করল। হযরত যুনাইরা (রাযি.) দাঁত কামড়ে সকল কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছিলেন। কারণ, তিনি তো আল্লাহর নামে আরও বড়-বড় কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁকে প্রহর করতে-করতে আবুজাহ্ল নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। একপর্যায়ে একটা কাঠ দিয়ে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হানল। এতে হযরত যুনাইরা (রাযি.) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন।

এবার আবুজাহ্ল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে কটাক্ষ করে বলল, দেখছিস! আমাদের মূর্তিগুলোর পূজা ছেড়ে দেওয়ার কারণেই তারা তোর দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। কথাটা হযরত যুনাইরার বুকে বর্শার মতো বিঁধলো। নিমর্ম চাবুকাঘাত সহ্য করলেন, ক্ষুৎ-পিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করলেন, সকল নির্যাতন-নিপীড়ন অকাতরে সয়ে গেলেন; কিন্তু এই কথাটা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। আল্লাহর ক্ষমতা ও মর্যাদার বিরুদ্ধে উচ্চারিত কথাটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে কোনো রকম নির্জন কামরায় প্রবেশ করেই তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। বড় অভিমানী কণ্ঠে আল্লাহর সঙ্গে গোপন অভিসারে লিপ্ত হলেন– 'হে আল্লাহ! তারা আমাকে চাবুকাঘাত করেছে; সহ্য করেছি, মারতে-মারতে হাড্ডিগুলো ভেঙে দিয়েছে;

---

১. সূরা আর-রাহমান : ৬০

কিছুই বলিনি, আঘাতে-আঘাতে শরীরটাকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে; তখনও দাঁত কামড়ে সব অত্যাচার সহ্য করেছি; কিন্তু তোমার শানে এমন বে-আবদি তো সহ্য করতে পারছি না। হে আল্লাহ্! এটা তোমার মান-মর্যাদার ব্যাপার! তারা বলে, আমার দৃষ্টিশক্তি নাকি তাদের নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু-না আমি একথা বিশ্বাস করি না। আমার তো বিশ্বাস, যখন আমি কিছুই ছিলাম না, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করছ। সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের সঙ্গে দৃষ্টিশক্তিও তুমিই দিয়েছ, আবার এখন তো তুমিই ছিনিয়ে নিয়েছ। তারা কেউ এসবের কোনো ক্ষমতা রাখে না। হে আল্লাহ! আমার ব্যক্তিত্বে আঘাত লেগেছে। আমি তোমার ইয্যত ও মর্যাদার দোহাই দিয়ে দু'আ করছি, তুমি পুনরায় আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও, যেন তারা তোমার কুদরত ও শক্তিমত্তার পরিচয় পায়।'

এভাবে তিনি দু'আ শেষ করে অশ্রুসিক্ত হাতদুখানা এখনও মুখে বোলাননি, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ! আজ আমাদের কী অবস্থা! তখনকার পুরুষরা তো ছিলই, নারীদের মধ্যে পর্যন্ত আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসার এমন জযবা ছিল।

বিবি আসিয়ার খোদাপ্রেমের কাহিনী

এবার আপনাদের সামনে এক রাজরানীর গল্প বলব, যাঁর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ছিল অকল্পনীয়। তাঁর নাম ছিল আসিয়া। যুগের সবচেয়ে শক্তিধর বাদশা ফেরাউনের স্ত্রী ছিলেন তিনি। আল্লাহ তা'আলা তাকে রূপে-গুণে সৌন্দর্যের প্রতীক বানিয়েছিলেন, যার কারণে ফেরাউন তাঁর প্রেমে মুগ্ধ ছিল। রাজকীয় আরাম-আয়েশের কোনোই কমতি ছিল না তাঁর। যেমন ইচ্ছা তেমন পোশাক পরিধান করতেন। যেভাবে ইচ্ছা ঘর সাজাতেন। যেমন ইচ্ছা তেমন পানাহার করতেন। বিশ-ত্রিশজন পরিচারিকা তাঁর সেবায় সদা নিয়োজিত ছিল। সারাদিন শাহী মহলে রাজত্ব করে বেড়াতেন। বড়ই সুখের জীবন ছিল তাঁর।

একদিন জানতে পারলেন, আল্লাহ্ তা'আলা একজন নেক বান্দাকে নবী হিসেবে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। তিনি মানুষকে মানুষের ইবাদত ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন। তাঁর সেই একত্ববাদের পবিত্র বাণী রানী আসিয়ার কানেও পৌঁছল এবং অন্তরে গেঁথে গেল। তার অন্তর সাক্ষ্য দিল, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যেকথা বলছেন, তা সত্য ও ইনসাফপূর্ণ বটে; কিন্তু আমার স্বামী

ফেরাউন তো নিজেই নিজেকে খোদা বলে দাবি করেন। অথচ সত্য কথা হলো, সমগ্র পৃথিবীর খোদা হলেন আল্লাহ।

এ নিয়ে ভাবতে-ভাবতে কয়েকদিন কেটে গেল। তিনি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। বারবার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, খোদা তো তিনি, যিনি জীবনও দান করেন এবং মৃত্যুও দান করেন। আমার স্বামী মিস্টার ফেরাউন তো আমার তোষামুদিতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, আমার কথায় উঠ-বস করে, তাহলে সে কী করে খোদা হবে? এত কিছুর পরও তিনি ছিলেন তো নারী; তাই সারাক্ষণ একটা অজানা আতঙ্কে পার হতে লাগল, পাছে ফেরাউন যদি জেনে যায়, তাহলে আর রক্ষা হবে না। শাহী মহলের সকল আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস নিমেষেই মাটির সঙ্গে মিশে যাবে আর নির্যাতনের পাহাড় ভেঙে পড়বে মাথায়। তবুও মন বারবার হোঁচট খেত, আসিয়া! এগুলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস। আখেরাতের সুখ-শান্তি হলো চিরস্থায়ী। সেটাই আসল জীবন। সেই অনন্ত জীবনের জন্য তোমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। মূসা যে সত্যের আহ্বান নিয়ে এসেছেন, তাতে সাড়া দাও!!

অবশেষে আসিয়া চুপে-চুপে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনলেন এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তার ঈমান সম্পর্কে অবহিত করলেন।

এবার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা রং ছড়াল। ধ্যান-ধারণা, কথা-বার্তার ধরন বদলে গেল। এখন থাকেন যদিও ফেরাউনের সাথে, কিন্তু অন্তর দূরে সরে এল। ফেরাউনের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে লাগল। বিষয়টি বেশিদিন গোপন থাকল না। ফেরাউন আলামতে বুঝে ফেলল, আসিয়া তার থেকে দূরে সরে গেছে। যেমন– সে যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ তুলত, আসিয়া খুব মনোযোগসহ তার কথা শুনতেন। যখন এক আল্লাহর আলোচনা আসত, তখন তাঁর চেহারার রঙ্গ ও ভাব-ভঙ্গি বদলে যেত। ঠিক কবিতার এই ছন্দটির মতো।

اک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا.

অর্থ : একটা মুহূর্তও আত্মগোপনে থাকা সম্ভব হল না, যখন কেউ তোমার নাম নিল।

যখন ফেরাউন তার সম্মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করত, তখন তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন, আল্লাহর ইশক ও মহব্বতের উত্তাল তরঙ্গ তার হৃদয়সাগরে গর্জন করে উঠত। অবশেষে ফেরাউনের নিকট এই রহস্য

উন্মোচিত হয়ে গেল যে, 'আমার স্ত্রী আসিয়া তো মূসার রবের ওপর ঈমান এনেছে' তখন সে হযরত আসিয়াকে খুব বোঝাল, 'এমন সিদ্ধান্ত নিয়ো না আসিয়া! আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, তোমার কোন জিনিসের অভাব বলো আমাকে; আমি তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করব।' তিনি বললেন, 'নাহ; যে সত্যকে আমি গ্রহণ করেছি, তা ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এভাবেই পরস্পরে প্রতিদিন কথা কাটাকাটি চলতে লাগল।

একদিন ফেরাউন স্ত্রীর প্রতি খুব ভালোবাসা প্রকাশ করছিল। তখন হযরত আসিয়া তাকে বোঝালেন, 'স্বামী আমার! আপনি যখন আমাকে এত ভালোবাসেন, তখন আমার কথা মেনে নিচ্ছেন না কেন? আসুন! আপনিও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনুন, যিনি আমাদের সবার রব।' ফেরাউন তখন মোমের মতো গলে গিয়ে বলল, 'যাচ্ছি; এখনই যাচ্ছি মূসার কাছে। আমি এখনই ঈমান নিয়ে আসব।' এই বলে সে সত্যি-সত্যি বেরিয়ে গেল। পথে হামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে ফেরাউনের প্রধানমন্ত্রী ছিল। বলল, হামান! সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি মূসার ওপর ঈমান আনব।'

হামান বলল, 'তওবা, তওবা! মূসার মতো একটা গোলামের দাস হওয়ার চেয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করা অনেক ভালো।'

কথাটা ফেরাউনের ব্যক্তিত্যের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানল। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, অসম্ভব, একজন প্রতাপশালী বাদশা একটা ইহুদি গোলামের দাসত্ব বরণ করে নিতে পারে না। সেখান থেকেই সে উল্টোপায়ে ঘরে ফিরে এল। এসে আসিয়াকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, আমি মূসার ওপর ঈমান আনব না। এ নিয়ে হযরত আসিয়ার সঙ্গে তার প্রচণ্ড বাগ্বিতণ্ডা হলো। একপর্যায়ে ফেরাউন ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, তুই মূসার খোদাকে অস্বীকার কর এবং আমাকে খোদা বলে স্বীকার কর। অন্যথায় আমি তোকে কঠিন শাস্তি দেব। হযরত আসিয়া বললেন, বেশ তো, তোমার যা ইচ্ছা হয় করো, আমাকে তোমার মহল থেকে বের করে দিতে পার; কিন্তু আমার অন্তর থেকে ঈমান বের করতে পারবে না।

ফেরাউন প্রথমে হুমকি-ধমকি দিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করল; কিন্তু এতে কোনো ফল হলো না; বরং বিষয়টি এখন তার প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে দেখা দিল। ফেরাউন তার লোকদের নির্দেশ দিল, এখনই তাকে চুলের মুঠো ধরে টেনে-হেঁচড়ে শাহী মহলের বাইরে নিয়ে যাও। সঙ্গে-সঙ্গে নির্দেশ পালিত হলো। কিছুক্ষণ পূর্বেও যিনি ছিলেন রাজরানী, এখন তিনি পথের ভিখারিনী।

তাকে টেনে-হেঁচড়ে শাহী মহলের আঙিনায় নিক্ষেপ করা হলো। শরীর বিক্ষত-বিবস্ত্র, পোশাক ফাটা-ছেঁড়া অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এত কিছুর পরও তিনি ঈমান ছাড়লেন না। ফেরাউন দেখল, এই ছোট-খাট শাস্তিতে তাকে বাগে আনা যাচ্ছে না। তাই এবার আদেশ জারি করল, বন্দীকে মাটিতে শুইয়ে হাতে-পায়ে পেরেক ঠুকে দেওয়া হোক। আদেশমতো হযরত আসিয়াকে মাটিতে শোওয়ানো হলো। নরম-কোমল হাত মাটিতে রেখে তাতে বড় একটা লোহার পেরেক ঠুকে দেওয়া হলো। যে দেহ কোনোদিন ফুলের আঘাতও সহ্য করেনি, আজ তা একমাত্র আল্লাহর জন্য রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। তারপর দ্বিতীয় হাতেও এভাবে পেরেক ঠোকা হলো। তারপর উভয় পায়েও এভাবে পেরেক ঠুকে পুষ্পকোমল দেহটিকে এভাবে মাটিতে সেঁটে দিল! তারপর ফেরাউন আবার বলল, তোর দেহ থেকে চামড়া ছিলে নেব। এখনও সময় আছে আমাকে খোদা বলে স্বীকার করে নে। হযরত আসিয়া বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয় করো; তবুও আমি তোমার মতো মিথ্যা খোদাকে স্বীকার করব না। সুতরাং আদেশ হলো, তার শরীরের চামড়া তুলে নাও। নির্দেশ অনুযায়ী জীবন্ত মানবীর শরীর থেকে চামড়া খসানো শুরু হলো। রাজপ্রাসাদের আঙিনা তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

একটু কল্পনা করুন! আজ যদি কোনো কোমলহৃদয় মানুষের সামনে একটি মৃত বকরির চামড়া খসানো হয়, তখন সে অস্থির হয়ে ওঠে। তিনি তো কোমলবদন একজন জীবন্ত নারী ছিলেন। বিবস্ত্র অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। হাত-পায় পেরেকমারা, নড়াচড়া করতে পারছেন না। এদিকে এলোমেলো চুল নিয়ে মাথাটা পড়ে আছে। অপর দিকে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে দেহ থেকে চামড়া তুলে নেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রণার ওপর যন্ত্রণার এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে হয়ত সেদিন গোটা পৃথিবী কেঁদেছিল। এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন কেবল আল্লাহর জন্য। সেই চরম কষ্টের মুহূর্তে তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে আল্লাহকে বলেছিলেন–

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

'হে আমার রব! আমি দুনিয়ার শাহী মহল থেকে বিতাড়িত হয়েছি, তোমার ওপর ঈমান আনার অপরাধে রক্তাক্ত হয়েছি। আমি ফেরাউনের সঙ্গ চাই না, চাই তোমার সঙ্গ, তোমার সান্নিধ্য। প্রভু! আমার জন্য তোমার নিকটেই একটা ঘর নির্মাণ করে দাও; দূরে নয়, নিকটেই।'[১]

---

১. সূরা তাহরীম : ১১

হযরত আসিয়ার দু'আ ভাষার মধ্যে লুকিয়ে ছিল অসীম ভালোবাসা। তিনি এভাবে বলেননি যে, হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতে ঘর দাও। বরং জান্নাত শব্দটি উল্লেখ করার পূর্বে 'ঘর' এবং 'তোমার নিকট' শব্দ দুটি উল্লেখ করেছেন। ওলামায়ে মুফাসিরীন লিখেছেন, তিনি ঘর তো চেয়েছেন; কিন্তু যেখানে-সেখানে নয় কিংবা দূরে কোথাও নয়, বরং আল্লাহর নিকটে প্রিয়তমের সান্নিধ্যে ঘর চেয়েছেন।

এমনিভাবে আরও একটি দু'আ করেছেন–

وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه.

'আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্মসমূহ থেকে মুক্তি দিন।'[১]

কী মেধাবী ও দূরদর্শী ছিলেন তিনি! এভাবে বলেননি, 'হে আল্লাহ! আমাকে ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি দিন।' বরং একটি শব্দ বাড়িয়ে বলেছেন, 'ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম' থেকে, যেন ফেরাউনের সাথে-সাথে অন্য অত্যাচারীর নির্যাতন থেকেও মুক্তি মিলে যায়। সুবহানাল্লাহ!

এক সাহাবীর ভালোবাসার গল্প

এক সাহাবী মরুভূমিতে বকরি চরাতেন। মাঝে-মধ্যে মদীনায় আসতেন এবং লোকদের জিজ্ঞাসা করতেন, নবীজি নতুন কোনো কথা বলেছে কি? কিংবা নতুন কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে কি? যদি কিছু থাকত, তাহলে তা শিখে মুখস্থ করে ফিরে যেতেন। এই সাহাবীর একটা মজার ঘটনা শুনুন।

একবার মদীনায় এসে জানতে পারলেন, একটি নতুন আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাতে আল্লাহ তা'আলা কসম খেয়ে বলেছেন 'আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তাও আমিই'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কথাটি কসম খেয়ে বলেছেন। এই সাহাবী যখন আয়াতটি শুনলেন, তখন খুব রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'কে সেই অবিশ্বাসী, যাকে বিশ্বাস করানোর জন্য আমার আল্লাহকে কসম খেয়ে বলতে হলো? সুবহানাল্লাহ! কী মহব্বত ও ভালোবাসা-ই-না তাদের হৃদয়ে বিরাজ করত!

অন্তর কার জন্য?

আর আজ আমাদের অন্তরগুলোর কী করুণ দশা! কোনো অন্তরে সম্পদের ভালোবাসা, কোনোটায় আবার নারীর ভালোবাসা, কোনোটায়

---

১. সূরা তাহরীম : ১১

প্রবৃত্তির ভালোবাসা। বলুন তো, এই অন্তর কি এসবের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল? কখনই নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ.

আমি কোনো মানুষের বুকে দুটা অন্তর রাখিনি।[১]

আমি কোনো মানুষের বুকে দুটা অন্তর রাখিনি যে, একটা দেবে আল্লাহকে, অপরটা দেবে নফস ও শয়তানকে। বরং অন্তর একটাই আর তা দিতেও হবে একজনকে। আর তিনি হলেন অন্তরের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ।

এক রাখালের খোদাপ্রেম



বনী ইসরাঈলের এক রাখাল ছিল সহজ-সরল প্রকৃতির। আনমনে নিজে-নিজেই বলে যাচ্ছিল, 'হে আল্লাহ! আমি শুনছি তোমার কোনো স্ত্রী নেই, বাচ্চা-কাচ্চা নেই, তোমার কাজকর্ম করে দেয় কে? যদি কখনও আমার কাছে আসতে, তাহলে আমি তোমার খেদমত করতাম। তোমার কাপড়-চোপড় ধুয়ে দিতাম, নখ-চুল কেটে দিতাম। ভালোভাবে গোসল করিয়ে গায়ে-মাথায় তেল দিয়ে দিতাম। নিজের হাতে লোকমা তুলে খাইয়ে দিতাম। ....ইত্যাদি।'

মাসিক আল কাউসার- বর্ষ: ২০, সংখ্যা : ০৪,২০২৪

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তখন সেই পথে কোথাও যাচ্ছিলেন। রাখালের কথাগুলো শুনে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, এই আল্লাহর বান্দা! কী বকছ এসব? তুমি তো আল্লাহর শানে মারাত্মক গোস্তাখী (বে-আদবী) করেছ! বেচারা সহজ-সরল প্রকৃতির লোক ছিল। অত তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বুঝত না। পয়গম্বরের মুখে ধমক খেয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। আর তার এভাবে ভয় পাওয়া ও কেঁপে উঠার প্রতি আল্লাহর এত মায়া হলো যে, তিনি ওহী পাঠিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে সতর্ক করে বললেন, তুমি আমার বান্দাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ। তারপর কবির ভাষায় শুনুন–

تو برائے وصل کردن آمدی * نہ برائے فصل کردن آمدی.

'হে নবী মূসা! আমি তোমাকে আমার সঙ্গে বান্দাকে মিলানোর জন্য পাঠিয়েছি, বিচ্ছিন্ন করার জন্য তোমাকে পাঠানো হয়নি।'

---

১. সূরা আহযাব : ৪

কারণ, রাখাল যা বলেছিল, তা বাহ্যিক অর্থে অবশ্যই ভুল ছিল আর সেজন্য হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু কথাগুলোর পিছনে যেহেতু অন্তরের আবেগ ও ভালোবাসার উষ্ণতা মিশে ছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা তার আবেগের মূল্যায়ন করলেন।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর খোদাপ্রেম

আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যতের সঙ্গে এতটুকু মহব্বত ও ভালোবাসা রাখা উচিত, যেন দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ মিলে যায়। আল্লাহ যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে 'খলীল' (অন্তরঙ্গ বন্ধু) উপাধিতে ভূষিত করেন, তখন ফেরেশতারা প্রশ্ন করেছিল, হে আল্লাহ! আপনি কি তাকে এতই ভালোবাসেন যে, খলীল উপাধিতে ভূষিত করলেন? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, সে বাস্তবেই এই উপাধির উপযুক্ত। যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখো।'

এবার এক ফেরেশতা একজন মানুষের রূপ ধরে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর নিকট এলেন। তিনি তখন বনে বকরি চরাচ্ছিলেন। ফেরেশতা উচ্চ আওয়াজে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো একবার পাঠ করলেন।

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِيْ الْعِزَّةِ والْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ والْكِبْرِيَاء وَالْجَبْرُوْتِ. سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ والرُّوْحِ. اللّٰهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. يَامُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ.

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো আওয়াজগুলো শুনছিলেন। খুব মজা পেয়ে এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, কাছেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, বাক্যগুলো আরেকবার পাঠ করো। লোকটি বলল, বিনিময়ে কী দেবেন? তিনি বললেন, এখানে যে বকরিগুলো বিচরণ করছে, এর অর্ধেক নিয়ে নিয়ো। সে পুনরায় বাক্যগুলো পাঠ করল। এবার হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পূর্বের চেয়ে আরও বেশি মজা পেলেন। তিনি পুনরায় বাক্যগুলো পাঠ করার অনুরোধ করলেন। লোকটি বলল, বিনিময়ে এবার কী দেবেন? তিনি উত্তর দিলেন, অবশিষ্ট বকরিগুলো নিয়ে নিয়ো।

লোকটি পুনরায় বাক্যগুলো পাঠ করে শোনাল। এবার তিনি যেন পূর্বের চেয়ে আরও বেশি মজা পেলেন। বললেন, অনুগ্রহ করে বাক্যগুলো

আরেকবার শোনাও। সে বলল, বিনিময়ে এবার কী দেবেন? আপনার কাছে এখন তো আর একটা বকরিও নেই। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন, দেখো; এই বকরিগুলোর মালিক এখন তুমি। এগুলো চরানোর জন্য রাখাল অবশ্যই লাগবে। তুমি আমাকেই রাখাল বানিয়ে নিয়ো। আমি দক্ষতার সাথে এগুলো চরাব। এ উত্তর শুনে ফেরেশতা বললেন, হে ইবরাহীম! আপনার বকরি আপনার কাছেই থাকুক। আমি আসলে মানুষরূপী একজন ফেরেশতা। আপনার পরীক্ষা নিতে এসেছিলাম। আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সত্যিই আপনি আল্লাহকে অনেক ভালোবাসেন। 'খলীল' উপাধি আপনার মতো খোদাপ্রেমী মানুষের জন্যই শোভা পায়। আল্লাহু আকবার!

ভালোবাসার স্তর কী হবে?

যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহও তাদের ভালোবাসেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহকে ভালোবাসার স্তর কী? অর্থাৎ– কেমন ভালোবাসলে তাকে ভালোবাসা বলা হবে? উত্তর কুরআনুল কারীমেই আছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ.

'ঈমানদাররা আল্লাহকে প্রচণ্ড ভালোবাসে।'[১]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মূলত ভালোবাসার একটি গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি বলে দিয়েছেন যে, শুধু ভালোবাসা এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং যে ভালোবাসা প্রচণ্ড ও তীব্র, সেটিই এখানে উদ্দেশ্য। কবি বলেন–

محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن * محبت نہیں جس میں شدت نہیں.

محبت کے انداز ہیں سب پرانے * خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے.

'মহব্বত-মহব্বত তো বলে সবাই। কিন্তু তা মহব্বত নয়, যাতে তীব্রতা নেই। শুনে রাখো, প্রকৃত মহব্বতের ধরন সদা পুরাতন। এখানে নতুনত্বের কোনো অবকাশ নেই।'

সারকথা হলো, শুধু ভালোবাসলেই হবে না, ভালোবাসায় প্রচণ্ডতা ও তীব্রতা থাকতে হবে।

---

১. সূরা বাকারা : ১৬৫

প্রকৃত ভালোবাসার স্বাদ

ভালোবাসা যখন প্রচণ্ড হয়, তখন সেই প্রচণ্ডতা মানুষের ইবাদতের মধ্যে রং নিয়ে আসে। ভালোবাসার তীব্রতা তাকে নির্জনতার স্বাদ পাইয়ে দেয়। তীব্র ভালোবাসা মানুষকে নীরবতার মজা চাখায়। আমরা নীরবতার স্বাদ কি-ইবা বুঝি? আমরা তো সারাদিন পটপট করতে থাকি, মজলিসে-মাহফিলে হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকি। আমরা কী করে বুঝব, রাতের নির্জনতার মজা কেমন হয়? আমরা কিভাবে জানব, যে মহান স্রষ্টার সঙ্গে যখন মানুষ যোগাযোগ স্থাপন করে নেয়, তখনকার পরিস্থিতি ও তার স্বাদ কেমন হয়? একটু তাদেরই জিজ্ঞাস করুন, যাদের সঙ্গে স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেছে।

এক বুযুর্গের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তাঁর এক খাদেম প্রায় দু-বছর যাবৎ তাঁর খেদমত করেছে; কিন্তু হযরত তাকে মনে রাখতেই পারেন না। সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, আরে মিয়া! তুমি কে? সে উত্তরে বলে, হযরত! আমি আপনার খাদেম অমুক। তখন তিনি বলেন, ও আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিছুক্ষণ পর আবার যখন তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া পড়ে, পুনরায় প্রশ্ন করেন, আরে মিয়া! তুমি কে? খাদেম উত্তর দেয়, হযরত আমি আপনার খাদেম অমুক। তিনি আশ্বস্ত হয়ে বলেন, আচ্ছা-আচ্ছা!

সুবহানাল্লাহ! চিন্তা করুন, একটি নাম অন্তরে এমনভাবে সেঁটে গেছে যে, দু-বছরের খাদেমের নাম পর্যন্ত সেখানে সামান্য স্থান পায়নি। কবি বলেন–

ما ہر چہ خاندہ ایم فراموش کردہ ایم * الّا حدیث یار کہ تکرار می کنیم.

'আমরা যা কিছুই পড়েছি,সবই ভুলে গেছি। তবে বন্ধুর সেই কথাটি ভুলিনি, যা বারবারউচ্চারণ করেছি।'

আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণ যখন আযানের উদ্দেশ্যে মিনারে উঠতেন, তখন আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহর শান ও মর্যাদার প্রভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন একেবারে মিনারের নিচে মাটিতে আর সেখানেই মৃত্যুবরণ করতেন। অথচ আজ আল্লাহু আকবারের আওয়াজ আমরাও শুনি; কিন্তু আমাদের অন্তর এতে প্রভাবিত হয় না। কেন হয় না? কারণ, প্রকৃত ভালোবাসা এখনও হৃদয়ে জেগে ওঠেনি। ভালোবাসার আগুন এখনও উত্তাপ ছড়াতে পারেনি। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা খুব শীঘ্রই সেই আগুন আমাদের অন্তরে জ্বালিয়ে দিন।

যাদের দু'আ দ্রুত কবুল হয়, তাদের পরিচয়

মানুষের অন্তরে যখন প্রকৃত ভালোবাসা ও ইশ্‌কে ইলাহী স্থান করে নেয়, তখনই মানুষ সত্যিকারের জীবনের সন্ধান খুঁজে পায়। কামিয়াব জীবন যখন নসিব হবে, তখন মুখ থেকে দু'আ বের হতেই আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যতের দরবারে তা কবুল হয়ে যাবে। একটি কথা লৌহকলাকার মতো সরল ও ধ্রুব সত্য যে, যার পেট হারাম থেকে পবিত্র থাকবে, তার অন্তরও গাইরুল্লাহ থেকে মুক্ত থাকবে। আর যে অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর ভারবাসা বিরাজ করবে, তার উত্তোলিত প্রার্থনার হাত কখনও আল্লাহ তা'আলা শূন্য অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন না। এ জাতীয় পুণ্যবান ব্যক্তিদেরই 'মুস্‌তাজাবুদ্দাওয়াত' বলা হয়। যারা দু'আ করলেই আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নেন।

খোদাপ্রেম আনুগত্যকে সহজ করে দেয়

অন্তরে যখন ভালোবাসা থাকে, তখন আল্লাহর অনুগত্য করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কষ্টসাধ্য ইবাদতে নিমগ্ন হওয়া সহজ হয়ে যায়। প্রবাদ আছে–

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعٌ.

'প্রেমিক তার প্রিয়তমের ইচ্ছার বাইরে যায় না, বরং তার আদেশ নিষেধগুলোর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।'

সুতরাং মানুষও যদি আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যতের সঙ্গে আন্তরিক মহব্বত ও ভালোবাসা রাখে, তাহলে তার জন্য রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়া সহজ হয়ে যায়। একটা উদাহরণ নিন। সম্পদের প্রতি, টাকা-পয়সার প্রতি আমাদের ভালোবাসার বিষয়টি তো সর্বজনবিদিত। এখন তাহাজ্জুদের সময় যদি কোনো ডাকপিয়ন আসে এবং বলে, আমি মানিঅর্ডার নিয়ে এসেছি, এখনই ফিরে যাব, দেরি করা যাবে না, তখন সেই আল্লাহর বান্দা যত গভীর ঘুমেই থাকুক আর যত শীতই থাকুক, উঠে মানিঅর্ডার গ্রহণ করবে। কারণ, মানিঅর্ডারের প্রতি তার প্রচণ্ড ভালোবাসা আছে।

তো মানুষ সম্পদ অর্জনের জন্য যদি মজার ঘুম উৎসর্গ করতে পারে, তাহলে স্বীয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাতের শেষ প্রহরে উঠে তাঁর দরবারে সিজদায় কেন লুটিয়ে পড়তে পারবে না? অবশ্যই পারবে যদি অন্তরে আল্লাহর প্রকৃত ভালোবাসা থাকে। তার অন্তরের ভালোবাসাই কোনো ধরনের উপকরণ ব্যতীত যথাসময়ে তাকে জাগিয়ে দেবে। ঘড়ির এলার্মেরও

প্রয়োজন হবে না, নিজে নিজেই চোখ খুলে যাবে এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনাকারীদের কাফেলায় শামিল হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লেগে যাবে। কুরআন সেই দৃশ্যটি এভাবে তুলে ধরেছে–

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

'রাতের শেষ প্রহরে তাদের পিঠ-পাঁজরগুলো বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং ভয় ও আশা নিয়ে স্বীয় প্রতিপালককে ডাকতে থাকে এবং আমার দেওয়া রিযিক থেকে খরচও করে।'[১]

খানকায়ে ফয়জিয়ার আশেকদের সম্মেলন

আমাদের শায়খ (রহ.) প্রায়ই বলতেন, খানকায়ে ফয়জিয়া মিসকীনপুর শরীফে রাতের বেলা সব সালেকীন একটা বড় কামরায় একসাথে শুতেন। ঘুমানোর কিছুক্ষণ পর তাদের একজনের ওপর 'ওয়াজ্‌দ' এসে যেত। সে উঁচু আওয়াজে আল্লাহ, আল্লাহ যিকির শুরু করত। তার আওয়াজ শুনে সবার চোখ খুলে যেত। কিছুক্ষণ পর যখন তার অবস্থা স্বাভাবিক হতো, তখন নীরবে শুয়ে যেত। এখনও ভালো করে ঘুম পায়নি, ততক্ষণে আরেকজনের 'ওয়াজ্‌দ' এসে যেত এবং সেও আল্লাহ, আল্লাহ যিকির শুরু করত। এভাবেই জেগে-ঘুমিয়ে রাত কেটে যেত। আল্লাহর আশেকদের সম্মেলনে এভাবেই রাত পার হতো।

ইশ্‌কে ইলাহীতে বিভোর দুই বৃদ্ধ

মাকামাতে যাওয়ারিয়া নামক গ্রন্থে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা লেখা হয়েছে। একবার খানকায়ে ফয়জিয়ার দুই বৃদ্ধ পরস্পরে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ল। পরিস্থিতি হাতাহাতি পর্যন্ত চলে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বিস্মিত হয়ে বলল, কী আশ্চর্য! দুজনকেই বড় নেক ও মুত্তাকী মনে হচ্ছে। সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণও তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও এরা কলহ-বিবাদে লিপ্ত! একজন থাপ্পর মারলে অপরজনও থাপ্পর দিয়েই তার জবাব দেয়। ও একে টানে আর এ ওকে টানে। আবার কখনও ফিসফিস করে পরস্পরে কথাও বলে।

একব্যক্তি কৌতূহলী হয়ে কাছে এল, আসলে ঘটনাটা কী? কাছে এসে দেখল, উভয়েই আল্লাহর ইশ্‌ক ও মহব্বতে এমনভাবে হাবুডাবু খাচ্ছে যে, স্বচক্ষে না দেখলে এমন কাণ্ড বিশ্বাস হতো না। তাদের একজন বলছে,

---

১. সূরা সাজদাহ : ১৬

'আল্লাহ মেরা হায়' (আল্লাহ আমার)। দ্বিতীয়জন প্রতিবাদ করে বলছে, 'নাহি, আল্লাহ মেরা হায়' (না, আল্লাহ আমার)। এ ওকে মারছে আর বলছে 'আল্লাহ আমার' আর ও একে মারছে আর বলছে, 'না, আল্লাহ আমার'। আল্লাহু আকবার! আল্লাহর পাগলরা এমনই হয়।

হযরত শিবলী (রহ.)-এর ইশ্‌ক

হযরত শিবলী (রহ.)-এর সম্পর্কে শোনা যায়, কেউ যদি তার সম্মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করত, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে নিজের পকেটে হাত রাখতেন। পকেট থেকে মিষ্টিদ্রব্য বের করে সেই ব্যক্তির মুখে পুড়ে দিতেন আর বলতেন, 'যে মুখ থেকে আমার প্রিয়তমের নাম উচ্চারিত হলো, সেই মুখ কেন মিষ্টি দিয়ে ভরে দেব না?'

প্রিয়তমের সান্নিধ্যে যা হয়

ভালোবাসায়-ভালোবাসায় ব্যবধান আছে। উদাহরণ দিয়ে বুঝুন। একব্যক্তি এক শ্রমিককে ডেকে বলল, এই পাথরটা ভেঙে দাও; পারিশ্রমিক পাবে। তো সে এই পাথরে আঘাত হানবে বটে; কিন্তু সেই আঘাতে না আবেগ আছে, না ভালোবাসা। তার তো প্রয়োজন টাকা। সে এই আঘাতে আবেগ-ভালোবাসা মিশাতে যাবে কেন? বরং প্রতিটি আঘাতে বিরক্তি ও কষ্টই ফুটে উঠবে। এ তো গেল শ্রমিকের আঘাত! আরেক আঘাত হেনেছিল বিখ্যাত প্রেমিক পুরুষ ফরহাদ। তার প্রিয়তমা বলেছিল, আমাকে পেতে হলে ওই পাথরে দুধের ঝরনা প্রবাহিত করো। ফরহাদ কুঠার দিয়ে সেই অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় লেগে গেল। এক কবি তার অবস্থার বর্ণনা এভাবে দিচ্ছেন–

ہر ضرب تیشہ ساغر کیف وصال دوست * فرہاد میں، جو بات ہے وہ مزدور میں نہیں.

'হে সাগর! প্রতিটি আঘাতেই বন্ধুর সান্নিধ্যের আবেগ-উচ্ছ্বাস রয়েছে। ফরহাদের মধ্যে যে আবেগ রয়েছে, তা কাঠুরিয়ার মধ্যে নেই।'

অর্থাৎ– ফরহাদ কুঠার দিয়ে যখন পাথরের গায়ে আঘাত হানছিল, তখন প্রতিটি আঘাতেই প্রিয়তমের সান্নিধ্য পাওয়ার সীমাহীন আবেগ ও উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ছিল। আজ আমরা যে নামায পড়ি, তাহলো শ্রমিকের মতো আবেগহীন নিষ্প্রাণ নামায। যেদিন অন্তরে আল্লাহর খাঁটি ভালোবাসা জেগে উঠবে, সেদিন হয়ত ফরহাদের মতো আবেগময় জানদার নামায পড়ার সৌভাগ্য হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

এক নামাযীকে মজনুর ভর্ৎসনা

একদিন একব্যক্তি নামায পড়ছিল। মজনু তখন লাইলার প্রেমে মাতোয়ারা। সেই অবস্থায়ই সে এক নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করল। নামাযী নামায শেষ করে মজনুকে ধরে বলল, 'তুমি আমার নামাযটা বরবাদ করে দিলে; তোমার কি চোখ নেই? তুমি কি দেখনি, আমি নামায পড়ছিলাম?' মজনু উত্তর দিল, আল্লাহর বান্দা! আমি তো এক সৃষ্টজীবের প্রেমে মত্ত হয়ে আছি। এই ক্ষুদ্র জিনিসের ভালোবাসা আমার ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, আমি বলতেই পারব না, তোমার নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম করেছি। কিন্তু আমি আশ্চর্য হই মহান স্রষ্টার প্রতি তোমার ভালোবাসার নমুনা দেখে! তুমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছ আবার সামনে দিয়ে কে যাচ্ছে, তারও খবর রাখছ!

আল্লাহপ্রেমে বিভোরদের নামায

বন্ধুরা! আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানে দীনের নামায কিন্তু এমন ছিল না। তারা নামাযের মধ্যে খুব মেহনত-মোজাহাদা করতেন। যখনই তারা জমিনে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন, সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাদের পক্ষে ফয়সালা করে দিতেন। কিছু এমন লোকও ছিল, যারা আযান দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠত। কবি বলেন–

سنی نہ مصر و فلسطین میں اذان میں نے * دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیماب.

'আমি মিশর-ফিলিস্তিনে সেই হৃদয়গ্রাহী আযান শুনতে পাইনি, যা শুনে কখনও পাহাড়-পর্বতও থরথর করে কাঁপত।'

সুবহানাল্লাহ! তাদের সেজদায় কী পরিমাণ ইখলাস ও আত্মনিবেদন ছিল! তারা জানতেন, আল্লাহ তা'আলা শুধু সেই আমলগুলোই কবুল করেন, যা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইখলাসের সঙ্গে করা হয়। তারা এও জানতেন যে, অন্তরের একাগ্রতা ব্যতীত নামায গ্রহণযোগ্য হয় না। পূর্বসূরীদের নামাযের অবস্থা ফুটে ওঠে কবিতায়-

وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی * اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب.

'অন্তরের সেই সেজদার কথা মনে পড়ে, যা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে জমিন কেঁপে উঠত, সেই প্রাণবন্ত সেজদার জন্য আজ মসজিদের মিম্বর ও মেহরাব আহাজারি করছে!'

প্রিয়তমের সান্নিধ্যের জন্য বাহানা তালাশ করো

বন্ধুরা আমার! যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ভালোবাসা শিকড় গেড়েছে, তাঁরা মহান আল্লাহর মতো প্রিয়তমের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য নানা রকম বাহানা তালাশ করে, 'যদি সান্নিধ্য পেয়ে যাই, তাহলে কতই-না ভালো হবে।'

এ কারণেই আল্লাহর প্রিয় বান্দারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো আদায় করেন, কিন্তু এতে তাদের তৃপ্তি হয় না, মন ভরে না, মন চায় প্রিয়তমের সাথে আরও একটু কথা বলি, কবে তাঁর দিদার নসিব হবে? তাঁরা কখনও ইশরাকের নামাযকে, কখনও চাশতের নামাযকে, কখনও আউওয়াবীনের নফলকে বাহানা বানাচ্ছেন। আবার কখনও তাহাজ্জুদের নামাযকে বাহানা বানাচ্ছেন। কখনও ওযু করে সঙ্গে-সঙ্গে দু'রাকাত নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন, তো কখনও মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দু'রাআত নামাযের নিয়ত বেঁধে নিচ্ছেন। এসব শুধুই বাহানা। আসলে তো সে তার প্রিয়তম আল্লাহর সান্নিধ্য চায়, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ চায়। আমরা আমাদের কতিপয় সালেক (আধ্যাত্মিক সাধক) বন্ধুদের দেখি, তারা শুধু ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাযগুলো আদায় করে – নফল নামায পড়ে না। না, বন্ধুরা! এমন করা উচিৎ নয়। এটাও অনেক বড় ব্যাপার। কারণ, কিয়ামতের দিন ফরজ-ওয়াজিবের মধ্যে ঘাটতি দেখা দিলে নফল দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করা হবে। এর চেয়ে বড় ব্যাপার হলো, কে জানে, কোন স্থানে, কোন মুহূর্তে, কোন সেজদাটির ওপর আল্লাহর খাস দৃষ্টি পড়েছে আর তিনি তা কবুল করে নিয়েছেন! তাই যখন যেভাবে সুযোগ হবে, বেশি-বেশি নফল নামায পড়া উচিত।

ফরজ নামাযের মর্যাদা

ফরজ নামাযগুলো যথাযথভাবে আদায় করা অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার। এর গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, এর আদায়কারীদের মর্যাদাও অসীম। কারণ, ফরজ নামায আদায়ের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

'এসো নামাযের দিকে, এসো সফলতার পথে।'

কী অর্থ এর? অর্থ হলো, 'হে বান্দা আমার! তোমরা আমাকে দুনিয়াতে খুঁজে ফিরছ? আমার সান্নিধ্য চাচ্ছ? এসো নামাযে এসো! নামায পড়ো; আমার সান্নিধ্য পেয়ে যাবে, আমার সাক্ষাৎ নসিব হবে। তারপর এই নামাযের বিনিময়ে দুনিয়াতেও তোমরা সফলতা লাভ করবে।

প্রকৃত আল্লাহপ্রেমীর পরিচয়

বন্ধুরা আমার! আল্লাহর প্রেম যখন অন্তরে স্থান করে নেয়, তখন দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে আল্লাহর ভালোবাসার অনুভূতিটাই সব চেয়ে বেশি মজাদার মনে হয়। তারপর আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের ভালোবাসা সকল ভালোবাসার ওপর বিজয়ী হয়ে যায়। আর এই অবস্থাটাই ঈমানের পূর্ণতার লক্ষণ। এই বিষয়টিই আল্লাহ রব্বুল ইয্যত পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ.

'হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা-মাতা সন্তান-সন্তুতি, ভাই-বোন, স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, তোমাদের গচ্ছিত সম্পদ এবং ওই ব্যবসা, যার লোকসানের ভয় তোমরা করছ (এসব যদি) আল্লাহ, রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে নিজের কাছে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আমার সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো।'[১]

এ কারণেই আল্লাহপ্রেমীদের নেক আমল করা সহজ হয়ে যায়। তারা সময়ের পূর্বেই নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। যোহরের নামায আদায় করার পর আসরের অপেক্ষায় থাকে। আসর শেষ হওয়ার পর মাগরিবের অপেক্ষায় থাকে আর রাতে যখন ঘুমাতে যায়, তখন তাহাজ্জুদের নিয়ত করে ঘুমায়।

ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) স্বীয় মাকতুবাতে উল্লেখ করেন, 'তাসাউফ এক ধরনের বেচাইনি ও অস্থিরতার নাম। সূফী তাঁকেই বলা হবে, যে আল্লাহর প্রেমে সর্বদা অস্থির ও পেরেশান থাকবে। আগ্রহ-আবেগে, ইবাদত-আমলে সারাক্ষণ আল্লাহর প্রেমে বিভোর থাকবে।

---

১. সূরা তওবা : ২৪

এমনকি একস্থানে তিনি এও লিখেছেন- 'সূফী সেই ব্যক্তি, যার অবস্থা হবে বর্ণিত অবস্থার মতো। ইরশাদ হচ্ছে–

حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ.

'জমিন তার পূর্ণ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল।'[১]

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ.

'এমনকি তার জীবনও সংকীর্ণ হয়ে এল।'[২]

তারপর ইরশাদ হচ্ছে–

وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

'এবং তার ধারণা হলো যে, একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত তার আর কোনো আশ্রয় নেই।'[৩]

তিনি লিখেছেন, যে সাধকের অন্তরে এই ভাব তৈরি হবে, সে-ই তাসাউফজগতে অবস্থান করেছে বলে বিবেচিত হবে। আর যার অন্তরে এই ভাব তৈরি হয়নি, সে এখনও তাসাউফজগতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি।

যুবকের কবিতায় আল্লাহর প্রেম

যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রেমের এমন আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসা থাকে, তারা আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যতের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে, যা শুনলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। হযরত আলী হাজবীরী (রহ.) তাঁর 'কাশফুল মাহজুব' গ্রন্থে লিখেছেন, এক যুবক নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করতে-করতে কোথাও যাচ্ছিল। মুগ্ধ হয়ে সেগুলো আমি কলমের কালিতে বন্দি করে ফেলি।

وَاللهِ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ * إِلَّا وَأَنْتَ فِيْ قَلْبِيْ وَوَسْوَاسِيْ.

وَلَا جَلَسْتُ إِلٰى قَوْمٍ أُحَدِّثُهُمْ * إِلَّا وَأَنْتَ فِيْ حَدِيْثِيْ بَيْنَ جُلَّاسِيْ.

وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُوْنًا وَلَا طَرِبًا * إِلَّا وَحُبُّكَ مَقْرُوْنًا بِأَنْفَاسِيْ

---

১. সূরা তাওবা : ১১৮

২. সূরা তাওবা : ১১৮

৩. সূরা তাওবা : ১১৮

وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ * إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ
وَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْإِتْيَانِ زُرْتُكُمْ * سُبْحًا عَلَى الْوَجْهِ أَوْ مَشْيًا عَلَى رَأْس

কবিতাটির মর্মার্থ অনেকটা এরূপ-'আল্লাহর কসম! এমন কোনো সূর্যোদয় হয়নি, যখন তুমি আমার হৃদয়ে ছিলে না। এমন কোনো সূর্যস্তও হয়নি, যখন তুমি আমার কল্পনায় ছিলে না। এমন কোনো মজলিসে বসিনি, যেখানে আমি কথা বলেছি; অথচ তুমি আমার কথায় ছিলে না। (অর্থাৎ শয়নে-স্বপনে সারাক্ষণ আমি তোমায় স্মরণ করেছি)

সুখে হোক, দুঃখে হোক, যখনই তোমায় স্মরণ করেছি, তোমার ভালোবাসা আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে বিরাজমান ছিল। যখনই পানি পান করেছি, তো পেয়ালায় মুখ দিয়েই তোমার কল্পনা করেছি। প্রিয়তম! যদি তোমার সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব হতো, তবে মুখে মাথায় ভর দিয়ে হলেও তোমার দিদারের জন্য ছুটে যেতাম। (অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সেই কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ছুটে যেতাম)।

ভালোবাসার অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ

কেউ একজন বলেছিল, ভালোবাসার টানে মজনু পৃথিবীর সকল বস্তুর নামই রেখেছিল লাইলা। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর প্রেমে মজে জুলাইখাও সামনে যা-ই পড়ত, তাকেই বলত ইউসুফ। এমনিভাবে যাদের অন্তরে আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের প্রকৃত ভালোবাসা শিকড়ের মতো আঁকড়ে আছে, তারাও সবকিছুতেই আল্লাহকে দেখে, সবকিছুকেই আল্লাহর নামে ডাকে। কারণ, এসব তাঁরই করুণার দান।

একটি ছন্দের মূল্য লক্ষ টাকা

হযরত মাজযুব (রহ.) হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন। তিনি একটি ছন্দ রচনা করে স্বীয় পীর ও মুরশিদকে শোনালেন। হযরত থানবী (রহ.) ছন্দটি শুনে দারুন মুগ্ধ হলেন। সীমাহীন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'মিয়া! যদি আমার সামর্থ্য থাকত, তাহলে এই ছন্দটির জন্য তোমাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিতাম।' এ তখনকার কথা, যখন স্কুলে যাওয়ার জন্য এক পয়সাও পাওয়া যেত না। এ সেকালের কথা, যখন একজন ইঞ্জিনিয়ারের মাসিক বেতন ছিল পনেরো হাজার টাকা। আজ তাদের বেতন লক্ষ টাকার ওপর। তো সেই ছন্দটি কী ছিল? ছোট্ট একটি ছন্দ। মাত্র

দুই লাইনের। খুব সাদামাটা; কিন্তু হৃদয়স্পর্শী ও গভীর অর্থবহ। অল্প কয়েকটি শব্দ দিয়ে হৃদয়ের অব্যক্ত কত কথাই-না বলা হয়ে গেল! বললেন–

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی * اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی.

'অন্তর থেকে সব কামনা-বাসনা দূর হয়ে গেছে, এবার তো এসে যাও অন্তর নির্জন হয়ে গেছে।'

হযরত চালাসী (রহ.)-এর প্রেমের কবিতা

হযরত চালাসী (রহ.) তো আবেগ-জোশে বলেই ফেললেন–

مرا طعنہ دہد واعظ بعشقت * تو ہم یک بار سوئے او نظر کن

اورا مانند ما دیوانہ گرداں * تکبر از دماغ او بدر کن

چلاسی خواب در ہجراں حرام ست * شب ہجراں بفریادے سحر کن

'হে আল্লাহ! আমি তো আপনার ভালোবাসার প্রত্যাশী, আপনার প্রেমের কাঙাল। আর এই বক্তা কিনা আপনার প্রেম নিয়ে আমাকে উপহাস করছে। আল্লাহ! আপনি দয়া করে তাঁর অন্তরের ওপরও দৃষ্টিপাত করুন! তাকেও আমার মতো দেওয়ানা করে দিন। তার মস্কিষ্ক থেকে অহংকার বিদূরিত করুন! চালাসী! বিচ্ছেদ-বেদনায় ঘুমিয়ে পড়া মস্ত অপরাধ। তাই বিরহের এই বেদনাবিধূর রজনীটা তুমি তাঁর স্মরণে কেঁদে-কেঁদে কাটিয়ে দাও।'

প্রকৃত আশেকের পরিচয়

স্মরণ রাখবেন, প্রকৃত আশিক ও আল্লাহপ্রেমীদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, তারা যে অবস্থাই থাকুক, প্রিয়তমের স্মরণে গরম নিঃশ্বাস তাদের বুক চিরে বেরিয়ে আসে এবং নীরবে তপ্ত অশ্রু বিসর্জন দিয়ে বেদনাহত হৃদয়কে প্রশান্ত করার চেষ্টা করে। এব পাঞ্জাবী কবি বলেন–

عاشق ود کم رونا دھونا نے بن رون نہیں منظوری.

دل روئے چاہے اکھیاں رون تے وچ عشق دے رون ضروری.

کوئی تے روئے دید دی خاطر تے کوئی روندے وچ حضوری.

اعظم عشق وچ رونا پینڈا بہنویں وصل ہوئے بہانویں دوری.

কোনো-কোনো বন্ধু হয়ত ভাবছেন, আরে ভাই! ইনিও তো দেখছি দেওয়ানার মতো কাণ্ড শুরু করে দিয়েছেন! ইনিও দেখছি, প্রেম-ভালোবাসার কথা বলছেন!!

হ্যাঁ ভাই! আপনার ধারণা সঠিক। আপনি দুনিয়ার প্রেম-ভালোবাসা দেখেছেন। হায়! যদি আল্লাহর সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার স্বাদও কখনও চেখে দেখতেন, তাহলে আপনিও এমনই করতেন।

خیرہ نہ کر سکا مجھے جذبہ دانش وفرنگ * سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہوا گر.

'আমাকে ফিরিঙ্গিদের জোশ-জযবা পথহারা করতে পারেনি। মাটি যদি মদিনার হয়, তাহলে জেনে রাখো, তা আমার চোখের সুরমা।'

কেন আল্লাহপ্রেমের জযবা ও আবেগ মানুষের মধ্যে দিন-দিন লোপ পাচ্ছে? এর অন্যতম কারণ হলো, নফসের খাহেশাত ও মনের অভিলাষ এখন বিজয় লাভ করেছে। মনের অভিলাষের বিষয়টি এভাবে বুঝুন, একটা জলন্ত বাল্ব মাটির ওপর রাখুন। তারপর তার ওপর একটা টুকরি রাখুন। দেখবেন, পুরো ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। গাফেল মুমিনের দৃষ্টান্তও এমন। মুমিন বান্দা তো জ্বলছে। কেননা, সে কালেমা পাঠ করেছে। কিন্তু তার ওপর গাফলতের টুকরি এসে যাওয়ার কারণে বেচারার অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। যদি সে এই গাফলতের টুকরি উঠিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তার অন্তরের বাল্ব জ্বলে উঠবে।

আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টির উপায়

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত ইরশাদ করেন–

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.

'আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু।'[১]

বেলায়েত তথা প্রতিনিধিত্বের এটাই প্রথম স্তর, যা প্রত্যেক কালেমা পাঠকারী বান্দার ভাগ্যে জোটে। কিন্তু একে সমৃদ্ধ করে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দুটি কাজ করতে হবে।

এক. আল্লাহর যিকির। দুই. আল্লাহর নেক বান্দাদের সাহচর্য।

শায়খ আব্দুল্লাহ আনসারী (রহ.) বলেন–

---

১. সূরা বাকারা : ২৫৭

مَنْ لَا وِرْدَ لَهٗ لَا وَارِدَ لَهٗ.

যে যিকির-আযকার ও ওযাইফ পাঠ করে না, তার ওপর কোনো হালত সৃষ্টি হবে না। তার মধ্যে কোনো অবস্থার সৃষ্টি হবে না। তিনি আরও বলেন, কেউ নকশবন্দী. কেউ চিশতী, কেউ কাদেরী, কেউ সোহরাওর্দী যে যা-ই হও; যদি অন্তরে আল্লাহর স্মরণ ও ভালোবাসা থাকে, তাহলে তুমি সফল; অন্যথায় তুমি বিফল।

বন্ধুরা আমার! এগুলো মহব্বতে ইলাহীর আবেগময় কথা, ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি। মেশিনের নিকট বসে, দোকানের গদিতে আসন গ্রহণ করে, চৌরাস্তা ও বাজারের অলি-গলিতে ঘুরে-ফিরে ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগ্রত করা যাবে না। বরং এজন্য হৃদয়বান আল্লাহপ্রেমিকদের কাছে আসতে হবে।

تمنا دردِ دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی * نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں.

'আল্লাহপ্রেমী হৃদয় যদি চাও, তবে এই ফকীরদের খেদমতে উপস্থিত হও। কারণ এই মহারত্ন বাদশাদের ধনভাণ্ডারে পাওয়া যায় না।'

কেন? কারণ–

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو * ید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں.

'এই ফাটা-ছেঁড়া পোশাকধারীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো না। ভক্তি হয় তো ভালো করে দেখে নাও। শুভ্র-সফেদ হাত (অর্থাৎ– অসাধারণ কারামতের শক্তি) গুটিয়ে নীরব বসে আছেন।'

জিগার মুরাদাবাদীর জীবনের বিপ্লব

বন্ধুরা আমার! মানুষ যখন আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্যে আসে, তখন তাদের জীবনে বিপ্লব আসে। এজন্যই কবি বলেন–

نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی * بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.

'আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টির সেই অসাধারণ শক্তি দেখেছি, যার দ্বারা হাজারো মানুষের ভাগ্য বদলে গেছে।'

এশিয়ার মহান কবিদের মধ্যে জিগার মুরাদাবাদী একজন অনন্য কবি ছিলেন। জীবনের প্রথম দিকটা ছিল বড়ই উদাসীন। রঙিন পানি খুব পান করতেন। বিভিন্ন কাব্যানুষ্ঠানে হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব (রহ.)-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হতো। খাজা সাহেব হযরত থানবী (রহ.)-এর

এজাযতপ্রাপ্ত খলীফা ছিলেন। তখনকার দিনে তিনি শিক্ষামন্ত্রণালয়ে কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। এত উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। কারণ, দুনিয়ার প্রকৃত রূপ তার সামনে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। এত সুন্দর-সুন্দর কবিতা আবৃতি করতেন যে, মনে হতো, তিনি এক-একটা মুক্তার দানা নিচ্ছেন আর তা দিয়ে মালা গেঁথে যাচ্ছেন। কবি জিগার তার এই দরবেশী জীবন দেখে খুব প্রভাবিত হলেন।

একদিন জিগার সাহেব তাঁকে মজা করে প্রশ্ন করলেন, জনাব! আপনি তো 'মিস্টার' ছিলেন। এই 'টার' কিভাবে আপনাকে 'মিস' (Miss) করল? খাজা সাহেব মুচকি হেসে ছোট্ট উত্তর দিলেন, থানাভন গিয়ে। পুনরায় বললেন, একদিন আমিও যাব। খাজা সাহেব বললেন, খুব ভালো কথা; অবশ্যই যাবেন। তারপর তিনি জিগার সাহেবের পিছনে শ্রম দিতে লাগলেন। হৃদয়বান আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য ও সান্নিধ্যের গুরুত্ব ও উপকারিতা তার সামনে তুলে ধরলেন।

এভাবেই চলতে লাগল।

একদিন সাক্ষাতান্তে জিজ্ঞাস করলেন, কেমন আছেন জনাব? সেই মুহূর্তে খাজা সাহেব বিস্ময়কর কয়েকটি কবিতা আবৃতি করলেন–

پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی * اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی اپنی.

اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا علم * ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا علم.

'চাকুরী থেকে অবসর হয়ে গেছি; কী চমৎকার ব্যাপার। এখন দিনও আমার, রাতও আমার। এখন তো রাত-দিনের ব্যাপারটাই ভিন্ন রকম লাগে, সদা-সর্বদা তাঁর স্মরণে-সাক্ষাতে নিমগ্ন থাকি।'

জিগার সাহেব বিস্ময়াভিভূত হয়ে তার কবিতাগুলো শুনে ভাবতে লাগলেন, মুরীদের অন্তরে যদি এত খোদাপ্রেম থাকে, তাহলে তার শায়খের অন্তরের কী অবস্থা হবে? একপর্যায়ে বললেন, আচ্ছা জনাব! থানাভন তো যাব; কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।

খাজা সাহেব : কী সেটি?

জিগার : আমি সেখানে গিয়েও রঙিন পানি পান করব। কারণ, এটি আমার অভ্যাস। এ ছাড়া আমি থাকতে পারব না।

খাজা সাহেব : আমি পীরের কাছে জিজ্ঞাসা করব।

খাজা সাহেব হযরত থানবী (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! এক আল্লাহর বান্দা খুব কাজের; এখানে আসতে আগ্রহী। কিন্তু শর্ত দিচ্ছে, এখানে এসেও পান করবে। এখন কী করা।

হযরত থানবী (রহ.) : ভাই! খানকাহ্ হলো সর্বসাধারণের জন্য। এখানে তো এর অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, মদ পান করা কবীরা গুনাহ। তবে আমি তাকে আমার ঘরেই জায়গা করে দেব। মেহ্মান হিসেবে থাকবেন আর মেহমানের সকল ইচ্ছা পূরণে কোনো প্রকার বাধা দেওয়া ঠিক নয়। এই সুযোগ কাফেরের জন্য প্রযোজ্য।

যাহোক, জিগার সাহেব সবকিছু শুনে থানাভন গেলেন। প্রস্তুতি নিয়েই গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে মদ পান তো দূরের কথা হযরতের নূরানী চেহারা দেখেই তার অন্তরের অবস্থা বদলাতে শুরু করল। হযরতের প্রতিটি কথা তার হৃদয়ে গেঁথে গেল। অবশেষে নিবেদন করলেন, হযরত! তিনটি দু'আ করানোর জন্য এসেছি। হযরত জিজ্ঞাসা করলে, কী সেগুলো? জিগার সাহেব বললেন, প্রথম দু'আ হলো, আমি যেন মদ পান ছেড়ে দিতে পারি। দ্বিতীয় দু'আ হলো, আমি যেন দাড়ি রাখতে পারি। হযরত দু'আ করলেন। তৃতীয় দু'আ হলো, আমার শেষ বিদায় যেন ঈমানের ওপর হয়। হযরত এ দু'আটিও তার জন্য করলেন।

সুবহানাল্লাহ! দেখুন, সহচার্য ও শায়খের অন্তরদৃষ্টি ধীরে-ধীরে রং ছড়াতে লাগল। জিগার সাহেব সেই ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে সেখানেই হযরতের হাতে বায়'আত হলেন। তারপর যখন ফিরে এলেন, তখন তার হৃদয়ের ভুবন অনেক বদলে গেছে। একদিন একাকি বসা ছিলেন। মনে-মনে ভাবছিলেন, যদি মদ পান না করি, তাহলে এমন কী সমস্যা হবে? মনের অভিলাষ পূরণ করতে গিয়ে যদি আমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রব্বুল ইয্যতকে অসন্তুষ্ট করি আর ওই অবস্থাই আমার মৃত্যু এসে পড়ে, তাহলে আমার উপায় কী হবে? নাহ্; এ কাজ আর করা যাবে না। এভাবেই ভাবতে-ভাবতে তিনি মদপান থেকে তাওবা করে নিলেন।

যেহেতু দীর্ঘ দিন যাবৎ মদপানের অভ্যাস, ছেড়ে দেওয়ার সাথে-সাথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন, একেবারে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। একটু-আধটু পান করুন; অন্যথায় মরেও যেতে পারেন!

তিনি বললেন, একটু-আধটু যদি পান করি জীবন কতটুকু লম্বা হবে? ডাক্তাররা বলল, এই দশ পনেরো বছর। তিনি উত্তর দিলেন, দশ-পনেরো

বছর পর হলেও মরতে তো হবে। তার চেয়ে এখনই মরে যাওয়া ভালো। অন্তত তাওবার ছাওয়াব তো নসিব হয়ে যাবে। তারপর মদ আর মুখে নিলেন না। এরই মধ্যে তিনি একদিন আব্দুর রব নশতরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। মাশাআল্লাহ তখন তিনি মন্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল তাকে। জিগার সাহেব যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, তখন তার গায়ে পুরাতন ও মলিন পোশাক ছিল। মাথার চুলও এলমোলো, বেশভুষাও সাদাসিধা। বাইরের ফটকের নিরাপত্তাকর্মীকে বললেন, আমি স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছি। সে বেশ দেখে মনে করল, কোনো সাহায্য প্রার্থনাকারী কিংবা ভিক্ষুক হবে হয়ত; তাই বলল, 'যাও মিয়া! স্যার এখন ব্যস্ত আছেন।' তিনি বললেন, আচ্ছা! তারপর পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বের করে তাতে একটা ছন্দ লিখে আব্দুর রব নাশতারের নিকট পাঠালেন। তিনিও কাব্য-সাহিত্য রুচির অধিকারী ছিলেন। জিগার আশ্চর্যজনক একটি ছন্দ লিখেছিলেন−

نشتر کو ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ

'আমি তশতরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার কলিজাটা দেখতো তো তুমি!'

লক্ষ করুন, কি অর্থবহ ইঙ্গিত রয়েছে এতে। যাহোক, চিরকুট পেয়ে স্বয়ং আব্দুর রব চিরকুটটা হাতে করে বেরিয়ে এলেন। সহাস্য অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, আরে জনাব! আপনি তাশরিফ এনেছেন! চলুন, উপরে চলুন। এই বলে তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। জিগারের খোঁজখবর নিলেন। একপর্যায় তিনি বললেন, আমার তো জীবন বদলে গেছে।

কিছুদিন পর দেখা গেলো, চেহারায় সুন্নাত ঝলমল করছে। মানুষ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তার বর্তমান অবস্থার ওপর কবিতা বলতেন। এক ভক্তের অনুরোধে তিনি কবিতা লিখলেন−

چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا * سنا ہے وہ کافر مسلماں ہو گیا.

'চলো, জিগারের তামাশা দেখে আসি। শুনেছি, সেই কাফেরটা মুসলমান হয়ে গেছে।'

শাইখে কামেলের অন্তরদৃষ্টি ও সাহচর্যে থেকে জিগারের মধ্যে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছিল যে, একপর্যায়ে তিনি আত্মাধিক কবিতাও বলতে শুরু করলেন। আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমায় তাঁর অন্তরের দুয়ার খুলে গেল

এবং উঁচু মাপের আরিফ বিল্লায় পরিণত হলেন। তিনি এমন একটি ছন্দ বললেন, যার মূল্য লক্ষ টাকা দিলেও কম হবে। আজকে তার যে স্মৃতিচারণ করা হলো, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, এই কবিতাটি শোনানো। অসাধারণ তার মর্মার্থ। এই কবিতাটি আমার মতো অধমেরও খুব ভালো লেগেছে। একেবারে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো।

میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس جگر * وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا.

'ওহে জিগার! ব্যস, আমার ইশকের পূর্ণতার কথা শুধু এটুকুই বলব যে, তিনি আমার উপর গেছেন আর আমি যুগের উপর ছেয়ে গেছি।'

ফানা ফিল্লাহ'র মাকাম

বন্ধুরা আমার! মানুষের অবস্থা এমন তখনই হয়, যখন সে ফানায়ে কালবীর (আল্লাহর জন্য অন্তর বিসর্জন) স্তরে উপনীত হতে পারে। ফানা ফিল্লাহ (আল্লাহর মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া) এবং ফানায়ে কালবী এগুলো মূলত তাসাউফ ও আধ্যাত্মিক জগতের প্রথম স্তর। যখন ফানার মর্যাদা অর্জিত হয়ে যায়, তখন মানুষ আল্লাহর নিরাপত্তায় চলে যায়।

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, اَلْفَانِيُّ لَا يُرَدُّ. ফানী ব্যক্তি (আত্মোৎসর্গকারী) কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় না। অর্থাৎ– এই মর্যাদা হতে পতিত হয় না। এই স্তরে আসার পূর্বে পতন হতেও পারে। তবে আল্লাহ যাকে রাখেন, তাকে কে ফেলবে।

কোনো-কোনো সালেক তথা আত্মাধিক সাধনায় আত্মোনিয়োগকারীর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ফানী কেন প্রত্যাবর্তন করতে পারে না? এর উত্তরে হযরত থানবী (রহ.)একটি সহজ উপমার মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি যেমন সাবালক (পূর্ণ বয়স্ক) হওয়ার পর আর নাবালেগ হতে পারে না, তদ্রূপ যে ফানা ফিল্লাহর এই মাকামে পৌঁছতে পারবে, সে তরীকত ও মারেফাতের মধ্যে সাবালক হয়ে গেছে। এবার আল্লাহ তা'আলা তাকে সব ধরনের পতন থেকে হেফাযত করবেন। তো যা-ই হোক, যিকির ও আল্লাহর স্মরণকে এমন স্তরে পৌঁছাতে হবে, যার কারণে বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। এর ব্যতিক্রম হলে বন্ধুরা, পদস্খলনের ব্যাপক সম্ভবনা থেকে যায়। বলা যায় না, কার সঙ্গে কখন কি মুআলামা করা হয়।

فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمر ہے * جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.

'ফানা ফিল্লাহর মধ্যেই বাকা বিল্লাহর রহস্য লুকায়িত। যে মরতে জানে না, সে বাঁচতে জানে না।'

কয়েক দিনের পূর্ণিমা

ইশ্‌ক-ভালোবাসা মানুষের ক্ষেত্রে অনেকটা ডাক্তারের মতো। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইশ্‌কে ইলাহী তথা আল্লাহর ভালোবাসা। দুনিয়ার ইশ্‌ক মহব্বতের কথা এখানে আলোচনার বিষয় নয়। কারণ, এ হলো কয়েক দিনের পূর্ণিমা। তারপর তো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। দুনিয়াদাররা যখন সুন্দরীদের দেখে, তখন দুমড়ে-মুচড়ে যায়, তাদের ওযু ভেঙে যায়, ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, হতবিহ্বল হয়ে পড়ে; কিন্তু এই চর্মসৌন্দর্যের ডিস্টিম্পার আল্লাহপ্রেমীদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

خاک ہو جائینگے قبروں میں حسینوں کے بدن * ان کے ڈسٹمپر کے خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ.

'সুন্দরীদের দেহ কবরে গিয়ে মাটি হয়ে যাবে, তাদের এই ডিস্টিম্পার সৌন্দর্যের মোহে পড়ে পয়গম্বরদের থেকে বিচ্যুত হয়ো না।'

আল্লাহর কসম! যাদের হৃদয়ের সঙ্গে আল্লাহর আরশের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়, তারা দুনিয়ার সুন্দরীদের দিকে তাকানো তো দূরের কথা, তাদের দিকে থুতু ফেলতেও ঘৃণা বোধ করেন। তাদের সামনে ওদের চুলগুলো গাধার লেজের মতই মনে হয়।

একটি আয়াতের তাফসীর

তো বলেছিলাম, আল্লাহর জন্য অন্তরে আত্মবিলীনতার গুণ তৈরি করার জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন। এজন্য পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

'হে ঈমানদার বান্দারা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনো, বিশ্বাস স্থাপন করো।'[১]

ওলামায়ে মুফাসসিরীন লিখেছেন, এখানে آمِنُوا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, اِتَّقُوْا অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করো। আমি বলছি, হে মুখে

১. সূরা নিসা : ১৩২

উচ্চরণকারীরা! আয়াতের মর্মার্থটুকু হৃদয়েও গেঁথে নাও এবং সেই অনুযায়ী জীবনটাকেও ঢেলে সাজাও।

বন্ধুরা আমার! বলা তো অনেক সহজ, কিন্তু এর মর্ম হৃদয়ে গেঁথে নেওয়া অনেক কঠিন কাজ। মানুষের অন্তরও বড্ড শক্ত ও চতুর। সহজে নতি স্বীকার করে না। এজন্যই আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন–

مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے.

من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا.

'ঈমানদীপ্ত মুসলমানরা তো এক রাতেই চমৎকার মসজিদ নির্মাণ করে ফেলল। কিন্তু আফসোস! মন তো সেই পুরাতন পাপী, পাপীই রয়ে গেল; বহু বছরেও প্রকৃত নামাযী হতে পারল না।'

হ্যাঁ ভাই! বাইরের মসজিদ নির্মাণ করা সহজ, কিন্তু অন্তরের মসজিদ নির্মাণ করা, অন্তরকে নামাযী বানানো বড়ই কঠিন কাজ!

মানুষের অন্তরই আল্লাহর আরশ এসব হাদীস নয় ১/৭৯ পৃষ্ঠা

দেখুন, এই যে অন্তর; মানুষের এই অন্তরই আল্লাহর আরশ। আল্লাহ তা'আলা একে নিজের ঘর বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর আল্লাহর ঘরকেই তো মানুষ মসজিদ বলে। সুতরাং 'বাইতুল্লাহ' সারা দুনিয়ার সকল মসজিদের 'মা' আর সব মসজিদ তার সন্তানদের মতো। আচ্ছা বলুন তো, মা'আয়াল্লাহ! বাইতুল্লায় কি আল্লাহ থাকেন? না; থাকেন না। বরং বাইতুল্লায় তাঁর খাস তাজাল্লী (বিশেষ দৃষ্টি) অনবরত বর্ষিত হতে থাকে। অবিরাম রহমত ও বরকতের বর্ষণে তা সিক্ত হতে থাকে। তো যেভাবে বাইতুল্লার ওপর তাজাল্লী বর্ষিত হয়, তেমনিভাবে যে বান্দা তার অন্তরকে আল্লাহর প্রেমে সিক্ত করে সাজিয়ে নিতে পারে, সেই অন্তরেও আল্লাহ তা'আলার খাস তাজাল্লীর অবিরাম বর্ষণ হতে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ বলেন–

لَا يَسَعُنِيْ أَرْضِيْ وَلَا سَمَائِيْ وَلٰكِنْ يَسَعُنِيْ قَلْبُ عَبْدِيْ مُؤْمِنٍ.

'আমায় ধারণ করার মতো প্রশস্ততা আসমানেও নেই, জমিনেও নেই। তবে মুমিন বান্দার অন্তরের প্রশস্ততা আমায় ধারণ করতে পারে।'

এ কথাটিকেই কবি এভাবে বলেছেন– এসব হাদীস নয় ১/৭৮ পৃষ্ঠা

من نہ گنجم در زمین و آسماں * لیک گنجم در قلوب مؤمناں.

'আমি আসমান-জমিনের কোথাও বিরাজ করি না। যদি করি, তা হলে করি আমার মুমিন বান্দার অন্তরে।'

বন্ধুরা আমার! আমরা আমাদের বাসস্থান, ঘর-বাড়ি তো প্রতিদিনই পরিষ্কার করাই, যেন সেখানে আবর্জনা জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি না হয়। কিন্তু যে অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের ঘর বলে ঘোষণা করেছেন, সেই ঘরকে কতটা পরিচ্ছন্ন রাখি? কবীরা গুনাহ ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কল্পনা দিয়ে যদি সেই অন্তরকে দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত করে রাখি, তাহলে সেই ঘরের প্রতি আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি কিভাবে পড়বে?

মৃত্যু অন্তরের পরিচয়

একব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর নিকট এসে বলল, হযরত আমাদের কী যে হয়ে গেল বুঝতে পারছি না। মনে হয়, আমাদের অন্তরগুলো ঘুমিয়ে গেছে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তা কিভাবে বুঝলে? সে বলল, হযরত! আপনার এত ওয়াজ-নসীহত, কুরআনের বাণী, হাদীছের উপদেশ শুনেও আমাদের অন্তরে কোনো প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে না। মনে হয়, আমাদের অন্তরগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। হযরত উত্তর দিলেন, ভাই! যদি বাস্তবেই এই অবস্থা হয়, তাহলে বলো না, আমাদের অন্তরগুলো ঘুমিয়ে গেছে; বরং বলো, অন্তরগুলো মরে গেছে'। সে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! অন্তর আবার কিভাবে মরে? তিনি উত্তর দিলেন, দেখো ভাই! যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে, তাকে নেড়েচেড়ে জাগানো যায়, কিন্তু যাকে বহুবার নাড়া দিয়েও জাগানো যায় না, সে তো মরে গেছে। কুরআন-হাদীছের বাণী শুনেও সে সচেতন হতে পারেনি, যার অন্তরে বিপ্লব আসেনি, সেই অন্তর ঘুমিয়ে নেই, বরং মরে গেছে, নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে।

অন্তরগুলোকে জাগিয়ে তুলতে হবে

হ্যাঁ ভাই! বাস্তবেই মানুষের অন্তর পাপ-পঙ্কিলতার আবর্জনায় চাপা পড়ে মরে যায়। সে ক্ষেত্রে কর্তব্য হলো, একে পুনরায় জাগিয়ে তোলা। তার সজীবতা ও প্রাণবন্ততা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন সাধনা।

دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ * کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ.

'মৃতের অন্তর কোনো অন্তরই নয়। একে পুনরায় জীবিত করো। এটাই উম্মতের মহামারীর একমাত্র চিকিৎসা।'

এসব পুরাতন রোগের উত্তম চিকিৎসা হলো অন্তরকে জাগ্রত করা। অন্তর যদি জেগে ওঠে, তাহলে আমাদের আমলের মধ্যে প্রাণবন্ততা ফিরে আসবে। বরং বলা যায়, বসন্ত ফিরে আসবে।

در گلستاں تھا تو ہر شے ٹپکتی تھی بہار * دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا.

'ফুলবাগানে যখন বসন্ত ছিল, তখন সব কিছু থেকেই সৌন্দর্য ঝরে পড়ত। অন্তর মরুভূমি হয়ে গেছে, পৃথিবীও মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।'

আজ আমাদের সমস্ত ইবাদত ও আমল নিষ্প্রাণ কেন? কারণ, আমাদের অন্তরে আল্লাহর সেই প্রেমের আবেগ ও জযবা নেই, যা থাকা উচিত ছিল। এই প্রেম মেখে বান্দা যে আমলই করে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তা কবুল করে নেন। অন্তরের ওপর সাধনা করে যদি তা স্বচ্ছ কাচের মতো উজ্জ্বল ও আলোকিত করে নেওয়া যায়, তাহলে দেখবেন, বান্দার ওপর আল্লাহর কত ধরনের করুণা ও রহমত অবতীর্ণ হতে থাকে। সে হয়ে যায় আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তরর্ভুক্ত। তার পদধূলি যেখানেই লাগে, তা-ই ধন্য হয়ে যায়।

হাদীছে এসেছে, মুমিন বান্দার দু'আ শব্দগুলো যখন সপ্ত আসমান ভেদ করে আরশের দিকে ছুটতে থাকে, তখন ফেরেশতারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে থাকে, আরে! এ তো খুব পরিচিত আওয়াজ মনে হচ্ছে! এ তো দেখছি, দুনিয়ার অমুক বান্দার দু'আ আওয়াজ। তারপর তারা দ্রুত আসমানের দরজাগুলো খুলে দিতে থাকে। আর বান্দার সেই আকুতিভরা দু'আর সরাসরি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহও সেই দু'আকে পরম মায়ার সাথে কবুল করে নেন। আল্লাহু আকবার!

আল্লাহর ভালোবাসা বান্দাকে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়

বন্ধুরা আমার! যখন আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা অন্তরের গভীরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়, তখন বান্দা মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতায় সুরাইয়া তারকাকেও ছাড়িয়ে যায়। যে নয়নযুগলে আল্লাহর ভালোবাসা লেগে যায়, তার দৃষ্টি সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টি হয়ে যায়। যে মুখে তার মহব্বতের স্বাদ লেগে গেছে, সে তো তুর পাহাড়ের হযরত মূসার সাথে কথোপকথনকারী গাছের সদৃশ হয়ে যায়। যে অন্তরে আল্লাহর প্রেমের সুবাস ছড়ায়, সে আল্লাহর আরশে পরিণত হয়ে যায়। সেই ব্যক্তির অস্তিত্বে ইশ্‌কে ইলাহীর ছোঁয়া লেগে

যায়। সে আল্লাহর রহমত ও বরকতের ঝরনাধারায় পরিণত হয়। মোটকথা, আল্লাহর ভালোবাসা ও মহব্বতে ইলাহী মানুষকে এত উচ্চতায় পৌঁছিয়ে দেয় যে, মর্যাদা ও নৈকট্যে তারা ফেরেশতাদেরও ছাড়িয়ে যায়।

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا * مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ.

'ফেরেশতা না হয়ে মানুষ হওয়া অনেক ভালো। তবে এতে পরিশ্রম-সাধনা একটু বেশিই লাগে।'

মানুষ যখন প্রকৃত অর্থেই মানুষ হয়ে যায়, তখন তার অস্তিত্বে, কথায়-কাজে, চলনে-চাউনিতে অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি হয়। যার কারণে তার সকল ইবাদত-আমলেও প্রাণ সঞ্চারিত হয়। নামাযে স্বাদ লাগে, মেহমানদারিতে তৃপ্তি লাগে, রাতের শেষ প্রহরে জেগে উঠে তাহাজ্জুদের মজা পায়, কেঁদে কেঁদে আপন মাওলার কাছে শোক-শেকায়েত ও আবদার-অনুযোগ করে, যার স্বাদ কেবল সে-ই পায়। পৃথিবীতে ঘুমন্ত মানুষগুলো এর কী খবর রাখে?

مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے * بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں.

تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی * راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں.

'আমার মাঝে তো নিজের খবরও নেই, দুনিয়ার খবরও নেই। আমি তো বিভোর বসে আছি তোমার কল্পনায় তারাদের জিজ্ঞাস করো আমার জীবনকাহিনী। আমি জেগে-জেগে রাত কাটিয়ে দেই তোমার ভাবনায়।'

এ কথাগুলো আমি ব্যাখ্যা করছি দুটি উদাহরণের মাধ্যমে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর উদাহরণ

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন কোনো মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলতেন, 'হে অমুক! قُمْ بِإِذْنِ اللهِ. (তুমি আল্লাহর হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও) তখন আল্লাহ তা'আলা কিছুক্ষণের জন্য সেই ব্যক্তিকে জীবিত করে দিতেন। এখন আমরা সবাই মিলে যদি কোনো লাশের সামনে দাঁড়িয়ে قُمْ بِإِذْنِ اللهِ. এর মিছিলও করি, সে কি জীবিত হবে? না, হবে না। অথচ শব্দ সেগুলোই। বলাও হযেছে সেভাবেই। ব্যবধান শুধু মুখের। তাদের মুখ এত পবিত্র ও মুবারক ছিল যে, قُمْ بِإِذْنِ اللهِ. বলার সঙ্গে-সঙ্গে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যেত।

পুলিশের আইজি'র উদাহরণ

মনে করুন, একজন সাধারণ মানুষ মহাসড়ক দিয়ে কোথাও যাচ্ছে। পথে দেখল, একজন পুলিশ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে না। সে পুলিশকে বলল, আমি তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলাম। বলুন তো, এতে কি সে আসলেই বরখাস্ত হয়ে যাবে? না; হবে না। বরং তাকে পাল্টা ধোলাই খেতে হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যদি সে পথেই পুলিশের আইজি সাহেব অতিক্রম করেন এবং উক্ত পুলিশকে ডেকে বলেন, তোমার আইডি নম্বর কত? যাও আমি তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলাম। বলুন তো এবার সে বরখাস্ত হবে, নাকি হবে না? হয়ে যাবে। অথচ শব্দ তো সেগুলোই! একজন সাধারণ মানুষ বলে বিপদে পড়ল আর আইজি সাহেব বলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল। ব্যবধান কোথায়? ব্যবধান হলো আইজি সাহেব এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলে তার কথা কার্যকর হলো আর সাধারণ লোকটি সেই মর্যাদার অধিকারী নয় বলে তার কথা কার্যকর হলো না।

এমনিভাবে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, তখন কথা ও কাজের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতা ও প্রভাব সৃষ্টি হয়, যা অন্যদের অর্জিত হয় না।

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان * گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان.

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن * قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن.

'মমিনের প্রতিটি মুহূর্তই নতুন মান ও শান। কথায়-কাজে সব কিছুতেই আল্লাহর প্রমাণ। এ রহস্য কারুরই জানা নেই যে, মুমিন দেখতে কারী মনে হলেও আসলে সে কুরআন।'

এক তেজস্বী সাহাবীর দাপুটে জবাব

সাহাবা কেরাম যখন পারস্য অঞ্চলে জিহাদী অভিযান পরিচালনা করেন, তখন এক শহরের চতুর্দিকে মুসলিম বাহিনী অবরোধ করে শক্ত অবস্থান নিলেন। অবরোধ দীর্ঘদিন চলল। শহরের বাদশা মহা সংকটে পড়ে সভাসদদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন, কী করা যায় এখন? এদের হাত থেকেও বাঁচার কী উপায় হতে পরে? এরা যেদিকে ছোটে, সেদিকটা-ই জয় করে নেয়! এখন এরা আমাদের ঘাড়ে সাওয়ার হয়েছে। এদের হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বের করুন।

সভাসদরা পরামর্শ দিল, বাদশা সালামত! তাদেরকে ডেকে এনে আপনার শান-শওকত, প্রভাব ও শক্তি দেখান। তারা বস্ত্রহীন ও ক্ষুধার্ত লোক। তারা আমাদের ধন-সম্পদ দেখে প্রভাবিত হয়ে যাবে।

বাদশা বললেন, খুবই ভালো কথা। তাহলে সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে কাউকে তাদের নিকট পাঠাও এবং আলোচনার জন্য কাউকে আমন্ত্রণ জানাও।

সন্ধি প্রস্তাব পেয়ে মুসলিম সেনাপ্রধানের পক্ষে এক সাহাবীকে আলোচনার জন্য বাদশার কাছে পাঠানো হলো। ইনি এমন একজন সাহাবী ছিলেন, যার পরনে ছিল তালিযুক্ত পোশাক। বসার জন্য ঘোড়ার পিঠে কোনো জিন বা গদি ছিল না। নগ্ন পিঠেই আরোহণ করে এসেছেন। হাতে ছিল একটা ভাঙা তরবারী। রাজদরবারে প্রবেশ করে সোজা বাদশার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। বাদশা প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'এ কেমন বে-আদবি? তোমার কি এতটুকুও ভদ্রতা জানা নেই যে, বাদশার দরবারে কিভাবে আসতে হয়?'

সাহাবী : আমাদের প্রিয় রাসূলের শিক্ষা এটিই। মানুষকে পূজা করার শিক্ষা আমরা পাইনি।

বাদশা : তোমরা চাও কী? কেন এসেছ এখানে?

সাহাবী : আপনি ইসলাম গ্রহণ করে শান্তিতে থাকুন।

বাদশা : অসম্ভব! আমরা আমাদের ধর্ম ছাড়ব না।

সাহাবী : তাহলে রাজ্যক্ষমতা আমাদের হাতে দিয়ে দাও এবং জিযিয়া আদায় করো। আমরা তোমাদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার ব্যবস্থা করব।

বাদশা : তোমাদের মতো ভুখা-নাঙ্গা, ফকীর-মিসকীনের হাতে আমার রাজ্যক্ষমতা দিয়ে দেব? এটা কী করে সম্ভব?

সাহাবী : ঠিক আছে; যদি কোনো প্রস্তাবেই রাজি না হও, তাহলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নাও। আমাদের ও তোমাদের মাঝে একমাত্র তরবারীই চূড়ান্ত ফয়সালা করবে। তোমাদের সকল ধন-সম্পদ আমাদের হস্তগত হবে। তোমাদের স্ত্রী-কন্যারা আমাদের দাসী হবে।

দরবারভরা মানুষ। অসংখ্য উন্মুক্ত তরবারীর সামনে একজন সাহাবীর দাপুটে কথপোকথন কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না। ভয়ে-ক্ষেভে বাদশার ঘাম ছুটে গেল। তিনি পুনরায় বললেন–

আচ্ছা! এই যে তোমার তরবারীটা ভাঙা ও মরিচাধরা। এ দিয়ে তোমরা কিভাবে আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করবে?

সাহাবী : (তাচ্ছিল্যভরে মুচকি হেসে) বাদশা! তোমরা আমাদের মরিচাধরা তরবারীগুলো দেখছ ঠিক; কিন্তু এগুলো সঞ্চালনকারী ইস্পাতকঠিন বাহুগুলো এখনও দেখনি। এসো যুদ্ধের ময়দানে। সেখানেই বুঝতে পারবে, কার সঙ্গে যুদ্ধ করছ।

তারপর তিনি সেখান থেকে মুসলমানের সৈন্যশিবিরে ফিরে গেলেন। সেখানে যুদ্ধ হলো। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। জি; যারা গাইরুল্লাহকে ভয় পায় না, আল্লাহ তাদের কথা ও কাজে এমনই প্রভাব সৃষ্টি করে দেন।

لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا * حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا.

'তুমি যখন নারায়ে তাকবীর বলতে, তখন খায়বারও গুড়িয়ে যেত। আদেশ করলে সমুদ্রও পথ করে দিত।'

মুফতী ইলাহীবখ্‌শ নকশবন্দী (রহ.)-এর সততার জাদু

কান্দলায় এক টুকরো জমি নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। হিন্দুরা দাবি করছিল, এ জমি আমাদের; আমরা এখানে মন্দির নির্মাণ করব আর মুসলমানরা দাবি করছিল, এ জায়গা আমাদের; এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হবে।

উভয় পক্ষের এ বিরোধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা হতে লাগল। অবশেষে সবাই আদালতের দ্বারস্থ হলো। বিচারক ছিলেন এক ইংরেজ। আদালত প্রাঙ্গণে মুসলমান-হিন্দু উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক লোক উপস্থিত ছিল। বিচারক বললেন, এমন কোনো প্রক্রিয়া বলুন, যার দ্বারা সংঘাত-সংঘর্ষ ছাড়াই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

হিন্দুরা বলল, আমাদের কাছে একটা উপায় আছে। বিচারক বললেন, কী উপায় সেটি? তারা বলল, আমরা একজন মুসলমান আলেমের নাম বলছি; আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, এই জমি কাদের? যদি তিনি বলেন, এই জমি আমাদের, তাহলে জমি আমাদের হাওলা করে দেবেন। আর যদি তিনি বলেন, জমি মুসলমানদের, তাহলে জমি তাদের দিয়ে দেবেন। কিন্তু আমরা তার নাম গোপনে শুধু আপনাকেই জানাব – প্রকাশ্যে ঘোষণা করব না।

বিচারক মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি এ প্রস্তাবে রাজী? মুসলমানরা ভাবল, একজন মুসলমান আলেমকে সাক্ষী বানাচ্ছে; তিনি তো

মসজিদের পক্ষেই সাক্ষ্য দেবেন। তাই তারা বলল, হ্যাঁ আমরা এ প্রস্তাবে রাজী। বিচারক পরবর্তী একটি তারিখ ঘোষণা করে এজলাস মুলতবি করলেন।

বিচারক নির্জনে হিন্দুদের কাছে সাক্ষীর নাম জিজ্ঞাসা করলে তারা নকশবন্দী সিলসিলার একজন বড় মাপের বুযুর্গ হযরত মুফতী ইলাহীবখ্‌শ (রহ.)-এর নাম বলল। আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে সব হিন্দু মিলে তাদের নেতাকে বকাঝকা করতে লাগল যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে একজন মুসলমানের নাম কেন ঘোষণা করা হলো? হিন্দুদের মধ্যে কি কেউ ছিল না? এখন তো সে মুসলমানদের পক্ষেই সাক্ষ্য দেবে। কাজটা মোটেও ভালো হয়নি। এটা একটা আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অপর দিকে মুসলমানরা খুশিই ছিল। কারণ, সাক্ষী যেহেতু মুসলমান, তাহলে মসজিদের পক্ষে, মুসলমানদের পক্ষেই সাক্ষ্য পড়বে। এজন্য তারা খুব আত্মতুষ্টিতে ছিল।

পরবর্তী তারিখে আদালত প্রাঙ্গণে উভয় পক্ষের বিপুলসংখ্যক লোক সমবেত হলো। মুফতী ইলাহীবখ্‌শও উপস্থিত হলেন। বিচারক মুফতী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব! বলুন তো জমিটা কি হিন্দুদের, না মুসলমানদের? মুসলমানরা এই আত্মতুষ্টিতে ছিল যে, এখনই তিনি মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্য রকম। মুফতী সাহেব অত্যন্ত স্থিরচিত্তে বললেন, 'জজ সাহেব! সত্যিকার অর্থে জমিটুকু হিন্দুদের – মুসলমানদের নয়।' বিচারক পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'হিন্দুরা কি এ জমিতে বসতবাড়ি নির্মাণ করতে পারবে?' তিনি বললেন, মালিক যেহেতু তারা; ঘর নির্মাণ করুক আর মন্দির বানাক এটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। বিচারক মুফতী সাহেবের সততা ও সরলতায় মুগ্ধ হয়ে রায় ঘোষণা করলেন। রায়টি যেমন ঐতিহাসিক ছিল, রায়ের ভাষাও ছিল ঐতিহাসিক। তিনি লিখলেন–

آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا.

'আজকের এই মকদ্দমায় মুসলমানরা হেরে গেছে; কিন্তু ইসলাম জয়লাভ করেছে।'

বিচারক সবাইকে রায় শুনিয়ে দিলেন। হিন্দুরা বিচারকের মন্তব্য শুনে প্রভাবিত হয়ে বলল, 'জজ সাহেব! রায় তো আপনি আমাদের পক্ষে দিয়েছেন; কিন্তু বিজয় তো হলো ইসলামের। আপনাকে সাক্ষী রাখছি এই

আমরা কালিমা পড়লাম এবং মুসলমান হয়ে গেলাম। এবার এই জমিতে মন্দির নয় – মসজিদই নির্মিত হবে ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ!

এক আল্লাহরওয়ালার সততায় হিন্দুরা এতটাই মুগ্ধ হলো যে, তারা ইসলামও কবুল করল এবং বিবাদিত স্থানে মসজিদও নির্মাণ করল!

কবি বলেন,

ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق * یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق.

অর্থ : হাজারো ভয় থাকুক তবু মুখ যেন হয় অন্তরের বন্ধু। এটাই ছিল যুগ-যুগ ধরে খোদাপ্রেমীদের নিয়ম।

হযরত মুহাম্মাদ দরবন্দী (রহ.)-এর দৃষ্টির প্রভাব

বন্ধুরা! যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ঘর করে নিয়েছে, আল্লাহ তার দ্বারা এত বড়-বড় কাজ সম্পাদন করেন, যা গোটা একটা সম্প্রদায়ের পক্ষেও সম্ভবপর হয় না। হিজরী সপ্তম শতাব্দির কথা। মুসলমানরা তখন অধঃপতনের শেষ ধাপে গিয়ে ঠেকেছিল। তাতারী বর্বররা মরুভূমির ধূলিঝড়ের মতো মুসলিম সমাজকে তছনছ করে দিল। ছিনিয়ে নিল তাদের সালতানাত। শুধু বাগদাদেই একদিনে আড়াই লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। মুসলমানরা তাদের ভয়ে এতটাই আতঙ্কিত ছিল যে, কেউ যদি সংবাদ দিত, অমুক যুদ্ধে তাতারীরা পরাজিত হয়েছে, তাহলে কেউ বিশ্বাসই করত না।

দরবন্দ নামে একটি শহর ছিল। তাতারীরা যখন সেই শহরে প্রবেশ করল, তখন সেখানকার মুসলিম অধিবাসীরা শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু খাজা মুহাম্মাদ দরবন্দী (রহ.) ও তার এক খাদেম মসজিদে থেকে গেলেন। তাতারী শাহজাদা শহরে প্রবেশ করে দেখল পুরো শহর ফাঁকা পড়ে আছে। মূল্যবান আসবাবপত্র, বিশাল-বিশাল আলিশান অট্টালিকা দেখে সে বলল, দেখো, আমাদের শত্রুরা কত ভীতু। এত মূল্যবান জিনিসপত্র-ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে! সে সেনাবাহিনীকে আদেশ দিল, দেখো তো শহরে কোনো মানুষজন আছে কিনা?

কিছুক্ষণ পর তাকে সংবাদ দেওয়া হলো, দুজন লোক আছে; তারা মসজিদে অবস্থান করছে। হুকুম দেওয়া হলো, তাদের গ্রেফতার করে শাহাজাদার সম্মুখে হাজির করা হোক।

আদেশ পালিত হলো। শাহাজাদা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন–

তোমরা কি দেখনি, আমরা শহরে প্রবেশ করেছি?

হযরত : হ্যাঁ, আমরা জানতাম।

শাহাজাদা : তাহলে শহর ছেড়ে পালাওনি কেন?

হযরত : আমরা তো আল্লাহর ঘর মসজিদে বসে ছিলাম।

শাহাজাদা : তোমরা বলছ, আমরা আল্লাহর ঘর মসজিদে বসে ছিলাম। কিন্তু আমাদের শাণিত তরবারীর কথা কি ভুলে গিয়েছিলে? তোমাদের হাত-পায়ে জড়ানো লৌহশিকলের কথাও কি মনে ছিল না?

হযরত : এসব শিকল, তরবারী দিয়ে কি করবে তোমরা?

শাহাজাদা : কেন, এগুলো দেখে তোমাদের ভয় লাগছে না?

হযরত : এসব শিকল-ফিকলে ভয় পাওয়ার কী আছে? এগুলো আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

শাহাজাদা : মিথ্যা কথা। আমার আদেশ ব্যতীত তোমাকে এ শিকল থেকে কেউ মুক্তি দিতে পারবে না।

হযরত : কি বললে? পারবে না? তাহলে দেখো!

হযরত মুহাম্মাদ দরবন্দী (রহ.)-এর ধমনী তখন আল্লাহর জালালে টগবগ করছিল। তিনি অত্যন্ত জযবা ও জোশের সাথে 'আল্লাহ, আল্লাহ' বলতে শুরু করলেন আর অমনি লৌহশিকলের আংটাগুলো এক-এক করে আপনা-আপনি ভেঙে পড়তে লাগল। এ দৃশ্য শাহাজাদাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করল। সৈন্যদের আদেশ দিল, এদেরকে এ শহরেই থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

তাতারী শাহাজাদা হযরত মুহাম্মাদ দরবন্দী (রহ.)-এর ভক্ত হয়ে গেলেন। বিভিন্ন সময়ে তার কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন। হযরত দরবন্দী (রহ.) তার প্রশস্ত সিনায় অন্তরদৃষ্টি দিয়ে অন্তরের জগতই বদলে দিলেন। একপর্যায়ে তিনি হযরতের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। তার দেখাদেখি অন্যান্য শাহাদাজারাও ইসলাম কবুল করে নিল। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা পুরো মুসলিম সাম্রাজ্যকে পুনরায় মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے * پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے.

'তাতারীদের ইতিহাস হতে ফলাফল এটাই প্রকাশ পেল যে, ইসলাম অতন্দ্র প্রহরী পেয়ে গেল মূর্তিপূজারীদের মন্দির থেকে।'

যে কাজ পুরো কওম মিলে করতে সক্ষম হয়নি, আল্লাহর এক খাঁটি বান্দা একাই তা করে দেখিয়েছেন।

نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا * یہ نگہ کی تیر بازی وہ سپہ کی تیر بازی.

'বাদশাহী ও ফকিরির মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এটা দৃষ্টির তীরনিক্ষেপ আর ওটা সৈনিকের তীরনিক্ষেপ।'

হযরত আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহ.)-এর কথার জাদু

আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসার কারণে মানুষের কথার মধ্যে অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি হয়। একটি কথা একজন সাধারণ মানুষের মুখে শুনুন অন্তরে তেমন প্রভাব অনুভব হবে না; কিন্তু সেই কথাটিই যখন আল্লাহর কোনো আশেক বান্দা মুখে উচ্চারণ করবে, তখন তার অন্তরে তোলপাড় সৃষ্টি করে ফেলবে। কথা তো একই; শুধু মুখের ও বক্তার পার্থক্য।

হযরত আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহ.)-এর একটি বিস্ময়কর ঘটনা আছে। হযরতের সাহেবজাদা শাহ রুকনুদ্দীন লেখা-পড়া শেষ করে ঘরে ফিরেছেন। মুহতারাম পিতার সঙ্গে কোনো মজলিসে বসা ছিলেন। হযরত তাকে সম্বোধন করে বললেন, রুকনুদ্দীন! কিছু নসীহত শোনাও! মাওলানা রুকনুদ্দীন বড় মাপের আলেমে দীন ছিলেন। উঠে চমৎকার একটি মারেফতী বয়ান পেশ করলেন। সবাই খুব নীরবতা ও একাগ্রতার সঙ্গে তার বয়ান শুনল বটে; কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে তেমন কোনো প্রভাব হয়েছে বলে মনে হলো না।

তার বয়ান শেষ হওয়ার পর হযরত আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহী (রহ.) বললেন, 'রুকনুদ্দীন! রাতে আমি নিজের জন্য কিছু দুধ রেখেছিলাম। একটা বিড়াল এল আর দুধগুলো পান করে চলে গেল।' হযরতের এই কথাটুকু শোনার সঙ্গে-সঙ্গে পুরো মজলিস হাউ-মাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল। হযরত সাহেবজাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেটা! তুমি তো অনেক উঁচু মাপের ইল্‌মী বয়ান করলে; কিন্তু তাতে তো কোনো প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়নি। আর আমি সাধারণ একটি বাক্য উচ্চারণ করতেই এরা সবাই অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল।'

এর কারণ কি বলুন তো? তাই তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, 'আব্বাজান! যে মুখ থেকে কথাগুলো বের হয়েছে, তার মধ্যে অসাধারণ শক্তি ও প্রভাব রয়েছে, যা মানুষের অন্তরগুলো গলিয়ে দিয়েছে।

দৃষ্টির প্রভাব

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের দৃষ্টি যার ওপর পড়ে তার মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রভাব ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। হযরত শায়খুল হাদীছ (রহ.) এ সংক্রান্ত একটি বিস্ময়কর ঘটনা লিখেছেন। ঘটনাটি হলো, শাহ আব্দুল কাদের (রহ.)একবার দিল্লীর ফতেহপুর জামে মসজিদে ইতিকাফ করেন। যখন বাইরে এলেন, তখন একটা কুকুরের ওপর দৃষ্টি পড়ল। তিনি একটু মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখলেন, এতে সেই কুকুরটার মধ্যে এক ভিন্ন ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি হলো, যার কারণে অন্যান্য কুকুর তার পিছনে চলতে লাগল। সে যেখানে গিয়ে বসত, অন্য কুকুররাও তার কাছে গিয়ে বসে থাকত। হযরত থানবী (রহ.) যখন এই ঘটনাটি শুনলেন, তখন হেসে উঠে বললেন, সেই জালিম কুকুরটাও কুকুরদের পীর বনে গেল! দেখেছেন তো একজন কামেল ওলীর দৃষ্টি একটা কুকুরের ওপর পড়তেই সে এত দামী হয়ে গেল। যদি সেই দৃষ্টি একজন মানুষের ওপর পড়ে, তাহলে সে কেন দামী হবে না? অবশ্যই হবে।

মুফতী লুৎফুল্লাহ (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব

হযরত মুফতী লুৎফুল্লাহ সাহারানপুরী (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের একজন উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। একবার সপরিবারে কোনো বিবাহের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। একটা মহিষচালিত গাড়িতে ঘরের পর্দাশীল মহিলা ও শিশুদের বসিয়ে দিলেন। কাফেলায় পুরুষ বলতে তিনি একা। পথে একটা নির্জন এলাকা এল। সেখানে কিছু ডাকাত লুকিয়ে ছিল। কাফেলা দেখে তারা বেরিয়ে এসে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। বলল, সম্পদও লুটব, নারীদের কলঙ্কিতও করব। হযরত খুব মিনতি করে বললেন, দেখো! আমাদের কাছে যত স্বর্ণালঙ্কার আছে, আমরা তোমাদের হাতে তুলে দেব। তোমরা দয়া করে এই পর্দাশীল মা-বোনদের প্রতি হাত বাড়িও না। আমি নিজেই তাদের সব অলঙ্কার একত্রিত করে তোমাদের এনে দিচ্ছি। ডাকাতসর্দার বলল, ঠিক আছে তা-ই করুন।

হযরত পরিবারের সকল মহিলাকে বললেন, যার কাছে যত অলঙ্কার আছে সব এখনই খুলে আমার কাছে দাও। সরল-সহজ নারীরা চুড়ি, আংটি, গলার হার ইত্যাদি স্বর্ণালঙ্কার যা ছিল সব খুলে একটা রুমালে রাখল। হযরত সেই রুমালের পুটলিটা নিয়ে ডাকাতসর্দারের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, আমাদের কাছে যত গয়না ছিল, সব এখানে আছে। আপনারা নিয়ে যান এবং

আমাদের পথ ছেড়ে দিন। তারা বিনাকষ্টে এতগুলো গয়না পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে পথ ছেড়ে দিল। হযরত তার কাফেলাকে সামনে এগিয়ে নিলেন। অল্প একটু পথ অতিক্রম করতেই মহিলাদের একজন বলে উঠল হায়! হায়! আমার কনিষ্ঠা আঙুলে একটা স্বর্ণের আংটি ভুলে রয়ে গেছে। হযরত বললেন, সেটাও খুলে দাও। কারণ, আমি তাদেরকে আমার সব অলঙ্কার খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সুতরাং এই আংটি রেখে দেওয়া সমিচীন হবে না। তিনি আংটিটা নিয়ে দৌড়ে ডাকাতদের কাছে ফিরে এলেন। তারা প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে তার কথা শুনে আশ্বস্ত হলো। তিনি যখন তাদের কাছে পৌঁছলেন, তখন তপ্ত অশ্রু তার দুগাল বেয়ে পড়ছিল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, ভাই! আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সবগুলো অলঙ্কার আপনাদের হাতে তুলে দেব; কিন্তু ছোট্ট একটা আংটি আমাদের কন্যার হাতে ভুলবশত রয়ে গেয়েছিল। এই নিন; আমি সেটা নিয়ে এসেছি।

এই অপূর্ব সততা ও সরলতা দেখে ডাকাতসর্দারের ধমনিতে এমন কম্পন সৃষ্টি হলো যে, সে অঝোরে ঘামতে শুরু করল। বড় আক্ষেপের সুরে বলল, হায়! আপনি কত ভলো মানুষ। কী অপূর্ব সততা ও সরলতা আপনার। সামান্য একটা আংটির ব্যাপারে আপনি এমন আমানতদারি দেখালেন! আমিও তো আপনার মতো মুসলমান! অথচ মানুষের ওপর লুটে-পুটে অগণিত পাপ করে যাচ্ছি।

যে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছিলাম, তার কোনো মর্যাদা আমি রক্ষা করতে পারিনি। হযরত! আপনার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। এই নিন আপনার অলঙ্কার। আমি তাওবা করছি, আজকের পর আর কোনোদিন ডাকাতি করব না। আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

এক রমণীর অসিলায় দুর্ভিক্ষের অবসান

বন্ধুরা আমার! স্মরণ রাখবেন, যে ব্যক্তির মাঝে আল্লাহর প্রেম সৃষ্টি হবে, তাকে উসিলা বানিয়ে যদি দু'আ করা হয়, তাহলে আল্লাহ সেই দু'আকেও কবুল করে নেন। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.)একটি ঘটনা লিখেছেন।

একবার দিল্লীতে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। খাল-বিল, নদী-নালা সব শুকিয়ে গেল। ফসলের মাঠগুলো পানির অভাবে নষ্ট

হতে লাগল। চরম খাদ্যসংকট দেখা দিল। প্রচণ্ড গরমে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। বাচ্চারা কাঁদছে, মায়েরা ছটফট করছে। জীবজন্তু সব পেরেশান, কী করে এই দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে উঠবে? শহরের সকল উলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত নিলেন, অমুক দিনে শহরের সকল নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ সবাই একটা বড় ময়দানে সমবেত হবে। তাদের পশুগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে আসবে। ওলামায়ে কেরামও থাকবেন। সেখানে 'সালাতুল ইস্‌তিস্‌কা' তথা 'বৃষ্টি প্রার্থনার নামায' আদায় করা হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলার দরবারে কেঁদে-কেঁদে দু'আ করা হবে, যেন তিনি শহরবাসীর ওপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

সেকালে দিল্লীর শহরগুলো ছোট-ছোট ছিল। তাই যথাসময়ে শহরবাসী ময়দানে সমবেত হয়ে 'সালাতুল ইস্‌তিস্‌কা' আদায় করে খুব কেঁদে-কেঁদে দু'আ করল, হে আল্লাহ! আমরা খুব কষ্টে আছি; আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের ওপর রহমতের বৃষ্টি ঢেলে দিন। কিন্তু দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেল, বৃষ্টির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

ময়দানের পাশ দিয়ে এক যুবক উটে সাওয়ার হয়ে তার মাকে নিয়ে যাচ্ছিল। দেখে উট থামিয়ে সে মজমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, এখানে তোমরা একত্র হয়ে কী করছ? লোকেরা বলল, আমাদের এই অঞ্চলে অনাবৃষ্টির কারণে চতুর্দিকে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ছে। এর জন্য 'সালাতুল ইস্‌তিস্‌কা' আদায়ের উদ্দেশ্যে সবাই এখানে সমবেত হয়েছি। খুব কেঁদে-কেঁদে দু'আ হয়েছে; কিন্তু বৃষ্টির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

যুবক বলল, ঠিক আছে; আমিও আপনাদের জন্য বৃষ্টির দু'আ করছি। নিজের সাওয়ারীর কাছে গিয়ে মায়ের চাদরের একটা আঁচল হাতে নিয়ে আকাশের পানে চোখ তুলে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। মুহূর্তের মধ্যে আকাশের এক কোণে এক টুকরা কালো মেঘ ভেসে উঠল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেই মেঘখণ্ড পুরো এলাকা ছেয়ে গিয়ে অঝোরে বৃষ্টি ঝরাতে লাগল। পুরো মজমা, ওলামা, মাশায়েখ, নারী-পুরুষ সবাই হতবাক হয়ে আল্লাহর রহমতের বারিধারা দেখছিল আর তাঁর নামে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছিল।

ওলামায়ে কেরাম হতবাক হয়ে যুবকের দিকে তাকিয়ে ছিল। এত লোক মিলে দু'আ করল কবুল হলো না; অথচ এক যুবক দু'আর জন্য হাত উঠাতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারা যুবকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভাই! আপনি কী দু'আ করেছেন? যুবক বলল, তেমন কিছু তো না। তবে আমি একজন নেককার পুণ্যবতী মায়ের সন্তান। আমার মা সারাটা জীবন পবিত্রতা ও

খোদাভীতির মধ্যে কাটিয়েছেন। গুনাহের কোনো কলঙ্ক তিনি নিজের গায়ে লাগাতে দেননি। আমি দেখলাম, আপনারা বড়ই সমস্যায় আছেন। তাই আপনাদের জন্য দু'আ করার ইচ্ছা হলো। আমি আমার মায়ের চাদরের আঁচল হাতে নিয়ে এ দু'আ করেছি, 'হে আল্লাহ! আপনাকে এই চাদর পরিধানকারিনীর পুণ্য ও পবিত্রতার দোহাই দিচ্ছি। দয়া করে এর উসিলায় এই অঞ্চলে রহমতের বৃষ্টি দান করুন। আল্লাহ তা'আলা আমার মায়ের কোরবানীকে এতই পছন্দ করলেন যে, তার বরকতে তিনি আপনাদের রহমতের বৃষ্টি দান করলেন।

মুমিন বান্দার মর্যাদার গল্প

এক বুযুর্গ সফর করে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক খৃষ্টানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে বলল, আমাকে আপনার সফরসঙ্গী করে নিন। বুযুর্গ তাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললেন। পথে উভয়ের নিকট খাদ্য-দ্রব্য যা ছিল সব ফুরিয়ে গেল। অনাহারের দিন শুরু হয়ে গেল। ক্ষুধার্ত অবস্থায় সফর করা খুব কঠিন। কী করা যায়? তারা পরামর্শে বসল। মুসলমান বুযুর্গ বললেন, আজ আমি দু'আ করি; এতে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু রিযিক দেবেন, তা আমরা সবাই খেয়ে নেব। কাল আপনি দু'আ করবেন। খৃষ্টান বলল, ঠিক আছে তা-ই হবে।

যাহোক, মুসলমান বুযুর্গ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমি মুসলমান; আপনার প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতী। আপনার প্রিয়নবীর দীনের সততা প্রকাশ করুন। আমার মর্যাদা রক্ষা করুন। আমাদের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করে দিন।

میری لاج رکھ لے میرے خدا* یہ تیرے حبیب ﷺ کی بات ہے.

'আমার মান রক্ষা করো হে প্রভু! এটা তো হাবীবের মর্যাদার ব্যাপার।'

দু'আ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে একব্যক্তি খাবারভর্তি একটা বড় ঝুড়ি নিয়ে এল। মুসলমান বুযুর্গ দেখে খুব আনন্দিত হলেন এবং বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। মনে-মনে ভাবলেন, আজ তো ইসলামের বরকতে খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কাল দেখব, খৃষ্টান লোকটির সঙ্গে আল্লাহ কী আচরণ করেন?

পরদিন খৃষ্টান সঙ্গীকে দু'আ করার জন্য বলা হলো। সে একটু দূরে এক নির্জন স্থানে সরে গেল এবং খুব সংক্ষিপ্ত দু'আ করে অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে

এল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, একব্যক্তি গতকালের মতো খাবারভর্তি বড়-বড় দুটা ঝুড়ি নিয়ে উপস্থিত।

মুসলমান বুযুর্গ খুব বিস্মিত হলো, এ কী কাণ্ড! আমি ইসলামের নাম করে দু'আ করলাম খাবার এল মাত্র এক ঝুড়ি; আর এই খৃস্টান দু'আ করল খাবার এল দুই ঝুড়ি, বিষয়টি এমন হলো কেন? এদিকে খৃস্টান সঙ্গী তো ভীষণ খুশি। সে দস্তারখান বিছিয়ে মুসলমান বুযুর্গকে ডাকতে লাগল। বুযুর্গ এলেন ঠিক কিন্তু মুখে বিমর্ষ ভাব ছিল। খাওয়ার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। খৃস্টান জিজ্ঞাসা করল, জনাব! আপনাকে খুব বিমর্ষ লাগছে।

বুযুর্গ : হ্যাঁ; বিমর্ষ তো অবশ্যই। এ কেমন ঘটনা ঘটল!!

খৃস্টান : আপনি নিশ্চিন্তে খানা খান। আপনাকে আমি দুটি সুসংবাদ শোনাব।

বুযুর্গ : না; আগে সুসংবাদ শোনাও; তারপর খানা খাব। আমি অত্যন্ত মর্মাহত!

খৃস্টান : মজার ব্যাপার হলো, আমি নির্জনে গিয়ে কী দু'আ করব ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। অবশেষে খুব সংক্ষেপে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! আমার সফরসঙ্গী তোমার একজন সম্মানী মুমিন বান্দা। তুমি দয়া করে তার উসিলায় আজকে দুই ঝুড়ি খাবারের ব্যবস্থা করে দাও। দয়াময় আল্লাহ আমার দু'আ শুনলেন। আর তা হয়েছে আপনার বরকতে। এবার সুসংবাদ দুটি শুনুন। প্রথমটি হলো, আজকের ও গতকালের ঘটনায় প্রমাণ হলো, আপনি আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দের বান্দা। আর দ্বিতীয় সুসংবাদ হলো, ইসলামের সততা আমার কাছে প্রমাণিত হয়ে গেছে; তাই এই মুহূর্তে আমি কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছি।

এই বলে সে উচ্চৈঃস্বরে কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। বুযুর্গ আল্লাহ তা'আলার এই অকল্পনীয় পুরস্কার দেখে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

এক ঈমানদারের হাতের পরশে

এক বুযুর্গ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক অগ্নিপূজকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। বললেন, তুমি কোন ধর্মের লোক? সে বলল, আমি মজুসী (অগ্নিপূজক)। কুশলবিনিময় ও আলাপচারিতার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আচ্ছা ভাই! তোমরা অগ্নিপূজা কর কেন? আগুন তো খোদা নয়। খোদা তো তিনি, যিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অগ্নিপূজক তার কথায় অটল থাকল।

জোশে এসে বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা, আমাদের মধ্যে হক-বাতিলের একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। এসো; কোথাও আগুন জ্বালাই। তারপর সেই আগুনে তুমিও হাত দেবে এবং আমিও হাত দেব। যে হক্বের ওপর থাকবে, আগুন তার হাত জ্বালাতে পারবে না। আর যে বাতিলের ওপর থাকবে, আগুন তার হাত জ্বালিয়ে দেবে।

দুজন প্রস্তুত হয়ে গেল। এক জঙ্গলে প্রবেশ করে অনেকগুলো লাকড়ি জমা করা হলো। তারপর তাতে আগুন জ্বালানো হলো। একেবারে দাউ-দাউ আগুন। বুযুর্গ সামনে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু অগ্নিপূজক ঘাবড়ে গিয়ে পিছুটান দিল। তার মতিগতি দেখে বুযুর্গ জোরপূর্বক তার হাত নিজের হাতের মধ্যে রেখে উভয় হাত দাউ-দাউ আগুনে মেলে ধরলেন। বুযুর্গের তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি মুসলমান; আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমার ও দীনে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করবেন। কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা! আগুন তাদের কারুর হাতই জ্বালাল না। বুযূর্গের হাতও না, অগ্নিপূজকের হাতও না। এতে অগ্নিপূজক তো ভীষণ আনন্দিত হলো আর বেচারা বুযুর্গ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ফিরে এলেন। আসমানের দিকে তাকিয়ে অনুযোগ করলেন, হে আল্লাহ! এ কী হলো? আমি সত্য দীনের ওপর আছি; তাই আপনি আমার প্রতি করুণা করেছেন। আগুন আমার হাত জ্বালাতে পারেনি। কিন্তু এই অগ্নিপূজক তো মিথ্যার ওপর জমে আছে। তার দীনকে বাতিল প্রমাণ করার জন্য তার হাত কেন জ্বালিয়ে দিলেন না? তার এ উক্তিতে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে ইলহাম করে একথা ঢেলে দিলেন যে, প্রিয় বান্দা আমার! আমি তার হাতকে কিভাবে জ্বালাতাম যখন তোমার হাত তার হাতকে শক্ত করে ধরে ছিল? আল্লাহওয়ালাদের হাতে এমন বরকতও আসে। এজন্য বলা হয়—

هُمْ رِجَالٌ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ.

'তারা এমন বান্দা, যাদের সাহচর্য পাওয়ার পর কেউ হতভাগা থাকে না।'

তারা যে কাজেই হাত দেয়, আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দেন। তাদের হাতে যদি গাছের ডাল হয় আর শত্রুর হাতে তরবারী, তখন সেই গাছের ডালই শাণিত তরবারীতে পরিণত হয়।

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ * مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی.

'কাফের তরবারির উপরই ভরসা করে। মুমিন সৈনিক লড়াই করে অস্ত্র ছাড়া।'

সাত ব্যক্তির বরকত

এক বর্ণনায় এসেছে, সাত ধরনের এমন আল্লাহর বান্দা দুনিয়ায় আছে যে, তাদের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ করেন।.তাদের বরকতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সাহায্য করেন। তাদের বরকতে রিযিক দান করেন। এরা কোনো সাধারণ লোক নন। এরা আল্লাহ্কে পাওয়ার সীমাহীন মেহনত-মুজাহাদা করেন। এদের রগ-রেশায় আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের মহব্বত ও ভালোবাসা মিশে থাকে।

একটা ভুল ধারণার সংশোধন

কারো-কারো এমন ভুল ধারণাও হয় যে, আমরা সেই স্তরে কী করে পৌঁছব? আমাদের পক্ষে কি তা সম্ভব? বন্ধুরা আমার! ওই স্তরে পৌঁছা, এই মর্যাদা অর্জন করা অবশ্যই সম্ভব। তবে শর্ত হলো, নিজেকে শরীয়তের রঙে রঙিন করে নিতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও জীবনাদর্শকে গলার মালা বানিয়ে নিতে হবে। আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যত এই মারেফাতে খোদা তথা আল্লাহর পরিচয় পাওয়া সবার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। যেমন- মনে করুন, আপনাদের কেউ চাইল, আমি পলোয়ান হব। এর জন্য সে উত্তম খাবার খেল। পর্যাপ্ত পরিমাণে শরীরচর্চাও করল। তাহলে কিছুদিন পর অবশ্যই তার শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠবে। তার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে। ঠিক এভাবেই রূহানী স্বাস্থ্যের বিষয়টি বুঝুন। যদি কোনো ব্যক্তি অন্তর থেকে পাক্কা তাওবা করে যে, আর কখনও পাপে লিপ্ত হব না, সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে জীবনকে ঢেলে সাজায়, পাপমুক্ত জীবন-যাপনের চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার রূহানী শক্তি ও স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধি এনে দেবেন এবং সে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এখানে একটি উসুলী কথা বলে রাখছি যে, নবুওয়াত একটি আল্লাহ্প্রদত্ত বিষয়, যা একমাত্র আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের ভাগ্যে জোটে। আর বেলায়েত একটি অর্জনযোগ্য বিষয়, যা যেকোনো বান্দা মেহনত-মুজাহাদা করে অর্জন করতে পারে।

আল্লাহর ভালোবাসার রং

মানুষ যখন আধ্যাত্মিকতার এই স্তরে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহর ভালোবাসার রং তাকে এমনভাবে রাঙিয়ে দেয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছুই তার সাধনা ও আরাধনার বস্তু হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা এই রঙের কথাই বলেছেন–

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً.

'এ তো আল্লাহর রং। এর চেয়ে উত্তম রং আর কার হবে।'[১]

স্মরণ রাখবেন, এক হলো রং আরেক হলো রংবিক্রেতা আর অপরটি হলো রংমিস্ত্রি, যে রঙের কাজ করে। তো কুরআন ও সুন্নহ হলো রংমিস্ত্রি। রংমিস্ত্রি কাপড়ের ওপর যেভাবে রং মেখে দেয়, তদ্রূপ অলীগণও মানুষের অন্তরে আল্লাহর ইশ্‌ক ও মহব্বতের রং মেখে দেন।

دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا * سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا.

'দুই রঙের স্বভাব ছেড়ে একরঙা হয়ে যাও। হয় পুরোপুরি মোম হয়ে যাও, নাহয় পাথর হয়ে যাও।'

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহ.)-এর ওপর আল্লাহপ্রেমের রং

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহ.) নিকট অতীতের বুযুর্গানে দীনের মধ্যে অন্যতম একজন দীনি ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নকশবন্দী সিলসিলার মাশায়েখগণ তাঁর বুকে আল্লাহর অপার মহব্বতের আগুন জেলে দিয়েছিলেন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের যতদিন স্বাধীনতা অর্জিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত তার কলমের জিহাদ চলতে থাকবে। এ লক্ষ অর্জন করার জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে পাড়ি জমান। সেখানকার দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা ও বিভিন্ন ম্যাগাজিনে ভারতীয়দের স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। ইংরেজদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, ভারতীয়দের স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানরা স্বাধীনতা অর্জন না করবে, ততদিন তিনি দেশে ফিরবেন না। এজন্য তাকে জেল-যুলুমের শিকারও হতে হয়েছে। জেলে থাকাবস্থায় তিনি কিছু কবিতা লিখেছিলেন–

تم یونہی سمجھنا کہ فنا میرے لئے ہے * پر غیب میں سامان بقا میرے لئے ہے.

پیغام ملا تھا جو حسین بن علی کو * خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لئے ہے.

---

১. সূরা বাকারা : ১৩৮

یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی کسش * پر آج گھنگھور گھٹا میرے لئے ہے.

اللہ کے راستے میں جو موت آئے مسیحا * اکسیر یہی ایک دوا میرے لئے ہے.

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے * یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے.

অর্থ : তোমরা এমনিই ভাবছ যে, ধ্বংসই আমার জন্য অবধারিত। কিন্তু বাস্তব হলো, গায়েবের চিরস্থায়ী আয়োজন আমার জন্য প্রস্তুত আছে। হুসাইন ইবনে আলীর কাছে যে পয়গাম পৌঁছেছিল, আমি আনন্দিত যে, সেই পয়গাম আমার জন্যও এসে গেছে। আল্লাহর পথে যে মৃত্যু আসে হে মাসীহা! এমনি এক মহৌষধ আমারও ভাগ্যে জুটেছে। তাওহীদের মর্ম তো হলো, খোদা হাশরের মাঠে বলে দিবেন, এই বান্দা উভয় জাহানে আমার ভয়েই ভীত ছিল।

এই বন্দী অবস্থায় তার আদরের কন্যা অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলো। সকল ডাক্তার-হাকীম তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন। মা তার যুবতী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেটি! জীবনের কোনো শেষ ইচ্ছা যদি থাকে, তাহলে বলো। কন্যা বলল, মা! আব্বুকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে! মা একটা চিঠিতে বিস্তারিত লিখে পাঠিয়ে দিলেন জেলখানার ঠিকানায়। মৃত্যুমুখে পতিত কন্যার শেষ ইচ্ছার সংবাদ পেয়ে তার মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল, তা বলে বোঝানো যাবে না। হযরত মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহ.) চিঠির উল্টো দিকে দুটি চরণ লিখে পুনরায় সেটি আবার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। চরণদুটি এরূপ ছিল–

میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں * تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں.

تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو * نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں.

অর্থ : আমি অপারগ ঠিক; কিন্তু আল্লাহ অক্ষম নন। তোমার থেকে আমি দূরে বটে; কিন্তু তিনি তো দূরে নন। তোমার সুস্থতা আমি কামনা করি; কিন্তু তিনি যদি মঞ্জুর না করেন, তা হলে আমারও তার প্রয়োজন নেই।

হযরত উসমান খায়রাবাদী (রহ.)-এর মহব্বতে ইলাহী

হযরত উসমান খায়রাবাদী (রহ.)। তিনিও নিকট অতীতে উঁচু মাপের একজন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর একটা দোকান ছিল। তাঁর একটি ভালো অভ্যাস

ছিল যে, কোনো ক্রেতা যদি পণ্যের বিনিময়ে নষ্ট পয়সা দিত, তখন তিনি তা ফিরিয়ে না দিয়ে রেখে দিতেন। সেকালে পয়সা-মুদ্রা এগুলো রুপার তৈরী ছিল। বেশি ক্ষয় হয়ে যাওয়া পয়সাকে নষ্ট পয়সা বলা হতো। তিনি জীবনভর মানুষের এসব নষ্ট পয়সা জমা করে রাখেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তিনি আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের দরবারে হাত তুলে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমি সারা জীবন আপনার বান্দাদের নষ্ট পয়সা জমা করেছি। দয়াময়! আপনিও আমার সকল নষ্ট আমল কবুল করে নিন।'

ইশ্ক ও মহব্বতের দোকান

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গিরী (রহ.) যখন হযরত শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে আসা-যাওয়া শুরু করলেন, তখনকার একটি ঘটনা। একদিন উভয়ে এক মজলিসে বসা ছিলেন। শাহ সাহেব মুঙ্গিরীকে সম্বোধন করে বললেন, 'মুহাম্মাদ আলী! তুমি কি কখনও ইশ্ক-মহব্বতের দোকান দেখেছ?' মাওলানা মুঙ্গিরী কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর বললেন, 'জি হযরত! আমি ইশ্কের দুটি দোকান দেখেছি। একটি হলো, শাহে আফাকের, (আসমানের বাদশার অর্থাৎ আল্লাহর) অপরটি শাহে আব্দুল্লাহর (অর্থাৎ আল্লাহরই এক বান্দা), যার নাম শাহ গোলাম আলী দেহলবী (রহ.), যিনি নকশবন্দী সিলসিলার একজন খ্যাতিমান বুযুর্গ ছিলেন এবং হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর বংশধর ছিলেন।

যাহোক এখানে দোকান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খানকাহ। কারণ, আল্লাহ তা'আলার ইশ্ক, মহব্বত, প্রেম-ভালোবাসার আদান-প্রদান আল্লাহওলাদের খানকায়ই হয়ে থাকে।

স্বচক্ষে দেখা একটি ইশ্কে ইলাহীর দোকান

বন্ধুরা আমার! আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি। এই অধম কোনো মজলিসে এভাবে কসম খেয়ে কথা বলে না। তারপরও কসম খেলাম একটি কথা বলার জন্য। তাহলো, এই অধমও স্বীয় জীবনে একটি ইশ্কের দোকান দেখেছে। তার সাক্ষী হযরত হাকীম আব্দুল লতীফ সাহেব এ মজলিসেই বসা আছেন। সেই দোকান দেখেছি চাকওয়াল অঞ্চলে। সেখানে ইশকের মদিরা পান করার জন্য সবাই আসে। কেউ পূর্ব থেকে, কেউ পশ্চিম থেকে, কেউ পেশওয়ার থেকে, কেউ করাচি থেকে। কখনও মুনীর সাহেব আসতেন,

কখনও হাকীম আব্দুল লতীফ সাহেব, আবার কখনও আসতেন মাওলানা নাইমুল্লাহ সাহেব। কেউ ইশ্‌কের বড়ি বা পুরিয়া নিতে আসত আবার কেউ প্রেমের মদিরা পান করার জন্য। এই অধমও সেই দোকানের আকর্ষণে সেখানে ছুটে যেত।

সেখানে একজন উঁচু মাপের শায়খ ও মুরব্বী ছিলেন, যার মুবারক জীবন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী ঢেলে সাজানো হয়েছে, যার বুক আল্লাহর প্রেমে ছিল ভরপুর। তিনি ইশ্‌কের ঔষধ বিক্রি করতেন। কখনও কাউকে নীরবে-নির্জনে বসিয়ে চিকিৎসা দিতেন। কখনও কাউকে জনসম্মুখে চিকিৎসা করতেন। কাউকে কৃত্রিম রাগ-ধমক দিয়ে আবার কাউকে পিতৃমমতা দিয়ে পরিশুদ্ধ করতেন। যে-ই সেখানে যেত, ইশ্‌কে ইলাহীর উত্তাপ হৃদয়ে ধারণ করেই ঘরে ফিরত। আমি কখনও ভেবে আশ্চর্য হই যে, যারা অন্যের হৃদয়ে ইশ্‌কের এমন আগুন জ্বালাতে পারেন, তাদের নিজেদের হৃদয়ে ইশ্‌কের আগুন না জানি কত তেজোদ্দীপ্ত!

جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیئے لاکھوں * اس قلب میں یا اللہ! کیا آگ بھری ہوگی.

অর্থ : যে অন্তরের আহগুলো লক্ষ অন্তরে আগুন জ্বেলেছে, হে আল্লাহ! তাতে না জানি কী পরিমাণ আগুন লুকিয়ে আছে!

আল্লাহ তা'আলা সেই স্থানগুলোতে বারবার গিয়ে আমাদের ইশ্‌কের ঔষধ ক্রয় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ভালোবাসার আগুন

বন্ধুরা! আমাদের সবার অন্তরেই আল্লাহর ভালোবাসার আগুন আছে, তবে মিটিমিটি জ্বলছে – দাউ-দাউ করে জ্বলছে না। যাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে, তাদের অবস্থা-ই ভিন্ন রকম হয়ে যায়। তখনই সাধারণ মানুষ ও আল্লাহর ওলীর মধ্যে পার্থক্য বুঝে আসে।

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن * ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور.

'শব্দ ও অর্থে কোনো পার্থক্য নেই ঠিক; কিন্তু মোল্লার আযান এক রকম, মুজাহিদের আযান আরেক রকম।'

উভয়ের উচ্চারিত শব্দমালা এবং অর্থ তো একই; কিন্তু মসজিদে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া এক জিনিস আর জিহাদের ময়দানে শত্রুদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া ভিন্ন জিনিস।

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں * کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور.

অর্থ : উভয়ের উড্ডয়ন একই ভুবনে মুক্ত আকাশে; তারপরও গাংচিলের জগত ভিন্ন, ঈগলের জগত ভিন্ন।

আমরা গাংচিলের মতো জীবন কাটাই আর আল্লাহওয়ালারা জীবন কাটান ঈগলের মতো। কারণ, তারা তো ঊর্ধ্ব গগনে ঘুরে বেড়ায়। সুবহানাল্লাহ।

ভাবনার যিষয়

আজ এই মজলিসে বসে হিসাব করে দেখুন, আমাদের অন্তরে কার ভালোবাসা প্রবল। মায়ের? পদের? গাড়ি-বাড়ির, নাকি কোনো সুন্দরীর? যদি অন্তর উত্তর দেয়, এখনও আল্লাহর ভালোবাসা গাইরুল্লাহর ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, তাহলে ছাড়িয়ে যাওয়ার দিন কবে আসবে? জীবনের বরফ তো গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, জীবনের কতটুকু সময় কালেমা পড়ে, যিকির করে কাটিয়েছি আর কতটুকু অনর্থক-বেহুদা কাজে হিসাব করে দেখেছি কি? তাহলে হিসাব করার তাওফীক কবে নসিব হবে?

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لاالہ إلا اللہ * لغت غریب ہے جب تک تیرا دل نہ دے گواہی.

অর্থ : তুমি আরব হও আর অনারব; তোমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটি মর্মহীন বাক্যমাত্র; যদি অন্তর স্বাক্ষ্য না দেয়।

মুখে উচ্চারিত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কী মূল্যইবা থাকবে যদি অন্তরে সাক্ষ্য না দেয়?

زباں سے کہہ بھی دیا لا إلہ تو کیا حاصل * دل ونگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں.

হিন্দুরা আল্লাহকে 'রাম' নামে ডাকে। তাই একজন বলল,

رام رام جپدیاں میری جبھیا گھس گئی * رام نہ دل وچ وسیا ایہہ کی ڈھاڑ پئی.

گل وچ مالا کاٹھ دی تے منکے لئے پرو * دل وچ گھنڈی پاپ دی تے رام جپیاں کی ہوئے.

অন্তরে যদি পাপের আবর্জনা থাকে, তাহলে 'রাম, রাম' জপে কী হবে? এজন্য বন্ধুরা! অন্তর থেকে প্রতিজ্ঞা করুন, হে আল্লাহ! আজকের পর আর আপনার নাফরমানি করব না। আর আপনার প্রিয় রাসূলের কোনো সুন্নাত ছাড়ব না। লোকেরা সমালোচনা করে, জনাব! কুরআন তো ঠিকই পড়ছি; কিন্তু উপলব্ধি তো তৈরি হচ্ছে না। নামায তো পড়ছি; কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন হচ্ছে না। আরে ভাই! এসব ইবাদতের প্রতি আমাদের আবেগ-

ভালোবাসা ছিলইবা কবে? যদি থাকে, তবে তা নিতান্তই কম। একে আরও বাড়াতে হবে। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির বেশি আনুগত্য করি, এজন্যই তাহাজ্জুদের সময় জাগা হয় না। আমরা আরামপ্রিয় ও ভোগবাদী। আমরা সম্পদকে বেশি ভালোবাসি; তাই যাকাত দিতে পারি না। সম্পদের লোভে হালাল-হারামের পার্থক্য করতে পারি না। আমাদের জিহ্বায় স্বাদ-লিপ্সা বেশি; তাই বাজারের অলি-গলি ঘুরে যেখানে যা পাই তা-ই মুখে পুরে দেই। এই খাবার কিভাবে তৈরি হলো, কোথা থেকে এল এসব জানার সময় পাই না।

বন্ধুরা আমার! একটা সময় ছিল, যখন মানুষের মধ্যে জাগ্রত হৃদয় থাকত, ভিতরের মানুষটা জেগে উঠত। আর আজ যারা আছে, তাদের হৃদয়গুলো গাফলতের ঘুমে অচেতন। ভিতরের মানুষটা ঘুমিয়ে আছে। বরং সত্য হলো, তাদের ভিতরটা মরেই গেছে। আমাদের নামাযগুলো খুবই ক্রটিপূর্ণ। এক্ষেত্রে আমাদের আরও যত্নশীল হতে হবে। কারণ, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে। কী পরিতাপের বিষয়! আমরা সিজদা করি ঠিক; কিন্তু আমাদের মন থাকে অন্য কোথাও। সিজদায় একাগ্রতা নসিব হয় না। সব সময় এ দু'আ করবেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন সেজদা করার তাওফীক দাও, যে সেজদায় এক মুহূর্তের জন্যও তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার কল্পনায় আসবে না। নিজেকে একটু জিজ্ঞাসা করুন, আমরা সারা জীবনের নামায থেকে এমন চার রাকাত নামায আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করতে পারব, যে চার রাকাত নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত একটি মুহূর্তের জন্যও গাইরুল্লাহর চিন্তা আসেনি? আমি নিশ্চিত, এমন নামায খুঁজে পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আজ যদি আমরা আমাদের নামাযগুলো সুন্দর করতে পারি, তাহলে এই নামায দিয়েই আমরা সব ধরনের দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি কাটিয়ে উঠতে পারি। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, আমরা আমাদের নামাযগুলোকে সুন্দর করতে পারছি না। নামাযে দাঁড়াই মসজিদে আর মন ঘুরে বেড়ায় দোকানে। এলোমেলো ভাবনাগুলো অন্য সময় না এলেও নামাযে এসে ঠিকই উপস্থিত হয়।

বন্ধুরা আমার! এই নিষ্প্রাণ নিরাবেগ সিজদা আর কত দিন করতে থাকব? আমরা কি আল্লাহর কাছে যাব না?

بر زمین چو سجدہ کردم زز مین ندا بر آمد * کہ مرا خراب کردی تو سجدۂ ریائی.

'যখন আমি সেজদায় গিয়ে মাটির ওপর কপাল রাখলাম, তখন মাটি থেকে আওয়াজ এল, এই রিয়াকার সিজদাকারী! তুমি আমাকেও ধ্বংস করে দিলে!'

میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا * تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملیگا نماز میں.

'আমি যখন জমিনে সিজদা করেছি, তো কখনো জমিন থেকে আওয়াজ এসেছে, তোমার অন্তর তো মূর্তিপূজারী, তুমি নামাযে কী-ইবা পাবে!'

বন্ধুরা আমার! আমাদের উচিত যে, আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদত করব। নিয়ায ফাতহী কী সুন্দর বলেছেন–

بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے * ہم ثواب وعذاب کیا جانیں.

کس میں کتنا ثواب ملتا ہے * عشق والے حساب کیا جانیں.

অর্থ : বন্দেগি দ্বারা তো তুমিই উদ্দেশ্য। আমি ছাওয়াব-আযাবের কী জানি! কোন আমলে কী ছাওয়াব ইশকওয়ালারা এসবের কী জানে!

আসুন, আমরা কবি ইকবালের সূরে সূর মিলিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত যেন আমাদেরকে তাঁর খাঁটি ভালোবাসা দিয়ে হৃদয় ভরে দেন।

یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے * جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے.

بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل * اس شہر کے خو گر کو پھر وسعت صحرا دے.

اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو * وہ داغ محبت دے جو چاند کو بھی شرما دے.

অর্থ : হে রব! মুসলিমদের অন্তরে সেই জীবন্ত আকাঙ্ক্ষা দাও, যা অন্তরকে উত্তপ্ত করবে, আত্মাগুলোকে করবে অনুপ্রাণিত, বিচ্যুত আহগুলোকে পুনরায় হারাম-এর পথে নিয়ে চলো। এই শহরের অধিবাসীদের আবার মরুভূমির প্রশস্ততা দান করো এযুগের আঁধারে। প্রতিটি অন্তরে উদ্বিগ্ন ভালবাসার এমন শুভ্রতা দাও, যা চাঁদকেও লজ্জিত করে দিবে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

নবীজির মে'রাজ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

নবীজির মাকাম ও মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উভয় জাহানের বাদশা, সকল নবীর নেতা এবং সারা জাহানের আমীর বানিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে তিনি মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার এত উঁচু মাকাম দান করেছেন, যা দেখে মানুষ তো ভালো ফেরেশতারা পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে।

কোন-কোন দিবসগুলো স্মরণ করা হবে

আজকের এই মাহফিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট একটি ঘটনার স্মৃতিচারণের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এজাতীয় ঘটনা – যার দ্বারা অন্তরে আল্লাহর স্মরণ তাজা হয় – পরস্পর আলোচনা ও স্মৃতিচারণের আদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ.

'তোমরা তাদের কাছে আল্লাহর দিবসগুলোর স্মৃতিচারণ করো।'[১]

---

১. সূরা ইবরাহীম : ৬

খ এসব হাদীস নয় ২/১২০

ইসলামী মাসগুলোতে আত্মত্যাগের ইতিহাস

আপনি চিন্তা করে দেখুন, ইসলামী মাসগুলোর মধ্যে প্রথম মাস হলো মুহাররম। ইসলামে আত্মত্যাগের ইতিহাসও সেখান থেকে শুরু। যেমন- হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই মুহাররম মাসের ১০ তারিখে নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতবরণের ঘটনাও এ দিনে সংঘটিত হয়েছিল। তদ্রূপ ইসলামী মাসগুলোর সর্বশেষ মাস হলো যিলহজ। এই মাসেও ইসলামের আত্মত্যাগের ইতিহাস রয়েছে। যেমন- হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে এ মাসেই কুরবানি করার জন্য ছুরির নিচে শুইয়েছেন আবার তাঁর পরিবর্তে একটা দুম্বা কুরবানিও করেছেন। যদি ইসলামী মাসসমূহের মাঝামাঝি তাকাই, তাহলে সেখানে পাওয়া যাবে রজব মাস। সে মাসে পাওয়া যাবে মানবতার সর্বোচ্চ মর্যাদা ও উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার বর্ণিল ইতিহাস। এ মাসের ২৭ তারিখেই আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় রাসূলকে সপ্ত আকাশের ঊর্ধ্বে আরশের ওপর ডেকে নিয়েছেন, যাকে আমরা 'মেরাজ' বলে চিনি। এ হলো সেই মর্যাদা, যা দেখে ফেরেশতারা বিস্মিত হয়েছিল। তারপর ইসলামী বৎসরের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি মাস হলো রবিউল আউয়াল মাস। এ মাসে আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় রাসূলকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। আর অবশিষ্ট দ্বিতীয়ার্ধকে আলোকিত করেছেন রমজান মাস দিয়ে।

তো সারকথা হলো, পুরো বছরকেই আল্লাহ তা'আলা কিছু বরকতময় মাস ও দিন দ্বারা সাজিয়েছেন।

এসব হাদীস নয় ২/১২৯

নবুওয়াতের ঘোষণা

একথা সবাই জানে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াতের ঘোষণা করেন। তিনি তো এর আগ থেকেই নবী ছিলেন। কারণ, প্রসিদ্ধ মাকুলা আছে–

كُنْتُ نَبِيًّا وَّادَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ.

'আমি তখন থেকেই নবী ছিলাম, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম তখনও কাদা-মাটির মাঝে ছিলেন।'

তবে নবুওতপ্রাপ্তির ঘোষণা হয়েছে চল্লিশ বছর বয়সে। তাহলে বলা যায়, ১২ই রবিউল আউয়াল আখেরী নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর আত্মপ্রকাশ হয়েছিল আর চল্লিশ বছর পর তিনি রাসূল হিসেবে জনসমক্ষে এসেছেন।

নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘোষণার পর আপনজনদের বিরোধিতা

যখনই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের ঘোষণা করলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তার আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী, শুভানুধ্যায়ী সবাই মিলে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। 'আল-আমীন' তথা 'বিশ্বস্ত' উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেছিল। তারপর নবীজিকে যন্ত্রণা দেওয়ার এমন কোনো পন্থা তারা হাতছাড়া করেনি, যা তাদের জানা ছিল।

আবূতালেব ঘাঁটির মর্মান্তিক দৃশ্য

একপর্যায়ে কুরাইশের সকল গোত্র এবং আশপাশের ছোট-ছোট গোত্রগুলো মিলে মুসলমানদের সাথে সামাজিক বয়কট করল। কেউ মুসলমানদের মধ্যে কোনো ধরনের লেনদেন, বেচাকেনা কিছুই করতে পারবে না। অবশেষে নবুওয়াতের সপ্তম বছর নির্দয় কুরাইশ সম্প্রদায় নবীজি ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের মক্কা থেকে বের করতে বাধ্য করল। মক্কার বাইরে পাহাড়ি এক ঘাঁটিতে গিয়ে সকল মুসলমান আশ্রয় নিলেন। এটি আবূতালিবের ঘাঁটি বা চৌহদ্দী নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে মক্কার একটি প্রাণিও যেন যেতে না পারে সেজন্য কঠোর নজরদারি করা হতো। স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোনো উপকরণ সেখানে ছিল না। কঠিন পিপাসায় সবাই কাতর হয়ে যেত। অনাহারে-অর্ধাহারে তাদের স্বাস্থ্য ও মনোবল চরমভাবে ভেঙে যেতে লাগল। দুধের বাচ্চারা মায়ের বুকের দুধ না পেয়ে কান্নাকাটি করত। তাদের এই কান্না দেখে আসমান-জমিন ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।

কিন্তু নিষ্ঠুর কুরাইশ সরদারের মন এক মুহূর্তের জন্যও বিগলিত হয়নি। তারা বরং মজা করে মুসলমানদের অসহায়ত্বের দৃশ্য অবলোকন করত। তাদের অন্তরগুলো এমন পাষাণ-কঠিন হয়ে গিয়েছিল যে, অন্তত নিষ্পাপ শিশুদের বিলাপের দিকে তাকিয়ে হলেও বয়কটকে একটু শিথিলও করতে পারত। কিন্তু তারা তা করল না। বরং একবার হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর এক আত্মীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়ার জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে পাহাড়ি ঘাঁটির দিকে রওনা হলো। নির্দয় কুরাইশ তাকেও আটকে দিয়ে বলল, অসম্ভব; তোমাকে সেখানে যেতে দেওয়া হবে না। তারা মুসলমানদের খাবার তো দিতই না – কেউ দিতে চাইলে তাকেও আটকে দিত। এমন মানবেতর জীবন যাপনের তিন তিনটি বছর কাটাতে হলো। সেই ত্যাগের ইতিহাস জেনে উম্মত আজও আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে।

আল্লাহর গায়েবি সাহায্য

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট করে যে চুক্তিপত্র কাবার দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিল, তার পুরোটাই পোকায় খেয়ে ফেলেছে। শুধু আল্লাহ নামটি ব্যতীত সেখানে আর কিছুই নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি তাঁর প্রিয় চাচা আবূতালিবকে অবহিত করলেন। আবূতালিব গিয়ে কুরাইশ-সর্দারদের বললেন, দেখো, মুহাম্মাদ বলছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে চুক্তিপত্রটি তোমরা কাবাঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিলে, তার পুরোটাই পোকায় খেয়ে ফেলেছে। সেখানে শুধু আল্লাহ শব্দটি বাকি আছে। যদি তাঁর কথা সত্য হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে এই বয়কট তুলে নেওয়া উচিত।

কুরাইশ-সর্দার কাবাঘরে গিয়ে দেখল, সত্যিই পুরো চুক্তিপত্রটি পোকায় খেয়ে ফেলেছে; শুধু আল্লাহ শব্দটি যে অংশে লেখা ছিল, সেটি খায়নি। তারা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার সত্যতা খুঁজে পেল, তখন তাদের মধ্যে ফাটল দেখা দিল। কুরাইশ সর্দারকে কেউ-কেউ বলতে লাগল, এই বয়কট আর দীর্ঘায়িত হতে দেওয়া যাবে না। আমরা আমাদের রক্তসম্পর্কের লোকদের দুর্বিষহ কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না। নিষ্প্রাণ শিশুদের গগণবিদারী আর্তনাদ আর সহ্য করতে পারব না। আমরা আরামে পেট ভরে খাব আর তারা ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত থেকে মনবেতর জীবন যাপন করবে এ হতে পারে না। এটা কোনো মনুষ্যত্ব হতে পারে না। আমরা অবশ্যই তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করব।

যাহোক নবুওয়াতের এই ১০ম বছরই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে সেই দুর্বিষহ কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

কুরাইশদের লোভনীয় প্রস্তাব ও নবীজির প্রত্যাখ্যান

এক বিপদ যেতে না যেতেই অন্য বিপদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। কিছুদিন এভাবে কেটে যাওয়ার পর একদিন কুরাইশ-সর্দাররা নবীজির চাচা আবূতালিবকে বলল, দেখুন আবূতালিব! আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সী ও সম্মানী। আপনার ভাতিজা আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আপনি তাকে এসব বন্ধ করতে বলুন। যদি সে সম্পদের জন্য এসব করে থাকে, তাহলে তাকে বলে দিন, পুরো মক্কার সমস্ত

ধন-সম্পদ তাঁর সামনে একত্রিত করে দেব। যদি নেতৃত্ব চায়, তাহলে আজ থেকেই আমরা তাকে নেতা হিসেবে মেনে নিলাম। যদি সুন্দরী কোনো নারীর আত্মীয়তা চায়, তাহলে পুরো আরবের সব সুন্দরীদের তার সামনে এনে দেব; যার দিকে সে ইঙ্গিত করবে, তার সাথেই তার আত্মীয়তা হবে।

চাচা আবূতালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাছে ডেকে কুরাইশ-সর্দারের সব কথা শোনালেন। উত্তরে তিনি বললেন, চাচাজান! এরা যদি আমার এক হাতে সূর্য আর অপর হাতে চন্দ্রও এনে দেয়, তারপরও আমি যে কাজ করছি তা বন্ধ করব না। এ উত্তর শোনার পর কুরাইশদের হিংসার আগুন আরও দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগল।

'আমুল হুয্ন' (বেদনার বছর)

এবছরই আল্লাহর হুকুমে নবীজির চাচা ইন্তেকাল করলেন। তিনি তাঁর জন্য অনেক বড় অবলম্বন ছিলেন। কিছুদিন পর আরেকটা আঘাত পেলেন। জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রাযি.)ও তাঁকে ছেড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। বেদনার ওপর বেদনায় তিনি কিছুটা ভেঙে পড়লেন। এজন্য তিনি এ বছরের নাম রেখেছেন 'আমুল হুয্ন' বা বেদনার বছর । হযরত খাদীজা (রাযি.) ও চাচা আবূতালিব ইন্তেকাল করার পর কুরাইশ পৌত্তলিকদের জন্য সকল বাধা দূর হয়ে গেল। তারা নবীজি ও তাঁর অসহায় সাহাবীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

তায়েফের সফর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের আত্মীয়-স্বজনের হাতে নিগৃহীত হলেন এবং তাদের হেদায়াতের ব্যাপারে মোটামুটি নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন মক্কার বাইরের গোত্রগুলোর দিকে মনোনিবেশ করলেন। বুকভরা আসা ছিল, হয়ত তাদের কেউ সত্যের ডাকে সাড়া দেবে। তাই তিনি মক্কার অদূরে তায়েফ অঞ্চলে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। সেই অঞ্চলের গোত্রগুলো তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল এবং সবগুলো শাখার সর্দাররা পরস্পর আপন ভাই ছিল। নবীজি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাদের একজন ঠাট্টা করে বলল, যদি আল্লাহ আপনাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে খুব শীঘ্রই কাবাঘরের চাদর বিদীর্ণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়জন উপহাস করে বলল, 'আল্লাহ বুঝি নবী বানিয়ে পাঠানোর জন্য আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে পেলেন না? অন্য কাউকে নবী বানিয়ে

পাঠাতেন।' তৃতীয়জন একটু শালীন ভাষায় বলল, যদি আপনি সত্যিই নবী হন, তাহলে আপনার সঙ্গে কথা বললে বে-আদবি হয়ে যাবে। আর যদি মিথ্যা দাবি করে থাকেন, তাহলে আপনার সাথে কথা বলার কোনো আগ্রহ আমার নেই।

নবীজি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেখান থেকে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। তায়েফের লোকেরা দুষ্টু ছেলেদের নবীজির পিছনে লেলিয়ে দিল। তারা নির্মমভাবে পাথর মেরে নবীজিকে রক্তাক্ত করে ফেলল। রক্তের প্রবাহে তাঁর জুতা মোরারক পর্যন্ত ভিজে গেল। তিনি সারা দিনের ক্লান্ত ছিলেন; খাওয়া-দাওয়া কিছুই করেননি। অবশেষে একটা পাহাড়ের পাদদেশে মাটিতে বসে পড়লেন এবং সেখানে এক ঐতিহাসিক দু'আ করলেন।

'হে আল্লাহ! আপনি কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট? নাহয় এদের হাতে আমাকে কেন সোর্পদ করেছেন? এরা তো আমার সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছে। হে আল্লাহ! যদি আপনি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে আমি ক্ষমা চাচ্ছি; আমাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার সেই নূরের উসিলায় প্রার্থনা করছি, যার ফলে সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায়।'

তাঁর দু'আয় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠল। তৎক্ষণাৎ ফেরেশতারা এসে বলল, হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল! আপনি অনুমতি দিন, আমরা এই জনপদটা মাটির সাথে মিশিয়ে দেই। এমন ধূলিঝড় চালাব যে, তাদের নাম-নিশানাও থাকবে না। আপনি যদি পছন্দ করেন, তাহলে আপনার সাথে বে-আদবির শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে মাঝখানে রেখে দুদিকের দুটি পাহাড় দিয়ে চাপা দেই, যেন তারা দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় নেয়। কিন্তু রহমতের নবী, দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'দেখো তারা কেউ আমাকে চিনতে পারেনি; তাই তারা আমাকে এত কষ্ট দিয়েছে। আমি আশা করি, তাদের বংশধরদের মধ্যে হতে কখনও-না-কখনও এমন লোক তৈরি হবে, যারা কালিমা পাঠ করবে এবং আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করবে। সাথে-সাথে আমার নবুওয়াতকেও স্বীকার করে নেবে।' সুবহানাল্লাহ!

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

'হে আল্লাহ! আমার কওমকে তুমি হেদোয়াত দাও। কারণ, তারা জানে না।'

যাহোক, নবীজি ভরাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তায়েফ থেকে মক্কার পথে পা বাড়ালেন। এখানে আসার পর তাঁর দুঃখ-বেদনা আরও বেড়ে গেল। অন্তরের

কষ্ট আরও বেড়ে গেল। আপনজনদের আচরণও দেখে নিলেন আবার পরমানুষদের যন্ত্রণাও দেখে নিলেন।

সারকথা, শত্রুরা তাঁকে চরম সংকটে ফেলে দিল।

হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন

এমনি ভরাক্রান্ত হৃদয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উম্মেহানী (রাযি.)-এর ঘরে গেলেন। এক বিস্ময়কর দু'আ করলেন। বললেন, হায় আল্লাহ! যদি এমন একজন বন্ধু পেতাম, যে সব সময় আমার সঙ্গ দিত! যদি এমন একজন সহমর্মী পেতাম, যে সব সময় আমাকে সান্ত্বনা দিত! যদি এমন কোনো সুজন পেতাম, যে সব সময় আমায় উৎসাহ দিত!

এ কথাগুলো বলতে-বলতে তিনি শুয়ে পড়লেন।

তখন মধ্য রাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে ছিলেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম শিয়রে এসে বললেন–

إِنَّ اللهَ يَقْرَأُكَ السَّلَامُ وَيَدْعُوْكَ

.'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে সালাম বলেছেন এবং তাঁর কাছে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হযরত জিবরাঈলকে দেখলেন এবং সালামের উত্তর দিলেন। হযরত জিবরাঈ দ্বিতীয় বাক্য বললেন

إِنَّ رَبَّكَ يَشْتَاقُ إِلَيْكَ.

'আপনার প্রভু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন!'

তারপর নবীজি ঘরের বাইরে তাশরীফ আনলেন। তাঁর মুবারক বক্ষ বিদীর্ণ করা হলো। অন্তর বের করে ধুয়ে মুছে পবিত্র করা হলো। তারপর এতে আল্লাহর বিশেষ রহমত ভরে যথাস্থানে রেখে দিল। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা নামাযের পূর্বে আমাদেরকে ওযু করার হুকুম দিয়েছেন, তদ্রূপ মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এই মেরাজ এক রকমের নামায ছিল, যার জন্য আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর অন্তরকে ওযু করালেন। সব ধরনের মন্দ স্বভাব থেকে অন্তরকে পবিত্র

করলেন। তারপর তিনি সেখানে দু-রাকাআত নামাযও আদায় করলেন। সেখান থেকে তাঁকে উর্ধ্ব গগনের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো।

সফরের সূচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে বাহন আনা হয়েছে, তার ব্যাপারে জিবরাঈল বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এই সাওয়ারীর নাম বোরাক। 'বোরাক' মূলত একটি আরবী শব্দ। بَرْق থেকে بُرَاق অর্থ বিদ্যুৎ। সাওয়ারীর গতি বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র হওয়ার কারণে এর নাম রাখা হয়েছে 'বোরাক'। নবীজি তাতে সাওয়ার হলেন। বাইতুল হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা করলেন। বোরাক একস্থানে পৌঁছলে জিবরাঈল (আ.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এটি রহমত ও বরকতের উপত্যকা। নবীজি সেখানে নেমে দু-রাকাত নামায পড়লেন। তারপর তূর পাহাড়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করে সোজা বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে পৌঁছলেন।

নবীগণের সামনে ইমামত

যখন নবীজি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন, তখন দেখলেন, সেখানে সকল আম্বিয়া সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। হযরত জিবরাঈল আমীন নবীজিকে বিনয়ের সাথে বললেন, হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল! মুক্তাদীরা তো কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে; এখন ইমাম সাহেবের প্রয়োজন। দয়া করে আপনি সামনে এগিয়ে যান; আজকের ইমামত আপনি করবেন। সকল আম্বিয়া (আ.) আজ আপনার পিছনে নামায পড়বে। নবীজি আগে বেড়ে নামায পড়ালেন। এভাবেই আল্লাহ রব্বুল ইয্যত প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমামুল আম্বিয়া তথা সকল নবীর নেতা বানিয়ে দিলেন।

মে'রাজের সফর

নামাযের পর নবীজির সামনে একটি ভিন্ন সাওয়ারী আনা হলো। হাদীছে এর নাম 'রফরফ' উল্লেখ করা হয়েছে। রফরফ-এর যদি বাংলা অর্থ করা হয়, তাহলে অর্থ হবে 'উর্ধ্বমুখী সিঁড়ি' আর ইংরেজীতে অর্থ হলো Elevator. দ্বিতীয় সাওয়ারী Elevator এর মতো ছিল। এতে যদি মানুষ চড়ে বসে, এটা তাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। 'বোরাক' নবীজিকে নিয়ে মক্কা থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করে এবং 'রফরফ' সেখান থেকে আকাশের

উচ্চতায় পৌঁছে যায়। এই সফরের প্রথম অংশকে আরবী ভাষায় ইসরা (اسراء) বলা হয়, যার শাব্দিক অর্থ হলো 'রাতে সফর করা'। আর সফরের দ্বিতীয় অংশকে মেরাজ বলা হয়, যার শাব্দিক অর্থ হলো উচ্চতা ও বুলন্দীর দিকে ছুটে যাওয়া। معراج এটি عروج থেকে নির্গত হয়েছে। যেন এখান থেকেই নবীজির উত্থান শুরু হয়ে গেছে। নবীজির সঙ্গে ছিলেন জিবরাঈল (আ.)। নবীজি উপরের দিকে এগুতে লাগলেন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে সপ্ত আসমান পর্যন্ত তিনি পৌঁছে গেলেন। সর্বশেষ আরশের ওপর পৌঁছে তিনি সাওয়ারী হতে অবতরণ করলেন। পথে তাকে বিভিন্ন ধরনের বিস্ময়কর দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

একস্থানে নবীজির দৃষ্টি পড়ল, 'লাওহ' ও 'কলম' ছিল। তিনি স্বচক্ষে তা-ও প্রতক্ষ্য করেছেন। ঐসব ফেরেশতাগণকেও দেখেছেন, যারা নেকী-বদীগুলো লিপিবদ্ধ করছিলেন। তাদের কলমের শব্দও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনেছেন। তারপর তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্যাবলি দেখিয়েছেন।

জান্নাতের মনোরম দৃশ্য

বর্ণনায় আসে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের বিভিন্ন রকমের নেয়ামতরাজির দৃশ্য অবলোকন করেছেন। কতিপয় লোককে তিনি দেখেন, তারা মাঠে ফসল বুনল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ফসল বড় হয়ে পেকে গেল। এগুলো কাটতেই পুনরায় বড় হয়ে পেকে যাচ্ছে! তিনি হযরত জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদের ফসল এমন হচ্ছে কেন? জিবরাঈল নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আসলে নেককার পুণ্যবানদের আমলের প্রতিদান দেওয়ার দৃষ্টান্ত। যারা দুনিয়াতে নেক আমল করে, তারা এর প্রতিদান দুনিয়াতেই বারবার পেতে থাকে। আখেরাতের হিসাব তো ভিন্ন। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি হতবাক হয়ে এদিক-সেদিক তাকালেন। কাউকে না দেখে তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাঈল! এটা কার পদধ্বনি? উত্তর দেওয়া হলো, হে আল্লাহর প্রিয় হাবীব! এটি আপনারই গোলাম হযরত বিলাল (রাযি.)-এর পদধ্বনি। তিনি যদিও দুনিয়ায়; কিন্তু তার খড়মের পদধ্বনি এখানে শোনা যায়। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, তার পদধ্বনি এখানে কেন শোনা যায়? উত্তরে জিবরাঈল (আ.)

বললেন, আপনার গোলাম বেলালের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে অনেক উঁচু। তিনি আল্লাহর দরবারে এতই প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত যে, তার কদম পরে মাটির ওপর আর পদধ্বনি শোনা যায় আরশের ওপর। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর উম্মতের মর্যাদাও দেখিয়ে দিয়েছেন।

জাহান্নামের ভয়ানক দৃশ্য

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাহান্নামের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তিনি দেখলেন, কিছু লোকের ঠোঁট কাটা হচ্ছে। এক ফেরেশতা বড় একটা কেঁচি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মানুষের ঠোঁটগুলো উটের মতো লম্বা ও ঝুলন্ত। আযাবের ফেরেশতা সেই ঠোঁটগুলো কেঁচি দিয়ে কাটছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈ! এদের এমন শাস্তি হচ্ছে কেন? জিবরাইল (আ.) উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা হলো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ফেতনাবাজের দল। দুনিয়াতে এর কথা ওকে, ওর কথা একে শুনিয়ে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করত। যা-ই শুনত কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই যার তার কাছে বলে বেড়াত। মানুষের মধ্যে বিভেদ, অনাস্থা ও কুধারণা সৃষ্টিতে এরা খুব দক্ষ ছিল। যে ঠোঁট দিয়ে তারা সে অপকর্ম করেছিল, আজ তাকেই কেঁচি দিয়ে কেটে কেটে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বক্তার পরিণাম

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ফেরেশতা একজনের গলা টিপে ধরছে। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যখন যন্ত্রণায় জিহ্বা বেরিয়ে আসে এবং মরার উপক্রম হয় তখনই তাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বাভিক হওয়ার পর পুনরায় আবার গলা টিপে ধরা হচ্ছে।

নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! এর পরিণতি এরকম কেন? হযরত জিবরাঈল (আ.) উত্তর দিলেন, এরা আপনার উম্মতের ঐসব খতীব, ওয়ায়েজ ও বক্তার দৃষ্টান্ত, যারা নিজেদের জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার চালিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল ছড়িয়ে দিত। সাধারণ মানুষ তাদের অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য শুনে পরস্পর দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে, হানাহানি, মারামারিতে লিপ্ত হতো। আজ তাদেরকে গলা টিপে ধরে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, বলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুন্দর করে বয়ান করার যোগ্যতা কি উম্মতের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদের বিভক্ত করে দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন? নাকি তারা পরস্পরে

ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য দিয়েছিলেন? তারা কোনো উত্তর দিতে পারবে না। এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত তাদের শাস্তি হতেই থাকবে।

মিথ্যা সাক্ষ্যের পরিণাম

তারপর নবীজি দেখলেন, কিছু মানুষ যাদের দেহ তো মানুষের মতো কিন্তু মুখমণ্ডল শূকরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিবরাঈলকে (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! এদের চেহারা এমন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর নবী! এরা মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী পাপী লোক। দুনিয়াতে এরা কারণে-অকারণে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিত। দেখুন-না, আজকের দুনিয়ার বন্ধুর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য হ্যাঁ যোগ করে তা শক্তিশালী করা হচ্ছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মানুষের জান, মাল, ইয্যত, আবরু লুটে নিচ্ছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঐসব মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীদের চেহারাগুলো শূকরের চেহারায় রূপান্তরিত করে দেবেন। তখন উপলব্ধি হবে যে, আমরা যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম, তা আমাদের জন্য কতটা বিধ্বংসী প্রমাণিত হলো।

স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারিনীর শাস্তি

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও দেখলেন, কিছু মহিলা মাদী কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দের মতো বিকট আওয়াজে চিৎকার করছে আর কাঁদছে। তাদের পোশাকাদি ও মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, হযরত জিবরাঈ (আ.) উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা ঐসব নারী, যারা দুনিয়াতে স্বামীর সঙ্গে কলহ ও ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত হতো। কারণে-অকারণে স্বামীকে কথার বাণে জর্জরিত করত। এরা স্বামীর আনুগত্য ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতাসুলভ আচরণের পরিবর্তে যন্ত্রণাদায়ক আচরণ করত। আজ আল্লাহ তাদেরকে শক্ত হাতে ধরেছেন। কুকুরের মতো আওয়াজ করেই তারা কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে।

অহংকারের পরিণতি

নবীজি সেখানে আরও দেখলেন যে, কতিপয় লোকের মাথা লক্ষ করে প্রচণ্ড ভারী পাথর মেরে কুচলে দেওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তা আবার সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। আবার পাথর মেরে মাথা থেতলে দেওয়া হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন

করলে জিবরাঈল উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা হলো অহংকারী লোক দুনিয়ায় নিজেকে খুব বড় মনে করত। খুব অহংকার ছিল তার। হ্যাঁ, আরে আমার সমকক্ষ কেউ আছে নাকি? হ্যাঁ, আমি এই করে ফেলব, ওই করে ফেলব। তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত ওই শাস্তি দেওয়া হবে।

আমানতের খেয়ানতের শাস্তি

তারপর নবীজি আরও দেখলেন, কতিপয় লোকের মাথায় বড়-বড় বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেগুলো তারা বহণ করতে সক্ষম নয়। জোরপূর্বক চাপানোর কারণে তারা ভার নিতে না পেরে এদিক-সেদিক পড়ে যাচ্ছিল। ফেরেশতারা পুনরায় তাদের মাথার ওপর সেই বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাঈল! এটা কেন? উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা ঐ সমস্ত লোক যারা দুনিয়ায় আমানতের খেয়ানত করেছে। মানুষ তো বিশ্বাস করে আমানত জমা রাখত আর তারা সেই আমানতের সঠিক ব্যবহার না করে খেয়ানত করত। আজ তাদের সেই কৃতকর্মের জন্য এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

বেনামাযীর পরিণতি

তারপর রাসূল নবীজি আরও দেখলেন, কিছু লোকের মাথার ওপর পাথর দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করা হচ্ছে। তারপর অন্য পাথরের ওপর তাদের মাথা রেখে পূর্বের পাথর দিয়ে মাথা পিসে দেওয়া হচ্ছে। তিনি হযরত জিবরাঈলকে (আ.) জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা হলো আপনার উম্মতের বেনামাযী লোকদের দৃষ্টান্ত। এরা আল্লাহর দেওয়া কপালকে আল্লাহর সামনে সেজদায় অবনত করত না। যারা আল্লাহর সামনে মাথা নত করত না, তাদের মাথাকে আজ চূর্ণবিচূর্ণ করা হচ্ছে।

যিনা ও ব্যভিচারের পরিণতি

নবীজি আরও দেখলেন, কতিপয় নারী, পুরুষ যাদের মাথার ওপর তাদের লজ্জাস্থান অবস্থিত। সেখান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত পূজ বের হচ্ছে আর তারা পিপাসার তাড়নায় সেগুলোই গলাধঃকরণ করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এদের এই শাস্তি কেন হচ্ছে? হযরত জিবরাঈল উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা আপনার উম্মতের ব্যভিচারী নারী-পুরুষ। যিনা-ব্যভিচারের কারণেই তাদের আজ এই পরিণতি।

পরনিন্দাকারীর শাস্তি

এমনও কিছুলোক দেখানো হলো, যারা নিজেরাই নিজেদের গোশত কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। প্রশ্ন করে জানা গেল, এরা ছিল অন্যের নামে গীবত ও পরনিন্দাকারী। আজ তারা নিজেরাই নিজেদের গোশত ভক্ষণ করছে। দুনিয়ায় অন্যের নামে সমালোচনা করা, তার অগোচরে তাকে মন্দ বলার পরিণতি এটাই।

জান্নাতী ঐশ্বর্য পরিদর্শন

সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাতের আলিশান নেয়ামতরাজি দেখানো হলো। জান্নাতের ঐশ্বর্যময় বিশাল-বিশাল অট্টালিকা, সবুজ-শ্যামল পুষ্পকাননে বাহারী রঙের রকমারি ফুল। বিশাল-বিশাল ফলবতী গাছে থাকা সুস্বাদু ফল। ফল ও ফুলের সুগন্ধে সুরভিত পুরো জান্নাতী পরিবেশ। হুর-গেলমান সবাই মিলে জান্নাতীকে নিয়ে আনন্দে মেতে থাকে। সুন্দর-সুন্দর কারুকার্যখচিত পালঙ্কে হেলান দিয়ে থাকে। এমন আরও অগণিত নেয়ামত।

এসব হাদীস নয় ১/১৫৫

আরশের উচ্চতায়

জান্নাতী নেয়ামতরাজি পরিদর্শন করা শেষ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হলো। যেতে-যেতে যখন একপর্যায়ে আরশে আযিম এসে গেল, তখন জিবরাঈল (আ.) থেমে গেলেন। তারপরই আরশে আযীমের নূরানী এলাকা। তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ পর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গ দিতে পেরেছি। এপর আর সামনে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, আরশে আযীমের নূরানী তাজাল্লী এত প্রখর যে, যদি এক কদম আগে বাড়ি, তাহলে আমার সকল ডানা জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষাতের জন্য যখন নিয়ে আসা হলো, তখন পথপ্রদর্শক দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বলল, এবার আপনি একাই সামনে এগিয়ে যান। কারণ, প্রেমিক তার প্রিয়তমের সাক্ষাতের জন্য নির্জনতা চাচ্ছে।

হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আসল আকৃতি

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আ.)কে দুবার তার আসল আকৃতিতে

দেখেছেন। একবার নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় হেরাগুহার সম্মুখে। দ্বিতীয়বার মেরাজের সফরে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى.

'নিশ্চয়ই আপনি দ্বিতীয়বার জিবরাঈলকে নিচে নামতে দেখেছেন।'[১]

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى.

'সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।'[২]

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى.

'তার পাশে 'জান্নাতুল মাওয়া' অবস্থিত।'[৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি সিদরাতুল মুনতাহা নামক স্থানে জিবরাঈলকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছি। তার সারা দেহে সর্বমোট ছয়শত ডানা ছিল। অতীতে আরও একবার তার আসল আকৃতিতে দেখার কারণে এবার চিনতে সমস্যা হয়নি। তারপর 'সিদরাতুল মুনতাহা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, এটি 'জান্নাতুল মাওয়া'র সন্নিকটে অবস্থিত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, সকল জান্নত সপ্ত আকাশের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এর প্রতিটি স্তর পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। সর্বশেষ স্তর হলো জান্নাতুল ফেরদাউস এবং তার উপরেই আরশে ইলাহীর ছায়া পড়ে থাকে।

সিদরাতুল মুনতাহার বিবরণ

যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন, তখন সিদরা'র ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নূরের তাজ্জালী পড়ে ছিল। এটি দেখতে একটি বরই গাছের মতো। গাছের পাতাগুলোর ওপর সোনালী রঙের প্রজাপতিরা ঝলমল করছিল। নবীজি বললেন, এই দৃশ্য এত মনোমুগ্ধকর, এত বিস্ময়কর ছিল যে, পৃথিবীর কোনো মাখলুক তার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

---

১. সূরা নাজম : ১৩

২. সূরা নাজম : ১৪

৩. সূরা নাজম : ১৫

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى.

'যখন সিদরাকে ঢেকে ফেলল ওই জিনিস, যা ঢেকে ফেলেছে।'[১]

তাঁর এই প্রতক্ষদর্শন এতটাই একাগ্র ছিল যে, এদিক-সেদিক তাকানোর সুযোগ হয়নি। আল্লাহ বলেন–

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.

'তাঁর দৃষ্টি এদিক-সেদিকও হয়নি ভ্রমও হয়নি।'[২]

তিনি অত্যন্ত ধীর-স্থিরচিত্তে সিদরাতুল মুনতাহার মনোলোভা দৃশ্য অবলোকন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.

'তিনি স্বীয় প্রভূর বড়-বড় নির্দশনসমূহ প্রতক্ষ করেছেন।'[৩]

'সিদরাহ' একটি বরই গাছ। কোনো-কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, এই বরই গাছটির গোড়া ষষ্ট আকাশে আর শাখা-প্রশাখাগুলো সপ্ত আকাশের উপরে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এই গাছটির প্রতিটি পাতায় বসে-বসে ফেরেশতারা তাসবীহ পাঠ করে। এই গাছটিকে সিদরাতুল মুনতাহা এই জন্য বলা হয় যে, এটি নিম্ন ও উচ্চ উভয় স্থানের সঙ্গমস্থল। ওপর থেকে অবতীর্ণ বিধিবিধান এখানে এসে থেমে যায় এবং ভিন্ন কোনো অবস্থায় সেটি নিচে অবতীর্ণ হয়। এমনিভাবে নিচ থেকে যা কিছু উপরে ওঠে, তা এখানে এসে থেমে যায়।

মোটকথা, এভাবে বলা যায় যে, এই গাছটি সৃষ্টিজগত ও বিধানজগতের মাঝে একটি মোহনা। এই গাছটির সঙ্গে বনী আদমের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। এ কারণেই হাদীছে আছে, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় পানির মধ্যে বরই পাতা ফেলে গরম করে নাও। তারপর সেই ফুটানো পানি দ্বারাই গোসল দাও।

চারটি ঝরনাধারা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মে'রাজে আমি সেই বরই গাছটির নিচে চারটি ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে দেখেছি।

---

১. সূরা নাজম : ১৬

২. সূরা নাজম : ১৭

৩. সূরা নাজম : ১৮

জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ ঝরনাগুলো কোত্থেকে এসেছে? সে উত্তর দিল, এখানে দুটি ঝরনা হলো কাউসার ও সালসাবীল, যার বর্ণনা কুরআনে কারীমে এসেছে। কিয়ামতের দিন এই জলধারা থেকে নালা করে হাউজে কাউসারে পানি ঢালা হবে। সেখান থেকে আপনার উম্মতদের পানি পান করানো হবে। অবশিষ্ট দুটি ঝরনাধারা নীল ও ফোরাত নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। যেমন– সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা চাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

আল্লাহর দর্শন

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন–

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى.

এ আয়াত দ্বারা কতক মুফাসসির হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর দর্শন উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ وَلَقَدْ رَاٰى مُحَمَّدٌ رَبَّه مَرَّتَيْنِ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রভুকে দুবার প্রত্যক্ষ করেছেন।

তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় আছে, 'তিনি একবার আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেন, একবার অন্তর দিয়ে দেখেছেন। তাবরানী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায়ও এ জাতীয় অর্থবহ শব্দ এসেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), ইবনে ওমর (রাযি.) এবং আবূযর গিফারী (রাযি.)-এর বর্ণনা থেকেও একথাই বোঝা যায়। তবে আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) এ বিষয়ে কঠোর ভাষায় বিরোধিতা করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.)ও আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকার করেন। হযরত মাসরূক (রাযি.) একবার হযরত আয়েশা (রাযি.)কে প্রশ্ন করলেন, আপনি কিসের ভিত্তিতে আল্লাহর দর্শনকে অসম্ভব মনে করেছেন। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ বলেছেন–

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ.

'চর্মচক্ষু আল্লাহকে দেখতে পারে না। তবে তিনি সকল দৃষ্টিকে দেখছেন।'[১]

একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে, হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর দাবিও যুক্তির মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। কারণ, এই আয়াতের মধ্যে إدراك (উপলব্ধি)কে অস্বীকার করা হয়েছে – দর্শনকে নয়। إدراك তথা

১. সূরা আন'আম : ১০৩

অনুধাবন ও উপলব্ধি বলা হয় কোনো বস্তুকে পরিপূর্ণভাবে বেষ্টনী দিয়ে ফেলা। আর আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা কিংবা বৈশিষ্টাবলীকে জ্ঞানের পরিধিতে পরিবেষ্টিত করা অসম্ভব। বাকি রইলো رؤية, অর্থাৎ আল্লাহর দর্শন প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাযি.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) প্রমুখের আকীদা হলো যে, জান্নাতে সকল ঈমানদার আল্লাহর দর্শনলাভে ধন্য হবে। কিন্তু সেই দর্শন হবে দিক, অবস্থা, উপমা ও সাদৃশ্যমুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتّٰى تَمُوْتُوْا.

'তোমরা মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় রবকে দেখতে পারবে না।'

অর্থাৎ– এই দিদার ও দর্শন একমাত্র তখনই লাভ হবে, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে পরকালে চলে যাবে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামও তুর পাহাড়ে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের আবেদন করেছিল। তখন উত্তর এসেছিল لَنْ تَرَانِيْ. (তুমি আমাকে দেখার সামর্থ্য রাখ না)। তবে ওই পাহাড়ের দিকে তাকাও, আমি সেখানে তাজাল্লি দেব। যদি সেটি স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে আমাকে দেখতে পাবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়ের ওপর তাজাল্লি দিলেন, পাহাড় টুকরা-টুকরা হয়ে ধসে পড়ল এবং হযরত মূসা সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এর অর্থ হলো, এই অবিনশ্বর পৃথিবীতে আল্লাহর দর্শন সম্ভব নয়। তারপরও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দীদারে ইলাহীতে ধন্য হয়েছিলেন, তা ছিল ভিন্ন জগতে 'হাযিরাতুল কুদুসে'। অতএব এ নিয়ে মতবিরোধ করার কোনোই সুযোগ নেই।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে তাঁর রবকে দেখেছেন। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)ও একই মত পোষণ করেন। এক ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে বলে উঠল, হযরত! উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) তো এই বর্ণনাটি অস্বীকার করেছেন।

তার কথার উত্তর আমি স্বয়ং নবীজির হাদীছ দিয়ে দিচ্ছি, তিনি ইরশাদ করেন–

رَأَيْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ.

'আমি আমার রবকে দেখেছি।'

এটি সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। এটি আল্লাহর রাসূলের মুখনিঃসৃত, যা হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কথা থেকে অনেক শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছ যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীমকে বন্ধুত্ব, হযরত মূসাকে কথপোকথন এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দর্শন দান করেছেন?

হযরত আবূযর গিফারী (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

رَأَيْتُ نُوْرًا.

'আমি আল্লাহর নূর দেখেছি।'

অন্য বর্ণনায় আছে–

فَسَجَدْتُّ لَه.

'আমি আল্লাহর সম্মুখে সেজদা করেছি।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, দুবার দর্শন লাভের অর্থ হলো, নবীজি আল্লাহকে একবার স্বচক্ষে দেখেছেন, একবার অন্তরদৃষ্টিতে দেখেছেন।

হাদীছে এসেছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন নবীজির বক্ষ বিদীর্ণ করলেন, তখন বলেছিলেন–

قَلْبٌ وَكِيْعٌ فِيْهِ أُذُنَانِ سَمِيْعَتَانِ، وَعَيْنَانِ بَصِيْرَتَانِ

'এটি খুব ক্ষমতাবান অন্তর। এতে দুটি কান ও দুটি চোখ রয়েছে।'

অর্থাৎ– নবীজির অন্তরের দুটি চক্ষু ছিল, যেগুলো দিয়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করেছেন।

যাহোক, আল্লাহর দিদার ও দর্শন তিনি দুবার লাভ করেছেন। একবার স্বচক্ষে, একবার অন্তর দৃষ্টিতে। উভয়টিই সঠিক মত এবং উভয়ের উদ্দেশ্যও অভিন্ন।

আল্লাহর সান্নিধ্য

তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরও উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়। কত উচ্চতায়? এর সঠিক অনুমান কেউ করতে

পারবে না। যখন তিনি তাঁর প্রতিপালকের দরবারে পৌঁছলেন, তখন বিস্ময়কর ভাষায় তাঁর প্রসংশা বর্ণনা করলেন। তিনি মাত্র তিনটি শব্দ বললেন–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ আমার মুখে উচ্চারিত সকল প্রশংসা আল্লাহর।

وَالصَّلَوٰاتُ আমার সকল শারীরিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য।

وَالطَّيِّبَاتُ সম্পদ ব্যয় করে যত ধরনের ইবাদত আমি করেছি, সকল মালী ইবাদতও হে আল্লাহ! আপনারই জন্য।

অর্থাৎ– তিনি তিনটি কথা বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার মৌখিক ইবাদতগুলোও আপনার জন্য, শারীরিক ইবাদতগুলোও আপনার জন্য। এতে আল্লাহর রহমতে জোশ এসে গেল। নবীজি বলেছেন, তিনটি কথা। আল্লাহ তা'আলা বিনিময়ে তিনটি কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

'হে আমার প্রিয় নবী! আপনার উপরও আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। যখন নবীজি দেখলেন, রহমত, বরকত ও শান্তির লেনদেন হচ্ছে, তখন তাঁর উম্মতের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا.

'শান্তি আমাদের ওপরও বর্ষিত হোক।'

وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

'এবং আমার উম্মতের মধ্যে যারা নেককার ও পুণ্যবান হবে, তাদেরও ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

জীবন উৎসর্গ হোক সেই দয়ার নবীর ওপর, যিনি মহান স্রষ্টার বিশেষ সান্নিধ্যের সময়ও পাপী উম্মতের কথা ভোলেননি। সেই অপার সালামাত, রহমত ও বরকতেও উম্মতকে শামিল করেছেন। ফেরেশতারা তো দেখে হতবাক! বিস্মায়াভিভূত! ফেরেশতাদের মুখে বেরিয়ে এল–

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রিয় রাসূলের যতগুলো বাক্যবিনিময় হয়েছে, সেগুলো 'তাশাহহুদ' নাম করে উম্মতের জন্য উপহার

হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ সেই তাশাহহুদ আমরা প্রত্যেক নামাযের শেষে পড়ে সেই মে'রাজের ঘটনাকেই স্মরণ করে থাকি।

নামাযের উপহার

যখন বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসে, তখন ফেরার সময় কিছু হাদিয়া গ্রহণ করেই বিদায় নিতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার প্রিয় রাসূল! আপনি আমাদের এই কথপোকথনকে উপহার হিসেবে নিন এবং স্বীয় উম্মতকে বলবেন, তারা যেন দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করে এবং এই নামাযেই আমার সঙ্গে কথপোকথনে লিপ্ত হয়। নবীজি ফিরছিলেন। পথে হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ! কী বিধান নিয়ে এলেন? উত্তর দিলেন, আমাকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায দেওয়া হয়েছে। মূসা (আ.) বললেন, আমার উম্মতকেও এমন বিধান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা তা মানতে পারেনি। আপনি পুনরায় তাশরীফ নিয়ে যান; বিধানে কিছুটা ছাড় করিয়ে আনুন। নবীজি পুনরায় আল্লাহর দরবারে পৌঁছে উম্মতের দুর্বলতা পেশ করলেন। আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ থেকে কমিয়ে পঁয়তাল্লিশ করে দিলেন।

একই ঘটনা আবার ঘটল তো চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। পাঁচ নামায করে কমতে লাগল। এভাবে তিনি নবার আল্লাহর দরবারে আসা-যাওয়া করলেন। বাহ্যিকভাবে মনে হবে, তিনি নামাযের পরিমাণ কম করানোর জন্য যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পরবর্তী কালে যেন কেউ একথা বলতে না পারে যে, ইবাদত ভারী হয়ে গেছে। এভাবে নবার যাওয়ার পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একপর্যায়ে বললেন, মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায। আর আল্লাহর দরবারে যেতে আমার লজ্জা লাগছে। পরিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তোহফা নিয়ে তিনি দুনিয়ায় ফিরে এলেন।

কিছুক্ষণের জন্য জগত স্পন্দনহীন ছিল

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে ফিরে এলেন, তিনি বলেন, আমি ঘরে পৌঁছে দেখি, যে পানি দ্বারা আমাকে ওযু করানো হয়েছিল, তা এখনও প্রবাহিত হচ্ছে। বিছানার উষ্ণতাও আমার কাছে এমনই মনে হয়েছে। বস্তুত মে'রাজে যতটুকু সময় ব্যয় হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ততটুকু সময় পৃথিবীকে স্পন্দনহীন করে রেখেছেন। জগতের সকল কার্যলীলা স্থগিত হয়ে যায়। যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন দুনিয়ার সব কিছু আগের মতো চলতে শুরু করে।

ইসলামের আঙিনায় আধুনিক সায়েন্স

একটা সময় ছিল, যখন জগদ্বাসী হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসন বাতাসে ভাসার বিষয়টি বুঝতে পারেনি। আজ উড়োজাহাজের উড্ডয়ন সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসনের উড্ডয়নকে বুঝিয়ে দিয়েছে। একটা সময় এমনও ছিল যে, মানুষের একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো যে, আবাবীল পাখি ছোট-ছোট কংকর নিক্ষেপ করে বড়-বড় হাতি মেরে ফেলেছে! তারা বলত, ক্ষুদ্র কংকরে হাতি হত্যা করার মতো এত শক্তি কোত্থেকে আসবে। কিন্তু আজ বন্দুকের বুলেট সেই বিষয়টি সবার কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। একটা গুলি কী করে একটা বিশাল হাতিকে মুহূর্তের মধ্যে ভূলুণ্ঠিত করতে পারে তা আজ সবাই বোঝে। সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল ইয্যতের আদেশে আবাবীল যখন ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করত, তখন তা গুলি হয়ে বর্ষিত হতো। তো সায়েন্স সময়ের ব্যবধানে যেসব না বোঝা বাস্তবতাগুলো হতে পর্দা সরিয়ে দিচ্ছে।

একসময় এসব কথা বুঝে আসত না। আজ তা বোঝা তুলনামূলক সহজ হয়ে গেছে। যারা লিফ্‌টে চড়েছেন, তাদের জন্য রফরফ-এর বাস্তবতা অনুধাবন করা সহজ। আজ براق (বোরাক) শব্দটিকে برق (বোরাক অর্থ-বিদ্যুৎ)-এর কারণে বোঝা সহজ হয়ে গেছে। কারণ, বিদ্যুৎ এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার (১,৮৬,০০০) মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। আল্লাহ খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তার প্রিয় রাসূলকে মে'রাজের বিস্ময়কর ভ্রমণ করিয়ে এনেছেন। বাহ্যিকভাবে কেউ এটা বুঝুক বা না বুঝুক এটাই সত্য।

বন্ধুরা! আমরা এর ওপরই ঈমান রাখি। যেহেতু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাই আমরা পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে একথা বিশ্বাস করি যে, নবীজি সশরীরে মে'রাজে গমন করেছেন এবং স্বল্প সময়ে ফিরেও এসেছেন।

একটি চমৎকার ঘটনা

এ সংক্রান্ত এক পাঞ্জাবীর ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমাদের এলাকা পাঞ্জাবে, যখন ভোরে-ভোরে মানুষ ঘুম থেকে উঠে তখন লাঙল-জোয়াল কাঁধে নিয়ে ফসলের মাঠে চলে যায়। লাঙল চালায় যে, তাকে পাঞ্জাবী ভাষায় 'হালী' বলে। সেই হালী যখন হাল চালায়, তখন লম্বা সময় পার হয়ে যায়। প্রায় তিন-চার ঘন্টা। ততক্ষণে তাদের স্ত্রীরা বাড়িতে লসসী, মাখন, রুটি

ইত্যাদি নাস্তা তৈরি করে মাঠে চলে আসে। স্বামী বেচারার ক্ষুৎ-পিপাসায় করুণ দশা থাকে। সে অধির আগ্রহে স্ত্রীর পথপানে চেয়ে থাকে। যেন এক প্রেমিক তার প্রিয়তমের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। যে স্ত্রী নাস্তা নিয়ে মাঠে পৌঁছে স্বামী লাঙল যেখানে ছিল, সেখানেই থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং কাছে বসে নাস্তা করে।

পাঞ্জাবী ভাষায় পংক্তিটি এমন-

پیالونگ داجدوں لشکارا* تے پالیاں نے روک لئے.

একই ধরনের আচরণ হয়েছে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। যখন তিনি মেরাজে রওনা হলেন, তখন আল্লাহ রব্বুল ইয্যত সমগ্র জগতের যাবতীয় কার্যলীলা বন্ধ করে দিলেন। পৃথিবী স্পন্দনহীন একটা পাথরে পরিণত হলো। আমার প্রিয় রাসূল আমার কাছে এসেছে; আমি তাঁর সঙ্গে নির্জনে কথা বলতে চাই। কী পরিমাণ কথা বলব? ইরশাদ হচ্ছে–

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ.

'আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলের ওপর ওহী অবতীর্ণ করলেন এবং যা ইচ্ছা তা-ই অবতীর্ণ করলেন।'[১]

এটাই প্রেমিক-প্রিয়তমের মধ্যে গোপন রহস্য। কোনো প্রেমিক তার প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা অন্য কারো কাছে বর্ণনা করে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমেও তাদের বিষয়টি অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন–

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ.

'তারপর আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর বান্দার ওপর ওহী নাযিল করলেন। ওই ওহী, যা তিনি চাইলেন। অবশ্যই তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় প্রতিপালকের বড়-বড় নিদর্শনসমূহকে প্রত্যক্ষ করেছেন।'

মক্কার কুরাইশদের বিস্ময়

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজ হতে যখন ফিরে এলেন, তখন একদিন পর তিনি মক্কার কুরাইশদের পুরো ঘটনা বর্ণনা করে

---

১. সূরা নাজম : ১০

শোনালেন। শুনে তারা যারপরনাই বিস্মিত হলো। তারা বিশ্বাস করতেই পারছিল না যে, এত স্বল্প সময়ের মধ্যে কেউ মক্কা থেকে মসজিদুল আকসায় কিভাবে পৌঁছতে পারে আবার ফিরেও আসতে পারে! তাই বিষয়টিকে তারা অবাস্তব ও কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিল। কুরাইশ কাফেররা নবীজিকে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে বলল, ঠিক আছে আপনি যেহেতু মসজিদুল আকসা ঘুরে এসেছেন, তাহলে বলুন তো তার ছাদ কেমন ছিল? নবীজি বললেন, ছাদের কথা তো আমার মাথাই আসেনি। আমার মধ্যে তখন চরম উৎকণ্ঠা কাজ করছিল যে, তারা আমাকে এমন প্রশ্ন করল, যার উত্তর আমার জানা ছিল না। কিন্তু আমার রব আমাকে অপমান হতে দেননি।

তিনি আমার দৃষ্টিসীমা থেকে সকল পর্দা সরিয়ে দিলেন। মসজিদুল আকসা তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার ছাদ দেখে-দেখে তাদের উত্তর দিলাম। একে-একে তারা যতগুলো প্রশ্ন করল, সবগুলোর সঠিক উত্তর দিলাম। কিন্তু তাদের ভাগ্যে হেদায়াত ছিল না। তারা আমাকে বলতে লাগল, এ তো দেখি অনেক বড় জাদুকর। এ জাদুর সাহায্যে সবকিছু বলে দিচ্ছে!

হযরত আবূবকর (রাযি.)-এর সাক্ষ্য

আবূজাহ্ল সেখান থেকে উঠে ঘরের দিকে চলে গেল। পথে হযরত আবূবকর (রাযি.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। বলল, আবূবকর! তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক, শিক্ষিত ও সমঝদার। তুমি-ই বলো, কেউ যদি বলে, আমি একই রাতে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়েছি এবং ফিরেও এসেছি, এটা কি সম্ভব? আবূবকর বললেন, না এটা সম্ভব নয়। আবূজাহ্ল বলল, তোমার সাথী মুহাম্মাদই তো এ কথা বলেছে! হযরত আবূবকর (রাযি.) সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, যদি আমার প্রিয় বন্ধু বলে থাকেন, তাহলে তা সম্ভব। বরং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি যা বলেছেন সবই সত্য বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আবূবকর (রাযি.)-এর এই সাক্ষ্যকে এতই পছন্দ করলেন যে, তাঁর উপাধি দেওয়া হলো সিদ্দীক। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নামের সাথে 'সিদ্দীক' উপাধিটি সংযুক্ত করে নাম নিতে হবে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর প্রিয় রাসূল একটি দাবি করেছেন আর আবূবকর (রাযি.) না দেখেই তার সাক্ষ্য দিয়ে দিলেন। এই মে'রাজের ঘটনা বড়-বড় তাফসীরের কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে এর অনেক হেকমতও উল্লেখ করা হয়েছে।

মেরাজের ঘটনার কিছু হেকমতপূর্ণ বিষয়

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় হাবীবকর্তৃক মে'রাজের ঘটনা ঘটিয়ে আমাদেরকে কিছু দূরদর্শী হেকমত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আসুন, এবার সেই হেকমতগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

এক. প্রিয়জনের সঙ্গে সরাসরি আলাপন : সেই হেকমতগুলোর মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত ইতিপূর্বে তাঁর প্রিয় রাসূলের সঙ্গে জিবরাঈলের (আ.) মধ্যস্থতায় আলাপ করেছেন। এ আলাপনে জিবরাঈল (আ.) মধ্যস্থায় ছিলেন। তারপর একটা সময় এল, যখন মধ্যস্থতা ছাড়াই সাক্ষাতে কথা বলার পরিবেশ তৈরি হলো। প্রিয়জনের সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করতে মন চায়। তাই আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় রাসূলকে আরশে আযীমে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আল্লাহ যেন বললেন, হে আমার প্রিয় রাসূল! দুনিয়ায় তো জিবরাঈল আমার পয়গাম নিয়ে আপনার নিকট হাযির হতো; এবার আপনি নিজেই আরশে আযীমে চলে আসুন, যেন আমরা নির্জন সাক্ষাতে মিলিত হতে পারি।

সুতরাং মে'রাজের একটি হেকমত হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলের সঙ্গে নির্জনে আলাপ করেছেন এবং রাসূলকে সুমহান মর্যাদায় ভূষিত করলেন।

দুই. ফেরেশতাদেরকে রাসূলের দর্শন করানো : দ্বিতীয় হেকমত ছিল, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় রাসূলকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' তথা সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ বানিয়েছেন। আর যিনি রহমাতুল্লিল আলামীন হন, তিনি শুধু ইহজগতের জন্যই নয় বরং দৃশ্য-অদৃশ্য সকল জগতের জন্য রহমতস্বরূপ। এজন্য আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো, আমার প্রিয় রাসূলের দর্শন লাভ করে দুনিয়াবাসী তো ধন্য হয়েছেই, এবার 'রহমাতুল্লিল আলামীন'কে আরশে আমন্ত্রণ জানাই, যেন আরশের ফেরেশতারাও তার দিদার লাভে ধন্য হতে পারে এবং এই উদ্দেশ্যই মে'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়।

তিন. ফেরেশতাদের ওপর স্বীয় রাসূলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ : আরেকটি হেকমত হলো, ফেরেশতারা যেহেতু আরশের ওপর ছিল, তাই হতে পারে, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চতায় অবস্থান করা অহংকার ছিল। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় রাসূলকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তিনি কতটুকু উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন? এত উচ্চতায় যে, ফেরেশতারাও যেখানে পৌঁছতে পারেনি।

বরং নিচে রয়ে গেল। এতে যেন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সম্মুখে একথা প্রমাণ করে দেখালেন যে, তোমরা নিজেদের উচ্চতায় অবস্থান নিয়ে অহংকারে পতিত হয়ো না। আমি আমার প্রিয় রাসূলকে এমন উচ্চতায় ডেকে এনেছি, যেখানে সম্মানী ফেরেশতা জিবরাঈলও পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে এমন মর্যাদায় ভূষিত করে কেমন যেন ফেরেশতাদের অহংকারকে ভূলুণ্ঠিত করে দিলেন।

চার. রাসূলকে ইমামুল আম্বিয়া প্রমাণ করা : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজের পূর্বে যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কায় ছিলেন, ততক্ষণ ছিলেন ইমামুন্নাস তথা মানুষের ইমাম। কারণ, তিনি তখন মানুষের ইমামত করেছেন। কিন্তু মসজিদুল আকসায় গিয়ে যখন আম্বিয়া আলাইহিস সালামের ইমামত করলেন, তখন হয়ে গেলেন ইমামুল আম্বিয়া বা নবীগণের ইমাম। যখন আরশে পৌঁছলেন, সেখানেও তিনি ফেরেশতাকূলের ইমামত করলেন। এভাবে তিনি ফেরেশতাদেরও ইমাম হয়ে গেলেন। তো আল্লাহ বললেন, আমার প্রিয় রাসূল 'ইমামুল কুল' তথা সকল মাখলুকের ইমাম।

পাঁচ. মক্কায় কাফেরদের অবদমিত করার জন্য : অপর একটি হেকমত হলো, মক্কায় কাফেররা যখন প্রস্তাব দিয়েছিল যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদের দেবতাদের বিরোধিতা ত্যাগ করেন, আমরা আপনার সম্মুখে সম্পদের স্তূপ লাগিয়ে দেব, আমাদের নেতা বানিয়ে নেব ইত্যাদি আরও কত প্রলোভন দেখাল। তখন এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ তা'আলার রহমতের দরিয়ায় জোশ এসে গেল। আল্লাহ বলেন, প্রিয় হাবীব! মক্কায় কাফেররা আপনার সম্মুখে দুনিয়ার তুচ্ছ ধন-সম্পদ পেশ করছে। আপনি আমার কাছে আসুন। আমি আপনাকে আমার বিশাল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ করাব। দেখবেন, আপনার জন্য আমি বিস্ময়কর কত কিছু সৃষ্টি করে সাজিয়ে রেখেছি। তারপর তাঁর প্রিয় রাসূলকে আখেরাতের বিস্ময়কর জগত ভ্রমণ করিয়ে দেখিয়েছেন, যেন দুনিয়ার কাফেরদের একথা ভুল প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার টাকা-পয়সাই সব চেয়ে বড় জিনিস। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় রহমতের ভাণ্ডার দান করবেন। আর সে কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে মেরাজের মহামূল্যবান নেয়ামতে ধন্য করেছেন।

ছয়. প্রিয়জনের মনঃতুষ্টি করা : একটি হেকমত এও ছিল যে, আল্লাহকর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে লজ্জিত-অপদস্ত

হওয়ার পর একবার তিনি মুখ ফুটে বলেছিলেন, হায়! যদি একজন বন্ধু পেতাম, যে আমার সাথে থাকবে, কোনো সহযোগী যদি পেতাম, যে আমাকে সাহায্য করবে, কোনো সহমর্মী যদি পেতাম, যে আমাকে সান্ত্বনা দিত। তাঁর কথাগুলো শুনে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আরশে আযীমে ডেকে নিলেন, যেন বললেন 'হে প্রিয় রাসূল! আমিই তো আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। দুনিবাসী যদি কষ্ট দেয়, তাহলে আসুন; আমি আপনাকে সান্ত্বনা দেব। এরা তো আপনার হৃদয় ভেঙে দিয়েছেই; আসুন আমি আপনার মন আনন্দে ভরে দিচ্ছি। দুনিয়ার হতভাগারা তো আপনাকে যন্ত্রণা দিয়েছেই; আসুন আমি আপনাকে সৌভাগ্যের পাগড়ি পরাব। কারণ আপনার প্রকৃত বন্ধু তো আমিই। প্রকৃত সমবেদনা ও সহযোগিতা তো আমার কাছেই পাবেন।

তো মে'রাজের হেকমতসমূহের মধ্যে এটিও একটি হেকমত যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে সান্ত্বনা দিলেন।

সাত. খৃষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন : একটি হেকমত তো এও ছিল যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা আরশে ডেকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে অবস্থান করিয়েছেন। হতে পারে খৃষ্টানরা ভিতরে-ভিতরে এই আত্মগৌরবে ডুবে আছে যে, আমাদের নবী অনেক মর্যাদাবান। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাটিতে না রেখে আসমানে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই আত্মগৌরবকে ভেঙে দিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মে'রাজে নিয়ে গেছেন। উদ্দেশ্য 'হে খৃষ্টানরা! তোমাদের নবী চতুর্থ আসমানে আছে; তাহলে আমার প্রিয় রাসূল, আখেরী নবী তারও উপরে গিয়ে ভ্রমণ করে এসেছেন। সুবহানাল্লাহ!

আট. আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখে প্রশংসায় মুখর হওয়া : অপর একটি হেকমত হলো, পৃথিবীতে যত ধরনের সৃষ্টিজীব ইতিপূর্বে এসেছিল, তারা সবাই আল্লাহকে না দেখেই তাঁর প্রশংসা করেছে। কিন্তু এমন একজন যদি না হয়, যিনি স্বচক্ষে দেখে প্রশংসা করবেন, তাহলে কেমন লাগবে? তাই আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে ঊর্ধ্ব আকাশে নিয়ে বললেন, হে প্রিয় রাসূল! সমগ্র পৃথিবী আমাকে না দেখেই আমার প্রশংসা করে, পবিত্রতা বর্ণনা করে। আমি আপনাকে এই মর্যাদা দান করছি যে, আপনি আমাকে স্বচক্ষে দেখবেন এবং আমার নিদর্শনসমূহ দেখে আমার প্রশংসা করবেন। সুতরাং সকল নবীর সাক্ষ্য ছিল না দেখে; কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য হয়েছে স্বচক্ষে দেখে।

নয়. আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর ভাণ্ডার পরিদর্শন : পৃথিবীর নিয়ম হলো, বাদশা যখন কাউকে নিজের বন্ধু বানান, তখন তাকে নিয়ে নিজের রাজমহল পরিদর্শন করান। স্বীয় ধনভাণ্ডার দেখান। নিজের দরবারে আমন্ত্রণ জানান। তদ্রূপ আল্লাহ রব্বুল ইয্যতও তাঁর প্রিয় রাসূলকে বিশেষ নৈকট্য দান করেছেন এবং তাঁকে আরশ-কলম থেকেও উপরে নিয়ে গেলেন। নিজের আরশে ভ্রমণ করালেন। নিজের ধনভাণ্ডার দেখালেন। বললেন, হে বন্ধু আমার! দুনিয়ায় যদি বন্ধুরা তাদের বন্ধুদের এমন নিজস্ব জিনিস দেখায়, তাহলে আমি প্রকৃত শাহানশাহ; আসুন আমিও আমার সকল গুপ্ত ধনভাণ্ডার আপনাকে দেখাচ্ছি, যেন পৃথিবীবাসী বিশ্বাস করে, সত্যিই আমি আপনাকে আপন করে নিয়েছি।

দশ. শাফায়াত করার মর্যাদা প্রদান : একটি হেকমত এও ছিল যে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের প্রিয় হাবীব কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবেন। অর্থাৎ শাফায়াতের মর্যাদা লাভ করবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কিয়ামত কায়েম হবে, লোকেরা সবাই দুশ্চিন্তায় আত্মহারা হয়ে যাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার পাপ অনুপাতে স্বীয় ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হবে সেই মুহূর্ত। সবাই বিভিন্ন নবীদের নিকট সুপারিশের জন্য আসবে। হযরত আদম (আ.), নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.)-এর নিকটও আসবে। বলবে, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! কিন্তু সবাই তখন আল্লাহর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। একপর্যায়ে সবাই আমার কাছে ছুটে আসবে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সুপারিশের জন্য আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি সেজদায় লুটিয়ে তাঁর শানে প্রশংসা করতে থাকব। নবীজি বলেন, আমি আল্লাহর এমন প্রশংসা করব যে, এমন প্রশংসা না কখনও কেউ করেছে, না কেউ করতে পারবে। সেই প্রশংসা এমন চমৎকার হবে যে, এতে আল্লাহ তা'আলার সকল গাম্ভীর্য দয়া ও রহমতে পরিণত হয়ে যাবে। তাঁর রহমতের দরিয়ায় জোশ এসে যাবে। তিনি বলবেন, হে আমার হাবীব! আমি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট; আপনি মাথা উঠান, যান, যার জন্য আজ আপনি শাফায়াত করবেন, তা কবুল করা হবে।

এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় রাসূলকে আরশে আহ্বান করে জান্নাত-জাহান্নামের দৃশ্য দেখিয়েছেন, যেন কিয়ামতে তিনি শাফায়াতের মর্যাদা লাভ করেন এবং লোকদের জন্য শাফায়াত করাও সহজ হয়ে যায়। বান্দা যখন কোনো দৃশ্য অবলোকন করে, তখন তার জন্য কথপোকথন সহজ

হয়ে যায়। যখন মানুষ প্রথমবার কথা বলে, তখন সে খুব চিন্তায় পড়ে যায়, আরে আমি কী বলব? তো আল্লাহ তা'আলাও তাঁর প্রিয় হাবীবকে মে'রাজে নিয়ে জান্নাত-জাহান্নামের পরিদর্শন করিয়েছেন। উদ্দেশ্য আল্লাহর হাবীবও যেন জানতে পারেন, জান্নাতী-জাহান্নামীদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হবে এবং কিয়ামতের দিনও যেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শাফায়াতের হক আদায় করতে পারেন।

আল্লাহর প্রিয় হাবীব ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে প্রত্যেক নবীকে একটি করে এমন দু'আর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যা হুবহু কবুল করা হবে। যখন নবীজি এ কথাটি বললেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম কেঁপে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি আপনাকেও তেমন দু'আর অনুমতি দিয়েছেন। নবীজি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তাঁরা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনি কোন দু'আটি চেয়েছেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি নগদে কিছুই চাইনি। তবে এই সুযোগ আমি কিয়ামতের দিনের জন্য জমা করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন আমি দু'আ করব, হে আল্লাহ! আমার সকল উম্মতকে আজ আপনার করুণার বদৌলতে ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তিনি আরও বলেন, আমার একজন উম্মতও যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের বাইরে থাকবে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করব না। আমার জন্য বরাদ্দ দু'আটি আমি কিয়ামতের দিনই করব। আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আর বিনিময়ে আমার পাপী ও গুনাহগার উম্মতদের ক্ষমা করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ!

এগারো. আল্লাহর অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ : আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় রাসূলকে মে'রাজে ডেকে নেওয়ার পিছনে আরও একটি হেকমত হলো, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর হাবীবের সম্মুখে উম্মতের আমলনামা প্রকাশ করবেন। আর এই কারণেই তিনি তাঁর রাসূলকে মে'রাজে নিয়ে গেলেন। তাঁকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেখালেন, যেন আমার অনুগ্রহের ভাণ্ডার তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। যদি তাঁর সামনে উম্মতের পাপ ও গুনাহগুলো উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তিনি ব্যথিত হবেন যে, হায়! আমার উম্মতের এত পাপ! তাদের ক্ষমার উপায় কী হবে? এজন্য আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় হাবীবকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের গুপ্ত ভাণ্ডার দেখিয়ে দিয়েছেন যে, হে আমার মাহবুব! আপনার উম্মতের পাপ যত বেশিই হোক আমার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে

দেখুন, তা এই অনুগ্রহ ও রহমতের চেয়ে কিছুতেই বেশি হবে না। আমার অনুগ্রহ সকল পাপের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। বিষয়টি এজন্য জানানো হলো, প্রিয় হাবীব যেন উম্মতের পাপরাশি দেখে দুশ্চিন্তায় না পড়েন।

বারো. আসমান-যমীনের মর্যাদায় সমতা আনা : কোনো-কোনো ওলামায়ে কেরাম এই হেকমতও লিখেছেন যে, একবার আসমান ও জমিনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। আসমান বলে, দেখো, আমার ওপর চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি রয়েছে; তাই আমার মর্যাদা বেশি। জমিন বলল, তাতে কী? আমার কাছে রয়েছে সাহাবায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং মর্যাদা আমারই বেশি।

আসমান : আরে! আমার কাছে হলো আল্লাহর রহমতের খাযানা।

জমিন : আমার কাছে আল্লাহর প্রিয় হাবীবের মদীনা।

আসমান : আমার ওপর হলো সকল পবিত্র স্থানসমূহ – যেমন-আরশ, কুরসী, লাওহে মাহফুয ইত্যাদি।

জমিন : আমার উপর রয়েছে তুর, হেরা, মক্কা, মদীনা ইত্যাদি ধরনের গৌরব। পরিশেষে জমিন বলল, আচ্ছা! তোমার কাছে তো অনেক কিছুই আছে; কিন্তু দোজাহানের গৌরব মাদানী নবী, রাসূলে খোদা, হাবীবে কিবরিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমার কাছে, না আমার কাছে? এই সৌভাগ্য তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দান করেছেন।

এ কথা শোনার পর আসমান নিরুত্তর হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলার রহমত হলো, তিনি উভয়ের মাঝে সমতা বিধান করার জন্য বললেন, জমিন যদি প্রিয় হাবীবের সান্নিধ্য পেয়ে গৌরবান্বিত হতে পারে, তাহলে আসমান সেই গৌরব থেকে কেন বঞ্চিত হবে। সুতরাং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মে'রাজে আহ্বান জানালেন এবং আসমানের সকল মাখলুক হাবীবে খোদার দর্শন লাভ করে ধন্য হলো।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

বিনয় ও নম্রতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ. وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ.

হে লোক সকল!

أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ.

তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ.

আর আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী, যার প্রশংসা করা হয়েছে।

তিনি মর্যাদাবান, প্রশংসিত ও মহাপরাক্রমশালী। তিনি সেই স্রষ্টা, যিনি তোমাকে জীবনের প্রয়োজনীয় সব নেয়ামত দান করেছেন, যাঁর করুণার বারিধারা বৃষ্টির চেয়েও বেশি। তোমার দেহের অঙ্গ-অঙ্গ সেই মহান সৃষ্টিকর্তার করুণায় ভরপুর। নিজেদের প্রকৃত পরিচয় অনুধাবন করার চেষ্টা করো। তারপরও যদি স্বীয় প্রতিপালকের সামনে মাথা নত না কর, তবে

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ..

'তিনি যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদের স্থলে একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করবেন। আর আল্লাহর জন্য এটি কোনো দুঃসাধ্য কাজ নয়।'[১]

---

১. সূরা ইবরাহীম : ১৯

ইতিহাসের কোনো পাতায় তোমাদের নামও থাকবে না। কোনো গল্প বা কাহিনীতেও তোমাদের আলোচনা আসবে না।

মাটির মর্যাদা

আমরা হলাম বান্দা! বান্দা থেকে বন্দেগী প্রকাশ পাওয়াই প্রশংসার বিষয়। আমরা মাটির তৈরী। তাই মাটির মতো জীবন যাপন করার মাঝেই সার্থকতা। অথচ শয়তান আমাদেরকে অগ্নিসন্তান হয়ে উদ্ভ্রান্ত জীবন যাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। মাটি পায়ের নিচে থাকলে সবাই পছন্দ করে। যদি পদতল থেকে উড়ে এসে কাপড়ে বা শরীরে লাগে, তখন সঙ্গে-সঙ্গে তা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। মুখে এসে লাগলে তৎক্ষণাৎ ধুয়ে ফেলা হয়। সুতরাং মাটির জন্য বিনয় ও নম্রতাই শোভনীয়। যতক্ষণ তা পায়ের নিচে থাকে, ততক্ষণ তার মূল্য থাকে। যেই সে উপরে ওঠার চেষ্টা করে, সবাই ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখান করে। ঠিক এভাবে যে মানব মাটির তৈরী হয়েও অগ্নিনির্মিতের মতো ঊর্ধ্বে উঠতে চয়, আল্লাহ তার নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে দেন।

তাসাওউফ কাকে বলে

তাসাওউফ 'কাশ্‌ফ' অর্জিত হওয়ার নাম নয়, রং দেখার নাম নয়, অন্তরের 'হরকত' অর্জনের নাম নয়, অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ঘটার নাম নয়, ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন কোনো বিষয় পূর্বেই অনুমান করার নাম নয়, মামলা-মকদ্দমায় বিজয়ী হওয়ার নাম নয়, দু'আ কবুল হওয়ার নাম নয়। কারণ, দু'আ তো শয়তানেরও কবুল হয়েছিল। তাসাওউফ নামায-তেলাওয়াতে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির নাম নয়। বরং তাসাউফ হলো নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার নাম।

হযরত সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবী (রহ.) একবার হযরত থানবী (রহ.)কে প্রশ্ন করলেন, 'হযরত! তাসাউফ কী জিনিস?' হযরত থানবী (রহ.)উত্তর দিলেন, 'তাসাউফ নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার অপর নাম।' এ কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

নিজের আমিত্বকে মিটিয়ে দিন

বন্ধুরা আমার! নিজের 'আমিত্বকে' মিটিয়ে দিন। স্বরণ রাখবেন, যে নিজের আমিত্ব ও অহংবোধকে মিটাবে না, তার আমিত্ব ও অহংকারকে আল্লাহ মিটিয়ে দেন। আর যার আমিত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মিটান, তার

তামাশা পুরো পৃথিবী দেখতে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমিত্বকে ভেঙে দেওয়ার পূর্বে আমরা নিজেরাই নিজেদের আমিত্বকে ভেঙে দিই। আর নিজের আমিত্ব ও অহংবোধকে নিজেই ভেঙে দেওয়ার নাম 'নফসের অবদমন'।

তাসাউফের মূলভিত্তি

নিজের নফসকে দমন করা তথা আমিত্বকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া এই নেয়ামত পূর্বপরাম্পরা হতে চলে আসছে। লোকেরা আজ প্রশ্ন করে, 'তাসাউফের ভিত্তি কী?' আরে ভাই! নিজের আমিত্বকে ভেঙে দেওয়া, অন্তরের আত্মতুষ্টি ও অহংবোধ জাতীয় আত্মিক ব্যধিগুলোর চিকিৎসার নামই তো তাসাউফ। আর এসব আধ্যাত্মিক সাধনার শিক্ষা তো সেই সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীন পূর্বসূরীদের থেকেই চলে আসছে।

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর বিনয়

নিজের আমিত্বকে মিটিয়ে দেওয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তো হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর জীবনেই পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'সিদ্দীক' হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। আশারায়ে মুবাশ্শারাহ (দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন)-এর মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। উহুদ পাহাড়কে তিনি বলেছিলেন, এই 'উহুদ! নড়ছিস কেন? তোর ওপর সিদ্দীক বসে আছে'। জীবদ্দশায় তাকে ইমামতের জন্য নামাযের মুসল্লায় পাঠিয়েছেন। হিজরতের সময় তিনি তাকেই সফরসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এত সব ফযীলত থাকা সত্ত্বেও হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর অবস্থা এই ছিল যে, নিজের দিকে তাকিয়ে তিনি কেঁপে উঠতেন, হায়! যদি আমার জন্মই না হতো! হায়! যদি আমি পাখি হতাম! হায়! যদি আমি ঘাস হতাম যে, কোনো প্রাণী আমাকে খেয়ে ফেলত, (তাহলে সারা জীবনের আমল নিয়ে আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার প্রয়োজন হতো না।) তার এই আত্মহারা অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে ইরশাদ করেন–

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَيِّتٍ يَمْشِيْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى ابْنِ قُحَافَةَ.

'কারো যদি ইচ্ছে হয়, সে মাটির ওপর একটা জীবন্ত লাশ দেখবে, সে যেন আবূকুহাফার বেটা আবূবকর সিদ্দীককে দেখে নেয়।' সুবহানাল্লাহ।

তারপর আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাকে গুহার মধ্যে স্বীয় হাবীবের মুখে إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. এর সুসংবাদও শুনিয়েছেন। কারণ, প্রবৃত্তির চাহিদা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, খাহেশাতে নাফসানী নিষ্পেষিত হয়েছিল, প্রকৃত মানবতার গুণ পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছিল। তিনি জীবিত ছিলেন ঠিকই; কিন্তু দুনিয়ায় থাকতেন না। তার মন-মস্তিষ্ক পৌঁছে গিয়েছিল আরশে আযীমের উচ্চতায়।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের বিনয়

সায়্যিদুনা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) নিজেকে কিভাবে বিলীন করেছেন? একবার যুদ্ধলব্ধ কিছু গনিমতের মাল এল। কিছু বন্দীও এল। তিনি দেখে খুব খুশি হলেন। কিছুক্ষণ পর সবাইকে ডেকে বললেন, তোমরা মিম্বরের কাছে এসে বসো! উপস্থিত সবাই মিম্বরের নিকটবর্তী হয়ে বসল। তিনি সবার দিকে ফিরে নিজেকে নিজেই সম্বোধন করে বললেন, 'এ ওমর ইবনুল খাত্তাব! তুমি সেই ব্যক্তি, যার মা শুকনা গোশত চিবিয়ে খেতেন।' আরবে দুর্ভিক্ষের একটা নিদর্শন ছিল, উদরপূর্তি করার মতো খাবার যদি কেউ না পেত, তাহলে সে ক্ষুধার তাড়নায় শুকনা গোশত চিবিয়ে ক্ষুধা নিবারণের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করত।

একথা বলেই হযরত ওমর মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন। সবাই সীমাহীন বিস্ময় নিয়ে নির্বাক তাকিয়ে রইল, এ কী? আমীরুল মুমিনীন কিছু বলবেন বলে আমাদের একত্রিত করলেন! কিন্তু এ কী বললেন তিনি?

সবার জিজ্ঞাসার পরিপেক্ষিতে তিনি আসল রহস্য উন্মোচন করলেন। বললেন, যখন যুদ্ধবন্দীরা এখানে এল, তখন আমার অন্তরে এই আত্মতুষ্টি জেগে উঠল যে, বাহ ওমর! সত্যিই তোমার কৃতিত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তোমার শাসনামলেই ইসলামের ব্যাপক বিজয় অর্জিত হয়েছে। আমি উপলব্ধি করলাম, আমার ভিতরে আত্মতুষ্টি জেগে উঠেছে। তাই অন্তরের রোগ চিকিৎসার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করলাম যে, সবাইকে একত্রিত করে এমন একটি কথা বলব, যা ওমরের আত্মতুষ্টি ও আত্মগৌরবকে ধূলির সাথে মিশেয়ে দেবে।

সুবহানাল্লাহ! তারা অন্তরের অভিলাষকে এভাবেই অবদমিত করতেন। নফস ও প্রবৃত্তির অজগর যখনই মাথা ছাড়া দিয়ে উঠত, সঙ্গে-সঙ্গে তার মুণ্ডুপাত করা হতো। অন্তরের অবস্থার সামান্যতম অবনতি হলেই দ্রুত তার চিকিৎসা করিয়ে নিতেন। বোঝা গেল, তারা সব সময় নিজেদের নফসের খোঁজ রাখতেন।

আত্মতুষ্টি একটা মারাত্মক ব্যাধি

হাদীছে পাকে কিছু মুহলিকাত (বিধ্বংসী) স্বভাব এবং কিছু মুনজিয়াত (মুক্তিদানকারী) স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। মানুষকে ধ্বংসকারী স্বভাবসমূহের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্বভাব হলো 'উযব' তথা আত্মতুষ্টি। হাদীছের ভাষায়, وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه. মানুষের নিজের মধ্যে আত্মতুষ্টি সৃষ্টি করে নেওয়া তার ধ্বংসের পথকে সুগম করে দেয়। আজ খোঁজ নিয়ে দেখুন, আমরা প্রত্যেকেই এ রোগের রুগী। إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ দু-একজন হয়ত বাদ পড়বে। আত্মতুষ্টি ও অহংবোধকে তো আমরা ত্রুটিই মনে করি না। আমরা তো সবসময় আমিত্ব নিয়েই বিভোর থাকি।

সময়ের ব্যবধানে অবস্থার পরিবর্তন

একটা সময় ছিল, যখন মানুষ কোনো নেক আমল বা পুণ্যের কাজ করত, তখন এ বিষয়টি কাউকে জানাত না – গোপন রাখত। তারপর এল এমন সময়, যখন মানুষ আমলও করত এবং তা প্রচারও করত। আর আজ যে সময়টায় আমরা বেঁচে আছি, এখানে মানুষ আমল করে না; কিন্তু বলে বেড়ায়। হ্যাঁ; জনাব! আমার হজ করার ইচ্ছা আছে। জনাব! আমার গ্রন্থরচনা করার ইচ্ছা আছে, আমার একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা আছে ইত্যাদি।এখনও কল্পনা ও চিন্তাই করছে যে, এটা-ওটা করব, অথচ প্রচারের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। এসব কেন হয়? এজন্য হয়, যেন মানুষ আমার আলোচনা করে আর আমার অন্তর এতে ফুলতে থাকে। কী আশ্চর্য! আমরা নফ্স ও প্রবৃত্তির তোষামোদ করে যাচ্ছি আর নফস আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে ঠেলে দিচ্ছে।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর গুণাবলি

সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রাযি.) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে অনেক সুসংবাদ অর্জন করেছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাঁকে এমন মর্যাদা ও দূরদর্শিতা দান করেছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ প্রায় পাঁচবার তার মতের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। একথা তো বলা যাবে না যে, তাঁর চিন্তা ও রায়ের ওপর আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তবে একথা বলা যাবে যে, কয়েকবার আসমানী ওহীর সঙ্গে তার রায় মিলে গিয়েছিল।

তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে নবীজি ইরশাদ করেন–

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ.

'আমার পর যদি কেউ নবী হতো, তবে সে হতো ওমর।'

আরেকবার বলেন–

اَلْحَقُّ يَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرٌ.

'সত্য ওমরের ভাষায় কথা বলে।'

আরও বলেন, ওমর যে পথ ধরে চলে, শয়তান সে পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর বিনম্র দু'আ

যে মহান ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত এতগুলো ফযীলত শোনালাম, তিনি তাহাজ্জুদের সময় স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে কী পরিমাণ আকুতি-মিনতি করে মনের ভাব প্রকাশ করতেন, তা কি জানেন? তিনি দয়াময় আল্লাহর দরবারে হাত তুলে যে দু'আগুলো করেছেন, তা আমার-আপনার জন্য আজ হেদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসেবে সংরক্ষিত আছে। তিনি আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের দরবারে দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنَيَّ صَغِيْرًا وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا.

'হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিতে আমাকে ছোট ও ক্ষুদ্র করে দেন। কিন্তু সৃষ্টিজীবের অন্যান্য মাখলুকের চোখে বড় বানিয়ে দিন।'

এ কারণেই যে ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে মানী-গুণী ও বড় হয়, তার জন্য দাওয়াত ও ইরশাদের পথ সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষই যদি কাউকে নগণ্য-তুচ্ছ মনে করে, তাহলে দীনি উপকারিতা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। এজন্যই তিনি দু'আ করলেন, যেন নফস ও অন্তর আত্মগৌরবে ফুলে না যায়। আর এ-ই তো তাসাউফ।

আমাদের অবস্থার একটি ঝলক

আমাদের অবস্থা হলো, আমরা নিজেদের দৃষ্টিতে এক একজন শাহেনশাহ হয়ে আছি। বলি, আমরা যা ইচ্ছে তা-ই করব, বাধা দেওয়ার কে আছে? আরে ভাই! শরীয়ত, ঈমান, ইসলাম কি নেই? সূফী সাহেব! ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে

বাগ্বিতণ্ডা হলে বলে, আমি এই করব, ওই করব। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি হয়ে গেলে বলে, হুঁ, তাকে আমি দেখিয়ে ছাড়ব, এমন করব, ওমন করব। ভাই! যতক্ষণ আমার এ জাতীয় অহংকারসূচক বাক্য আমার মধ্য থেকে দূর না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রকৃত মুসলমান হতে পারব না এবং তাসাউফের হাকীকতও অর্জিত হবে না।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর বিনয়ের আরেকটি ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত ওমর (রাযি.)কে এত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন তারপরও তিনি নিজের ব্যাপারে কতটা সচেতন ছিলেন! একবার হযরত হুযাইফাকে (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, হুযাইফা! আমার একথা জানা আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের নামগুলো তোমার কাছে বলে গেছেন। আমি তোমাকে তাদের নামগুলো প্রকাশ করতে বলব না; তবে এতটুকু জিজ্ঞাসা করব যে, বলো, মুনাফিকদের সেই নামের তালিকায় ওমর ইবনে খাত্তাবের নাম নেই তো?

আল্লাহ! আল্লাহ! কি বিনয়ী ছিলেন তারা! আজ আমরা হলে বলতাম, আরে আমি তো নবীজির কাঙ্ক্ষিত পুরুষ। আমার জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আও করেছেন। আমাদের শানে কত ফযীলত বর্ণনা করেছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। একবার চিন্তা করে দেখুন, যাঁকে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হয়েছে, তিনি তাঁর রবের সম্মুখে কতটা ঝুঁকে যাচ্ছেন। নিজের ঈমানের ব্যাপারে কতটা সচেতন যে, একজন অধীন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করছেন, মুনাফিকদের তালিকায় আমার নাম নেই তো?

আমরাও কি নিজেদের ঈমানকে এভাবে কখনও যাচাই করে দেখেছি? না বরং আমাদের ঘাড় তো সোজা হয়ে থাকে, দৃষ্টি থাকে উপরের দিকে। অন্যের দোষক্রটিগুলো আমাদের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে; কিন্তু নিজেদের দোষক্রটি চোখে পড়ে না। হায়! যদি এই চোখগুলো বন্ধ থাকত, ঘাড় নিম্নমুখী হতো এবং দৃষ্টি নিজের প্রতি হতো যে, দেখি, আমার মধ্যে কী-কী দোষক্রটি লুকিয়ে আছে, তাহলে কতই-না ভালো হতো। কিন্তু এমন সদিচ্ছার যে বড় অভাব!

হযরত আলী (রাযি.)-এর বিনয়

একবার একব্যক্তি এসে হযরত আলী (রাযি.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তাবেঈ ছিলেন। মদীনায় নতুন এসেছেন। তিনি হযরত আলী (রাযি.)কে চিনতেন না। সালামান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে?

হযরত আলী (রাযি.) উত্তর দিলেন–

مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

'আমি একজন মুসলমানমাত্র।'

বন্ধুরা! তিনি একথা বলেননি যে, আমি নবীজির জামাতা, জান্নাতী রমণীদের সর্দারনী হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর স্বামী, জান্নাতী যুবকদের নেতা হযরত হাসান-হুসাইন (রাযি.)-এর পিতা। আমি ইল্‌মের দরজা, আমাকে আল্লাহর সিংহ বলা হয়, আমার হাতেই আল্লাহ তা'আলা খায়বার বিজয় করিয়েছেন। নিজের প্রবৃত্তিকে দলিত মথিত করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি একজন সাধারণ মুসলমান'। যদি তাদের অবস্থা এই হয়, তাহলে আপনি, আমি কোন ক্ষেতের গাজর-মুলা যে, কিভাবে নিজেকে সত্য-মিথ্যা বিশেষণে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলব?

আযাযিল কিভাবে শয়তান হলো?

শয়তানও এমনই আত্মগরিমায় ফেটে পড়ে বিতাড়িত হয়েছিল। আপনি লক্ষ করুন, শয়তান যে বিতাড়িত হয়েছিল, তা কি কোনো পাপের জন্য? সে কি মদ পান করেছিল যে, নেশাগ্রস্ত হয়ে বিতাড়িত হয়েছে? না। তার মধ্যে কিসের নেশা ছিল? শুধু অহংকারের নেশা। সে আত্মগরিমার মদ্যপ ছিল। তাকাব্বুর ও অহংকারের নেশায় সে বলেছিল, أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ. 'আমি আদম থেকে উৎকৃষ্ট।' সে আমিত্বের শরাব পান করেছিল। এজন্য তাকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। ছিল সে 'তাউসুল মালাইকা' (ফেরেশতাদের সর্দার) আর হলো আল্লাহর দুশমন – বিতাড়িত শয়তান। আল্লাহ বলেন–

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ.

'যাও, বেরিয়ে যাও আমার জান্নাত থেকে, তুমি অভিশপ্ত ও বিতাড়িত।'[১]

আজ আমরা পাপ করে তার দায় অনায়াসেই শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেই যে, শয়তানের ফাঁদে পড়ে পাপ হয়ে গেছে। একথা মেনে নিলেও বলুন, যখন স্বয়ং শয়তান পাপ করেছিল, তখন কোন শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়েছিল? তখন তো কোনো শয়তানই ছিল না। আযাযিল তো তারই নাম ছিল! তাহলে এবার চিন্তা করে দেখুন, আযাযিলকে শয়তান কে বানাল? এর উত্তর কী? উত্তর হলো, তাকে তার অহংকারী নফ্‌স শয়তান বানিয়েছে।

---

১. সূরা সোয়াদ : ৭৭

নফ্স যখন অহংকার ও আত্মগরিমার কারণে বিকৃত হয়ে যায়, তখন সে ফেরেশতাদের সর্দারকেও অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত করে দেয়।

আমাদের প্রকৃত শত্রু

এজন্য বলছি, আমাদের নফ্স তথা প্রবৃত্তিকে শয়তানের চেয়েও বেশি ভয় করা দরকার। কারণ, করুণাময় আল্লাহ্ শয়তান সম্পর্কে বলেছেন–

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا.

'শয়তানের ফাঁদ-প্রতারণা দুর্বল।'[১]

কিন্তু একজন মানুষের প্রলোভন প্রসঙ্গে যখন আলোচনা আসে, (ইউসুফ ও যুলাইখার ঘটনায়) তখন আল্লাহ্ নফ্সের ধোঁকা সম্পর্কে বলেন–

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ.

হে নারীরা! তোমাদের ফাঁদ-প্রতারণা বড়ই ভয়ানক।'[২]

যেখানে মানুষের নফ্সের ধোঁকার প্রসঙ্গ এল, সেখানে কুরআনে কারীম عَظِيم (অর্থ বিশাল) শব্দটি ব্যবহার করেছে। আর যেখানে শয়তানের ধোঁকার প্রসঙ্গ এল, সেখানে ضَعِيف (অর্থ দুর্বল) শব্দটি ব্যবহার করা হলো। এতেই বোঝা গেল, শয়তান ততক্ষণ পর্যন্ত সফলকাম হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নফ্স তথা প্রবৃত্তি তার সঙ্গ না দেয়। আমাদেরকে তো আমাদের নফ্সই ধ্বংস করে দিল। আমাদের প্রকৃত দুশমন তো আমাদেরই নফ্স। একারণেই মাশায়েখগণ নফ্সের ওপর মেহনত-মুজাহাদা করান।

এক আরেফ বিল্লাহ্ বলেন–

نہنگ واژدہا وشیر نر مارا تو کیا مارا * بڑے موذی کو مارا نفس اِمارہ کو گر مارا.

'বাঘ, সিংহ ও অজগর মারায় খুশি হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃত খুশির বিষয় হলো 'নফস'কে মারতে পারা।'

নফ্সকে হত্যা করার অর্থ

নফ্সকে হত্যা করার অর্থ হলো মানুষের অন্তর থেকে শরীয়ত পরিপন্থী কামনা-বাসনাগুলো অবদমিত হয়ে যাওয়া, 'আমিত্ব'কে মুছে ফেলা। একেই

১. সূরা নিসা : ৭৬
২. সূরা ইবরাহীম : ২৮

বলে, সে নফ্সের গলায় শরীয়ত ও সুন্নতের লাগাল পরিয়েছে। সে নফ্সকে কাবু করে ফেলেছে। সে নফ্সকে পরাজিত করেছে।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমরা সামান্য নফ্সকে তো পরাজিত করতে পারিনি; অথচ বিশ্বজয়ের বুলি আওড়াই। কেউ-কেউ তো প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছেন, জি জনাব! আমরা সারা পৃথিবী জয় করে নেব। আরে ভাই! প্রথমে নিজের নফ্সকে জয় করে নাও, তারপর সারা পৃথিবীর কথা ভেবো।

'অধম' 'ফকীর' শব্দের ব্যবহার

আমাদের শায়েখগণ 'আমি' শব্দটাকে এতই অপছন্দ করতেন যে, সাধারণ কথা-বার্তায়ও এ শব্দটি ব্যবহার করতেন না। এর পরিবর্তে 'ফকীর' 'অধম' এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতেন। ভাই! আমরা তো আসলেই অধম। 'অধম' শব্দটি আমার কাছে খুব ভালো লাগে। 'ফকীর' শব্দটিও ভালো লাগে। 'ফকীর' তো এজন্য ভালো লাগে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে বলেছেন–

أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ.

'ধনী একমাত্র আল্লাহ্ই; তোমরা তো ফকীর।'

তাই ফকীর বলতেও আমার কাছে ভালো লাগে। এই স্বভাবটি আমাদের সবার মধ্যে এসে গেলে মন্দ কী।

عاجز (অধম) শব্দের উৎস

আমাদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে عاجز (অধম) শব্দটি ব্যবহার করা উচিৎ। কারণ, হাদীছে এসেছে–

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

'সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যে নিজের নফ্সকে (প্রবৃত্তি) অবদমিত করল এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করল।'

তারপর বর্ণিত হচ্ছে–

اَلْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ هَوَاهُ.

'আর অধম (অক্ষম) ওই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।'

যদি হাদীছের শব্দগুলো সামনে রাখি, তাহলে عاجز তথা 'অধম' শব্দটি আমাদের ক্ষেত্রে শতভাগ প্রযোজ্য একটি শব্দ। মাশায়েখগণ নিজেদের

জন্য عاجز এজন্য ব্যবহার করতেন না যে, তাদের মধ্যে عاجزي (বিনয়) ছিল এবং তারা নিজের عاجزي কে প্রকাশ করেছেন। বরং এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত শব্দ হওয়ার কারণে ব্যবহার করতেন। তারা নিজেদেরকে খাহেশাত ও প্রবৃত্তির দাস মনে করতেন। এজন্য তারা عاجز শব্দটা ব্যবহার করতেন। এটা ছিল তাদের নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার সর্বোত্তম নমুনা।

আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতরাজি

বন্ধুরা আমার! আমরা একটু নিজেদের ব্যক্তিত্বের দিকে তাকাই। ব্যক্তিত্ব বলতে কি-ইবা আছে! সবই তো আল্লাহর। আমরা তো প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। এত নেয়ামত তিনি আমাদের দান করেছেন যে, গণনা করে শেষ করা যাবে না। তিনিই বলেন–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا.

'যদি তোমরা আমার নেয়ামতরাজি গণনা কর, তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।'[১]

তিনি যদি আমাদের সুস্থতা না দিতেন, তাহলে আমরা অসুস্থ থাকতাম। যদি বুদ্ধি-বিবেক না দিতেন, তাহলে পাগল হতাম। সম্পদ যদি না দিতেন, তাহলে দরিদ্র হতাম। সম্মান যদি না দিতেন, অপদস্ত হতাম। তিনি যদি আমাদের সন্তানাদি না দিতেন, তাহলে আমরা নিঃসন্তান থাকতাম। আজ আমরা যা কিছু দেখছি, সবই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ফল।

আল্লাহ সাত্তার (পাপ গোপনকারী)

আল্লাহ তা'আলার ধৈর্য ও সহনশীলতার ওপর জান কুরবান হোক। তিনি আমাদেরকে এখনও ধ্বংস করেননি। তিনি ধৈর্য ধরে আছেন। সত্য কথা হলো, আমরা আল্লাহ তা'আলার সাত্তার তথা পাপ গোপনকারী বিশেষণ ও গুণের কল্যাণে বেঁচে আছি। যদি তিনি আমাদের পাপগুলো গোপন করে না রাখতেন, তাহলে সমাজে মুখ দেখানো কষ্ট হয়ে যেত। যদি পাপের মধ্যে দুর্গন্ধ থাকত, তাহলে হয়ত আমাদের কাছে কেউ বসতেও চাইত না। যা হচ্ছে তা পুরোটা আল্লাহর 'সাত্তার' গুণেরই বদৌলতে। তাঁর অনুগ্রহেই আজ আমরা সম্মানের সাথে বেঁচে আছি।

---

১. সূরা ইবরাহীম : ৩৪

নফ্সের মুহাসাবা (হিসাব গ্রহণ)

আমি আগেও বলেছি, তাসাউফ নিজেকে বিলীন করা ও মিটিয়ে দেওয়ার অপর নাম। জিজ্ঞাসা করতে চাইলে নিজেকেই জিজ্ঞাস করুন, আমি তাসাউফে কী অর্জন করেছি। এই মাপকাঠি দিয়ে নিজেকে নিজেই যাচাই করে নিন যে, আমি নিজেকে কতটুকু উৎসর্গ করেছি?

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর বাণী

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) তার রচিত 'মাকতুবাতে' লেখেন, একজন সালেক (সাধক) ততক্ষণ পর্যন্ত সফলকাম হতে পারে না, যতক্ষণ-না সে নিজেকে নিকৃষ্ট কুকুরের চেয়েও অপদস্ত মনে না করবে। আর বাস্তবতাও এই যে, কুকুর তার মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, অথচ আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার অতটা কৃতজ্ঞতা আদায় করি না।

হযরত বালহে শাহ (রহ.)-এর কথা

হযরত বালহে শাহ বলেন,

راتیں جاگیں تے شیخ سڈاویں راتیں جاگن کُتے تیں توائے.

رکھا سکھا ٹکڑا کھاکے دنیں جار کھاں وچ ستے تیں توں اتے

কুকুর যদি মালিকের দরজায় ঘুমায়, তবুও সে মালিকের কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আর আমরা পালঙ্কের উপর নরম বিছানায় ঘুমাই; তারপরও যদি সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করা লাগে, আমরা অভিযোগ-অনুযোগ শুরু করে দেই।

হযরত শায়খ সা'দী (রহ.)-এর বাণী

বন্ধুরা! যার চোখে তার ব্যক্তিগত সৌন্দর্য ও গুণ ধরা পড়ে, সে ধ্বংস হয়ে গেছে বলা যায়। নিজের গুণ নিজে দেখতে নেই। এতে মনে অহংকার সৃষ্টি হয়। বরং যখন নিজের দিকে দৃষ্টি পড়বে, তখন দোষ-ক্রটিগুলো দেখবে। যখন স্বীয় রবের ওপর দৃষ্টি পড়বে, তখন তাঁর সৌন্দর্য ও গুণাবলী দেখবে। এমনিভাবে যখন অন্যের ওপর দৃষ্টি পড়বে, তখন তার ভালো গুণগুলো দেখবে। কিন্তু নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়লে নিজের দোষ-ক্রটিগুলোই দেখতে হবে।

হযরত শায়খ সা'দী (রহ.) বলেন,

مرا پیر دانائے مرشد شہاب * دو انداز فرمود بر روئے آب.

یکے آں کہ بر خویش خود بیں مباش * دگر آں کہ بر غیر بد بیں مباش.

'আমার দূরদর্শী মুরশিদ শিহাব আমাকে দুটি নসীহত করেছেন। একটি হলো, নিজের প্রতি সুধারণা রোখো না, অপরটি অন্যের প্রতি কুধারণা রেখো না।'

আমার পীর ও মুরশীদ শায়খ শিহাবুদ্দীন দুটি বাক্যে কবিতার পুরো সারাংশ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

১. তোমরা নিজেদের গুণাগুণ দেখো না।

২. অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করো না।

আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, এ দুটি দোষই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা নিজেদের গুণ দেখতে ও অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করতে পছন্দ করি।

এক বিস্ময়কর ব্যখ্যা

আমাদের পূর্বসূরীদের অবস্থা এমন ছিল যে, যদি অন্যের কোনো ত্রুটি চোখে ধরা পড়ত, তখন তার এমন ব্যাখ্যা করে নিতেন, যেন তার ব্যাপারে সুধারণা বাকি থাকে। তারপরও নিজের গুণগুলোকে ত্রুটি বলেই মেনে নিতেন।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহ.)-এর এক মুরীদ কোনো কারণে নফ্সের ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিল। এক নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একব্যক্তি কোনোভাবে বিষয়টি জেনে গেল। এই লোকটি আবার উক্ত মুরীদকে সহ্য করতে পারত না। সে ভাবল, চমৎকার সুযোগ! আমি গিয়ে হযরতজিকে বিষয়টি অবহিত করি। তারপর আর মুরীদগিরি থাকবে না। সে হযরতজির কাছে এসে বলল, হযরত! আপনার অমুক মুরীদ তো ব্যভিচারী। সে তো অনেক বড়-বড় অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। এ বিষয়ে অমুক-অমুক ব্যক্তি প্রত্যক্ষদর্শী।

লোকটি যখন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, তখন হযরত বললেন, 'আচ্ছা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে? আমার ধারণা, ওই সময় আল্লাহ তা'আলার مُضِلّ (পথভ্রষ্টকারী) নামের গুণের তাজাল্লি তাঁর ওপর পতিত হয়েছিল। কারণ,

হেদায়াতের দিশাও তিনিই দেন আবার পথভ্রষ্টও তিনিই করেন। আপনি তাঁর জন্য দু'আ করুন।'

এই উত্তর শুনে লোকটি হতবাক হয়ে গেল, এ কী? এসেছিলাম সুধারণা নষ্ট করার জন্য; এখন দেখছি সব অন্য ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। এখন তো আমিও আতঙ্কে আছি। আল্লাহ না করুন, যদি আমিও এমন পরিস্থিতির স্বীকার হই, তাহলে আমার অবস্থা তো তার চেয়েও খারাপ হবে!

আবদালের মর্যাদা কিভাবে অর্জিত হলো?

হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহ.) কিভাবে আবদালের (আল্লাহকর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ নৈকট্য) মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন? উত্তরটা তাঁর মুখেই শুনুন! তিনি বলেন, একবার আমাদের শহরে দীর্ঘ দিন যাবত বৃষ্টি বন্ধ ছিল। শহরের মানুষের মধ্যে বলাবলি হচ্ছিল, সম্ভবত শহরে এমন কোনো পাপী রয়েছে, যার পাপের কারণে রহমতের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে আছে। তিনি বললেন, লোকেরা এখনও বলাবলি করছিল। এরই মধ্যে আমি নিজের অন্তরকে বললাম, বায়জিদ! এই শহরে আর তোমার থাকার অধিকার নেই। তুমিই সেই পাপী, যার কারণে আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি বন্ধ রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে শহরের সবচেয়ে পাপী ও নিকৃষ্ট মনে করে শহর থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমার আল্লাহ আমার এই বিনয়কে কবুল করে আমাকে আবদালের মর্যাদা দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

দেখলেন তো? আমরা হলে বলতাম, আমি ছাড়া সবাই পাপী! সত্য কথা হলো, যে নিজেকে তুচ্ছ মনে করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদাবান বানিয়ে দেন।

জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে গেল

হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহ.)-এর যুগে একব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে কেউ স্বপ্নযোগে তার সাক্ষাৎ পেল। সে প্রশ্ন করল, খবর কী? কবরে কেমন আচরণ হলো তোমার সঙ্গে? মৃত বলল, করুণাময় আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে প্রশ্ন করল, সব নেক আমল কবুল হয়েছে? উত্তর দিল, না; একটি ছোট্ট আমল কবুল হয়েছে। প্রশ্ন করল, তাহলে বলো, কী ছিল সেই আমল? উত্তর দিল, একবার হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে চিনতাম না। কেউ একজন বলে উঠল, দেখো; আল্লাহর এক অলী যাচ্ছেন। আমি তাকে আল্লাহর ওলী মনে করেই খুব ভক্তি নিয়ে দেখেছিলাম। ব্যস, এতটুকু আমল আল্লাহ তা'আলা খুব পছন্দ

করলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি আমার এক প্রিয় বান্দাকে আমার প্রিয় বলে ভক্তিভরা দৃষ্টিতে দেখেছিলে। যাও সেই দৃষ্টির বিনিময়ে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ! যখন তিনি নিজেকে নগণ্য মনে করতে লাগলেন, তখন আল্লাহ তাকে এমন মর্যাদা দান করলেন যে, তার চেহারার দিকে ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে তাকানোর কারণে একজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

শায়খে কামেলের পরিচয়

নিকট অতীতের কয়েকজন আকাবিরে দীনের কয়েকটি ঘটনাও আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি। কারণ, এ শিরোনামটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এরজন্য আকর্ষণীয় বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। এটি সবাই নিজ-নিজ স্থানে বহুবার শুনেছেন। শুনে-শুনে কান ভারী করে ফেলেছেন। এখন এমন কথার প্রয়োজন যেগুলো আমাদের অন্তরকে জাগিয়ে তুলবে।

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق * جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے.

آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست * زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے.

'তোমার যুগের হকপন্থী ইমাম তিনিই, যিনি তোমাকে বর্তমান থেকে বিমুখ করে দিবে। আয়নায় তোমাকে চোরাবালি দেখিয়ে ফুলের পাপড়ি জীবনটা তোমার জন্য আরো কঠিন করে দেবে।'

শায়খের কাজ কী? আয়নায় চেহারা দেখিয়ে দেওয়া। হাদীছে এসেছে–

اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ.

এক মুমিন অপর মুমিনের আয়নাস্বরূপ।'

অর্থাৎ শায়খ তার ভিতরের চেহারা দেখিয়ে দেন যে, তোমার আসল রূপ হলো এই। কারো যদি আয়নার প্রতি ক্ষোভ হয় যে, সে আমার চেহারার ময়লা-আবর্জনাগুলো কেন দেখাল, এটা কি ঠিক হবে? না; এটা আয়নার অপরাধ নয়। বরং আয়নার কাজই হলো, যা বাস্তব তা দেখিয়ে দেওয়া। অপরাধ তো তার, যে চেহারায় ময়লা-আবর্জনা মেখে চলা-ফেরা করে।

খাজা ফজল আলী কুরাইশী (রহ.)-এর মর্যাদা

এই কথাগুলো অন্তরের কানে শোনার চেষ্টা করুন। হযরত খাজা ফজল আলী কুরাইশী (রহ.)একবার এক মাহফিলে তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

বয়ানের শুরুতেই বললেন, 'ফকির ভাইয়েরা!' সবাই তার দিকে মনোযোগী হলো। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, 'ফকির ভাইয়েরা!' তারপর চুপ হয়ে গেলেন। চিন্তা করছেন। কথা শুরু করেননি। কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে বললেন, 'একবার আমার পেটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস জমে গিয়েছিল এবং তা বেরও হচ্ছিল না। পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হলো। চোখে-মুখে শরষে ফুল দেখতে লাগলাম। উপস্থিত শ্রোতারা হতবাক হয়ে কাণ্ড দেখছিল। এ কী কাণ্ড? একজন পীর সাহেব সবাইকে একত্রিত করে এসব কী শোনাচ্ছেন? পেটে গ্যাস জমছে, বের হচ্ছে না, চোখে-মুখে শরষে ফুল দেখছি এসব কি জনসম্মুখে বলার মতো কথা? পীর সাহেব বলে যাচ্ছেন, আমার অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে, মরেই বুঝি যাব! কিছুক্ষণ পর আমার গ্যাস বের হয়ে গেল আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রশান্তি দান করলেন।

মজলিস নির্বাক হয়ে শুনছে।

তারপর তিনি বললেন, ফকির ভাইয়েরা! যে মানুষটার পেটে এত দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস জমে, যা বের করতে না পারলে চরম সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেই মানুষের মুখে কি কখনও বড় কথা সাজে?

সবাই উত্তর দিল, না, হযরত! সাজে না।

তিনি বললেন, তাহলে শোনো। আমি তোমাদের একটি গোপন কথা বলছি। এবার তিনি সেই কথাটি বললেন, যা তিনি প্রথমে বলতে চেয়েছিলেন। বললেন, আজ রাত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে স্বপ্নযোগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি বললেন, 'ফজল আলী কুরাইশী! তুমি সুন্নাতের অনুসারী এমন একটি জামাত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছ যে, এমন লোকের দ্বিতীয় কোনো মানুষ এই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।'

সুবহানাল্লাহ! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কী অসাধারণ একটি সুসংবাদ! কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনার পূর্বে তিনি গ্যাস হওয়া ইত্যাদির কথা বলে পরিবেশটাই পাল্টে দিলেন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। এমন মর্যাদা অর্জনের আলোচনার কারণে যেন অন্তরে আত্মতুষ্টি বা অহংকার জেগে না ওঠে।

আমাদের শায়েখগণ এভাবেই তাদের নফ্স ও প্রবৃত্তির চাহিদাকে দলিত-মথিত করেছেন। আর এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাদের এমন নৈকট্য দান করেছেন যে, স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

স্বপ্নযোগে বলেছেন, 'ফজল আলী কুরাইশী! সুন্নাতের অনুসারী যে জামাত তুমি তৈরি করেছ এমন জামাত এই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।' অথচ আলোচনা শুরু করেছেন গ্যাস হওয়া এসব বিষয় দিয়ে, যেন নিজের অন্তরকে আত্মতুষ্টি ও অহংকার থেকে মুক্ত রাখতে পারেন।

প্রকৃত মর্যাদা ভুল স্বীকার করার মাঝেই নিহিত

বন্ধুরা! আমাদের উচিৎ নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করার মাঝে কোনো প্রকার লজ্জাবোধ না করা। কারণ, নিজের ভুল স্বীকার না করা শয়তানের কাজ আর ভুল স্বীকার করে নেওয়া হযরত আদম (আ.)-এর সুন্নাত। এবার আমাদের সম্মুখে দুটি পথ খোলা রয়েছে। কখনও যদি ঘরে একটু-আধটু ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তো নাক উঁচু করে রাখার কিছুই নেই। বিষয়টাকে স্বাবাভিকভাবেই নিতে হবে। কখনও স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য হয়ে গেলে স্বামী চান, আমি ওয়ান পজিশনে থাকি আবার স্ত্রী চায়, আমি ওয়ান পজিশনে থাকি। দুজনই জিততে চায়। বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়ে গেলে সেখানেও প্রত্যেকেই চায়, আমি বিজয়ী অবস্থানে থাকি। না; এমনটা ঠিক নয়। বরং হক ও ইনসাফকে সামনে রাখতে হবে। কখনও যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়, তাহলে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ, নিজের ভুল স্বীকার করার মাঝেই প্রকৃত মর্যাদা নিহিত থাকে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জালান্ধরী (রহ.) একবার হাদীছের দরস দিচ্ছিলেন। দরসের মাঝখানে একটি প্রশ্ন এল, যার উত্তর তাঁর জানা ছিল না। আমাদের কেউ আজ এমন পরিস্থিতির স্বীকার হলে খালি মাঠে গোল করে চলে যেত। বুঝতেই দিত না, এখানে একটি বুঝবার বিষয় আছে। ছাত্রদের তো খবরই থাকে না। তাদেরকে যা পড়ানো হয়, তা-ই পড়ে। এটি হলো ওস্তাদের কাজ। বললে বললেন, না বললে না। কিন্তু সেসব বুযুর্গানে দীন বড়ই আমানতদার ও বিশ্বস্ত ছিলেন। এটা ইল্‌মী খেয়ানত বলে বিবেচিত হবে যদি পাঠদানকালে ওস্তাদের মনে কোনো ধরনের ইল্‌মী প্রশ্ন জাগে আর তিনি তার উত্তর না দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন; ছাত্রদের কিছুই বললেন না। ওইসব বুযুর্গানে দীন থেকে এমন খেয়ানতও হতো না।

যাহোক হযরত জালান্ধরী (রহ.) ছাত্রদের প্রকাশ্যে বললেন, এখানে এই প্রশ্ন জাগছে; কিন্তু এর উত্তর আমার বুঝে আসছে না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত

তিনিও নীরব ছিলেন, ছাত্ররাও নীরব ছিল। কখনও পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছেন, আবার কিছুক্ষণ কিতাবের হাশিয়া (টীকা) দেখছেন। কিন্তু এর কোনো উত্তর তৈরি করতে পারছিলেন না। অবশেষে বললেন, আচ্ছা! প্রশ্নটার উত্তর আমার নিজের বুঝে আসছে না; আমি অমুক মাওলানার কাছ থেকে জেনে আসি। এই মাওলানা সাহেব হযরতের কাছ থেকেই দাওরা হাদীছ পড়েছেন। তাঁর ছাত্র ছিলেন। হযরত নিজের ছাত্রদের সামনেই সেই মাওলানার নাম উচ্চারণ করলেন। যখন তিনি উঠতে লাগলেন, এরই মাঝে এক ছাত্র দৌড়ে গিয়ে সেই মাওলানা সাহেবকে বললেন, হযরত জালান্ধরী সাহেব আপনার কাছে এই উদ্দেশ্যে আসছেন।

মাওলানা সাহেব নিজের কিতাব বন্ধ করে সাথে-সাথে হযরতের কাছে ছুটে এলেন। এসে বললেন, হযরত আমাকে স্মরণ করেছেন? হযরত বললেন, হ্যাঁ, এই প্রশ্নটার উত্তর আমার বুঝে আসছে না। দেখুন তো, এর উত্তর কী হবে? মাওলানা সেটি পড়লেন এবং বুঝতে পারলেন। কিন্তু কথা এভাবে বললেন যে, হযরত! যখন আমি আপনার নিকট পড়েছিলাম, তখন এ স্থানটি পড়ানোর সময় আপনি এই প্রশ্ন উপস্থাপন করেছিলেন এবং তার উত্তর এভাবে দিয়েছিলেন। তারপর উত্তর বুঝিয়ে দিলেন।

এখন দেখুন! মাওলানা সাহেব বিষয়টির কৃতিত্ব নিজের দিকে না ফিরিয়ে ওস্তাদের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন না, হ্যাঁ ভাই! আমার এত ইল্‌ম যে, ওস্তাদও আমার কাছে কিতাব বুঝতে আসেন! না, না, তা করেননি। কারণ, তাঁরা সাহচর্যপ্রাপ্ত ছিলেন, তরবিয়তপ্রাপ্ত ছিলেন। একেই বলে তাসাউফ। এর নামই আত্মদমন।

মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.)-এর বাই'আতের ঘটনা

জামেয়া আশরাফিয়া লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান অমৃতসারী (রহ.) হযরত থানবী (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফাদের একজন ছিলেন। তিনি যখন দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেন, তখন সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করলে। একপর্যায়ে তার হাদীছের কিতাবও পড়ানোর সৌভাগ্য হলো। এবার বুঝুন, যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের হাদীছের ওস্তাদ হয়ে যান, তাঁর ইল্‌মী মর্যাদা কী পরিমাণ হয়? তাঁর অন্তরে খুব ইচ্ছা ছিল, আমি হযরত থানবী (রহ.)-এর হাতে বায়'আত হব। এ ব্যাপারে কয়েকবার চিঠিও পাঠিয়েছেন। হযরত থানবী (রহ.) সব সময় উত্তর দিতেন, 'মুফতী সাহেব! বাই'আতের মূল লক্ষ তো ভক্তি-

ভালোবাসা; আর সেটা তো আপনার মধ্যে আছেই। সুতরাং বায়'আত হওয়া আবশ্যক নয় এবং বিষয়টি এড়িয়ে যেতেন। মুফতী সাহেব পুনরায় চিঠি পাঠাতেন আর থানবী (রহ.) এড়িয়ে যেতেন। এভাবে অনুরোধ আর পাশ কাটানো চলতে লাগল। মুফতী সাহেব বললেন, একবার আমি থানাভন গিয়ে উঠলাম। আমার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল, হযরতের নিকট বায়'আত না হয়ে ফিরব না। আমি তো তার গোলাম হতে চাচ্ছি। আমি চাই কিয়ামতের দিন হযরতের খাদেম ও শিষ্যদের নামের তালিকায় আমার নামও চলে আসুক। এসব ভেবে আমি হযরতের কাছে গিয়ে বললাম, হযরত! আমাকে বায়'আত করে নিন। হযরত সেই পুরাতন উত্তর দিলেন যে, 'মুফতী সাহেব! বায়'আত তো জরুরী নয়।' তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হযরত! আজ বায়'আত হয়েই ঘরে ফিরব।

হযরত থানবী (রহ.) যখন দেখলেন, মুফতী সাহেব নিজ সিদ্ধান্তে অনড়, তখন বললেন, মুফতী সাহেব বায়'আত হতে হলে তিনটি শর্ত আছে। এগুলো আপনাকে মানতে হবে। আজ যদি কাউকে বলা হয়, বায়'আত হতে হলে এই-এই শর্ত পূরণ করতে হবে, তখন মুরীদ বলবে, আরে এ তো দেখছি অনেক বড় অহংকারী পীর। বায়'আতই করছে না। আমি তো ঘর ছেড়ে তার হাতে বায়'আত হওয়ার জন্য এসেছি। আর পীর সাহেব আমাকে বায়'আত করছেন না। এ কথা মাথায় আসে না যে, আমাদের তিনি পরিশুদ্ধ করবেন, আত্মার ব্যাধিগুলোর চিকিৎসা করবেন! না ভাই! আজ-কাল তো পীর সাহেবদের কাছে আসেই না। আর যদি এসেও যায়, তাহলে প্রথমে নিজের হালত জানায়। তারপর তার উত্তর দেওয়ার পরামর্শ দেয়। অর্থাৎ এভাবে বলে যে, হযরত! আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি আমাকে পরামর্শ দিন। আজ-কালের মুরীদদের অবস্থা হলো এই!

যাহোক, এটা তো অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা এসে গেল। হযরত থানবী (রহ.) বললেন, মুফতী সাহেব! আপনাকে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে।

তিনি বললেন, আমি প্রস্তুত।

হযরত থানবী (রহ.) : প্রথম শর্ত হলো, আপনি পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলেন। সাধারণত পাঞ্জাবীদের আরবী হরফের মাখরাজ বিকৃত হয়ে যায়। সুতরাং কোনো ভালো কারী সাহেবের নিকট তাজবীদসহ কিরাত শিখুন, যেন মাসনূন কেরাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াতে পারেন।

মুফতী সাহেব : হযরত! আমি প্রস্তুত।

থানবী (রহ.) : দ্বিতীয় শর্ত হলো, আপনি অমুক কিতাবটি একজন গাইরে মুকাল্লিদ (লা-মাযহাবী) আলেমের নিকট পড়েছেন। আর গাইরে মুকাল্লিদদের জীবাণু সহজে মস্তিষ্ক থেকে বের হয় না। এখন আপনি সেই কিতাবটি দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্রদের সঙ্গে বসে পুনরায় দরস নেবেন।

শর্তগুলো লক্ষ করুন। কী কঠিন শর্ত! এভাবেও তো বলতে পারতেন যে, আপনি নির্জনে কোনো ওস্তাদের নিকট পড়ে নেবেন। কিন্তু না; যে দারুল উলূমে আপনি হাদীছের দরস দেন, সেই দরসগাহেই ছাত্রদের সঙ্গে বসে সেভাবে ওস্তাদের কাছে পড়বেন যেভাবে ছাত্ররা পড়ে, যে সঠিক আকীদার ওস্তাদের নিকট পড়ার কারণে গাইরে মুকাল্লিদীর বিষাক্ত জীবাণু দূর হয়ে যায়।

মুফতী সাহেব : হযরত! আমি প্রস্তুত।

থানবী (রহ.) : তৃতীয় শর্ত হলো, আমাকে অনুমতি দিন, আমি পর্দার আড়ালে আপনার স্ত্রীকে কসম দিয়ে আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করব।

মুফতী সাহেব : হযরত! এতেও আমি প্রস্তুত।

এসব আলোচনা শেষ করে মুফতী সাহেব বললেন, হযরত তো আমার জন্য তিনটি শর্ত দিয়েছিলেন। যদি তিনি চতুর্থ শর্ত হিসেবে একথা বলতেন যে, তুমি প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাইতুল খালায় (টয়লেটে) বসে থাকবে, তাহলে তাতেও আমি রাজি হয়ে যেতাম। কারণ, আমি আমার ভিতরের দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি হতে চাচ্ছিলাম।

তারপর যখন তিনি সকল শর্ত পূরণ করলেন, তখন তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। হযরতের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সুযোগ্য খলীফাদের মধ্যে গণ্য হলেন। আল্লাহু আকবার!

মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.)-এর বিনয়

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা মাওলানা উবাইদুল্লাহ সাহেব একবার এই অধমের কাছে তাঁর পিতার গল্প করতে গিয়ে বললেন, ‘একবার তিনি ঘরে শুয়ে ছিলেন। গরমের মৌসুম ছিল। ঘামে দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা ছিল। আম্মাজান উঠে নিজের চারপাই (এক ধরনের খাট, যার শোওয়ার জায়গাটা সুতা দিয়ে বোনা থাকে আর চার কোনে চারটা কাঠ বা লোহার পায়া থাকে) উঠানে এনে রাখলেন। আব্বাজানের যেহেতু

পায়ে সমস্যা ছিল – হাঁটতে পারতেন না, তাই আম্মাজান আমাকে জাগালেন। আমি তাদের বড় সন্তান এবং যুবক ছেলে ছিলাম। আম্মাজান আমাকে জাগিয়ে বললেন, বেটা, ওঠো; তোমার আব্বাকে একটু বারান্দায় নিয়ে যেতে হবে। তুমি তাকে কোলে তুলে নিয়ো আর আমি তার চারপাইটা বারান্দায় রেখে বিছানা করে দেব। আমি যখন আব্বাকে কোলে তুলে বারান্দায় পাতা বিছানায় রাখলাম, তখন তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। আমাকে বললেন, 'বেটা! আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আমার কারণে তোমার আরামে ব্যাঘাত ঘটেছে। আমার আরামের জন্য তোমার কষ্ট করতে হলো। সুবহানাল্লাহ! এই ছিল বিনয়।

মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর বিনয়

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর কথা আলোচনা ছাড়া মাহফিলে কোনো মজাই পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইল্‌ম ও আমলে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছেন। সেকালে শাহজাহানপুরে (ইণ্ডিয়া) বৎসরে একবার সকল ধর্মের লোক একত্রিত হতো এবং নিজ-নিজ ধর্মের তাবলীগ করত। যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হতো। মুসলমান ওলামায়ে কেরাম চিন্তিত ছিলেন যে, কাকে আনা যায়। যখন হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর নাম এল, সবাই নিশ্চিন্ত হলেন, হযরত তাশরীফ আনুন এবং দীনে ইসলামের সত্যতা ও হক্কানিয়্যাতের ওপর সারগর্ভ আলোচনা করুন। তারা হযরতের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। হযরত বললেন, ঠিক আছে; আমি বিতর্কের একদিন আগে ট্রেনে চড়ে সেখানে পৌছে যাব। আয়োজক ওলামায়ে কেরাম আশ্বস্ত হলেন, হযরত তাশরীফ আনবেন।

যেদিন হযরতের তাশরীফ আনার কথা, আয়োজক ওলামায়ে কেরাম তাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য ট্রেন স্টেশনে পৌছে গেলেন। হযরতের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতার কথা প্রসিদ্ধ আছে। হাদীছেও আছে–

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّه يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ.

'মুমিন বান্দার দূরদর্শিতাকে সমীহ করো। কারণ, সে আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে।'

হযরত স্বীয় আধ্যাত্মিক দূরদর্শতার দ্বারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, আমার আসার সময়টা যেহেতু তাদের জানা আছে, হয়ত তারা আমাকে সংবর্ধনা দিতে স্টেশনে পৌছে যাবে। এমনিই তো নফ্‌সের অবস্থা ভালো

নয়; তার উপর আরও খারাপ করার আয়োজন! না; কিছু একটা করতে হবে। এই ভেবে তিনি নির্দিষ্ট স্টেশনের এক স্টেশন আগেই ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। বাকি পথ পায়ে হেঁটে সফর শুরু করলেন। প্রায় পাঁচ মাইল পথ।

এ দিকে ট্রেন পৌঁছে গেছে দেখে সবাই হযরতকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য জড়ো হয়ে গেল। কিন্তু এ কী! হযরত তো ট্রেনে নেই! তাহলে কি তিনি তাশরিফ আনেননি। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। একজন বড় আলেম বললেন, আশেপাশের হোটেল ও মুসাফিরখানাগুলো তালাশ করো; হয়ত কোনো একটায় পূর্বেই এসে আরাম করছেন। তারা হোটেল ও মুসাফিরখানায় খবর নিয়ে দেখল, কাসেম নামের কেউ সেখানে নেই। শুধু একটা হোটেলে খুরশিদ হাসান নামের এক ব্যক্তির জন্য একটা রুম বুকিং দেওয়া আছে।

এদিকে হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) যে স্টেশনে নেমেছিলেন, সেখান থেকে তিনি পরবর্তী শহরের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওনা করলেন। পথে একটা খাল পড়ল। এটা পার হতে গিয়ে তাঁর পাজামা ভিজে গেল। সঙ্গে কোনো খাদেমও নেই। নেই কোনো সফরসঙ্গী। হযরত স্বীয় চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে পাজামা খুলে ফেললেন। হাতে ছিল লাঠি। এদিকে সফরও করতে হবে আবার পায়জামা শুকানোর অপেক্ষাও করা যাবে না। তাই লাঠিটা কাঁধে রেখে লাঠির মাথায় পাজামাটা ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। ইসলামের একজন প্রভাবশালী আলেমে দীন ও মুনাযির এ কেমন দেওয়ানার মতো ছুটে চলছেন! ওদিকে লোকজন সংবর্ধনার জন্য জড়ো হয়ে আছে আর এদিকে আল্লাহর এক দেওয়ানা ফকীরের মতো গন্তব্যপানে ছুটে চলছেন। শহরে পৌঁছে তিনি খুরশিদ হাসান নামে (ছদ্ম নাম) এক হোটেলে একটা রুম বুকিং দিলেন। ভাবলেন, আজ এখানেই আরাম করি; কাল বিতর্ক মাহফিলের পূর্বেই যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছব।

অপর দিকে লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন দেখল, হযরত কোথাও নেই, তখন খুরশিদ হাসান নামের রুমটার প্রতি নজর পড়ল। কৌতূহল নিয়ে এসে হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই! এই কামরায় কে? ম্যানাজার উত্তর দিল, একজন মাওলানা সাহেব। দুর্বল ও শীর্ণকায়। তাদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো। তিনি যদিও بَسْطَةً فِي الْجِسْمِ (বিশাল বপুধারী) ছিলেন না, কিন্তু بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ (অফুরন্ত ইল্‌মের অধিকারী) অবশ্যই ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইল্‌মের অনেক উঁচু

মাকাম দান করেছিলেন। তারা সবাই সন্দেহ দূর করতে রুমে ঢুকে দেখলেন, হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)সেখানে আরাম করছেন। সবাই চরম বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল, হযরত! আপনি এখানে আর আমরা আপনার সংবর্ধনার জন্য সবাই গিয়ে স্টেশনে জড়ো হয়েছি! হযরত বললেন, হ্যাঁ, আমিও এ কারণেই এখানে এসে বসে আছি। উত্তর শুনে সবাই আরও বিস্মিত হলো, হযরত! আপনি এ কী বলছেন?

তারপর হযরত তাদেরকে বিনয় ও নম্রতার অমূল্য উপদেশ দান করলেন এবং অত্যন্ত আক্ষেপ করে নিজের ব্যাপারে বললেন, হায়, দুটা শব্দ পড়েছি বলে আজ দুনিয়ার মানুষ চিনছে, জানছে। অন্যথায় কাসেম নিজেকে এমনভাবে বিলীন করে দিত যে, দুনিয়ার কেউ তার নাম পর্যন্ত জনত না।

বন্ধুরা! নিজেকে বিলীন করার, নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার এমন জযবা যখন মানুষের মধ্যে তৈরি হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে উপরে উঠানোর দায়িত্ব নেন। আজ ইল্‌মের দীনের নাম যতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে, কাসেম নানুতবীর নামও সেখানে পৌঁছে যাবে। সুবহানাল্লাহ!

খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.)-এর বিনয়

আমি জনাব মাস্টার নাযিম সাহেবকে মজলিসে দেখছি। তাকে দেখে আমার একটি কথা মনে পড়ে গেল। কথাটি তিনিই আমাকে শুনিয়েছেন। আমি তো শ্রোতা; তিনি এর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। কথাটি যেহেতু আজকের আলোচ্যসংশ্লিষ্ট; তাই আপনাদেরও শুনিয়ে দিচ্ছি।

একবার জনাব মাস্টার সাহেব হযরত খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.)-এর মাহফিলে অশংগ্রহণের উদ্দেশ্যে খানেওয়ালে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরতের এক মুরীদ সাক্ষাৎ করতে এল। এই মুরীদের বাড়ি এমন একটা গ্রামে ছিল, যেখানে হযরত সিদ্দীকী (রহ.)-এর এক পীর ভাই বাস করতেন। তিনিও খেলাফতপ্রাপ্ত বড় মাপের শায়খ ছিলেন। তিনিও সেই এলাকার শায়খ ও আলেম ছিলেন। আমি এই মুহূর্তে তার নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। যখন ওই মুরীদ হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মাহফিলে এল, হযরত সিদ্দীকী (রহ.)তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! আসার সময় অমুক শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ? সে উত্তর দিল, জি; সাক্ষাৎ করেই এসেছি।

আমি তখনকার কথা বলছি, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত সিদ্দীকী (রহ.)কে দুনিয়ার ভাণ্ডার উজার করে দিয়েছিলেন। দুনিয়া তার কদমে চুমু আঁকত। হযরত তাকে বললেন, আচ্ছা! তুমি দেখা করতে গেলে তিনি আমার

জন্য কিছু বলেছেন কি? মুরীদ ইতস্তত করতে-করতে বলল, জি; সালামও বলেছেন। তার বলার ভঙ্গিতে হযরত বুঝে নিলেন, সে কিছু একটা গোপন করছে। পীর তো পীরই হন। আমাদের হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) একবার করাচি তাশরীফ এনেছিলেন। এক ব্যক্তি এল। কেউ একজন বলে উঠল, হযরত! এ লোক অমুক উদ্দেশ্যে এসেছে। শায়খ খুব রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি অভিশাপ করি সেই পীরের প্রতি, যার নিকট মুরীদ আসবে আর তার জানা থাকবে না, কেন এসেছে? আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ফেরাসাতের নূর দান করে থাকেন।

যখন হযরত সিদ্দীকী (রহ.) বুঝে গেলেন, সে কোনো কথা গোপন করছে, তখন বললেন, বলো; আর কী বলেছেন? মুরীদ তো নীরব। হযরত বিষয়টি নিয়ে খুব পীড়াপীড়ি করলেন। বললেন, যা কিছু শুনেছ, যেভাবে শুনেছ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব বলো। অবশেষে সে মুখ খুলল, হযরত! যখন আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, সিদ্দীকী সাহেবের কাছে যাচ্ছি, তখন তিনি আমাকে বললেন, হযরতকে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো আর বোলো, দুনিয়া ও আখেরাত দুজন সহোদরা। উভয়ে একজনের বিবাহে থাকতে পারে না।

কথা শেষ করে মুরীদ বলল, হযরত! আমি তার কথার কোনো অর্থই বুঝতে পারিনি; তাই কথাগুলো আপনার কাছে পৌঁছানো উচিৎ মনে করিনি।

হযরত সিদ্দীকী (রহ.) একথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। আমাদের মতো কেউ হলে সেই কথার জবাব দশ কথা দিয়ে দিতাম। কিন্তু সেখানে তো বিনয়ের ব্যাপার ছিল। হযরত সিদ্দীকী (রহ.) দীর্ঘক্ষণ মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে মাথা তুলে একটা শীতল নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! এখনও দুনিয়ায় এমন মানুষ আছেন, যারা আমাদের ইসলাহ করেন। সুবহানাল্লাহ! আর আমাদের আস্থা হলো এই যে, কেউ যদি আমাদেরকে ইসলাহী কোনো কথা বলে দিল, তো বাপ রে বাপ! তাওবা-তাওবা! কথা তো নয়, যেন গুলি ছোড়া হলো। আমরা সহ্য করতে রাজী নই। আমরা এর বিরোধিতার সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করে বসি।

মাওলানা আব্দুল গাফূর মাদানী (রহ.)-এর বিনয়ের ঘটনা

হযরত খাজা ফজল আলী কুরাইশী (রহ.)-এর খানকায়ে মিসকীনপুর শরীফে দূর-দূরান্ত থেকে সালেকরা এসে অবস্থান করত এবং তাযকিয়ায়ে নফ্স ও আত্মার পরিশুদ্ধির মেহনত ও মুজাহাদা করত। সাধারণত এসব

সালেকগণ যখন ফজরের সময় প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য লোকালয় থেকে দূরে কোনো নির্জন স্থানে যেত, তখন ফেরার সময় কিছু শুকনা লাকড়ি, খড়-কুটাও কুড়িয়ে নিয়ে আসত। স্থানীয় লোকেরা এ নিয়ে আশ্চর্যও হতো, আবার ঠাট্টাও করত। বিষয়টি কোনোভাবে হযরত কুরাইশী (রহ.)-এর কানে পৌঁছে গেল। তিনি মাওলানা আব্দুল গাফূর মাদানীকে (রহ.) ডেকে বললেন, মাওলানা! আপনি লাকড়ির এত বড় বোঝা আর মাথায় তুলবেন না। অল্প-স্বল্প লাকড়ি হাতে করে নিয়ে আসবেন, যেন পুণ্যের কাজে অশংগ্রহণ হয়ে যায়। হযরত আব্দুল গাফূর মাদানী (রহ.)বললেন, হযরত! আমার তো এতে কোনো কষ্টই অনুভব হয় না। খুব সহজেই নিয়ে আসি। হযরত কুরাইশী (রহ.) বললেন, মাওলানা! এখানকার স্থানীয় লোকগুলো মূর্খ। এরা আপনার মূল্য বোঝে না। আপনার শানে আজে-বাজে কথা বলে। মাওলানা মাদানী জিজ্ঞাস করলেন, তারা কী বলে? কুরাইশী (রহ.)বললেন, যখন আপনি লাকড়ির বিশাল বোঝাটা মাথায় তুলে হেঁটে আসেন, তখন এরা আপনার দিকে ইঙ্গিত করে বলে, দেখো! কুরাইশী খোরাসান থেকে গাধা এনেছে।

হযরত মাওলানা আব্দুল গাফূর মাদানী (রহ.) তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, হযরত এই লোকগুলো বাস্তবেই আমাকে চিনতে পেরেছে। সেজন্যই এমন সত্য কথা বলতে পেরেছে। সুবহানাল্লাহ! বিনয়ের কী যে অবস্থা ছিল!

মাওলানা সাঈদ আহমদ গোহানবী (রহ.)-এর বিনয়

হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ গোহানবী (রহ.) হযরত আহমদ সাঈদ কুরাইশীর খলীফাদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমাদের এখানেও তাশরীফ এনেছিলেন। হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ ইয়াসিন সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের শায়খ ছিলেন। এই অধমও কয়েকবার তাঁর জুতা তোলার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। বয়স তখন কম ছিল। তারপরও সাক্ষাৎ নসিব হলো। একবার তিনি বাঙ্গ তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর মাহফিলে গিয়ে বসি। তো তিনি একটি বিষয় আলোচনা করেছিলেন। বললেন, ওহে ফকীর ভাইয়েরা! তোমরা অনেক ভালো। ও ফকীর ভাইয়েরা! তোমরা অনেক ভালো! তোমরা অনেক ভালো। এ কথাটি সকল খলীফা অন্তরের কান দিয়ে শুনুন। ওলামায়ে কেরামও অন্তরের কানে শুনুন। আসাতিযায়ে কেরামও মনের কানে শুনুন। বললেন, ফকীর ভাইয়েরা! তোমরা অনেক ভালো মানুষ। দীনের ভালোবাসায় এখানে এসেছ। আমাকে ভালো মনে করে আল্লাহওয়ালা মনে করেই এখানে এসেছ। ফকীর ভাইয়েরা! তোমরা অনেক ভালো। আমি

তো বলি, তোমরা জান্নাতী। আমি তো বলি তোমরা জান্নাতী। বারবার জান্নাতের আলোচনা করলেন।

কেউ-কেউ ভাবতে লাগল, আরে এ কী? জান্নাতের টিকিট দেখি এখানেই বন্টন করা হচ্ছে। আমাদের মতো কোনো বদগুমান অসহনশীল লোক হলে তো মজলিস ছেড়ে উঠে পড়তাম। এ আবার কেমন শায়খ যে, দুনিয়াতে বসে-বসে জান্নাতের টিকিট বিতরণ করছেন! আরে না ভাই! কখনও-কখনও মাশায়েখগণ এমনভাবে কথা বলেন, যার বাস্তবতা অনুধাবনে তাড়াহুড়া করতে নেই। যখন বারবারই তিনি বললেন, তোমরা জান্নাতী, তোমরা জান্নাতী। শেষ পর্যন্ত তিনি এতটুকু পর্যন্ত বলে ফেললেন যে, আমি লিখিত দিতে প্রস্তুত আছি যে, তোমরা জান্নাতী।

এসব বলার পর অবশেষে তিনি বললেন, হ্যাঁ, বাকি থাকল তোমাদের পীরের ব্যাপার। তো শোনো! সে আছে চরম অন্ধকারে। কেয়ামতের দিন তো আমাকে হাতে-পায়ে শিকল লাগিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একথা প্রমাণ করতে না পারব যে, আমি আমানতের হক আদায় করেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার শিকলগুলো খোলা হবে না।

আল্লাহু আকবার! বন্ধুরা আমার! একেই বলে বিনয়।

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.

'আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞেস করব, যাদের কাছে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছে এবং আমি অবশ্যই রাসূলদেরও জিজ্ঞেস করব।'[১]

আল্লাহ আমাদেরকে আত্মদমন ও বিনয়ের গুণে গুণান্বিত করুন। আমাদের আমিত্বকে মিটিয়ে দিন।

আমীন। ছুম্মা আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

১. সূরা আরাফ : ৬

দুনিয়ার পরিচয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَر فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আবাস। চিরস্থায়ী আবাস হলো আখেরাত। দুনিয়া প্রতারণার জায়গা আর আখেরাত প্রশান্তির জায়গা। দুনিয়া আমলের স্থান, আখেরাত বিনিময়ের স্থান। কয়েকদিনের দুনিয়া একটা পরীক্ষার হল। হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)প্রায়ই বলতেন, এ দুনিয়া ভ্রমণের জায়গা নয়, তামাশার স্থান নয়, বিলাসিতার জায়গা নয়; বরং এটা পরীক্ষার স্থান। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের কেউ-কেউ একে পর্যটনকেন্দ্র বানিয়ে ফেলেছে! দুনিয়া ইট-বালির তৈরী; এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপরও মানুষ একে ভালোবাসে। আর আখেরাত সোনা-রুপার তৈরী; কোনোদিন ধ্বংস হবে না। কিন্তু তারপরও মানুষ সেদিকে ঝোঁকে না।

প্রকৃত সূফী-সাধকের পরিচয়

যদি কারও মধ্যে আখেরাতের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, প্রতারণার এই ঘর থেকে মন উঠে যায় এবং আখেরাতের দিকে মন ঝুঁকে যায়, চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সারাক্ষণ আখেরাতের প্রস্তুতির চিন্তা ঘুর-পাক করে, তখন বুঝতে হবে, সে ধীরে-ধীরে সূফী-সাধকে পরিণত হচ্ছে। কারণ, মানুষের মধ্যে এমন ভাব ও ভাবনা সৃষ্টি করা-ই হচ্ছে তাসাউফের মূল লক্ষ্য। ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) প্রায়ই বলতেন,

তাসাউফ অস্থিরতার অপর নাম। যখন অস্থিরতা থাকবে না, তখন তাসাউফ বিদায় নেবে। সূফী সেই ব্যক্তিকে বলে, যে আল্লাহর ভালোবাসায় অস্থির থাকে, আল্লাহর দিদারের জন্য অধীর হয়ে থাকে। এ কারণেই ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا.

'যে ঈমানদার ব্যক্তি আখেরাত চায় এবং তার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তাহলে এই লোকদের চেষ্টা-সাধনাকে আল্লাহ কৃতকার্য করেন।'[১]

অর্থাৎ– দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং অন্তরে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া একজন প্রকৃত সূফীর পরিচয়।

তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকারের মূল উদ্দেশ্য

দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তর থেকে কিভাবে বের হবে? আখেরাতের প্রতি আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি হবে? আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের অপরিসীম ভালোবাসা অন্তরে কিভাবে তৈরি করবে? এসবই হলো তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই বেশি পরিমাণে যিকির-আযকারের ওযীফা শিখানো হয়। 'মুরাকাবা' ও বিভিন্ন যিকিরের ওযীফা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা এবং দুনিয়ার মহব্বত বের করে দেওয়া।

পাপ থেকে আত্মরক্ষার দুটি পন্থা

দুটি জিনিসই এমন আছে, যা মানুষকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। প্রথমটি হলো, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে দিদার করার সীমাহীন আগ্রহ মানুষের মধ্যে জেগে ওঠা। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে আমলনামা নিয়ে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়। এই সাক্ষাতের আগ্রহ কিংবা হিসাব-নিকাশের ভয়-এ দুটি বিষয় ব্যতীত পাপ থেকে বেঁচে থাকা বড়ই দুষ্কর।

দুনিয়ার মহব্বতই সব অনিষ্টের মূল

দেখুন, অন্তর একটি পাত্রের মতো। এতে দুটি বিপরীত জিনিসের মধ্যে যেকোনো একটি থাকতে পারে – উভয়টি এক সাথে থাকতে পারে না।

---

১. সূরা বানী ইসরাইল : ১৯

হয়তো সেখানে আল্লাহ থাকবে, তাঁর মহব্বত থাকবে অথবা থাকবে দুনিয়া ও তার মহব্বত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ.

'দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের মূল।'

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ.

'হায় যদি কারূনের সমপরিমাণ সম্পদ আমাদের থাকত!'

কারূনের যুগের লোকেরা এ কথাই বলেছিল। আরও বলেছিল–

إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.

'নিশ্চয়ই সে বড়ই ভাগ্যবান!'

কিন্তু কারূনের পরিণতি কে না জানে? একটি বিষয় বড়ই আশ্চর্য লাগে যে, আমরা আজ-কাল সব ধরনের বড়-বড় পাপ থেকে তাওবা করি; কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত যে একটা বড় পাপ তা থেকে তওবা করি না। আপনি কি কখনও কাউকে দেখেছেন যে, সে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলছে, হে আল্লাহ! আমার অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা বের করে দিন এবং আমার এই পাপ ক্ষমা করে দিন? আলেম হোক জাহেল হোক, সাধারণ লোক কিংবা বিশেষ ব্যক্তিত্ব হোক, সব পাপ থেকে তারা তওবা করলেও এই পাপ থেকে কখনও কেউ তওবা করে না। কারণ, একে পাপই মনে করে না। অথচ এটা সকল বড়-বড় পাপের মধ্যে একটা পাপ।

আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দী হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) তাহাজ্জুদের সময় উঠে দুটি দু'আ বিশেষভাবে করতেন। একটি হলো, 'হে আল্লাহ! রাত হয়েছে, তারারা জ্বলজ্বল করছে, দুনিয়ার বাদশারা নিজ-নিজ দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আপনার দরজা এখনও খোলা। আমি আপনার সম্মুখে আঁচল পেতেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। দ্বিতীয় দু'আ হলো, হে ওই সত্তা, যিনি বিশাল আকাশকে শূন্যে আটকে রেখেছেন, মাটিতে পড়তে দেননি, আপনি দুনিয়ার মহব্বতকেও আটকে রাখুন, যেন আমার অন্তরে প্রবেশ করতে না পারে।

দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অর্থ

যদি কখনও বলা হয়, দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে রেখো না, তো এর অর্থ কখনওই এটা নয় যে, মানুষ লোকালয় ছেড়ে কোনো নির্জন গুহায় গিয়ে

বসবাস করবে। সমাজ ও সামাজিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। দুনিয়াবিমুখতার এই অর্থ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সমাজ ও সামাজিকতার সাথে থেকেই জীবন যাপন করবে। তবে অন্তর সর্বদা আল্লাহর স্মরণে তরতাজা রাখবে।

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) একটি বিস্ময়কর কথা বলতেন। 'যে পথটি আল্লাহর দিকে গিয়েছে, তা কোনো বিরান ভূমি কিংবা গিরি-গুহা হয়ে যায়নি, বরং এসব লোকালয়ের অলি-গলি, হাট-বাজার হয়েই গিয়েছে। সুতরাং এই সমাজেই বসবাস করতে হবে এবং আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের হুকুম অনুযায়ী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর আলোকে জীবনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। তবেই আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের মারেফাত অর্জিত হবে।

অর্থাৎ– থাকতে হবে পানিতেই; তবে নিজের ডানাগুলো ভিজতে দেওয়া যাবে না। এক কবি বলেছিলেন, 'হে বন্ধু! তুমি পানকৌড়ি থেকে শিক্ষা নাও। পানকৌড়ি বিশাল জলরাশিতে ডোবাডুবি করে ঠিকই; কিন্তু নিজের ডানাগুলো ভিজতে দেয় না – সেগুলো শুকনাই থাকে; যখনই ইচ্ছা হবে ডানা মেলে আকাশে উড়াল দেবে। আর যেসব পানকৌড়ির ডানা ভিজে যায়, তারা ডানা মেলে বেশি দূর উড়তে পারে না; ফলে শিকারীরা এদের পিছনে ছুটতে থাকে। মুমিন বান্দাও ঠিক এমন। তারা দুনিয়াতে বসবাস করে, ঘর-সংসার করে; কিন্তু অন্তরকে এর ভালোবাসা ও মহব্বত থেকে মুক্ত রাখে।

দুনিয়ার প্রকৃত পরিচয়

স্মরণ রাখবেন, ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা এগুলোর নাম দুনিয়া নয়; বরং যেসব জিনিস মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন করে তোলে, তা-ই দুনিয়া।

چیست دنیا از خدا غافل بدن * نے قماش ونقرہ وفرزند وزن.

'ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তানের নাম দুনিয়া নয়। দুনিয়া তো সেই জিনিস, যা আল্লাহ থেকে বিমুখ করে দেয়।'

সুতরাং মানুষকে দুনিয়ার জীবনটা এমনভাবে যাপন করতে হবে, যেন অন্তর উদাসীনতা ও আল্লাহবিমুখতা হতে মুক্ত থাকে এবং সেখানে আল্লাহর ভালোবাসা জায়গা করে নেয়।

دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں * بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں.

'দুনিয়াতে আছি বটে; কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যাশী হইনি। বাজার হয়ে পথ চলেছি বটে; কিন্তু ক্রেতা হইনি।'

দুনিয়াও এক আশ্চর্যের জিনিস। তার হালালের জন্য হিসাব দিতে হবে আর হারামের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

দুনিয়ার পিছনে কারা ছোটে?

এক বর্ণনায় এসেছে–

اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَه، وَمَالُ مَنْ مَالَ لَه، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ.

'দুনিয়া ওই ব্যক্তির ঘর, যার কোনো ঘর নেই, ওই ব্যক্তির সম্পদ, যার কোনো সম্পদ নেই। আর দুনিয়ার জন্য জমা করে রাখে সে, যার কোনো বিবেক নেই। আসল জিনিস তো আখেরাত – পরকাল। এ কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ. وَطَالِبُهَا كِلَابٌ

'দুনিয়া একটি মৃত প্রাণী; যে এর পিছনে ছুটে বেড়ায় সে কুকুর।'

ہے لگا دنیا کا میلہ چار دن * دیکھ لو اسکا تماشہ چار دن.

کیا کروگے قصر عالی شان کو * جبکہ ہے اس میں ٹھکانہ چار دن.

'দুনিয়ার মেলা বসেছে চারদিনের জন্য। এর তামাশাও চারদিনই দেখে নাও। আলিশান প্রাসাদ দিয়ে কী করবে? এতে অবস্থান তো মাত্র চারদিনের!'

আত্মশুদ্ধির মজলিসের মূল লক্ষ্য

আমাদের আত্মশুদ্ধিমূলক এসব মজলিস ও সালেকীনদের ইজতিমার মূল উদ্দেশ্যই হলো, এই বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া। হযরত মুহাম্মাদ ওয়াসী (রহ.)-এর এক মুরীদ বলেন, যখন আমার অন্তরে কঠরতা আসত, তখন আমি হযরত ওয়াসী (রহ.)-এর চেহারা দেখে নিতাম। তাতে আমার অন্তরের কঠোরতা শিথিল হয়ে আসত। অর্থাৎ– অন্তরের মধ্যে যে মরিচা পড়ে, তার ঘষা-মাজা এ ধরনের মাহফিলেই হয়ে থাকে।

ঈমানের তরি কিভাবে ডোবে?

সম্পদ মানুষের ঈমানের জন্য ঢালস্বরূপ। যেমন- হাদীছে আছে-

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا.

'অভাব-অনটন কখনও কুফরি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।'

কিন্তু সম্পদের ভালোবাসা অন্তরে থাকা উচিৎ নয়। যেমন- একটা নৌকা যদি পানিতে থাকে, তাহলে তো ভাসতে পারবে। কিন্তু যদি পানি না থাকে, তাহলে তা কিসের ওপর ভাসবে? বালুর ওপর তো ভাসতে পারবে না। তো ভাসমান নৌকার মধ্যে যদি পানি ঢুকে যায়, তাহলে এই পানিই তা ধ্বংসের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তদ্রূপ জীবন-জীবিকার জন্যে সম্পদ হলে খুব ভালো; হাতে থাকুক কিংবা পকেটে; কিন্তু হাত বা পকেট পেরিয়ে তা যদি অন্তরে প্রবেশ করে ফেলে, তাহলে ওই সম্পদের লালসা-ই তার ঈমানের তরিকে ডুবিয়ে দেয়।

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর দুনিয়াবিমুখতা

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কিছু বান্দা এমনও অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের কাছে সম্পদ এলেও তারা খুশি হতেন না, আবার খোয়া গেলেও দুঃখ করতেন না। শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) সম্পর্কে কিতাবে একটি ঘটনা লেখা আছে। একবার ব্যবসায়িক পণ্যবাহী একটা জাহাজ বন্দরে পৌছল। হঠাৎ কেউ একজন এসে তাকে দুঃসংবাদ দিল, হযরত! শুনেছি, আপনার ব্যবসায়িক জাহাজটা নাকি ডুবে গেছে। হযরত বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! কিছুক্ষণ পর আবার তাকে সুসংবাদ শোনানো হলো, হযরত! আপনার জাহাজটা দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়ে বন্দরে পৌছেছে। উত্তরে হযরত এবারও বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এক কৌতূহলী মুরীদ হযরতকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! জাহাজ ডুবে যাওয়ার দুঃসংবাদ শুনেও বললেন, আলহামদুলিল্লাহ আবার দূর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়ার সংবাদ শুনেও বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। বিষয়টি বোধগম্য হচ্ছে না।

হযরত উত্তর দিলেন, যখন ডুবে যাওয়ার সংবাদ শুনলাম, অন্তরকে যাচাই করে দেখলাম, তাতে কোনো দুঃখের চিহ্ন নেই; তাই আলহামদুলিল্লাহ বললাম। আর দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়ার সংবাদ শুনে অন্তরকে যাচাই করে দেখলাম, তাতে আনন্দের কোনো চিহ্ন নেই; তাই আলহামদুলিল্লাহ বললাম।

সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষ বিবেচনা

এই ভাব ও অনুভব তো বড়-বড় কামেল বুযুর্গানে দীনের ছিল। সাধারণ মানুষের বিষয়টি ভিন্ন। এরা যতই নেককার পুণ্যবান হোক তাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষমাত্রা হলো, ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হোক আর খোয়া যাওয়াতে দুঃখ হোক সমস্যা নেই; কিন্তু সম্পদের মায়ার ওপর আল্লাহর ভালোবাসার প্রাধান্য থাকতে হবে। অর্থাৎ– যখন আল্লাহর ভালোবাসার সঙ্গে সম্পদের ভালোবাসার সংঘর্ষ হবে, তখন সম্পদের মোহ ও ভালোবাসাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিতে হবে।

হযরত থানবী (রহ.) লিখেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সম্পদকে ভালোবাসতে নিষেধ করেননি। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপরীতে সম্পদকে বেশি ভালোবাসতে নিষেধ করেছেন। মানে ভালোবাসো; তবে বেশি না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِه.

'হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তানাদি, ভাইয়েরা, স্ত্রীরা, পরিজন, তোমাদের গচ্ছিত সম্পদ ও তোমাদের ব্যবসা, যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের ভিটা-বাড়ি এগুলো যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে যায়।'[১]

তাহলে অবশ্যই সেগুলো ঈমানের জন্য চরম ক্ষতিকর।

দুনিয়ার মোহ থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখার উপায়

মানুষ যখন আল্লাহর যিকির করে, তখন অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা তৈরি হয় এবং দুনিয়ার মহব্বত বের হয়ে যায়। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর বার্তা যখন রানী বিলকিসের নিকট পৌঁছালো তখন তিনি নিজের মন্ত্রী, উজীর ও পারিষদবৃন্দকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। কেউ বলল, আপনি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করুন; আমরা আপনার পাশে থাকব। কিন্তু রানী বিলকিস বললেন–

إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً.

---

১. সূরা তাওবা : ২৪

'রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে আক্রমণ করে, তখন সেই জনপদকে তারা ধ্বংস করে দেয়। আর সেখানকার সম্মানী অধিবাসীদের অপদস্থ করে তাড়িয়ে দেয়।'[১]

এই আয়াতের তাফসীরে ওলামায়ে মুফাসসিরীন একটি উদাহরণ লিখেছেন। আয়াতে উল্লেখিত قَرْيَةً শব্দ দ্বারা যদি অন্তরের জনপদ আর مُلُوْك শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নাম ও তাঁর মহব্বত উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তখন উদাহরণটি এভাবে সাজবে–

যখন আল্লাহর নাম অন্তরের জনপদে ঢুকে পড়বে, সেখানে বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার মহব্বত নামক অধিবাসীদের অপদস্ত করে তাড়িয়ে দেবে। আল্লাহর বেশি-বেশি যিকিরের জন্য তাকিদ করা হয়। কারণ, এটি মানুষের অন্তরে দুনিয়াবিমুখতা সৃষ্টি করে। এজন্য আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا.

'আল্লাহর নামের যিকির বেশি-বেশি করো এবং তাঁর দিকে তাবাত্তুল অবলম্বন করো।'[২]

'তাবাত্তুল' হলো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে যাওয়া। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেশি-বেশি যিকির করা অপরিহার্য।

আমলী জীবনে দুনিয়াপ্রীতির প্রভাব

সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখতা যতক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমলী জীবনে কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। আমল হবে; কিন্তু এর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে না। যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা নেই, তার সামান্য আমলেই ব্যাপক ফলাফল বেরিয়ে আসে। আর যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা থাকে, তার আমল যদিও প্রচুর হয়; কিন্তু ফলাফল নিতান্তই সামান্য হয়।

সাহাবায়ে কেরামের সবচেয়ে বড় কারামত

যাদের জীবনে তাকওয়া-তাহারাত থাকে এবং মাশায়েখে ইযামের সান্নিধ্যে জীবন কাটায়, তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার রং এমনভাবে ফুটে

---

১. সূরা নামল : ৩৪

২. সূরা মুয্যাম্মিল : ৮

ওঠে যে, দুনিয়া আর তাদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। সাহাবায়ে কেরামকে দেখুন। তাদের জীবন কেমন দুনিয়াবিমুখতায় কেটেছে! কেউ-কেউ আছে; তারা সাপের মন্ত্র জানে। তারা সাপকে যদি মুষ্ঠিবদ্ধও করে, সাপ তাদের দংশন করে না। সাহাবায়ে কেরামও দুনিয়ার মন্ত্র জানতেন। তাই দুনিয়া তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এ কারণেই কায়সার ও কিসরার রাজসিংহাসন ও রাজমুকুট যখন তাদের কদমে লুটিয়ে পড়েছিল, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ লেগে গিয়েছিল, তখনও তাঁরা এসবের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। যেমন- হযরত আলী (রাযি.) মেহরাবে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন–

يَا صَفْرَاءُ، يَا بَيْضَاءُ، غُرِّ غَيْرِيْ.

'হে স্বর্ণ! হে রৌপ্য! আমাকে নয় – অন্যদের ধোঁকা দাও।'

আমি তোমার ফাঁদে পা দেব না।

অপর দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) এক দিনেই বারো হাজার দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছেন।

লোকেরা মনে করে, সাহাবায়ে কেরামের কারামাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারামত হলো, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর বাহিনীর ঘোড়াসহ নদী পার হয়ে যাওয়া। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, তাঁদের এর চেয়েও বড় কারামত হলো, যখন তাদের সামনে দুনিয়ার তাবৎ ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি লুটোপুটি খাচ্ছিল, সোনা-রুপার স্তূপ জমে গিয়েছিল, তখন তারা নিজের ঈমানী কিশতিতে ভেসে আবর্জনার জগদ্দল হতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধন-রত্ন তাঁদের পায়ে ধোঁকার শিকল পরাতে পারেনি।

দুনিয়া ও আখেরাত দুই সতীনের মতো

কোনো-কোনো মাশায়েখ বলেন, দুনিয়া ও আখেরাত পরস্পর সতীনের মতো সম্পর্ক রাখে। একজনকে সন্তুষ্ট করলে অন্যজন অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দুনিয়া-আখেরাত আপন দুই বোন যেমন এক সাথে এক পুরুষের বিবাহবন্ধনে থাকতে পারে না, একজনের বিবাহ হলে আপরজন হারাম হয়ে যায়, তদ্রূপ দুনিয়াকে যে প্রাধান্য দেবে, সে আখেরাত হারাবে। আখেরাতকে যে প্রাধান্য দেবে, সে দুনিয়া হারাবে কিংবা অতটা পাবে না, যতটা সে আকাঙ্ক্ষা করবে।

স্বর্ণ থেকে দুর্গন্ধ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) বলেন, স্বর্ণ যদি কিছুক্ষণ হাতে ধরে রাখ, তাহলে হাত থেকে দুর্গন্ধ আসবে।

বন্ধুরা! যদি স্বর্ণ স্পর্শ করার কারণে হাত থেকে দুর্গন্ধ আসতে পারে, তাহলে সেই স্বর্ণ যদি কারো অন্তরকে স্পর্শ করে, তাহলে সেই অন্তর থেকে কি দুর্গন্ধ আসবে না?

হযরত আলী (রাযি.)-এর অমূল্য নসীহত

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, হযরত আলী (রাযি.) একবার উপস্থিত শ্রোতাদের সম্বোধন করে বললেন–

اِرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْاٰخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بَنُوْنَ، فَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ.

'দুনিয়া প্রতিনিয়ত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আখেরাত প্রতিনিয়ত এগিয়ে আসছে। দুনিয়া আখেরাত উভয়ের অনেকগুলো সন্তান রয়েছে। তোমরা দুনিয়ার সন্তান হয়ো না, আখেরাতের সন্তান হও। কারণ, আজ আমলের সুযোগ আছে; হিসাব নেই। কিন্তু কাল শুধু হিসাব থাকবে; আমলের সুযোগ থাকবে না।

দুনিয়া হারুত-মারুতের চেয়েও বড় জাদুকর

বর্ণনায় এসেছে–

اَلدُّنْيَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ.

'দুনিয়া হারুত-মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের চেয়েও বড় জাদুকর।'

এর কারণ হলো–

كَانَ سِحْرُ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِه.

'হারুত-মারুতের জাদু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করত।'

আর দুনিয়া এমন জাদুকর, যে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে।

দুনিয়াদারদের মর্যাদা দেওয়ার ক্ষতি

দুনিয়াদারদের মর্যাদা দেওয়া অনেক বড় ফেতনা।

বলা হয়–

نِعْمَ الْأَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ وَبِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْأَمِيْرِ.

কোনো দুনিয়াদার যদি আল্লাহপ্রেমীদের দ্বারে আসে, তাহলে তা খুবই প্রশংসাযোগ্য কাজ এবং এতে সেই দুনিয়াদারও আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। পক্ষান্তরে যেসব লেবাসধারী আল্লাহপ্রেমী দুনিয়াদারদের দ্বারে-দ্বারে ঘোরে, তারা অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির সম্মুখে তার সম্পদের কারণে বিনয়াবনত হলো, তার দুই তৃতীয়াংশ দীন ধ্বংস হয়ে গেল।

সহমর্মিতা ও বিনয় দুটি ভিন্ন জিনিস

এখানে একটি কথা বুঝে নিন যে, সহমর্মিতা (إِكْرَام) ও বিনয় (تواضع) দুটি ভিন্ন জিনিস। সহমর্মিতা বাহ্যিক বিষয় আর বিনয় অভ্যন্তরীণ বিষয়। যদি কেউ দুনিয়াদারদের অন্তর থেকে ভালোবাসে এবং আন্তরিক সহমর্মিতা রাখে; কিন্তু প্রকাশ না করে, তাহলে তার উভয় জাহান বরবাদ হয়ে যাবে। এ কারণেই হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) স্বীয় মাকতুবাতে লিখেছেন, দুনিয়াদার লোকদের সংশ্রব থেকে এমনভাবে পলায়ন করো, যেভাবে দুষ্ট লোকদের থেকে পলায়ন করে থাক। এদের খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ থেকেও বিরত থাকো। কারণ, এদের সুস্বাদু লোকমা গ্রহণ করার দ্বারাও অন্তরের ব্যধি বৃদ্ধি পায়। তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা রেখো না। সম্ভব হলে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও বর্জন করো।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীদের সংযম

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) তার দুই সহপাঠীর সঙ্গে হাদীছের শিক্ষা লাভ করার জন্য কোথাও রওনা করলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা ভাবলেন, ওস্তাদজির ওখানে তো থাকার ব্যবস্থা নেই। তাই তারা নিকটবর্তী একটি মসজিদে গিয়ে অবস্থান করলেন। ওস্তাদজির নিকট প্রতিদিন যেতেন এবং সবক পড়ে আবার চলে আসতেন। তাদের নিকট খাদ্য-দ্রব্য যা ছিল, তা অল্প কদিনেই শেষ হয়ে গেল। শুরু হলো উপবাস। তিনজন মিলে পরামর্শ করলেন, আমাদের যেকোনো একজন উপার্জনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাব আর

অপর দুজন পড়তে যাবেন। পালাক্রমে এভাবেই চলতে থাকবে। যা কিছু উপার্জন করে আনা হবে, তা সবাই মিলে আহার করব।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুজন পড়তে চলে গেলেন। একজন উপার্জনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। ভাবলেন, কাজ যেহেতু করবই; তো সবচেয়ে বড় মহাজনের কাজ করি। এই বলে তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। একাগ্রচিত্তে দু-রাকাত নামায পড়লেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার কাছে খুব কেঁদে-কেঁদে দু'আ করলেন। তারপর কুরআন তেলাওয়াত করলেন। দু'আ করলেন। রুকু-সিজদায়ও খুব রোনাযারী করলেন। এভাবে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যায় মসজিদে ফিরে এলেন। উভয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ, ভাই, আজ কিছু উপার্জন হয়েছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, আমি সবচেয়ে বড় মহাজনের কাজ করেছি। তিনি পারিশ্রমিক পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেন। খুব শীঘ্রই তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দেবেন। সেই দিনটা সবার উপবাসেই কেটে গেল।

পরদিন অন্য একজনের পালা এল। দুজন হাদীছ পড়তে চলে গেলেন। অপরজন সেই একই কথা ভাবলেন যে, কাজ করলে সবচেয়ে বড় যিনি তাঁরই কাজ করব। একমাত্র আল্লাহই সেই সত্তা, যাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। তিনিও মসজিদে গিয়ে নামায-দু'আ ইত্যাদির মধ্যে সময় পার করে দিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এলেন। সাথীরা জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু ব্যবস্থা হলো কি? তিনি উত্তর দিলেন, এমন একজনের কাজ করেছি, যিনি স্বীয় গোলামদের খুব খেয়াল রাখেন। তিনি অবশ্যই আমাদের পারিশ্রমিক দান করবেন।

এভাবে দ্বিতীয় দিনও উপবাস করেই কেটে গেল। পরদিন তৃতীয়জনও একই কাজ করলেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে বললেন, এমন সত্তার কাজ করেছি, যিনি কাউকেই নিরাশ করেন না। যাহোক তিনটা দিনই উপবাসে কেটে গেল।

এদিকে এ যুগের যিনি বাদশা ছিলেন, তিনি রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসলেন। দেখলেন, শাহী মহলের ছাদ থেকে কেউ নিচে নেমে আসছে। তিনি খুব বিস্মিত হলেন। আতঙ্কিতও হলেন। এত রাতে আবার ছাদ থেকে নামার সাহস করল কে? গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, এটি বিস্ময়কর আকৃতির একটি বিপদ। হাত লম্বা করে বাদশার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বলল, সুফিয়ান সাওরী ও তার সঙ্গীদের খবর নাও; অন্যথায় তোমাকে শাস্তি দেওয়া

হবে। তারপর বিপদটি হাত সংকুচিত করে চলে গেল। বাদশা তো এই দৃশ্য দেখে ভয়ে-আতঙ্কে ঘেমে-নেয়ে একাকার। তিনি উঠেই হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন, এই! কে কোথায় আছ? সুফিয়ান সাওরী কে; তার খোঁজ নাও।

সুবহানাল্লাহ! আজ যদি তারা সাধারণ কারো কাছে সাহায্য চাইত, তাহলে, সামান্য কিছু পেয়ে গেলেও এমনভাবে রাজ্যময় আলোড়ন সৃষ্টি হতো না। যেহেতু তারা সর্বচেয়ে বড়জনের কাছে চেয়েছেন তাই তাঁর সকল মাখালুক তার আদেশ পালনে মরিয়া হয়ে উঠল।

বাদশা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, সুফিয়ান সাওরী ও তাদের সঙ্গীদের যে যেখানেই থাকুক সসম্মানে আমার কাছে নিয়ে আসো। কাজটা যে করতে পারবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে। সঙ্গে একথাও বলে দিলেন যে, যাওয়ার সময় কিছু স্বর্ণ-গয়না, মণি-মুক্তা ইত্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আসতে না চাইলে সেগুলো হাদিয়া দিয়ে আসবে।

মোটকথা, পুরো সালতানাতে একটা আওয়াজ সাবাইকে আলোড়িত করে তুলল, সুফিয়ান সাওরী কোথায়? সুফিয়ান সাওরী কোথায়? এমনকি একব্যক্তি খুঁজতে-খুঁজতে ওই মাদরাসায় গিয়ে উঠল, যেখানে সুফিয়ান সাওরী ও তাঁর সাথীরা পড়তেন। গিয়ে বলল, আমাদের বাদশার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে।

এবার সেই তিন সহপাঠী বললেন, যে মালিকের কাছে আমরা চেয়েছিলাম, তিনি দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন তাদের কাছে গিয়ে হাত পেতে কিছু গ্রহণ করতে আমাদের ঈমানী চেতনায় বাধে। আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে। তাই আমরা যাব না। তবে আমাদের মালিকের এই ক্ষমতাও আছে যে, তিনি আমাদের মধ্যে এমন ক্ষমতা তৈরী করে দেবেন, যদি সুবহানাল্লাহ-আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করি, তবে এতেই আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারিত হয়ে যাবে। অবশেষে তা-ই হলো। তারপর তারা সেখানে যতদিন ছিলেন, আল্লাহর যিকির করতেন আর আল্লাহ তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করে দিতেন।

সুবহানাল্লাহ! দেখুন, দুনিয়ার সম্পদ তো এসেছিল। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ, আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টিতে সোনা-গয়না, টাকা-পয়সা এগুলো আবর্জনার মতো। আর আমাদের দৃষ্টিতে এগুলো বাস্তবেই সম্পদ বলে মনে হয়। এজন্য এসব দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

হযরত মির্জা মাযহার জানেজানাঁ (রহ.)-এর সংযম

আমাদের নকশবন্দিয়া সিলসিলার একজন বড় মাপের শায়খ হযরত মির্জা মাযহার জানেজানাঁ (রহ.)কে একবার তৎকালীন গভর্নর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যে, হযরত! আপনার কাছে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে উপকৃত হচ্ছে; তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনার জন্য একটা বিশাল এলাকা বরাদ্দ দিয়ে দেব, যেন আপনার কার্যক্রম আরও নিরবচ্ছিন্ন ও গতিশীল হয়। দয়া করে এসে কথা বলুন।

হযরত উত্তর দিলেন, জনাব! আপনি আমাকে যা দিতে চাচ্ছেন, তা আপানার ভাষায় বিশাল হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো এই দুনিয়ার ব্যাপারে বলেছেন—

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ.

'হে নবী! বলে দিন, দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য।'[1]

আর সেই সামান্য থেকে ক্ষুদ্র একটি অংশ আপনি আমাকে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমার যে এত সামান্য জিনিস নিতে বড়ই লজ্জা লাগছে!

শায়খ আব্দুর কাদের জিলানী (রহ.)-এর সংযম

একবার শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর নামে সে কালের হাকেম একটি ফরমাননামা প্রেরণ করলেন। তাতে লেখা ছিল, হযরত! আপনি লোকদের আল্লাহ-আল্লাহ শিখাচ্ছেন এবং এ উদ্দেশ্যে মানুষও দূর-দূরান্ত থেকে আপনার কাছে আসছে। তাই আমি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আপনাকে নিমরোয এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করলাম। হযরত সেই ফরমাননামার উল্টো পিঠে এমন একটি উত্তর লিখলেন, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি লিখলেন, যখন থেকে 'নিমশব' (মধ্যরাত মানে তাহাজ্জুদ)-এর হুকুমত পেয়েছি, তখন থেকেই নিমরোযের (একটি প্রদেশের নাম) হুকুমত আমার দৃষ্টিতে মশার ডানার চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ!

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর ফাতাওয়া

হযরত ইমাম শাফেঈ (রহ.) ফাতাওয়া দিলেন, যদি কোনো ব্যক্তি এভাবে ওসিয়ত করে যে, আমার মৃত্যুর পর আমার সমস্ত সম্পত্তি ওই ব্যক্তিকে

---

১. সূরা নিসা : ৭৭

দেওয়া হোক, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। তাহলে আমি ফাতাওয়া দিচ্ছি, দুনিয়াবিমুখ সংযমী মানুষই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। সুতরাং তাকেই মৃত ব্যক্তির সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে। কারণ, দুনিয়াবিমুখ সংযমী লোকেরাই দুনিয়ার প্রকৃত রূপ দেখতে পায়, যার কারণে দুনিয়ার মহব্বত তাদের থেকে বিদায় নিয়ে থাকে।

এক ফকীরের দুনিয়াবিমুখতা

এক বাদশা কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন, এক ফকীর রাস্তার মাঝখানে শুয়ে আছে এবং বাদশার দিখে নিজের পা সোজা করে আছে। বাদশা খুব আশ্চর্য হলেন। যেখানে সারা পৃথিবীর সকল মানুষ আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়, আমার তোষামোদি করতে-করতে তাদের মুখে ফেনা চলে আসে, সেখানে কিনা রাস্তার সামান্য একটা ফকীর আমার দিকে পা দিয়ে শুয়ে আমাকে দেখছে! বাদশা একজনকে বললেন, যাও; ওই ফকীরটাকে কিছু পয়সা দিয়ে আসো! চাকর ফকীরকে পয়সা দেওয়ার জন্য সামনে এগুতেই ফকীর অত্যন্ত দীপ্ত কণ্ঠে বলল, বাদশা সালামত! যেদিন থেকে আপনার দিক থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছি, সেদিন থেকেই আমার এই পা আপনার দিকে করে নিয়েছি। আপনার পয়সার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। সুবহানাল্লাহ! এরা-ই হলেন প্রকৃত দুনিয়াবিমুখ আল্লাহপ্রেমী, যাঁদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকে না।

দুনিয়া একদিনের

এক বুযুর্গ বলতেন—

اَلدُّنْيَا يَوْمٌ وَلَنَا فِيْهَا صَوْمٌ.

দুনিয়া মূলত একটা দিনের মতো। সেই দিনটাতে আমরা রোযা রেখেছি। সুতরাং মুমিন বান্দারা এই দুনিয়ায় রোযাদারের মতো। এরা জীবনকে অনেক সীমারেখার গণ্ডিতে রেখেই কাটিয়ে দেয়। আয়েশ-আরামকে বিসর্জন দিয়ে আখেরাতের আমলে নিমগ্ন থাকে। মৃত্যু পর্যন্ত সুন্নাত ও শরীয়ত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে।

হযরত খাজা আহমাদ সাঈদ (রহ.)-এর দুনিয়াবিমুখতা

খাজা আহমাদ সাঈদ (রহ.) আমাদের নকশবন্দী সিলসিলার একজন এবং শাহ আব্দুল গনী (রহ.)-এর ভাই ছিলেন। শাহ আব্দুল গনী (রহ.)

এমন একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন, যার কাছে হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) ও অন্যান্যরা হাদীছ পড়েছেন। দারুল উলূম দেওবন্দের মাধ্যমে যাঁর রূহানী ফয়েজ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।

ইংরেজদের শাসনামলে খাজা আহমাদ সাঈদ (রহ.) ও শাহ আব্দুল গনী (রহ.) হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে হেজাযে চলে যান। আনুমানিক একশত লোকের কাফেলা ছিল। সেখানে পৌঁছার পর অনেক অভাবে দিন কাটতে লাগল। অনাহারে-অর্ধাহারে ছেলেমেয়ে ও শিশুরা খুব কষ্ট পেতে লাগল। এই অবস্থা দেখে হযরত শাহ আব্দুল গনী (রহ.)-এর অন্তরে একথা জেগে উঠল যে, আমরা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি জানালে হয়তো বাচ্চাদের জন্য একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তাই তিনি ভাই শাহ আহমাদ সাঈদ (রহ.)-এর কাছে এসে বললেন, আমার মনে এমন চিন্তা এসেছে; আপনার মতামত কী?

হযরত শাহ আহমাদ সাঈদ (রহ.) একটি বিস্ময়কর উত্তর বললেন। বললেন, আমার তো মনে হয়, আমি একজন রোযাদার। আমি রোযা রেখেছি; কিছুক্ষণ পর ইফতার করব। আপনি এমন ব্যক্তিকে রোযা ভাঙার আদেশ করবেন, নাকি পুরা করার জন্য বলবেন। যেহেতু তারা আলেম ছিলেন তাই তাদের মধ্যকার কথোপকথনও ইল্‌মী ঢংয়ে হচ্ছিল। শাহ আব্দুকারণী (রহ.) বললেন, যদি সময় খুবই অল্প হয়, তাহলে রোযা পুরো করার পরামর্শই দেওয়া হবে। হযরত শাহ আহমাদ সাঈদ (রহ.)বললেন, আমার অবস্থা তো এমনই। আমি রোযা রেখেছি। ইফতারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাই দুনিয়ার রোযাটি ভাঙতে চাচ্ছি না।

রিযিকের ভাবনা

আপনি হয়তো ভাবছেন, এভাবে দুনিয়াবিমুখ হয়ে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তাঁরা কোত্থেকে খায়। হাঁ; যার অন্তর দুনিয়ার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে, সে দুনিয়াবিমুখ হয়ে জীবন যাপনের পদ্ধতিও জানে। একবার হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহ.) এক ইমাম সাহেবের পিছনে নামায আদায় করলেন। নামাযের পর ইমাম সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! রুজি-রুটির জন্য কী কাজ করেন?

বায়জিদ : দাঁড়াও! প্রথমে নামাযটা আমার পড়ে নিই; তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।

ইমাম : আমি আপনার কথা বুঝতে পারিনি।

বায়জিদঃ তুমি ইমাম হয়েছ; অথচ তোমার জানা নেই, আমার-তোমার সবার রিযিকদাতা একমাত্র মহান আল্লাহ।

ইমাম : হযরত! একটু খুলে বলুন; অনুগ্রহ হবে।

বায়জিদ : যেদিন কুরআনে পাকে এ আয়াতখানা তেলাওয়াত করেছি وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ (তোমাদের রিযিক আকাশে), সেদিন থেকে রিযিকের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

বন্ধুরা আমার! আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করুন। তারপর দেখবেন, আল্লাহ কিভাবে রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন। সেই রিযিকের মধ্যে পরিবার-পরিজন, তৃপ্তি-প্রশান্তি সব কিছুর চাহিদা পূরণের সবরকম ব্যবস্থা থাকবে। অথচ আমাদের অবস্থা হলো, আমরা রিযিকের পিছনে ছুটতে-ছুটতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলি।

সময় এসেছে ভেবে দেখার

যারা বিভিন্ন মাশায়েখের নিকট আসেন, তাদের শতকরা নব্বইজনেরই অন্তরে দুনিয়াবি স্বার্থ লুকায়িত থাকে। কেউ ঝাড়-ফুঁক করাতে এল, কেউ তাবিজ নিতে এল কিংবা কেউ দু'আ করানোর জন্য এল। এই দু'আগুলোর উদ্দেশ্য যাচাই করে দেখুন, কারো উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য, কারো আয়-উপার্জন অথবা অন্য কিছু। বরং আজকাল আগমনকারী প্রত্যেক সালেক চার ধরনের কথা বলেন। প্রথমবার বলেন, হযরত! আমি অনেক বড়-বড় মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি; কিন্তু পীর হিসেবে আমি আপনাকে পছন্দ করেছি। আমার দিকে বিশেষ তাওয়াজ্জুহ দিন; তবে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হবে। দ্বিতীয় কথাটি এই বলে যে, হযরত! আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো যাচ্ছে না। পাঠ করার মতো কোনো তাসবীহ বা ওযীফা বলে দিন। তবে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হবে। তৃতীয় কথাটি বলে, হযরত! ঘরে সবসময় বিপদাপদ, অভাব-অনটন লেগেই থাকে; একটা নকশা লিখে দিন, যেন সব মুশকিল আসান হয়ে যায়। তবে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হবে।

আর সর্বশেষ কথাটি হলো, হযরত! কী যে করি! মুরাকাবা করা হচ্ছে না; আপনিই বরং একটু তাওয়াজ্জুহ দিয়ে দিন। তবে আমাকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হবে।

চিন্তা করুন, এমন দুর্বল ইচ্ছা নিয়ে কী করে আধ্যাত্মিক ধাপগুলো অতিক্রম করা সম্ভব? এপথ তো দৃঢ় প্রত্যয়, অসীম সাহস ও নিরলস সাধনা চায়। সূফী তো দৃঢ় প্রত্যয়ী ও নিরলস সাধক হয়ে থাকে। হযরত থানবী (রহ.) লিখেছেন, যার মধ্যে একনিষ্ঠতা ও দৃঢ় প্রত্যয় পাওয়া যায়, সে ভাগ্যবান মানুষ। তাই আমাদেরও সেভাবে মনের অবস্থার উন্নতি করতে হবে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

দুটি বিশাল নেয়ামত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবীতে দুটি মহামূল্যবান নেয়ামত নিয়ে আগমন করেছেন। একটি হলো, স্পষ্ট কিতাব (আল-কুরআন)। দ্বিতীয়টি আলোকিত অন্তর। একটি হলো উজ্জ্বল প্রজ্ঞা। অপরটি আলোকিত চরিত্র। একটি হলো পরিপূর্ণ জ্ঞান অপরটি পূর্ণাঙ্গ আমল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা একটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি তাঁর নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের পরিচয় দিয়েছেন।

مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ.

'তারা হলো নবীগণ, সত্যবাদীগণ, আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গকারীগণ ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণ।'[১]

এই আয়াতের আলোকে নবী ও সিদ্দীকগণের সঙ্গে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্পর্ক সুদৃঢ় বলে মনে হয়, পক্ষান্তরে শহীদ ও নেক বান্দাগণের সঙ্গে আমলের সম্পর্ক মজবুত বলে মনে হয়। সারকথা হলো, পৃথিবীর যত কল্যাণ ও সৌভাগ্য রয়েছে, সবকিছুই ইল্‌ম ও আমলের মধ্যে নিহিত।

এ যুগে ইল্‌ম ও আমলের অধঃপতন

বর্তমান কালকে ইল্‌ম ও আমলের অধঃপতনের কাল না বলে উপায় নেই। যে মুসলমানই নামায পড়ল, সে নিজেকে দীনদার ভাবতে লাগল। যে

---

১. সূরা নিসা : ৬৯

তাহাজ্জুদ পড়ে নিল, সে নিজেকে জোনায়েদ বাগদাদী ভাবতে লাগল। হজ করে এসে নিজেকে ইসলামের ঠিকাদার মনে করতে লাগল। যাকাত দিয়ে নিজেকে জান্নাতী ভাবতে শুরু করল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, নফ্স ও প্রবৃত্তির গোলামি কেউ ছাড়তে পারেনি।

এখন একটা ব্যাপক মহামারী হলো এই যে, সবাই يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ. (হায়! যদি কারূনের সমপরিমাণ সম্পদ আমারও থাকত) অবস্থার শিকার। অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদেরকে এতটা পেরেশান করে রেখেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি – চাই সে যেকোনা স্তর বা অঙ্গনেরই হোক – মুখে শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতার শব্দ তারা খুব কমই মুখে আনে। নতুবা অধিকাংশ সময় অতৃপ্তি ও অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ তাদের মুখে লেগেই থাকে।

আজ দুনিয়ার লাইনে একজন অপরজন থেকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা চলছে। আজ আমরা নিজেদের সন্তানদের এমন শিক্ষা অর্জনের জন্য স্কুল-কলেজে পাঠাচ্ছি, যা শিক্ষা করে তারা দু-পয়সা অর্জন করবে। আপনি দেখবেন, প্রতিদিন সকাল বেলা হাজারো ছেলেমেয়ে ঘর ছেড়ে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির দিকে ছুটছে। তার একমাত্র কারণ হলো, তারা জাগতিক এই শিক্ষাকে রুজি-রুটি উপার্জনের জন্য অপরিহার্য মনে করছে। এই বাস্তবতা তার আপন জায়গায় স্বীকৃত। কিন্তু এর পূর্বে আমাদের সন্তানদের জন্য আরও একটি অপরিহার্য বিষয় রয়েছে। তা হলো দীনি ইল্‌ম শিক্ষা করা।

এরা যখন দীনি ইল্‌ম শিক্ষা করল না, আল্লাহ-রাসূল, জান্নাত-জাহান্নাম, ইহকাল-পরকাল সম্পর্কে কিছুই জানল না, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানল না, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করল না, তবে এই সন্তানরা দুনিয়াতেই তাদের বাবা-মার জন্য মহা-আপদে পরিণত হবে। আর আখেরাতে আল্লাহর আদালতে নালিশ করবে, হে আল্লাহ! আমাদের বাবা-মা আমাদেরকে এমন কোনো শিক্ষা দেননি, যা দ্বারা আপনাকে চেনা, আপনার বিধিনিষেধ জানার সুযোগ আমাদের হতো। তাই আজ আমাদের সাথে তাদেরও জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন।

একটা ভ্রান্ত ধারণার নিরসন

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আজকালের শিক্ষিত ও সচেতন পিতা-মাতা, যারা দীন-দুনিয়ার উভয়ের স্লোগান দিয়ে থাকে, তারা নিজেদের

সন্তানদের দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ভয় পায়, পাছে রুজি-রুটি নিয়ে সংকটে পড়তে না হয়। আর এ কারণেই তারা নিজেদের সন্তানগুলোকে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করছে। ভালো করে শুনে নিন, আপনাদের এ ধারণা ভুল। আপনারা হয়তো ভাবছেন, তারা যদি দীনি শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে ভিন্ন কোনো প্রাণী হয়ে যাবে; সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। ইংরেজী শিক্ষিত ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে। তারা বলে, এই দীনি শিক্ষা মূলত চৌদ্দশত বছর পূর্বের একটি পুরাতন শিক্ষাকারিকুলাম। আজকের নবযুগে এর তেমন কোনো বাস্তবতা নেই। এখন যুগ নতুন, প্রজন্ম নতুন, দৃষ্টিভঙ্গিও নতুন; তাই সমাজও হতে হবে নতুন, আধুনিক।

আমি বলব, এখানেই আমাদের বিবেক বিভ্রান্ত হয়েছে।

দীনি শিক্ষা চির অমর

শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে যে আইন ও বিধিবিধান আল্লাহ তা'আলা প্রণয়ন করেছেন, তা আজও অমলিন অবস্থায় আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এতে দুনিয়ার বাস্তবতা, সততা-সত্যবাদিতা ও কল্যাণকামিতা নিহিত আছে। একালে, সেকালে সর্বকালেই এটি সত্য হিসেবে প্রমাণিত হবে। মানুষ যখনই এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, পদে-পদে হোঁচট খাবে। লজ্জা, অপমান তাদের পিছু ছাড়বে না। অবশেষে কাঁপতে-কাঁপতে হাঁফাতে-হাঁফাতে এই দীনি শিক্ষার দরজায় এসে আশ্রয় নেবে।

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی

میرے جرم خانہ خراب کو ترے عفو بندہ نواز میں.

'জগতের কোথাও তো নিরাপত্তা মিলল না। মিলল তো কোথায় মিলল? আমার ঘর খারাপ করার অপরাধ আর তোমার ক্ষমাশীলতার মাঝে।'

জাগতিক শিক্ষা ত্রুটিযুক্ত

স্কুল-কলেজে দীনি বিষয়গুলোর তুলনায় জাগতিক বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বরং দীনি বিষয়গুলোর প্রতি মোটেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এ কারণে শিক্ষাসিলেবাসে দীনি বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই ত্রুটি সত্ত্বেও তারা একে সফল ও পরিপূর্ণ সিলেবাস বলে দাবি

করে। একে তারা ত্রুটিযুক্ত সিলেবাস বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। আর একারণেই দীনি শিক্ষায় শিক্ষিতদের তারা শতভাগ শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে মেনে নিতে চায় না। অথচ এরাই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বেশি প্রিয়। এরা নিজেদের জীবনকে দীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। জীবনভর তাদের মুখে-মনে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বাণী আলোচিত হয়, অথচ এদের তারা মূর্খ মনে করে!

দুনিয়াকে ভালোবাসার পরিণতি ভালো নয়

দীনি শিক্ষায় শিক্ষিতরা দুনিয়ার দু-চার পয়সা উপার্জন করতে পারে না। তো এতে এমন কি ক্ষতি হয়ে গেল? কেন? এরা যে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যতের সন্তুষ্টি পেয়েছে এর কি কোনো মূল্য নেই? এরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত দু'আ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এর কি কোনো মূল্য নেই? আমরা এতটা অর্থপূজারী হয়ে গেছি যে, আমাদের মন-মস্তিষ্কে দুনিয়ার নেশা এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে, যে দীনি শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব, দুনিয়া আখেরাতের সফলতা লাভ করতে পারব, সেই দীনি শিক্ষাকে আমরা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছি। পক্ষান্তরে যে জাগতিক শিক্ষা দিয়ে আমাদের দু-বেলার ভাত-রুটির ব্যবস্থা হবে, তাকে আমরা সীমাহীন মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখি এবং এর পিছনেই জীবনের মূল্যবান সময়গুলো পার করে দিচ্ছি। মাস্টার্স ডিগ্রিধারী এমন কত মুসলিম আছে, যারা পাক-পবিত্রতা, ওযু-গোসলের মাসআলাগুলোও জানে না। এটাই হলো দুনিয়ার ভালোবাসার পরিণতি।

এক পিএইচডি ডক্টরের আক্ষেপ

আমাদের এখানে পিএইচডি ডিগ্রীধারী এক ডক্টরের পিতা মারা গেলেন। জানাযার নামাযের জন্য তিনি এক আলেমে দীনকে অনুরোধ জানালেন। সেই আলেম নামায পড়িয়ে দিলেন। জানাযার পর ডক্টর সাহেব অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। সবাই তাকে সান্ত্বনা দিল যে, এমন বেদনাবিধুর মুহূর্ত সবার জীবনেই আসে। আপনি ধৈর্য ধরুন। এতটা ভেঙে পড়বেন না। কিন্তু তার কান্না থামল না। অবশেষে সেই আলেমে দীন এসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেন আপনি এভাবে কাঁদছেন? বিশেষ কোনো ব্যাপার আছে কি? ডক্টর সাহেব কান্না থামিয়ে বললেন, হযরত! আমি এজন্য কাঁদছি না যে, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। এভাবে একদিন সবাইকেই যেতে হবে। আমার

কান্নার কারণ হলো, আমার পিতা আমাকে জাগতিক শিক্ষায় এতবড় শিক্ষিত বানালেন, আমাকে মানুষ ডক্টর বলে সম্মান জানায়; কিন্তু দীনি শিক্ষার ব্যাপারে চরম অন্ধকারে রেখে গেছেন। আজ আমার পিতা লাশ হয়ে আমার সামনে চিরনিদ্রায় শায়িত আর আমি জানাযার নামায পর্যন্ত পড়তে জানি না।

চিন্তার দৈন্য

দীন থেকে এ পরিমাণ দূরত্বের কারণ কি? দীনি শিক্ষিত ও জাগতিক শিক্ষিতদের মধ্যে এই বৈষম্যবোধ কেন তৈরি হলো? তার কারণ হলো, কলেজ-ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের একটা ভ্রান্ত ধারণা হলো, মাদরাসার শিক্ষার্থীরা কিছুই করতে জানে না। এরা দানব টাইপের হয়। এদের চিন্তা-ভাবনা পুরাতন যুগের। পুরাতন যুগের কিতাব পড়ে-পড়ে পুরাতন মানসিকতার লোক হয়ে ওঠে।

আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি তাদের এই যে, আলেমদের সাইন্স পড়া উচিৎ। অথচ একথাটি ওলামায়ে কেরাম তাদেরকে এভাবে বলা উচিৎ ছিল যে, আজকের জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের দীনি ইল্‌ম অর্জন করা প্রয়োজন। কারণ, ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা দেখুন; গোটা অঞ্চলে পাঁচ পার্সেন্টও চোখে পড়বে না। অপরদিকে জেনারেল শিক্ষিতদের সংখ্যা শতকরা পাঁচানব্বই পার্সেন্ট। যারা পঁচানব্বই পার্সেন্ট, তারা তো পূর্বেই জীবনের সিংহভাগ জাগতিক শিক্ষার জন্য ওয়াক্‌ফ করে রেখেছেন।

আমরা মনে করি, যদি এই পাঁচ পার্সেন্ট ওলামায়ে কেরামও সাইন্স ও বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত হতো, তাহলে আমাদের সমাজ আরও সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর হতে পারত। কিন্তু আমি বলি, আমাদের এই ধারণা একশ পার্সেন্ট ভুল। মানুষের অন্তর ও মস্তিষ্ক যখন বিকারগ্রস্ত হয়, তখন তারা এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

একথাটি আমাদের অন্তরে গেঁথে নিতে হবে যে, যে পাঁচ পার্সেন্ট ওলামায়ে কেরাম ও দীনি শিক্ষার শিক্ষার্থীরা কুরআন বা হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তারাই এই উম্মতের সবচেয়ে কল্যাণকামী জামাত। এরাই গোটা সম্প্রদায়ের আসমানী জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করেন। জাতি যখন বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের সম্মুখীন হয়, তখন এর শরঈ সমাধানের জন্য এই পাঁচ পার্সেন্ট লোকের কাছে আসতে হয়।

গোটা জাতির শরঈ সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের গুরুদায়িত্ব এরা নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। পদে-পদে এরাই আমাদেরকে দিকনিদের্শনা দেয় যে, এ পথে এসো; আল্লাহর সন্তুষ্টি এখানে আছে।

বস্তুত কথা এভাবে হওয়া উচিৎ যে, আজকাল স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি যদি দীনি বিষয়গুলোও শিক্ষা দেওয়া হতো এবং এ ধারাবাহিকতা শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব শ্রেণি ও বর্ষেই থাকত, তাহলে আমাদের উদীয়মান প্রজন্ম বিজ্ঞানী হয়ে বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভালো একজন মুসলমান হয়েও বের হতে পারত। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির লাভের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ সকল চেষ্টা-সাধনা, শিক্ষা-গবেষণা কেবল বস্তুবাদকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার ওপর কোনো ধরনের চর্চা ও গবেষণা হচ্ছে না। পরকালের জন্য কোনো রকমের আয়োজনও দেখা যাচ্ছে না।

আজকের আলোচ্য বিষয়

আজকের এই মাহফিলে আমাদের সম্মুখে ওইসব শিশু-কিশোররা বসে আছে, যারা কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম অর্জন করছেন কিংবা কুরআন হিফ্‌য করছেন। সেই উপলক্ষ্যে এই শিশু-কিশোরদের মন-মস্তিষ্কে দীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা উদ্ভাসিত করে গেঁথে দিতে হবে, যেন তাদের সামানেও সত্য সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়। সাথে-সাথে আমাদেরও যেন এ উপলব্ধি তৈরি হয় যে, যারা দীনি ইল্‌ম অর্জন করছে, তারা-ই মানবতার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। এরা একটি সুদূরপ্রসারী ও সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়াবি সম্পদের ক্ষণস্থায়িত্ব

জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা পড়া-লেখা শেষ করে তাদের জাগতিক চাহিদাগুলো পূরণ করছে। আখেরাতের চাহিদাগুলো তো দুনিয়ার অর্থ-কড়ি দিয়ে পূরণ করা যায় না। তারা সম্পদ উপর্জন করল ঠিক; কিন্তু এ দিয়ে জীবনের সকল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। কিছু চাহিদা থেকেই যাবে; পূরণ হবে না। যেমন– অর্থের বিনিময়ে চশমা তো ক্রয় করা যেতে পারে; কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তো আর ক্রয় করা যায় না। অর্থ দিয়ে কিতাব ক্রয় করা যেতে পারে; কিন্তু ইল্‌ম ও প্রজ্ঞা তো ক্রয় করা যায় না। অর্থের বিনিময়ে আপনি নরম-কোমল বিছানা তো ক্রয় করতে পারবেন; মধুর ঘুম তো ক্রয় করতে

পারবেন না। অর্থের বিনিময়ে ঔষধ ক্রয় করতে পারেন; কিন্তু সুস্থতা তো আর ক্রয় করতে পারবেন না। টাকা-পয়সা দিয়ে উত্তম পোশাক তো ক্রয় করা যাবে; কিন্তু রূপ-সৌন্দর্য তো আর ক্রয় করতে পারবেন না। অর্থ দিয়ে আপনি হয়তো কারও খোশামোদি ক্রয় করতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা তো অর্জন করতে পারবেন না। অর্থের বিনিময়ে খেজাব ক্রয় করে সাদা চুল-দাড়ির রং পরিবর্তন করতে পারবেন; কিন্তু যৌবন তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।

সুতরাং বোঝা গেল, অর্থ-সম্পদ দিয়ে সব কিছু হয় না।

ইল্‌ম ও সম্পদের মাঝে ব্যবধান

ইল্‌মের সঙ্গে কি সম্পদের কখনও তুলনা হতে পারে? সম্পদের মূল্য সময়ের ব্যবধানে হ্রাস পেতে থাকে আর ইলমের মর্যাদা সময়ের সাথে-সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সম্পদের হেফাযত করতে হয় তোমাকে, কিন্তু ইল্‌ম সর্বদা তোমার হেফাযত করে। অর্থ-সম্পদ হলো ফেরাউন-কারূনের উত্তরাধিকার। পক্ষান্তরে ইল্‌ম হলো আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মিরাস। সম্পদ দ্বারা ইল্‌ম অর্জন করা যায় না; কিন্তু ইল্‌ম দ্বারা সম্পদ অর্জন করা যায়। মহাবিচারের দিন (হাশরের মাঠে) সম্পদের হিসাব নেওয়া হবে; কিন্তু ইলমের কোনো হিসাব নেওয়া হবে না। ইল্‌ম পৃথিবীর উন্মুক্ত আকাশের মতো বিশাল ও বিস্তৃত; আর সম্পদ মাটির মতো পদদলিত। সম্পদের প্রাচুর্যে প্রতারিত হয়ে ফেরাউন বলেছিল, 'আমিই তোমাদের বড় খোদা' আর ইল্‌মের ঐশ্বর্যের কারণে আল্লাহর প্রিয় নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃতজ্ঞচিত্তে বলতেন–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ.

'হে আল্লাহ! আপনার যথাযথ ইবাদতও করতে পারিনি এবং আপনাকে চেনার মতো চিনতেও পারিনি।'

چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک.

আল্লাহর সঙ্গে এই ক্ষুদ্র মাটির (মানুষের) আবার কীসের তুলনা!

জীবনের লক্ষ্য

আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের এ কথা অন্তরে গেঁথে নিতে হবে যে, জাগতিক শিক্ষা অর্জন করা আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজন; কিন্তু জীবনের

লক্ষ্য নয়। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হলো, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তাঁর বিধিনিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপন করা। আর এই জিনিসটি দীনি শিক্ষা ব্যতীত আপনি অর্জন করতে পারবেন না। আপনি দুনিয়ার সবচেয়ে উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করুন কিংবা নোবেল পুরস্কার বিজয় করে নেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের আমলগুলো জানতে এবং শিখতে হলে ওলামায়ে কেরামের ঝুপড়িতে আপনাকে আসতেই হবে। তাদের সস্তা চাটাইয়ের ওপর হাঁটু গেড়ে আপনাকে বসতেই হবে। তারপরই সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তু আপনি পেতে পারেন। আর যদি মনে করেন, আমরা হুজুরদের ইল্‌ম ছাড়াই সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন পার করে দেব, আমাদের তো বিলাসবহুল গাড়ি-বাড়ি সবই আছে, তাহলে আমি বলব, তোমার জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই যে, তুমি নিজেকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছ। তোমার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

'তার দুনিয়াও বরবাদ, আখেরাতও বরবাদ! আর এটা-ই হলো মহাক্ষতি।'[১]

বুদ্ধিমান লোকদের পরিচয় হলো, তারা প্রয়োজনকে প্রয়োজন পরিমাণই পূরণ করে; কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে হাতছাড়া হতে দেয় না। যদি আমরা বলি, সমাজের শতকরা পঁচানব্বই পার্সেন্ট লোক ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করছে আর পাঁচ পার্সেন্ট যারা দীনি শিক্ষা গ্রহণ করছেন, তারা ঠিক করছেন না; তাদেরও সাইন্স, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ, তাহলে আমি বলব, কথাটা যুক্তিসঙ্গত হয়নি। কারণ, সারা জীবন যদি স্কুল-কলেজের জ্ঞান চর্চাই করে, তাহলে আল্লাহকে চেনার সময় কিভাবে বের করবে? আর আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত সে পরকালে মুক্তি-ইবা পাবে কিভাবে? এ কথাটি আকবর এলাহাবাদি এভাবে বলেছেন–

انہوں دین کہاں سیکھا بھلا جا جاکے مکتب میں * پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

'কতক জীবন এমন আছে, যেগুলো স্কুল-কলেজ তাওয়াফ করতে-করতেই কেটে যাচ্ছে আর যখন শিক্ষা গ্রহণ শেষ হয়, তখন অফিসের 'স্যারে'র কার্যালয়েই জীবনের প্রদীপ নিভে যায়।'

---

১. সূরা হাজ্জ : ১১

জাতির প্রকৃত কল্যাণকামী কারা?

বন্ধুরা আমার! একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইল্‌মে ওহী তথা ঐশী শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তার কি কোনো গুরুত্ব নেই? আমাদের জীবনে সেই ঐশী শিক্ষার বৈপ্লবিক প্রভাবকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারব? তাহলে আসুন, আজ থেকে এ কথার প্রচার শুরু করি যে, ওই পাঁচ পার্সেন্ট ওলামায়ে কেরাম যারা নিজেদের জীবনের একশত পার্সেন্ট সময় দীনি ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ওয়াক্‌ফ করেছেন, এরাই জাতির প্রকৃত কল্যাণকামী। এরা জাতির মাথার উপর ইল্‌মী ছায়া। জাতি যখন হোঁচট খাবে, এরাই তখন জাতিকে গন্তব্যের দিশা দেবে। জাতি যখন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে, এরাই তখন হাত ধরে-ধরে মনযিল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। যখন জাতির মধ্যে চরম হতাশা কাজ করবে, তখন দয়াময় আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার বাণী তাদের এরাই শোনাবে। ফিরিয়ে নেবে নিরাশার অন্ধকার জগত থেকে।

মুহতারাম ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

আজকের এই মাহফিলে আপনাদের সম্মুখে যেসকল ওলামায়ে কেরাম 'পাগড়ি সম্মাননা' গ্রহণ করেছেন, পুরস্কার হিসেবে পবিত্র কুরআনের কপি ও হাদীছের কিতাবাদি গ্রহণ করেছেন, আসুন, এবার তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। এই নগণ্য চাটাইয়ে উপবেশনকারী, সাধারণ পোশাক পরিধানকারী, সাধারণ খাবার খেয়ে কৃতজ্ঞতা আদায়কারী এবং অল্পেতুষ্ট ওলামায়ে কেরাম ও দীনি রাহবারদের প্রশংসা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ.

'আল্লাহওয়ালা ও পণ্ডিতবর্গ।'[১]

الرَّبَّانِيُّونَ দ্বারা আল্লাহওয়ালা সূফীগণ আর الْأَحْبَارُ দ্বারা ওলামায়ে কেরাম উদ্দেশ্য। এদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন–

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.

'তারা আল্লাহর কিতাবের হেফাযত করবে।'[১]

---

১. সূরা মায়েদা : ৪৪

অর্থাৎ– এদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, দুনিয়ায় কুরআনের এক-একটি আয়াতকে এবং এক-একটি হাদীছকে এমনভাবে হেফাযত করা, যেন কেউ এর মধ্যে কোনো ধরনের বিকৃতি সাধন করতে না পারে এবং পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত তা এভাবেই পৌঁছবে যেভাবে পূর্ব থেকে অবিকৃত অবস্থায় এসেছে। এ কারণেই এদের আম্বিয়া আলাইহিস সালামের উত্তরসূরী বলা হয়।

আল্লাহর সেনাবাহিনী

আপনি হয়তো ভাবছেন, কুরআনে কারীমের হেফাযতের দায়িত্ব তো আল্লাহ তা'আলা নিজের ওপরই নিয়ে নিয়েছেন, তাহলে পুনরায় এর দায়িত্ব ওলামায়ে কেরামকে কেন দেওয়া হলো? হ্যাঁ ভাই! কুরআনুল কারীমের হেফাযত তো আল্লাহ রব্বুল ইয্যত করবেন; কিন্তু তা হবে তাঁর বাহিনীর মাধ্যমে। যেমন- কোনো বাদশা যদি বলেন, আমি এই দেশের সীমান্ত এলাকার হেফাযত করব, তো তার কথার অর্থ এই নয় যে, বাদশা স্বয়ং সীমান্তচৌকিতে বসে-বসে পাহারা দেবেন। বরং এ কাজের জন্য তাঁর কাছে একটি চৌকস বাহিনী থাকে। সেই বাহিনীর প্রতিটি সদস্য তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। এদের বেতন-বোনাস ভালো। এদের স্বাস্থ্য-সুস্থতা উন্নত। তাদের ভাবমুর্তিও সমুন্নত। এদের প্রতি বাদশার বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টি থাকে। কারণ, এরা তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত।

ঠিক এভাবেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তার হেফাযত ও সংরক্ষণও তিনিই করবেন। আর কুরআন হেফাযতের সেই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য একটি বাহিনী তিনি গঠন করেছেন, যার নাম ওলামায়ে কেরাম ও হুফ্ফাযে কেরাম। হুফ্ফাজে কেরাম কুরআনের শব্দগুলোর হেফাযত করেন আর ওলামায়ে কেরাম তার অর্থ ও ব্যাখ্যাগুলো হেফাযত করেন। সুতরাং কুরআন-হাদীছ ও ইসলাম পরিপূর্ণরূপে আজও আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। এই সুদক্ষ বাহিনী এর মধ্যে কোনো ধরনের বিকৃতি সাধিত হতে দেয়নি। এই কুরআন-হাদীছের হেফাযতকারী বাহিনীকে আল্লাহ তা'আলা 'হিযবুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ওই সব হুফ্ফাযে কেরাম এবং ওলামায়ে কেরামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে–

---

১. সূরা মায়েদা : ৪৪

أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার বাহিনী ও আল্লাহর দল সফলকাম হবে।'[১]

সাহাবায়ে কেরাম নববী আদর্শের সংরক্ষক ছিলেন

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রকৃত ধারক-বাহক ছিলেন। তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তারা এক-একটি সুন্নাতের আশেক ছিলেন। সেই ইশ্‌ক-মহব্বতের রং মেখে তাঁরা নবীজির প্রতিটি কথা ও কর্মকে সংরক্ষণ করেছেন। তারা প্রকৃত অর্থেই সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। এই অনুসরণ এতটা পরিপূর্ণ ও অর্থবহ ছিল যে, বিবেক হতবুদ্ধি হয়ে যায়। কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টি আপনিও উপলব্ধি করতে পারবেন।

প্রথম ঘটনা : হাদীছে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে বসা ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে বসে আছেন। বাইরে থেকে একলোক এসে দেখল, পুরো মজলিসের সবাইকে একই রকম দেখা যাচ্ছে। পোশাক এক, কথা-বার্তা, চলাফেরা সবই এক। সবার চেহারায় এক অবর্ণনীয় নূরের জ্যোতি ঝলমল করছে। তাদের মাঝে বড়-ছোট, রাজা-প্রজার পার্থক্য বোঝার কোনো উপায় নেই। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হলো, 'আপনাদের মাঝে আল্লাহর নবী কোনজন?'

চিন্তার বিষয় হলো, নবীজির অনুকরণ কত মাত্রায় পরিপূর্ণ ছিল, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী পরিমাণ অনুকরণ করতেন যে, একজন বাইরের লোক পার্থক্য করতে পারেননি, কে গোলাম আর কে মনিব? এটাই ছিল প্রকৃত অনুসরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁরা প্রকৃত অর্থেই নবীজির অনুসারী ছিলেন। নিজের কথায়-কাজে, চলনে-বলনে, ওঠা-বসায় সর্বক্ষেত্রে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন।

দ্বিতীয় ঘটনা : সাহাবায়ে কিরামের ইত্তিবায়ে সুন্নাত তথা সুন্নাতের অনুসরণ এতই নিখুঁত ছিল যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হজ্বের সফরে যাচ্ছিলেন। পথে একস্থানে তিনি সাওয়ারী থামিয়ে নেমে

---

১. সূরা মুজাদালাহ : ২২

পড়লেন। নিকটবর্তী একটা জায়গায় গিয়ে এমনভাবে বসলেন, যেন প্রস্রাব করছেন। কিন্তু তিনি প্রস্রাব করলেন না। কিছুক্ষণ এভাবে থেকে ফিরে এসে সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন। সফরসঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করল, হে সাহাবীয়ে রাসূল! আপনি সেখানে গিয়ে কী করেছেন? প্রস্রাব করেছেন বলে তো মনে হয়নি? উত্তরে হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, একবার আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর সঙ্গী ছিলাম। তিনি এখানেই প্রাকৃতিক কাজ সেরে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আজ সেই স্থান চোখে পড়তেই আমার পা আটকে গেল। আমার প্রিয় রাসূল এখানে একটি আমল করেছিলেন। যদিও আমার প্রয়োজন নেই; কিন্তু সাধ্যমতো অনুকরণ না করে মনে প্রশান্তি পাচ্ছিলাম না। তাই সেখানে ছুটে গিয়ে যেভাবে নবীজি বসেছিলেন, সেভাবে কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে এসেছি। আমার অন্তরে এখন প্রশান্তি চলে এসেছে। আমার প্রিয় রাসূলের একটি সুন্নাত আদায় করার সৌভাগ্য আমার হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ!

তৃতীয় ঘটনা : এক সাহাবী ছিলেন হাবশী – নিগ্রো ও কালো। শরীরের আকার-গঠন ছিল অদ্ভুত। মাথার চুলগুলো ছিল ছোট ও কোঁকড়ানো। এ জাতীয় চুলে সিঁথি কাটা যায় না। আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় বাবরী চুল ছিল এবং তিনি মাথার মাঝখানে সিঁথিও কাটতেন। এই হাবশী সাহাবী নবীজির মাথার চুল দেখতেন আর আফসোস করতেন, হায়! আমার মাথায়ও যদি এভাবে সিঁথি কাটা যেত, তবেই নবীজির চুলের সঙ্গে আমার চুলের সাদৃশ্য হয়ে যেত! এর জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দু'আও করতেন।

একদিন এ নিয়ে তাঁর অন্তর আবেগে এতটাই উদ্বেলিত হয়ে উঠল যে, গোসল শেষ করে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনি দিয়ে অনেক্ষণ সিঁথি কাটার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে কিছুই হলো না। অবশেষে একটা লোহার টুকরা নিয়ে আগুনে পুড়লেন। লোহা গরম হয়ে যখন টকটক করছিল, তখন উঠিয়ে সেটি মাথার ঠিক মাঝখানে চেপে ধরলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চুলও জ্বলে গেল, মাথার চামড়াও পুড়ে গেল। চামড়া পুড়ে যাওয়ার কারণে মাথার মাঝখানে একটা সাদা দাগ পড়ে গেল। সাথী সাহাবীরা বললেন, তোমার এত কষ্ট করার কী দরকার ছিল? তিনি বললেন, চামড়া জ্বলার কষ্ট তো একদিন দূর হয়ে যাবে; কিন্তু পরম তৃপ্তির বিষয় হলো, আজ থেকে আমার মাথা আমার প্রিয় রাসূলের মাথার সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ! জান কুরবান হোক এমন নবীপ্রেমের জন্য।

চতুর্থ ঘটনা : হাদীছের কিতাবে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। একবার হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান (রাযি.) পারস্য গিয়েছিলেন। এক বন্ধু তাকে খানা খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। সেখানে আরও অনেক বিধর্মী লোক আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। খেতে বসে হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান (রাযি.) এর হাত থেকে একটি লুকমা মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তা উঠিয়ে খেয়ে ফেললেন। কেউ একজন বলল, আরে এ কী করছেন? এখানকার অনেক আমীর-ওমারা এভাবে পড়ে যাওয়া খানা উঠিয়ে খাওয়া অপছন্দ করেন। আপনি কাজটি না করলেও পারতেন। উত্তরে হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান (রাযি.) আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বললেন–

أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيْبِيْ لِهٰؤُلَاءِ الْحَمْقَاءِ.

'এই নির্বোধদের জন্য আমি আমার প্রিয় রাসূলের সুন্নাত ছেড়ে দেব নাকি?'

চিন্তা করে দেখুন, সাহাবায়ে কেরাম এক-একটি সুন্নাতের ওপর কী পরিমাণ মহব্বত ও ভালোবাসা নিয়ে আমল করেছিলেন। তাঁরা নবীজির ইল্‌মেরও উত্তরসূরী ছিলেন, আমলেরও উত্তরসূরী ছিলেন। এভাবেই এই ইল্‌ম সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পর্যন্ত ঠিক সেই অবয়বে পৌঁছেছে, যেই অবয়বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গিয়েছিলেন।

তাবেঈগণ যেভাবে দীনের সংরক্ষণ করেন

সাহাবায়ে কেরামের মতো তাবেঈগণও এই ইল্‌ম ও আমলকে অবিকৃত অবস্থায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। দীন বিকৃতির সব ধরনের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় তারা ইস্পাতকঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। তারপরও হকের সঙ্গে বাতিলকে ঘুলিয়ে-মিলিয়ে যেতে দেননি। এমনকি কোনো শাসক যদি নিজের স্বার্থের অনুকূলে কোনো অন্যায় ফাতওয়া চেয়েছেন, তো সেই ওলামায়ে কেরাম প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন; তবুও দীনের মধ্যে কোনো ধরনের বিকৃতি বা বিদ'আত বরদাশত করেননি। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), যাকে 'ইমামে আযম' তথা 'বিশ্বইমাম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে, তার লাশ বের হয়েছিল জেলখানা থেকে। তিনি অন্যায়কে সমর্থন করেননি। অবর্ণনীয় পাশবিকতার স্বীকার হয়ে জেলেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে (রহ.)কে একশত বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহকেও (রহ.) জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। ইমাম সারাখসীকে (রহ.) অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ইমাম বোখারী (রহ.) দেশান্তরিত হয়েছিলেন। হ্যাঁ, ইশ্‌ক-মহব্বতের সেই সোনালী দাস্তান (কাহিনী) এই স্বল্প সময়ে কিভাবে বর্ণনা করব? আসুন! নিকট অতীতের ওলামায়ে কেরামের কথা-ই আলোচনা করি। যেমন- আমাদের ভারতীয় ওলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে নিকট অতীতে যারা অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁদের জীবনেও এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যা আমাদেরকে দীনের জন্য আত্মদান, ত্যাগস্বীকার ও সাধনা করতে অনুপ্রাণিত করবে।

ভারতীয় আলেমদের সোনালী অতীত

মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বাদশা জাহাঙ্গীরের মুখোমুখি

ভারতীয় আলেমগণের এই বিপ্লবী যুগটি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) থেকে শুরু হয়। তিনি অখণ্ড ভারতবর্ষের সারহিন্দ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যুগেই বাদশা আকবর ইসলামকে বিকৃত করে 'দীনে এলাহী' নামে একটি নতুন দীন প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেখানে শির্‌ক-বিদ'আত ও ভ্রান্ত রসম-রেওয়াজকে ইবাদত হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এ হলো তখনকার কথা, যখন বাদশা আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর শক্তির নেশায় বুঁদ হয়ে ওলামায়ে কেরামকে লিখেছিল, আমার পক্ষে এই ফাতওয়া দাও, বাদশাকে তাযীমী সিজদা (সম্মানসূচক সিজদা) করা বৈধ।

একদিকে এই ফাতওয়ার দাবি অপর দিকে জেল-যুলুম, অত্যাচার-নির্যাতনের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া। বাদশার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যিনিই যাচ্ছেন, তাকেই চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত করে নিক্ষেপ করা হচ্ছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। কাউকে আবার ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। এমন চরম পরিস্থিতিতেও আল্লাহর কিছু নিবেদিতপ্রাণ মানুষ ছিলেন, কিছু ওলামায়ে কেরাম ছিলেন, যাঁরা সত্য উচ্চারণে নিজের জীবনের কোনোই পরোয়া করেননি। কারণ, দীনের হেফাযত তাঁদের ঈমানী দায়িত্ব ছিল।

তাঁরা অকুণ্ঠ চিত্তে বলে গেলেন-

جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی * حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.

'তার দেওয়া জীবন তার পথেই উৎসর্গ করেছি। সত্য কথা হলো, হক আদায় হয়নি।'

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে ফাতাওয়া দিলেন, 'সিজদায় তাযীমী' হারাম। তাঁর এই সাহসী ও সত্য উচ্চারণের কারণে তাকে গোয়ালিয়ারের দুর্গে বন্দী করে রাখা হলো। হাতে-পায়ে লৌহশৃঙ্খল পরিয়ে মাসের-পর-মাস তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হলো। তিনি হাতে-পায়ে শিকল বহন করে নিলেন, তবুও মিথ্যার সম্মুখে মাথা নত করলেন না। কারণ, মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে মাথা নত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে মাথা জীবনভর আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের দরবারে ঝুঁকেছে, সেই মোবারক মাথা কিভাবে একজন মাখলুকের সামনে ঝুঁকতে পারে? অবশেষে তার পাহাড়সম দৃঢ়তা ও অবিচলতার কল্যাণে আল্লাহ রব্বুল ইয্যত পৃথিবীবাসীকে এমন দিনও দেখালেন, যে দিন বাদশা জাহাঙ্গির তার কাছে পরাজিত হলো। সকল আমীর সেই ফকীর আলেমের সম্মুখে সশ্রদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, হযরত! আজ আপনি যা বলবেন, আমরা তা-ই করব। তারপর তিনি সব ধরনের শির্ক-বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করে সুন্নাতে রাসূলের আলোকে সমাজকে নতুনভাবে ঢেলে সাজালেন। আর এ কারণেই তাঁকে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

শাহ আব্দুর রহীম (রহ.)-এর পরিবার ও দীনের হেফাযত

তারপর আরেকজন মহাপুরুষ এলেন। নাম শাহ আব্দুর রহীম। আরব থেকে এসে হিন্দুস্তানে বসবাস করতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি পুণ্যবান পুত্রসন্তান দান করলেন, যে পরবর্তী কালে শাহ ওলীউল্লাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই 'ওলীউল্লাহ' খান্দানকেই আল্লাহ তা'আলা দীনের খেদমতের জন্য কবুল করে নিলেন। শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা শাহ আব্দুল আযীয (রহ.), শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) ও শাহ রফীউদ্দীন (রহ.) দিল্লীর মাটিতে বসে কুরআন ও হাদীছের খেদমত করেছিলেন। দীনি ইল্‌মকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন।

একটা সময় এমনও এল যে, সে যুগের শাসক তাদের মুখোমুখী হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা দুঃখ-কষ্ট সব কিছুই সহ্য করলেন;

কিন্তু দীনের মধ্যে কোনো ধরনের বিকৃতি আসতে দিলেন না। অবশেষে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.)-এর জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর উভয় হাতের কব্জিদ্বয় ও আঙুলগুলো ভেঙে দেওয়া হলো। যে ব্যক্তির হাত সর্বদা কুরআন-হাদীছের খেদমত করত, ক্ষমতার নেশায় অন্ধ হয়ে শাসকবর্গ তাদের ওপর অত্যাচারে পাহাড় ভেঙে দিল। সেই সব ওলামায়ে হক দুঃখ-কষ্ট তো সয়ে গেলেন; কিন্তু দীনের মধ্যে কোনো ধরনের বিকৃতি সাধিত হতে দিলেন না।

যদি তখন শাসকদের ক্ষমতা ও অপতৎপরতা কার্যকর হতো, তাহলে জানা নেই, দীন আজ আমাদেরকে কোন অবস্থায় নিয়ে পৌছাত। তাঁদের হাতে যদি কলম থাকত, তাহলে জানা নেই, কুরআন ও হাদীছের কী পরিমাণ বিকৃতি তারা করত। এ কেবল করুণাময় আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তিনি দীনের হেফাযতের দায়িত্ব সময়ের শাসকবৃন্দের হাতে ন্যস্ত করেননি। নতুবা তারা পিতলকে সোনা বলে চালিয়ে দিত। ইতিহাস খুলে দেখুন! জুব্বা-পাগড়ি যে অঞ্চলগুলো বিজয় করেছিল, কোট-টাই সেগুলো ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছিল।

ভারতে ইংরেজদের আগ্রাসন

একটা সময় এমনও এল, যখন ইংরেজরা ভারতে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করল। তারা যখন দেখল, ভারতবর্ষের সকল ধন-সম্পদ তো লুটে-পুটে নেওয়া হয়ে গেছে; এবার এই অঞ্চলের দীনি ঐতিহ্য ধ্বংস করে দিতে হবে, যেন আমাদের মোকাবেলা করার মতো আর কোনো দূরদর্শী মস্তিষ্ক অবশিষ্ট না থাকে। তারপর তারা ভারতের সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং তাতে নির্মিত ভবনগুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল। তাতে তখন শুধু দিল্লীতেই ছয়শত মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেল। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমরা এদের ঘাড় মটকে ভেঙে দেব। তারা কোনো বড় দীনি প্রতিষ্ঠান সচল থাকতে দেয়নি।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা

সময়ের এই অবর্ণনীয় নাজুকতা অনুধাবন করে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) দেওবন্দ নামক একটি অখ্যাত জায়গায় একটি দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মাদরাসাটি দিনে দ্বিগুণ তো রাতে চারগুণ উন্নতি লাভ করল। অল্প কদিনেই সেটি ইল্ম ও আমলের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেল। আজ সেই ছোট্ট দারুল উলূম দেওবন্দ এক বিশাল ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয়েছে।

দারুল উলূম দেওবন্দের সুসন্তানরা

এই ইসলামী ইউনিভার্সিটি থেকেই সেই সব বিপ্লবী ওলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদীন বের হয়েছেন, যাঁরা দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'স্বাধীনতা আমাদের অধিকার; তাই আমাদেরকে আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোক।' এটা সেই দারুল উলূম, যা ভারতবর্ষকে ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্ত করেছিল। যদি এসব ওলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদীন তখন সিসাঢালা প্রাচীরের মতো প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন, তাহলে আজকের প্রজন্ম একটি স্বাধীন দেশে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। কারণ, ইংরেজদের কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতায় এ পরিমাণ মাদকতা ও আকর্ষণ ছিল যে, ওলামায়ে কেরামের বিরোধিতা না থাকলে গোটা তরুণ সমাজ তাদের নষ্ট সংস্কৃতির স্রোতে ভেসে যেত। তাদের উঠা-বসা ভিন্ন রকম হতো। তাদের সকাল-সন্ধ্যাগুলো অন্য রকম কাটত।

কিন্তু জান কুরবান হোক ওলামায়ে দেওবন্দের প্রতি; তাঁরা এত প্রতিকূলতার মাঝেও দীনকে বুকের সাথে আগলে রেখেছিলেন। পৃথিবীকে জানিয়ে দিলেন, দীনের জন্য প্রয়োজনে আমরা জীবন দেব, তবুও দীনের ওপর কোনো রকমের অগ্রাসন সহ্য করব না। অবশেষে একটি সময় এল, তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিলেন। শামেলির ময়দানে হাফেয জামিন শহীদ (রহ.) নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন। এদিকে রেশমি রুমাল আন্দেলনের প্রাণপুরুষ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) মালটার অন্ধকার জেলখানায় নির্যাতন সহ্য করলেন। এদের হাতে-পায়ে লৌহকৃঙ্খল থাকত ঠিকই; কিন্তু মুখে থাকত পাক কুরআন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় দেখা গেল, কেউ কুরআনে কারীমের তাফসীর লিখে বের হচ্ছেন। আমাদের ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের সোনালী অতীত এমনসব ঈমানদীপ্ত ইতিহাসে ভরা, এক মাহফিলে যার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

তারানায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ

এই তো কিছুক্ষণ পূর্বে একছাত্র দারুল উলূম দেওবন্দের তারানা (সঙ্গীত) গেয়ে শোনাচ্ছিলেন–

یہ علم وہنر کا گہوارہ* تاریخ کاوشہ پارہ ہے.

এটি ইলম ও প্রজ্ঞার দোলনা – ইতিহাসের এক অনন্য গৌরবগাথা।

ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے* ہر سرو یہاں مینارہ ہے.

এখানকার প্রতিটি ফুল একেকটি স্ফুলিঙ্গ – প্রতিটি বৃক্ষ এখানকার সুউচ্চ মিনারসম।

کہسار یہاں دب جاتے ہیں* طوفان یہاں رک جاتے ہیں.

পর্বতমালা এখানে দেবে যায় – ঝড় এসে এখানে থেমে যায়।

اس کاخ فقیری کے آگے* شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں.

এই ফকিরি কুঁড়েঘরের সামনে বাদশাদের প্রাসাদও ঝুঁকে যায়।

عابد کے یقین سے روشن ہے* سادات کا سچا صاف عمل.

আবেদের একিন দ্বারা আলোকিত – নেককারদের স্বচ্ছ-নির্মল সরলতা।

آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا* خلاص کا ایسا تاج محل.

চোখেরা কি কখনও দেখেছে ইসলামের এমন তাজমহল?

یہ علم و ہنر کا گہوارہ* تاریخ کا وشہ پارہ ہے.

এটি ইলম ও প্রজ্ঞার দোলনা – ইতিহাসের এক অনন্য গৌরবগাথা।

ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے* ہر سرو یہاں مینارہ ہے.

এখানকার প্রতিটি ফুল একেকটি স্ফুলিঙ্গ – প্রতিটি বৃক্ষ এখানকার সুউচ্চ মিনারসম।

মসজিদগুলো আর্তনাদ করছে

আজ স্পেনের বেদনাদায়ক ইতিহাস আপনাদের সবার সামনে আছে। কুরতুবার জামে মসজিদে গিয়ে দেখুন। ওলামায়ে দেওবন্দের মূল্য আপনারা তখনই অনুধাবন করতে পারবেন, যখন বহির্বিশ্বের ওলামায়ে কেরামের অধঃপতনের দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন। তাদের বাহ্যিক বেশভূষা দেখলে দেখতে পাবেন, তাদের চেহারায় সুন্নাতে রাসূলের কোনো চিহ্ন নেই। বোঝা গেল, সেখানকার ওলামায়ে কেরাম সেখানকার পরিবেশ অনুযায়ী নিজেদের ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খায়ের দান করুন আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে দেওবন্দেকে। তাঁরা সর্বযুগে সব ধরনের ফেতনার সামনে পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

মিসর, তুর্কী ইত্যাদি শহর যেগুলোকে আজ মুসলিম দেশ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়, একটু সেখানে গিয়ে তাদের মসজিদগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, যে মসজিদে এক সাথে এক হাজার মুসল্লী জামাতে নামায আদায় করত, সেখানে আজ যোহর-আসরের নামাযে বড়জোর তিন-চারজন মুসল্লী পাওয়াও কঠিন হয়ে গেছে। সেই মসজিদগুলোর আর্তনাদ শুনলে চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

ইংরেজী শিক্ষিতদের করুণ দশা

আপনি একটু লক্ষ করে দেখুন, আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত ভাইয়েরা দীন থেকে কতদূরে অবস্থান করছেন! যারা সকাল-সন্ধ্যায় ইংরেজী পড়ায় মত্ত, তারা আরবী দুটি শব্দ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। পিএইচডি ডিগ্রিধারী কোনো ডক্টরকে কখনও সামনে দাঁড় করিয়ে আযান দিতে বলবেন, দেখবেন কি বিস্ময়কর উচ্চারণে সে আযান দেবে। কখনও যদি বলেন, ভাই আপনি তো পিএইচডি ডক্টর, একটু 'ইকামত' বলে শোনান! দেখবেন, তিনি বলবেন, ভাই আমি তো ভালো করে ইকামত বলতে জানি না। তারা বিশুদ্ধভাবে নামায পড়তেও জানে না। জানাযার নামাযের তো খবরও নেই যে, তা কিভাবে পড়তে হয়। পদ্ধতিও জানে না, মাসায়েলও জানে না। বোঝা গেল, তাদের মূল্যবান জীবনটুকু দীন ছাড়াই কেটে যাচ্ছে। যদি এসব লোকদের দায়িত্ব দেওয়া হয় যে, তোমাদেরকে 'কমিউনিজম' ও 'সোস্যালিজম'-এর মহাপ্লাবনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, তাহলে এরা প্রতিরোধ গড়ে তোলা তো দূরের কথা, নৌকা ডুবিয়ে বানের তোড়ে ভেসে যেত। কারণ, এদের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও নেই।

হক্কানী ওলামায়ে কেরামের দীনের ওপর দৃঢ়তা

কিন্তু আমাদের হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইমাম সেসব বাতিলের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন। আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই মধ্য এশিয়ার সেসব ওলামায়ে কেরামকে, যারা সত্তর বছর নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়াকে সহ্য করে নিয়েছেন; তবুও দীনকে নিজের বুক হতে বিচ্ছিন্ন হতে দেননি। একপর্যায়ে যখন অত্যাচারের কালো রাতের অবসান ঘটল, তখন সেই ওলামায়ে কেরাম পুনরায় সেই দীনের মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর জনসাধারণ সেই দীনকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে নিয়েছে।

মধ্য এশিয়ার ইল্‌মী অবদান

এরাই হলো সেই দীনের তালিবে ইল্‌ম, যাদের পূর্বপুরুষরা অনেক বড় ঝাপটা সয়ে দীনকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আজ তাদেরই রূহানী সন্তানরা এই দেশসমূহে ইল্‌ম অর্জনের জন্য আসছে। কেউ সউদী আরব যাচ্ছে, কেউ পাকিস্তান যাচ্ছে, আবার কেউ যাচ্ছে হিন্দুস্তানের দারুল উলূম দেওবন্দ। আজ ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ (রহ.)-এর রূহানী সন্তানরা ইল্‌মে দীন শিক্ষা করার জন্য আমাদের এ অঞ্চলে আসছে। এটি আমাদের ও মাদরাসার শুভানুধ্যায়ীদের জন্য কতই-না সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের দেশের ওলামায়ে কেরামের কারণে আজ বিদেশী ছাত্ররা সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে কুরআন ও হাদীছের ইল্‌ম অর্জনের জন্য আসে এবং যোগ্য আলেমে দীন হয়ে স্বদেশে ফিরে গিয়ে দীনের প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

আপনি তো কমিউনিজম ও সোস্যালিজমের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেননি। আজ এই ওলামায়ে কেরামই ইসলামের সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। তাদের রূহানী পূর্বপুরুষদের ওপর কুরআন ও হাদীছের প্রচার-প্রসার এবং বিশুদ্ধ দীনের দাওয়াতের গুরুদায়িত্ব ছিল, তাদের সেই অসমাপ্ত দায়িত্ব আদায়ে আজকের এই সুসন্তানরা নিরলস মেহনত-মুজাহাদা করে যাচ্ছে। রব্বুল ইয্‌যত ফয়সালাবাদের ওলামায়ে কেরামকে এই সৌভাগ্য ও মর্যাদা দান করেছেন যে, তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মধ্য এশিয়ার ছাত্ররাও কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

ইংরেজীর প্রতি অতিপ্রেম!

এর বিপরীতে যদি ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর কথা বলি, তাহলে বলতে হয়, এরা তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইংরেজ সেজে আছে। এতটা ইংরেজী প্রেমবোধ আশা করি 'শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের' মধ্যেও পাওয়া যাবে না, যতটা প্রেমবোধ 'কৃষ্ণাঙ্গ ইংরেজের' মধ্যে পাওয়া যায়। এ কারণেই যখন তাদের ঘরে কোনো নবজাতক জন্মগ্রহণ করে, তখন তাদেরকে আরবীতে কোনো কিছু শিখানোর পরিবর্তে

TwinKle, twinKle, little, star.
How g wondar what you are.

এসব শিখায়। এক ব্যক্তি ইংরেজী সম্পর্কে খুব চমৎকার কবিতা আবৃতি করতেন। বলতেন-

سنا ہے کہ وہاں ہوگی بولی عرب کی* مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی.

'শুনেছি পরকালে আরবী ভাষায় স॰ কথাবার্তা হবে। সেখানে আরবী ভাষা-ই কাজে আসবে। কিন্তু কী আশ্চর্যের ব্যাপার! এখানে আমাদের সন্তানরা সবাই দুর্দান্ত ইংরেজী শিখছে!'

আরও মজার ব্যাপার হলো, মাতৃভাষায়ও তো কথা বলা যেতে পারে। মাতৃভাষার চর্চা হবে, কিন্তু তা না করে ইংরেজী ভাষায় কথা বলাকে, ইংরেজী শব্দের ব্যবহারকে সম্মানজনক মনে করা হয়। যেমন-'আম্মু'র জন্য 'মম'- 'বাবা'র জন্য 'ডেডি' কন্যার জন্য 'টেডি' মানে সর্বদা 'রেডি'! এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করাকে তারা খুব পছন্দ করে। আপনি তাদের দৈনন্দিন জীবনের পরস্পরের কথাবার্তা শুনুন, বিস্ময়কর ইংরেজীপ্রেম দেখতে পাবেন। যদি তাদের বলেন, ভাই! একটু আরবী পড়ে শোনান তো, তাহলে তারা কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতও বিশুদ্ধভাবে পড়ে শোনাতে পারবে না। পক্ষান্তরে ইংরেজী বলতে বলুন, দেখবেন, যন্ত্রের মতো ফরফর করে ইংরেজী বলছে!

সময় এসেছে ভেবে দেখার

আজকের বাবা-মা পছন্দ করেন, তার সন্তান স্কুলে পড়ুক। ভালো কথা; অবশ্যই স্কুলে দিন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, এটি জীবনের একটি অনুসঙ্গমাত্র, মূল লক্ষ নয়। আপনি সন্তানদের যেভাবে ইংরেজী শিক্ষা দিচ্ছেন, সেভাবে কিন্তু আরবী শিক্ষা দেন না। কেন? আপনার সন্তান কুরআনের অর্থ কেন পড়ে না? আমাদের ওপর কি কুরআনের কোনো হক নেই? আমরা কুরআন পড়ব, বুঝব এটাই তো আমাদের ওপর কুরআনের হক।

ও হে মা! তুমি কি দীন ও দুনিয়াকে সমান-সমান রাখতে চাও! ও হে পিতা! তুমিও দীন ও দুনিয়াকে সমান-সমান রাখার ফয়সালায় বিশ্বাসী! অথচ তোমার পাঁচ সন্তানের মধ্যে পাঁচটিই কলেজে যাচ্ছে। এমন একটি সন্তানও তোমার নেই, কুরআন-হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য মাদরাসায় যায়। কখনও তাফসীর পড়ে, কখনও ফিক্‌হ পড়ে?

ও হে মা! তোমার অন্তরে এই আক্ষেপ কেন তৈরি হচ্ছে না যে, হায় আমার একটি সন্তানও এমন নেই যে, কুরআনকে বুকে জড়িয়ে রাখত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ মুখস্থ করত এবং

চোখের পানি ফেলে আমার জন্য দু'আ করত? এমন একটি সন্তান কি তোমার থাকা উচিৎ নয় যে তোমার জন্য শাফায়াতের যোগ্য হবে? হাদীছে পাকে এসেছে, হাফেযে কুরআনগণ এমনিভাবে ওলামায়ে কেরাম এমন মানুষের মুক্তির জন্য সুপারিশ করার সুযোগ পাবে, যাদের ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন কোনো ডাক্তার বা কোনো ইঞ্জিনিয়ারকে তো এই মর্যাদা দেওয়া হবে না।

ও হে মা! তোমার অন্তত একটি সন্তানও যদি এমন হতো, যার কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমার মাথায় নূরের টুপি রাখতেন! কতই-না ভালো হতো যদি তুমিও তোমার একটি সন্তানকে আলেমে দীন বানিয়ে নিতে পারতে। কিন্তু এমন হয় না। বাস শুধু এতটুকুই বিষয় যে, দুনিয়ার কামাই-উপার্জনে আমার সন্তান একজন সফল দুনিয়াদার হোক এজন্য আমাদের কত আয়োজন। অথচ তার আখেরাত যে ধ্বংস হয়ে গেল, তার দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাদের ঈমান-আমলের এই করুণ দশা কেন? কারণ, আমাদের দৃষ্টি থেকে আখেরাতের গুরুত্ব কমে গেছে। আখেরাতের কথা ভেবে আমরা এখন আর আলোড়িত হই না, শিহরিত হই না, অশ্রুসিক্ত হই না। কখনও এই অনুভব জাগ্রত হয়নি যে, সন্তানদের আখেরাত বরবাদ করে যে তাদেরকে জাগতিক শিক্ষা দিচ্ছি, এতে প্রাপ্তিটা কেমন? এর সাথে ঈমানবিধ্বংসী কিছু মিশে যাচ্ছে না তো? আকবর ইলাহী বলতেন-

ہم سمجھتے تھے لائیگی فراغت تعلیم * کیا خبر تھی چلا آئیگا الحاد بھی ساتھ.

'আমরা ভেবেছিলাম, শিক্ষা শেষে জ্ঞান নিয়ে আসবে। কে জানত, তার সাথে-সাথে নাস্তিকতও ঘরে চলে আসবে?'

যদি এই শিক্ষার অন্তরালে নাস্তিকতা চলে আসে, তখন তুমি কি করবে?'

সুতরাং আমাদের উচিৎ, এই ইংরেজী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাদরাসায় পাঠিয়ে দীন শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দেওয়া। যে যতটা ইল্‌ম অর্জন করতে পারে করুক। কুরআন ও হাদীছের ইল্‌মের সান্নিধ্যে থেকে আলোকিত জীবনের সন্ধান পাবে। আমাদের ইংরেজী শিক্ষার লোকেরা বলে থাকে যে, এই আলেম-ওলামারা নিজের জীবনের অর্ধেক সময় অর্থহীনভাবে কাটিয়ে দিল কিছুই শিখল না। এখন তারা কিভাবে উপার্জন করবে, কিভাবে সংসার পরিচালনা করবে? বন্ধুরা আমার! এ জাতীয় মন্তব্য মাদরাসার নূরানী পরিবেশ ও ফলাফলের সঙ্গে অপরিচিতির কারণে করা হয়। অন্যথায় দীনের সফলতা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়।

একটি চমৎকার ঘটনা

এই মুহূর্তে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটি আমরা ইংলিশ পাঠ্য বইতে পড়তাম। তাহলো, এক অঞ্চলে পাশাপাশি কয়েকটি দ্বীপ ছিল। এর মধ্যে এক দ্বীপে বসতবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল। আর স্কুল নির্মাণ করা হয়েছিল অন্য দ্বীপে। তাই বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার জন্য নৌকায় চড়ে যেতে হতো। একদিন সেই ছেলেদের মধ্যে দুষ্টু বুদ্ধি এল। তারা নৌকায় চড়ে মাঝিকে নানা প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চাইল। একজন এগিয়ে গিয়ে মাঝিকে বলল, আচ্ছা মাঝি! তুমি কি জ্যামিতি জান? মাঝি উত্তর দিল না; বাবাজি। ছেলেটি বলল, Then you have wasted halg of yowr lige. তাহলে তো তুমি নিজের জীবনের অর্ধেক ধ্বংস করে দিয়েছ এবং নিজেরা একটু মজা করে হাসল। কিছুক্ষণ পর আরেকটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, আচ্ছা মাঝি! বলো তো সাইক্লোজি (মনোবিজ্ঞান) কাকে বলে? মাঝি উত্তর দিল, কিভাবে বলব; এ তো আমার জানা নেই। ছেলেটা হেসে বলল, Then you have wasted halg of yowr lige. তাহলে তো তুমি তোমার জীবনের অর্ধেক ধ্বংস করে দিলে। কিছুক্ষণ পর আরেকজন এসে বলল, আচ্ছা মাঝি! বলো তো ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি কাকে বলে? মাঝি বলল, জানি না বাবা! এসব আমরা কী করে জানব। ছেলেটা বলল, Then you have wasted halg of yowr lige. তাহলে তো তোমার জীবনের অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গেল।

বাচ্চারা এ ধরনের কথা দিয়ে মাঝিকে নিয়ে হাসি-তামাশায় মেতে উঠল। হঠাৎ চতুর্দিক কালো হয়ে বৃষ্টি ঝরতে লাগল। নদীর বুকে বড়-বড় তরঙ্গ ফুলে উঠল। নৌকা একবার ডানে আর একবার বাঁয়ে কাত হয়ে ডোবার উপক্রম করছে। এবার মাঝি সবাইকে সম্বোধন করে বলল, কি বাবারা! নদীতে ঢেউ উঠেছে, সাঁতার কাটতে পার তো? সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল না মাঝি! আমরা তো সাঁতার জানি না! এবার মৃদু হেসে মাঝি বলল, Then you have wasted whole of yowr lige. তাহলে তো তোমরা নিজেদের পুরো জীবনটাই ধ্বংস করে দিলে। এখন তোমাদের ডুবে মরতে হবে।

কিয়ামতের দিন ঠিক এমনই হবে। আজ তো আপনারা ওলামায়ে কেরামকে বলছেন, তোমরা নিজেদের জীবনের অর্ধেকটাই ধ্বংস করে দিলে। কিন্তু হাশরের ময়দানে গিয়ে দেখবেন আপনারা নিজেদের জীবনের পুরোটাই

ধ্বংস করে দিয়েছেন। হিসাব-নিকাশের পর ওলামায়ে কেরাম যাচ্ছেন জান্নাতে আর আপনারা যাচ্ছেন জাহান্নামে। তখন ব্যাপারটা কেমন লাগবে?

সুতরাং আসুন, আমরা বরং কথার ভঙ্গি পরিবর্তন করে এভাবে বলি যে, ওই পাঁচ পার্সেন্ট ওলামায়ে কেরাম যারা দীনের হেফাযতে আত্মনিয়োগ করেছেন, কুরআনের প্রতিটি আয়াতকে হুবহু সংরক্ষণ করেছেন, তাদেরকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির আঙিনায় টেনে না এনে বরং পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইংরেজী শিক্ষিতদের বলুন, জনাব! আপনারা জাগতিক শিক্ষা তো অর্জন করেছেনই, এবার কিছু দীনি শিক্ষাও শিখে নিন। যেন পরকালে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করার মতো কিছু সম্বল জোগাড় করতে পারেন।

পাশাপাশি এ বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে যে, আজকের তরুণ ইংরেজী শিক্ষিতরাই আগামী দিনের নেতৃত্বদানকারী শ্রেণি। এরাই আগামীতে জাতির কাণ্ডারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, তাই এদের মধ্যেও দীনি অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, তোমাদের জন্য মাদরাসায় যাতায়াত রাখাও খুব প্রয়োজন। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি দীন না শিখবে, ততক্ষণ তোমার ঈমান নিরাপদ থাকবে না। আর ঈমানই তো আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। তা-ই যদি হারিয়ে বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আর আমাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়?

ফেতনার যুগে দীনরক্ষা

আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন ওইসব ওলামায়ে কেরামকে, যারা সর্বদা দীনকে বুকে আগলে রেখেছেন। এ কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। মানুষ নিজের বেলায় দরিদ্রতা সহ্য করে নিলেও সন্তান ও পরিবারের বেলায় তা মেনে নেয়া দুষ্কর। আপনি চিন্তা করে দেখুন, ইংরেজদের শাসনামলে দীন কারা শিখিয়েছিল? একমাত্র ওলামায়ে কেরাম। তারপর তারা তাদের সন্তানদের শিখিয়েছেন। আমরা 'মিষ্টার' উপাধি গ্রহণ করছি, অফিস-আদালতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দুনিয়ার উচ্চশিক্ষিত হওয়ার গৌরব অর্জন করছি; কিন্তু দীনের জন্য কী করছি? অথচ এই ওলামায়ে কেরাম দিনের-পর-দিন দরিদ্রতার কষাঘাত সহ্য করে, 'অল্পে তুষ্টি'র জীবন গ্রহণ করে নিয়েছেন অবলীলায়; তারপরও দীনের গায়ে কোনো আঁচড় লাগতে দেননি। যখন ইংরেজরা দীনের মধ্যে বিষ ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল, তখন এই ওলামায়ে কেরাম তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যেখানেই বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সেখানেই তারা সিসাঢালা প্রাচীরের মতো প্রতিরোধ

গড়ে তুলেছিলেন। ইহুদীবাদ-খৃষ্টাবাদ, মির্জাবাদ অথবা পারভেজী মতবাদ সর্বক্ষেত্রে এই ওলামায়ে কেরামই প্রতিবাদী কণ্ঠে গর্জে উঠেছিলেন। ফলে সেই ফেতনাগুলোর শেষরক্ষা হয়নি। নিজেই নিজের মৃত্যু ঘটিয়েছে।

کفر ناچا جن کے آگے بارہا ٹگنی کا ناچ

جس طرح جلتے توے پہ ناچ کرنا ہے سپند.

ان میں قاسم ہوں کے انور شاہ کہ محمود الحسن

سب کے دل تھے درد مند اور سب کی فطرت ارجمند.

'কুফর যাদের সামনে বারবার নর্তকীর নাচ নেচেছে, ফুটন্ত তাওয়ায় নাচা যেমন পছন্দের। এক্ষেত্রে কাসেম হোক বা আনওয়ার শাহ কিংবা মাহমুদ হাসান; সবার অন্তর ছিল ব্যথিত, সবার স্বভাব ছিল পূত-পবিত্র।'

এরাই দীনের জন্য মমতাবোধ ও সহমর্মিতার হৃদয়ধারী ছিলেন। এই ওলামায়ে কেরামই সকল মাঠে, সকল ময়দানে কুফরি শক্তির দাঁত ভেঙে দিয়েছিলেন এবং ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত করেছিলেন। এদেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে দীন আজ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এমনকি একটি সময় এমনও আসবে, যখন দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে এবং বহু মুমিন বান্দাকে তার চক্রান্তের জালে আটকে ফেলবে। বলুন তো! সেখানে আমাদের সঠিক পথের দিশা কে দেবে? সেখানে কি কোনো ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতা কাজে আসবে?

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব ইরশাদ করেছেন, যখন দাজ্জাল মদীনা তায়্যিবার দিকে ছুটবে, তখন সেখানে ফেরেশতাদের পাহারার কারণে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। তদুপরি সেখানে সে প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্প ঘটাবে, যা দেখে দুর্বল ঈমানদাররা শহর থেকে বের হয়ে তার প্রতারণার ফাঁদে পা দেবে। একজন মুমিন বান্দাও সেই ভূমিকম্পের শব্দ শুনে মদীনা থেকে বের হয়ে আসবে। তার উদ্দেশ্য থাকবে শুধু দাজ্জালকে দেখা। দাজ্জাল তাকে দেখে বলবে, 'তুই আমাকে খোদা স্বীকার করে নে।' মুমিন বলবে, 'কিছুতেই না। কারণ, তুই পাক্কা কাফের।' দাজ্জাল বলবে, 'আমি তোকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করতে পারব।' মুমিন বলবে, পারলে করে দেখা। দাজ্জাল তাকে হত্যা করবে। সে মারা যাবে এবং পুনরায় তাকে

জীবিতও করবে। দাজ্জালের মেরে জীবিত করার ক্ষমতাটুকু শুধু একবারের জন্য থাকবে, দ্বিতীয়বার আর সে পারবে না। মুমিন বান্দার বিষয়টি জানা থাকবে। তো দাজ্জাল তাকে মেরে জীবিত করার কারিশমা দেখিয়ে বলবে, এবার আমাকে খোদা মেনে নে। তখন মুমিন বলবে, ঠিক আছে, আরেকবার হত্যা করে জীবিত কর। কিন্তু দাজ্জাল তা পারবে না এবং লজ্জিত হবে।

ওলামায়ে কেরামের বরকত

এই ওলামায়ে কেরামের বরকতেই আজ পৃথিবীবাসী অনেক বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাচ্ছে। আজ যেভাবে পাপের ছড়াছড়ি শুরু হয়েছে, পাপের আগুনেই সব জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম সেই আগুনে পানি ঢালার কাজ করছেন। তারা ফোঁটা-ফোঁটা পানি ঢেলে উম্মতকে পাপের আগুনে দগ্ধ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাদের প্রচেষ্টায় যদিও আগুন পুরোপুরি নিভবে না; তবুও প্রত্যেক মানুষই তার কর্মের ফলাফল পেয়েই যাবে।

ভালোবাসার দাবি পূরণ

বিষয়টি একটি অপূর্ব উপমা দিয়ে বুঝুন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখন নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, অগ্নি শিখা এত বিশাল ছিল যে, ঊর্ধ্বাকাশে উড়ন্ত পাখি যদি সেই অগ্নিকুণ্ডের ওপর দিয়ে যেত, তো ডানা ঝলসে সে নিচে পড়ে যেত। ওই সময় ছোট্ট একটা পাখি ঠোঁটে করে এক ফোঁটা পানি আনত আর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আগুনের কুণ্ডলির ওপর নিক্ষেপ করত। অন্য পাখিরা জিজ্ঞাসা করল, তোমার এই এক ফোঁটা পানি দিয়ে আগুন নিভবে? পাখিটা উত্তর দিল, 'আমি জানি, এই এক ফোঁটা পানিতে আগুন নিভবে না; কিন্তু আমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বন্ধুত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁর নবুওয়াতের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা প্রদর্শন করছি।'

তো ভাই! ওই মাদরাসাগুলোকেও সেই ছোট্ট পাখি-ই মনে করুন, যারা নিজেদের ঠোঁটের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও আল্লাহর রহমতের এক একটি ফোঁটা নিয়ে পাপের আগুনে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করছে।

দুনিয়াতে ওলামায়ে কিরামের প্রয়োজন

আপনারা এই মাদরাসাগুলোর প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাবেন। মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষকে সুনজরে দেখার চেষ্টা করবেন। যাঁরা

এসব মাদরাসায় খেদমত করছেন, তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখবেন। মনে রাখবেন, যখন আপনি ভূমিষ্ট হয়েছিলেন, তখন এই ওলামায়ে কেরামই সর্ব প্রথম আপনার কানে আল্লাহর নামের উচ্চারণ পৌঁছিয়েছেন। যখন আপনি জীবনের পূর্ণতার জন্য একজন জীবনসঙ্গিনীর সন্ধান করেন, তখন এরাই বিবাহের খুতবা পাঠ করে তাদেরকে আপনাদের জন্য হালাল করেন। আবার যখন এ অবিনশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায়ের ডাক পড়ে, তখনও এরাই আপনার জানাযার নামায পড়িয়ে দাফনের ব্যবস্থ করেন।

জান্নাতেও ওলামায়ে কিরামের প্রয়োজন

এটিও একটি মজার ব্যাপার যে, ওলামায়ে কেরামের প্রয়োজনীয়তা জাতি যে শুধু দুনিয়াতেই অনুভব করবে, তা নয়। বরং জান্নাতে গিয়েও পদে-পদে তাঁদের প্রয়োজন দেখা দেবে। একজন সাধারণ মানুষ ভাবতে পারে, জান্নাতে আবার ওলামায়ে কেরামের প্রয়োজনীয়তা কিভাবে দেখা দিতে পারে? তাহলে শুনুন, হাদীছে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের জান্নাতে সবধরনের নেয়ামত দান করবেন এবং তারাও এই নেয়ামত পেয়ে যারপরনাই খুশি হবে। এভাবে দ্বীর্ঘ সময় পার হবে। অবশেষে একদিন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, হে জান্নাতীরা! তোদের আর কিছু লাগবে কি? তারা উত্তর দেবে, হে দয়াময়! এমন কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছি না, যার আমাদের প্রয়োজন হবে; সব কিছুই তো আপনি দান করেছেন। তাদের মস্তিষ্কে কোনো কিছুই আসবে না।

শেষমেষ আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের ওলামায়ে কেরামকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, এমন কোনো জিনিস বাকি আছে কিনা, যা আমরা পাইনি; অথচ এর প্রয়োজন আমাদের আছে? হাদীছে আছে, জান্নাতীরা সেদিন নিজ নিজ পরিচিত ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করবেন এবং তাদের শরণাপন্ন হবেন। তারা উত্তর দেবেন, হ্যাঁ; নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, জান্নাতে সব ধরনের নেয়ামতের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার দিদারও নসিব হবে। এখনও সেই দিদার আমরা লাভ করতে পারিনি। তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার নিকট 'দিদার' প্রার্থনা করো। সবাই দিদার প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা কবুল করে তাদের 'দিদার' দান করবেন।

সুবহানাল্লাহ! ওলামায়ে কেরাম সেই জামাত, যাদের প্রয়োজন আপনি জান্নাতেও অনুভব করবেন। দু'আ করি, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত এই ওলামায়ে

কেরামের মহব্বত ও ভালোবাসা আমাদের অন্তরে ঢেলে দিন। এ কারণেই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

'হে ঈমানদার লোকসকল! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহয্য কর, তাঁহলে তিনিও তোমদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম জমিয়ে দেবেন।'[১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব ওলামা হযরতের বেশি-বেশি খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমরা ওলামায়ে কিরামের সাধ্যমতো খেদমতও করব এবং তাদের কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করব। কারণ, এরা পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাবান কাজ করছে। যদি কারো এই সৌভাগ্য হয়ে যায় যে, সে তার সন্তানদের এসব দীনি প্রতিষ্ঠানে পড়তে দেন, তাহলে সত্যিই তিনি মোবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। সুবহানাল্লাহ! আজ যখন এসব কচি-কচি হাফেযে কুরআনকে পাগড়ি পরাচ্ছিলাম, তখন আমার মনে একথা দোল খেয়েছিল যে, 'হে আল্লাহ! আজ তো আমরা এদের কাপড়ের মুকুট পরাচ্ছি, কাল যখন এরা আপনার কাছে আসবে, আপনি তো এদের নূরের মুকুট পরাবেন। আহ! কী সৌভাগ্য এদের!

আমাদেরও উচিত, নিজেদের সন্তানদের দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া। আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করি, তিনি যেন আমাদের মতো ইংরেজী শিক্ষিতদেরও দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

---

১. সূরা মুহাম্মাদ : ৭

সৎকর্মশীলদের সাহচর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আল্লাহর অনুগত একদল ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা

হযরত মুর্শিদে আলম (রহ.) প্রায়ই বলতেন, মানুষের পৃথিবীতে এসে পড়া সহজ বিষয়। কিন্তু প্রকৃত মানুষ হওয়া সহজ বিষয় নয়। যে নির্মাণ করে কিংবা নির্মিত হয়, সে বোঝে বিষয়টি কতখানি কষ্টসাধ্য। একথা শতভাগ সত্য যে, মানুষ নিজেকে গড়তে চাইলেই তা পেরে ওঠে না। বরং কারো-না-কারো হাতে তাকে পড়তে হয়ই। যেমন- তাওরাত প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, এতে সকল বিধান বর্ণিত আছে। কিন্ত তারপরও তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরা মুসার অনুসরণ করো। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এতে সবকিছু পরিষ্কারভাবে বলা আছে। তারপরও আদেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরা রাসূলের অনুসরণ করো।

আমাদের প্রিয়নবী এই পৃথিবীতে দুটি বস্তু নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। এক. উজ্জ্বল কিতাব। দুই. পরিপূর্ণ আমল। মানবতার হেদায়াতের জন্য এই দুটি পথ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে কুরআন পাক অবতীর্ণ হতো; কিন্তু তারপরও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ইলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, রাসূল তাদের তাযকিয়া (পরিশুদ্ধি) করবেন। বোঝা গেল, আত্মিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির জন্য একজন আধ্যাত্মিক মুরুব্বীর প্রয়োজন আছে। যেমন- কাপড় ধোওয়ার জন্য একজন ধোপার প্রয়োজন, যে কাপড়ে সাবান লাগাবে, কাঁচড়াবে এবং পানি দ্বারা ময়লা আবর্জনা দূর করবে, তদ্রূপ অন্তরের বিষয়টিও এমন।

একটি যৌক্তিক দলিল

কোনো ছাত্র যখন পরীক্ষার হলে প্রশ্নোত্তর লিখতে বসে, তখন সে তার ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি উত্তর সঠিকভাবে লেখে। কোনো উত্তরই ভুল ভেবে লেখে না। কারণ, সেই বেচারা রাতভর জেগে জেগে মেহনত করে, কেঁদে-কেঁদে দু'আ করেছে। হে আল্লাহ! আমি যেন পাস করি। সুতরাং বুঝে-শুনে ভুল লেখার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তার উত্তরপত্র যখন কোনো পরীক্ষকের সামনে পড়ে, তখন তিনি বলে দেন, এটা ভুল, ওটা ভুল। আর তখন ছাত্র তার ভুল উপলব্ধি করতে পারে। ঠিক এভাবেই মানুষের আত্মিক বিষয়টি বুঝুন।

মানুষ নিজে-নিজে কখনও আত্মশুদ্ধি করতে পারে না। কারণ, নফ্স ও প্রবৃত্তি তার দোষ-ত্রুটিগুলো তার সামনে সুসজ্জিত করে দেখাবে। প্রত্যেকটি কাজের কোনো-না-কোনো Logic (যুক্তি) সে উপস্থাপন করবেই, যার কারণে তা বৈধ বলে মনে হবে। ঘুষখোর সর্বদা বলবে, আমি নিজের জন্য তো ঘুষ খাচ্ছি না, ছেলে-সন্তান, পরিবার-পরিজনের জন্য নিচ্ছি। তাদেরকে লালন-পালনের দায়িত্ব তো আমারই। এভাবেই মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সব ধরনের পাপে লিপ্ত হয়। আর এ কারণেই একজন কামেল শায়খের প্রয়োজন। যিনি সর্বদা তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকা সহজ করে দেবেন। আল্লাহ করুন আমাদের সবার জন্য একজন আল্লাহওয়ালার সংশ্রবে থাকার তাওফীক দান করুন। অন্যথায় আগামী দিনের ভয়াবহ পরিণতি কাউকে ছাড় দেবে না।

হযরত মুর্শিদে আলমের আক্ষেপ

হযরত মুর্শিদে আলম একবার হজে গিয়েছিলেন। সেখানে হযরত কারী ফাতাহ মুহাম্মাদ (রহ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর বাসায় গেলেন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন হযরত কারী সাহেব শুয়ে আরাম করছিলেন। হযরত বলছিলেন, আমি হযরত কারী সাহেবকে শোওয়া অবস্থায় দেখে নীরবে তার পা টিপে দিতে লাগলাম। হযরত আমাকে দেখে সঙ্গে-সঙ্গে পা গুটিয়ে নিলেন। বললেন, না, না, জনাব! আমি আপনাকে একাজ করতে দিতে পারি না। আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করেও তা পারলাম না। অবশেষে আমি কেঁদে ফেললাম। বললাম, আজ এ কেমন সময় এল আমার জীবনে যে, এমন একজন আল্লাহর বান্দা খুঁজে পাচ্ছি না, যিনি আমাকে তার পা টিপার অনুমতি দেবেন!

বড়দের কর্মপন্থা ও শায়খের প্রয়োজনীয়তা

সাধকের মাথার ওপর শায়খের অন্তরদৃষ্টি ও দু'আর ছায়া থাকে। একারণেই বড়-বড় বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য গ্রহণ করে নিজের ইল্‌ম ও আমলের পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করেছেন। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলতেন, যদি সূফী আবূহাশেম না হতেন, তাহলে রিয়া ও অহংকারের অনেক সুক্ষ্ম বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারতাম না। স্বয়ং ইমাম আযম আবূহানীফা (রহ.) হযরত জাফর সাদেক (রহ.)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন, যিনি নকশবন্দী সিলসিলার পঞ্চম স্তরের একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আবূহানীফা (রহ.) বলেন, 'যদি এ দুটি বছর না থাকত, তাহলে নোমান (ইমাম আবূহানীফার মূল নাম) ধ্বংস হয়ে যেত।'

ইমাম গায্‌যালী (রহ.)-এর পীর ও মুরশিদ শায়খ খাজা আবূআলী ফারমাদী (রহ.) ও নকশবন্দী সিলসিলার একজন বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন। তার সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম গায্‌যালী (রহ.) লিখেছেন, আমি খাজা আবূ আলী ফারমাদী (রহ.) হতে জাহেরী তরবিয়তের পাশাপাশি নকশবন্দী সিলসিলার বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক কামালাতও অর্জন করেছি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বিশ্‌র আল-হাফী (রহ.)-এর মজলিসে যেতেন। কেউ একজন বলল, হযরত! আপনি এত বড় আলেম ও মুহাদ্দিছ হয়ে একজন ফাটা-ছেঁড়া পোশাকধারীর কাছে কী উদ্দেশ্যে যান? তিনি উত্তর দিলেন, আমি হলাম আল্লাহর কিতাবের আলেম আর তিনি আল্লাহর মারেফাতের আলেম। এজন্য আমি তার খেদমতে উপস্থিত হই।

ইমাম গায্‌যালী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে ইল্‌ম অর্জনের লক্ষ্য

ইমাম গায্‌যালী (রহ.) ছাত্রজীবন থেকেই হযরত বূআলী ফারমাদী (রহ.)-এর সাহচর্য পেয়েছিলেন। তাঁর তরবিয়ত ও সাহচর্যের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তাঁর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। ইমাম গায্‌যালী (রহ.) যে মাদরাসায় পড়তেন, তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেকালের বাদশা নিযামুল মুল্‌ক তুসী (রহ.)। মাদরাসার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে জানানো হলো, হযরত আপনার মাদরাসায় যারাই পড়া-শোনা করে, তাদের কারুরই ভবিষ্যতে দীনি খেদমত উদ্দেশ্য নয়; সবার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া উপার্জন। সংবাদটি শোনার পর তিনি বললেন, আচ্ছা! এত অর্থ খরচ করছি আর ছাত্ররা দীন শিখছে দুনিয়া কামানোর জন্য; তাহলে তো মাদরাসা বন্ধ

করে দেওয়াই উত্তম। কিন্তু অন্তরে এই ভাবনা জাগল যে, আচ্ছা; ব্যাপারটা একবার যাচাই করে দেখা যাক। সংবাদের সত্যতা নিজেই পর্যবেক্ষণ করে দেখি।

পরদিন বাদশা নিযামুল মুল্‌ক তার শাহী পোশাক ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরিধান করে মাদরাসায় পৌঁছলেন। একছাত্রের সঙ্গে দেখা করে বললেন, ভাই এখানে তুমি কী উদ্দেশ্যে লেখা-পড়া করছ? ছাত্র বলল, আমার পিতা অনেক বড় বিচারক; আমিও বিচারক হতে চাই। আরেক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই! এখানে তুমি কী উদ্দেশ্যে লেখা-পড়া করছ? সে উত্তর দিল, আমার বাবা অনেক বড় মুফতী; আমিও তাঁর মতো মুফতী হব এবং মানুষের মধ্যে অনেক মর্যাদার অধিকারী হব। অপর একজন বলল, বাদশা নিযামুল মুল্‌ক ওলামায়ে কিরামের খুব ইয্‌যত করেন; তাই লেখা-পড়া করে তার দরবারের একজন ভালো সভাসদ হতে চাই।

বাদশা নিযামুল মুল্‌ক এসব উত্তর শুনে ভিতরে-ভিতরে মর্মাহত হলেন। ভাবলেন, হায়রে সত্যিই তো মাদরাসাটি দুনিয়ালোভী ছাত্র দিয়ে ভরে আছে। আমার এসব অর্থ-কড়ি সব বিফলে যাচ্ছে। তিনি ভগ্নহৃদয়ে মাদরাসা থেকে বের হচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন, নাহ এ মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়াই উত্তম হবে। কারণ, একজন ছাত্রও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এখানে লেখা-পড়া করছে না। বাইরের দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় তৎসংলগ্ন একটা কামরার দিকে তার দৃষ্টি পড়লে। কাছে গিয়ে দেখলেন, একটা অল্প বয়সী ছাত্র একাগ্র চিত্তে কিতাব পড়ছে। সামনে মিটমিট করে একটা বাতি জ্বলছে। খুবই সাধারণ বেশভুষা। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে সালাম দিলেন। ছাত্রটি সালামের উত্তর দিয়ে নীরবে পড়তে লাগল। বাদশাহ কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বললেন, কী হলো ভাই! আপনি যে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না? ছাত্রটি উত্তর দিল, আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় তো আমার নেই।

বাদশা বললেন, আমি তোমাকে ছোট্ট একটি প্রশ্ন করব; আমাকে সংক্ষেপে উত্তর দাও! তিনি মাথা না তুলেই বললেন, বলুন কী প্রশ্ন? বাদশা বললেন, তুমি কী উদ্দেশ্যে এই মাদরাসায় পড়া-লেখা করছ? উত্তরে ছাত্রটি বলল, আমার জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আমার জানা নেই, কিভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করব। তবে এসব কুরআন ও হাদীছের কিতাবে তার উপায় ও পদ্ধতি লেখা আছে। সেগুলো পড়ে সে অনুযায়ী আমল করে স্বীয় রবকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব।

বাদশা নিযামুল মুল্ক ছাত্রটির উত্তর শুনে মুগ্ধ হলেন এবং সেখান থেকে চলে এলেন। মনে-মনে খুবই তৃপ্ত হলেন যে, নাহ আলহামদুলিল্লাহ একটি ছাত্র হলেও এমন আছে, যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শিক্ষা লাভ করছে। তিনি শুধু তার খাতিরে মাদরাসা বন্ধ করলেন না।

বন্ধুরা! এই ছাত্রটিই যখন বড় হলো, নিজের যুগের একজন খ্যাতিমান ইমাম হয়েছিলেন, যাকে গোটা পৃথিবী ইমাম গায্যালী নামে চিনে। তো এ ছোট্ট শিশু গায্যালীর মধ্যে বিশুদ্ধ চিন্তা ও কর্মনিষ্ঠা কোথা থেকে এল? এ ছিল শায়খের সোহবাত ও সাহচর্য, যিনি শিশু বেলায়ই কচি অন্তরে এই জযবা ও অনুভূতি ঢেলে দিলেন যে, দীনি ইল্ম শিক্ষা করার একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

আল্লাহর সন্তুষ্টির গুরুত্ব

চাটাইয়ে বসে-বসে যারা লেখা-পড়া করে এবং ইল্ম অর্জন করে, তাঁদের হাঁটুতে-পায়ে চাটাইয়ের চিহ্ন লেগে যায়। অনেকের নামায পড়তে-পড়তে কপালে দাগ পড়ে যায়। স্মরণ রাখবেন, এসব আমলের ক্ষেত্রে যদি অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জযবা বা উৎসাহ না থাকে, তাহলে এসব চিহ্ন কোনো কাজে আসবে না। চতুষ্পদ জন্তু দেখেছেন নিশ্চয়ই। তাদের পায়ে-হাঁটুতেও দাগ থাকে। বলদের হাঁটুতে ঘাড়ে দাগ পাওয়া যাবে। ঘোড়া-গাধার হাঁটুতেও চিহ্ন পাওয়া যাবে। কোনো ছাত্রের মনে যদি এই অনুভূতি জেগে ওঠে যে, আমি দীনি ইল্ম শিক্ষা করার জন্য মেহনত করতে-করতে পায়ে দাগ ফেলে দিয়েছি; তাহলে তার স্মরণ রাখা উচিৎ, এসব শ্রম-সাধনা যদি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে নেকি পাওয়া যাবে। এপথে তার প্রতিটি নিঃশ্বাস বরকতময়। কিন্তু এসবের উদ্দেশ্য যদি হয় দুনিয়া, তাহলে এসব তার জন্য গাধার পিঠের বোঝা বলে বিবেচিত হবে।

মাওলানা ইয়হয়া (রহ.)-এর উক্তি

শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) প্রায়ই বলতেন, আমার আব্বাজান মাওলানা ইয়াহয়া (রহ.) আমাকে বলতেন, তালেবে ইল্ম যতই দুর্বল মেধার হোক, যদি তার মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ার ব্যাধি না থাকে, তাহলে অবশ্যই কখনও-না-কখনও সে তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে। আর তালেবে ইল্ম যতই মেধাবী হোক যদি তার মধ্যে বন্ধুত্ব পাতার স্বভাব থাকে, তাহলে

সে কখনও গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। এমনিভাবে সাধারণ মানুষের ব্যাপারটাও এমন। এখন দেখার বিষয় হলো, সে নিজের জীবনের মূল্যবান সময়গুলো কোন ধরনের লোকদের সংশ্রবে কাটায়।

ভালো বন্ধু ও মন্দ বন্ধুর উদাহরণ

হাদীছে পাকে মন্দ লোকদের কামারের ভাট্রির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভাট্রি হলো কামারের সেই ছোট্ট অগ্নিকুণ্ড, যেখানে কয়লা রেখে বাতাস দিয়ে তা প্রজ্বলিত করা হয়। যদি আপনার বন্ধুত্ব কামারের সঙ্গে হয়, তাহলে তার কাছে যান, কালো কয়লা ব্যতীত কিছুই পাবেন না না। আরও একটু কাছে যাবেন, তো ধোঁয়া পাবেন। আরও কাছে গিয়ে যদি বসেন, তাহলে কাপড় জ্বলে যাবে। মন্দ লোকও আপনাকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। নেককার পুণ্যবান বন্ধুর উদাহরণ হলো আতরওয়ালার মতো। তার নিকট যাবেন, আতরের সুবাস আসবে। ভালো বন্ধু আপনাকে আতরই দেবে। বন্ধু যদি ফাসেক হয়, তাহলে সে বিষই দেবে। আর সেই বিষ পর্যায়ক্রমে আপনার অঙ্গে-অঙ্গে ছড়িয়ে যাবে। এক কবি এই বিষয়টিই এভাবে ব্যাক্ত করেছেন-

جہاں عطر کھنیچتا ہے جاؤوہاں گر * تو آوٴگے اک روز کپڑے بسا کر.

جہاں آگ جلتی ہے جاؤوہاں گر * تو آوگے اک روز کپڑے جلا کر.

یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم * مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم.

'যেখানে আতর তৈরি হয়, যেটা আতরের করখানা, সেখানে আতর লেগেই থাকে। আর যেখানে আগুন জ্বলে, সেখানে যদি যাও, তাহলে একদিন-না-একদিন সেখান থেকে কাপড় জ্বালিয়ে আসতে হবে। যদি কেউ দাবি করে, জনাব! আমি আগুনের পাশেও বসি আবার কাপড় জ্বলতেও দেই না, তাহলে মেনে নিলাম, তোমার কাপড় জ্বলে না, তুমি কাপড় বাঁচিয়ে রাখছ; কিন্তু আগুনের উত্তাপ থেকে তো আর তুমি রেহাই পাচ্ছ না। এমনিভাবে মানুষ মন্দ লোকের সংশ্রবে থেকে যদিও পাপ থেকে দূরে থাকতে পারে, কিন্তু পাপের প্রভাব থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে না।'

অসম শ্রেণির সংশ্রব হতে দূরে থাকা

আধ্যাত্মিক জগতের একজন সাধক যদি তার সমশ্রেণির লোকদের ছেড়ে কোনো অসম শ্রেণির লোকের সংশ্রবে থাকে, তাহলে সে স্বীয় মর্যাদা থেকে

নিচে পড়ে যাবে। অসম শ্রেণি বলতে উদ্দেশ্য হলো, যার উদ্দেশ্য ভিন্ন, একই কাজে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য ভিন্ন-ভিন্ন। সমজাতীয় বা সমশ্রেণির বলা হয়, যখন উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হয়। তাছাড়া খারাপ বন্ধু তো সাপের মতো। যে সুযোগ পেলেই দংশন করে। সাপ দংশন করলে যেমন মানুষ শারীরিকভাবে মৃত্যু বরণ করে। তেমনিভাবে খারাপ বন্ধু যদি কাউকে দংশন করে, তাহলে সে রূহানী ও আত্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করে।

জন্তুর সংশ্রবের প্রভাব

কেউ-কেউ বলেন, হযরতজি! আমার বন্ধুত্ব যদিও ফাসেক-পাপী লোকদের সঙ্গে আছে, তথাপি তাদের কোনো কথা আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাদের একথাটা শতভাগ ভুল। কারণ, মানুষের ওপর যদি পশুর সংশ্রবের প্রভাব পড়তে পারে, তাহলে মানুষের সংশ্রবের প্রভাব কেন পড়বে না? ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যে ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করে, তার মধ্যে এক ধরনের বীরত্ব ও সাহসিকতা কাজ করে। যারা উটের সংশ্রবে থাকে, তাদের মধ্যে গোঁড়ামি পাওয়া যায়। এমনিভাবে যারা ছাগল-বকরির সংশ্রবে থাকে, তাদের মধ্যে নম্রতা ও বিনয় পাওয়া যায়। যদি এসব প্রাণীর সংশ্রবের প্রভাব মানুষের মধ্যে কার্যকর হতে পারে, তাহলে মানুষের সংশ্রবের প্রভাব কেন কার্যকর হবে না?

আল্লাহওয়ালাদের সুনজর

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) একটি বিস্ময়কর কথা বলতেন যে, দেখো, মানুষের বদনজর লাগা শরীয়তকর্তৃক প্রমাণিত বিষয়। যেমন-হাদীছে এসেছে–

اَلْعَيْنُ حَقٌّ

'নজর লাগা সত্য।'

সুতরাং যে দৃষ্টিতে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকে, যদি তা মানুষের ওপর প্রভার বিস্তার করতে পারে, তাহলে শায়খের যে দৃষ্টিতে স্নেহ, মহব্বত ও ইখলাস থাকে, তা কেন মানুষের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না? আল্লাহওয়ালাদেরও নজর লেগে যায়। সেটা বদনজর নয়, সুনজর। আল্লাহ করুন, কারো সুনজর আমাদের অন্তরের ওপর পড়ুক। হ্যাঁ, ভাই! তখনই মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে এবং সরল পথ অনুসরণ করে চলতে পারে।

একারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

'হে মুমিন বান্দারা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎ লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করো।'[১]

তরীকতের পথে সাধকদের মৌলিক দায়িত্ব

মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন-

قال را بگذار مرد حال شو* پیش مرد کامل پامال شو.

صد کتاب وصد ورق در نار کن* جان ودل را جانب دلدار کن.

'ক্বালাকে ছাড়ো এবং আধ্যাত্মিক জগতে কামেল ব্যক্তির সামনে বিলীন হয়ে যাও।

শত কিতাব আর শত শত পৃষ্ঠা এগুলো আগুনে নিক্ষেপ করো এবং মন-প্রাণ সবকিছু শায়খের হাতে সোপর্দ করে দাও।'

মূল্যবান বস্তু কিন্তু শায়খের সোহবত ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই বিষয়টিই এক পাঞ্জাবী কবি এভাবে ব্যক্ত করছিলেন।

مٹی بن کے کمہار دے وس پیئے تے پیالے والڑا بھیس وٹا لئے

قسمت نال جے پک کے توڑ چڑھے مزہ یار دے لباں دا پا لئے

'মাটি হয়ে মাটির পাত্রনির্মাতা কোনো কুমারের হাতে যদি আমরা আসতে পারি, যে আমাদেরকে পাত্রের আকৃতিতে ঢেলে তৈরি করবে আর ভাগ্য জোরে যদি আধ্যাত্মিক সাধনার অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে-পুড়ে বের হতে পারি, তাহলে প্রকৃত প্রিয়তমের ঠোঁটের উষ্ণতা আমাদেরও নসিব হয়ে যাবে।'

বন্ধুরা আমার! আমরা নিজেদের মাটি মনে করি এবং নিজেকে শায়খের হাতে ছেড়ে দিই। তারপর তিনি আমাদেরকে যে আদলে ঢেলে সাজাতে চান, সাজাবেন। তারপর দেখবেন, আল্লাহ আমাদেরকে কেমন মারেফাতের মদিরা পান করান। দেখুন, যে চারা গাছের কোনো মালী নেই, তা কতটা অযত্নে বাকা-তেড়া হয়ে বেড়ে ওঠে, কিন্তু যদি সেই গাছটা মালীর নিপুণ হাতের পরিচর্যা পেত, তাহলে তার সৌন্দর্য ও সজীবতা দেখে সবাই মুগ্ধ হতো।

---

১. সূরা তাওবা : ১১৯

আমি দু'আ করি, আল্লাহ্ আমাদেরও একজন মালী মিলিয়ে দিন, যিনি পরিচর্যা করে আমাদের প্রকৃত মানুষ বানাবেন। তাঁকেই বলে শায়খ।

নবীজির সাহচর্যের প্রভাব

সাহাবায়ে কেরাম যে বিশাল মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন, তা তাঁদের ইল্‌মী পারদর্শিতা কিংবা আমলী নিয়মানুবর্তিতার কারণে ছিল না; বরং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের কারণে ছিল। যেমন- যে সাহাবী, যিনি ঈমান অবস্থায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং কিছুক্ষণ পরই ইন্তেকাল করে গেছেন, এ সাহাবী আল্লাহ তা'আলার দরবারে যে মর্যাদা লাভ করেছেন, সারা দুনিয়ার সকল বড়-বড় অলী-আবদাল, গাউস-কুতুব সবাই যদি একত্র হন, তবুও নবীজির এমন একজন সাহবীর সমান হতে পারবেন না।

হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর মর্যাদা

ইমাম শাফেঈকে (রহ.) কেউ প্রশ্ন করল, হযরত! সাহাবী হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাযি.)-এর মর্যাদা বেশি, নাকি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর মর্যাদা বেশি? হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যুগ ছিল সাহাবা-পরবর্তী যুগ। তিনি তাঁর যুগে একজন ন্যায়পরায়ণ খলীফা ছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)ও একজন শাসক ছিলেন। হযরত আলী (রাযি.)-এর সঙ্গে খেলাফত প্রশ্নে তাঁর অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল। তাই তাঁর শাসনামল খুব একটা শান্তিময় ও নিরাপত্তাপূর্ণ ছিল না। প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যও সেদিকেই ইঙ্গিত করে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) এমন উত্তর দিলেন, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি বললেন, হযরত মুআবিয়া (রাযি.) যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে বের হন, তখন তাঁর ঘোড়ার পায়ে যে ধুলা লেগেছিল, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর তুলনায় সেই ধুলার মর্যাদা অনেক বেশি।

পীর নামের কলংক

দু'আ করি, আল্লাহ্ যেন আমাদের ভাগ্যেও বকাঝকা করেন এমন একজন শায়খ মিলিয়ে দেন। আজকাল তো পীররা মুরীদ হয়ে আছেন আর মুরীদরা হয়ে আছেন পীর। পীর সাহেব মুরীদদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের তোষামোদ করেন। কারণ, পীর সাহেবের দৃষ্টি থাকে মুরীদের পকেটের

দিকে। এসব দুনিয়াদার পীররা হলো পীর নামের কলঙ্ক। এদের কারণে প্রকৃত পীরদেরও আজ বদনাম হচ্ছে।

এক নকল পীরের কাহিনী

হযরত থানবী (রহ.) লিখেছেন, একব্যক্তি খাঁটি মনে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কোনো শায়খের হাতে বায়'আত হলো। শায়খের দৃষ্টি ছিল মুরীদের সম্পদের দিকে। লোকটি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখে এসে শায়খকে শোনাচ্ছিল, হযরত! আমি স্বপ্নে দেখলাম, আপনার হাতে মধু লেগে আছে আর আমার হাতে লেগে আছে ময়লা আবর্জনা। শায়খ সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, একেবারেই সত্য সপ্ন দেখেছ। কারণ, আমরা দীনদার; তাই আমাদের হাতে মধু লাগা ছিল আর তোমরা হলে দুনিয়াদার; তাই তোমার হাতে আবর্জনা মাখা ছিল।

মুরীদ বলল, হযরত স্বপ্নের পুরোটা এখনও শেষ হয়নি। বাকিটা শুনুন। শায়খ বললেন, শোনাও বাকি অংশ। মুরীদ বলল, আমি দেখলাম, আমি আপনার হাত চেটে খাচ্ছি আর আপনি আমার হাত চেটে খাচ্ছেন।

ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণে মুরীদের লাভ ঠিকই হচ্ছে; কিন্তু শায়খের দৃষ্টি যেহেতু মুরীদের পকেটের দিকে, তাই শায়খ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন।

মুরীদকে বকাঝকা করা কেন অবশ্যক?

আজকাল এমন কামেল বুযুর্গের সন্ধান মেলা বড়ই কঠিন, যিনি পূর্ণ অমুখাপেক্ষিতার সাথে একজন বান্দাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ মেহনত করবে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে কামেল বুযুর্গানে দীনের সান্নিধ্যে থাকার তাওফীক দান করেন।

শাইখে কামেলের পরিচয় হলো, তিনি প্রয়োজনে বকাঝকাও করবেন। আমাদের হযরত বলতেন, دَبْ না হলে اَدَبْ সৃষ্টি হয় না। যখন বকাঝকা হয়, তখন কোনো-কোনো বন্ধু ভয় পেয়ে যান। না-না; বরং একে নফ্সের জন্য মহৌষধ মনে করবেন। কারণ, মাশায়েখে ইমাম লিখেছেন, শায়খের দৃষ্টি যে মুরীদের ওপর গভীরভাবে পড়ে, তিনি তাকে বকাঝকা একটু বেশিই করেন। এই বকাঝকা শায়খের তরবিয়তের অন্তর্ভুক্ত। আজকালের পীর সাহেবরা তো 'চুপশাহ' হয়ে বসে থাকেন। মুরীদ ভালো করছে কী মন্দ করছে, সুন্নাত অনুযায়ী আমল করছে, নাকি বিদআত-রুসুমাতে লিপ্ত হয়ে গেছে এসব বিষয়ের কোনো খোঁজ নেই।

তারা বলে, আরে জনাব! শাহ সাহেব তো উর্ধ্বজগতের লোক! আমি বলি, হ্যাঁ, উর্ধ্বজগত তো ঠিক আছে, তবে কোন উর্ধ্বজগত? জাহান্নামের, নাকি মূর্খতার অন্ধকারের? আমাদের এখানে এসব পীর-মুরীদি হয় না। আমাদের এখানে হয় দীন শিক্ষার কাজ। প্রয়োজনে বকাঝকাও হয়। এটা শায়খের তরবিয়তের অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তার যদি সুস্থতার জন্য কোনো অঙ্গ কেটে ফেলে, তবে একে কেউ জুলুম বলবে না; বরং এ প্রকৃত কল্যাণকামিতা। অঙ্গ কেটে ফেলার পরও মানুষ ডাক্তারের জন্য দু'আ করে, কেন? সে বোঝে, এ তার কল্যাণের জন্য করেছে। তদ্রূপ শায়খের বকাঝকাও ডাক্তারের অপারেশনের মতো। এর দ্বারা শায়খ মুরীদের আত্মিক রোগের চিকিৎসা করেন। ভিতর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেন।

বকাঝকার সময় শায়খের উপলব্ধি

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, শায়খ যখন কাউকে বকাঝকা করেন, তখন নিজেকে তিনি উত্তম মনে করেন না। বরং তার অবস্থা হয় সেই জল্লাদের মতো, যাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, শাহজাদাকে অমুক অপরাধের জন্য চাবুকাঘাত করো। জল্লাদ শাহজাদাকে চাবুকাঘাত তো করবে; কিন্তু তার অন্তরে শাহজাদার প্রতি শ্রদ্ধাবোধও থাকবে। শায়খ তো এই অনুভূতি নিয়ে বকাঝকা করেন। যেমন- কোনো শিশু যদি চেহারায় কাদামাটি মাখে, তখন চেহারা ধুয়ে দিলে তার মুখমণ্ডল যেভাবে ঝলমল করে উঠে, শায়খের বকাঝকাও তার অন্তরকে আলোকিত করে তোলে।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহ.)-এর বিনয়

আমাদের মাশায়েখগণের মধ্যে এত বিনয় ছিল, যদি সেগুলো আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে যেত, তাহলে বিস্ময়ের সীমা থাকত না। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহ.)কে একলোক এসে প্রশ্ন করল, হযরত! অমুক বুযুর্গের নিকট বায়'আত হতে গেলে তিনি লম্বা ইস্তেখারার পর বায়'আত করেন আর আপনার কাছে যে-ই আসে, তাকেই বায়'আত করেন?

তিনি উত্তর দিলেন, আমি তো সবাইকে এজন্য বায়'আত করে নিই যে, যদি কেয়ামতের ভয়াবহ দিন আমার মুরীদরা তাদের পীরকে জাহান্নামের দিকে যেতে দেখে, তখন কেউ-না-কেউ তো অবশ্যই এমন হবে, যে আমার শাফায়াতের জন্য এগিয়ে আসবে। হতে পারে, একজন মুরীদের শাফায়াতে আল্লাহ তা'আলা পীরকেও জান্নাতী বানিয়ে দেবেন।

একটি বিস্ময়কর কথা

একটি বিস্ময়কর কথা শুনুন। কেউ একজন সুন্দর একটি উপমা দিয়েছিলেন। তা হলো, হালুয়া হলো পীর-মৌলভীর মুখের সিমেন্ট। যে পীর মুরীদের হালুয়ার দিকে চেয়ে থাকবে, সে কিভাবে ইসলাহ্ করবে? যে মাওলানার দৃষ্টি থাকবে অর্থের দিকে, সে কিভাবে মানুষকে দীন শেখাবে? তিনি তো ভক্তদের মর্জি অনুযায়ী ফাতাওয়া দেবেন। আমাদের আকাবির বুযুর্গানে দীনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা মানুষের হালুওয়ার দিকে নয়; বরং আল্লাহর জালওয়ার দিকে দৃষ্টি দিতেন। তারা দুনিয়া প্রত্যাশী নয়; বরং আল্লাহ্ প্রত্যাশী হয়ে জীবন কাটিয়েছিলেন। তারা জানতেন–

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ.

'দুনিয়া একটা মৃতজন্তু আর এর পিছনে যারা ঘুর-ঘুর করে, তারা কুকুর।'

সময় এসেছে ভেবে দেখার

বন্ধুরা আমার! আপনারা নিজেদের সময়ের হেফাযত করুন। এই দু-চারটা দিন আমার ও আপনাদের জন্য বড়ই মূল্যবান। সময় যদিও সংক্ষেপ, তবুও মূল্যায়ন করতে পারলে অনেক উপকার পওয়া যাবে। এক বৃদ্ধা একটা লাকড়ির বোঝা নিয়ে মিশরের বাজারে যাচ্ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)কে ক্রয় করার জন্য। একজন জিজ্ঞাসা করল, বুড়িমা! তুমি কি সেখানে পাত্তা পাবে? সেখানে তো বড়-বড় আমীর, বণিক, ব্যবসায়ীরা আসবে, শাহজাদা আর বাদশারা আসবে। বুড়ি উত্তর দিল, আমিও জানি, ইউসুফকে ক্রয় করতে আমি পারব না। কিন্তু অন্তরে এতটুকু সান্ত্বনা তো পাব যে, কিয়ামতের দিন যখন ঘোষণা হবে, ইউসুফ (আ.)-এর ক্রেতারা কোথায়? তখন আমিও সেই ক্রেতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুক্তির একটা উপায় তৈরি করে নেব।

বন্ধুরা আমার! কিয়ামতের দিন যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, আমার স্মরণে কে-কে সফর করেছিলে? কে-কে আমার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য ঘর-বাড়ি, বিবি-বাচ্চা ছেড়ে মসজিদের ধুলা কপালে মেখেছিলে? তো হতে পারে, আমরাও হাত তুলে দাঁড়াতে পারব। যদি আমরা এই সময়গুলোর মূল্যায়ন করতে পারি, তাহলে এটি আমাদের জীবনের অনেক দামী সম্পদ হিসেবে ধরা দেবে। আল্লাহ্ আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ছুম্মা আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

কুরআনের মর্যাদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه. أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

মানবতার আবেহায়াত

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ.

এটি এমন একটি কিতাব, যা আমি আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ.

'যেন আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন।'[১]

কুরআনে কারীম মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথপ্রদর্শক একটি কিতাব। এটি দিকভ্রান্তদের পথের দিশা দেয়। অপদস্থতার জগদ্দল থেকে বের করে সুরাইয়্যা তারকার উচ্চতার দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্নদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার দিকে উৎসাহ জোগায়। কুরআনে কারীম মানবতার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানবতার মুক্তির স্লোগান। এটি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের কালাম, তাঁর পবিত্র বাণীগ্রন্থ।

---

১. সূরা ইবরাহীম : ১

تَبَارَكْ بِالْقُرْاٰنِ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللّٰهِ وَخَرَجَ مِنْهُ.

'কুরআনে কারীম থেকে বরকত অর্জন করুন। কারণ এটি আল্লাহর কালাম, যা তার সত্তা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।'

ইবাদতই ইবাদত

কুরআনে কারীম এমন একটি কিতাব, যার দেখা ইবাদত, স্পর্শও ইবাদত, পড়াও ইবাদত। একে হিফয (মুখস্ত) করাও ইবাদত, একে বোঝাও ইবাদত, এর ওপর আমল করা আরও বড় ইবাদত।

করুণার বারিধারা

আপনারা হয়তো চুম্বক দেখেছেন। চুম্বক লোহাকে সর্বদা নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তো কুরআনে কারীমকে মনে হয়, এ যেন রহমতের চুম্বক। আল্লাহ তা'আলার রহমতকে দুনিয়ার দিকে আকর্ষণ করে। এ যেন রহমতের চুম্বক।

আল্লাহ বলেন–

إِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

'যখন কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত হবে, তা মনযোগসহকারে শ্রবণ করো এবং চুপ হয়ে যাও, যেন তোমাদের ওপর রহমত বর্ষিত হয়।'[১]

সুতরাং যে মজলিসে কিংবা মাহফিলে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত হয় কিংবা শ্রবণ করা হয় অথবা এর অর্থ ও তাফসীর বয়ান কিংবা শ্রবণ করা হয়, সেখানে আল্লাহ তা'আলার অবারিত করুণা ও রহমতের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। সুবহানাল্লাহ!

অন্তরের পাত্রটা সোজা করে ধরো

যখন আপনি আপনার অন্তরের পাত্র সোজা করে বসাবেন, তখনই আল্লাহর রহমতের ধারা আপনার অন্তরের পাত্রে জমা হবে। বৃষ্টির বর্ষণ যতই মুষলধারায় হোক, যদি পাত্র উল্টে থাকে, তাহলে পাত্রে এক বিন্দু পানিও জমবে না। আর এটি বৃষ্টির কোনো ত্রুটি নয়, বরং পাত্রের ত্রুটি, যা চিত না হয়ে উপুড় হয়ে আছে।

---

১. সূরা আরাফ : ২০৪

ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ.

'নিশ্চয়ই এই কুরআনে রয়েছে অনেক উপদেশ ওই সকল লোকদের জন্য, যাদের মধ্যে হৃদয় আছে।'

পক্ষান্তরে যার মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তে পাথর থাকে, সে স্বাদ পাবে কিভাবে?

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

'এবং এতে উপদেশ তাদের জন্য রয়েছে, যারা একাগ্রচিত্তে শ্রবন করে.দেহ-মন এক করে।'[১]

অর্থাৎ– এমন নয় যে, এই মজলিসে তার দেহ আছে; কিন্তু মন অন্য কোথাও পড়ে আছে। সুতরাং যদি এভাবে দেহ-মন এক করে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে কুরআন শোনা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার রহমতে আপনার অঞ্জলি ভরে যাবে।

কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের স্বাদ

সমগ্র পৃথিবীর কোনো কিতাব এমন নেই, যার হাফেয দুনিয়াতে পাওয়া যাবে। এই মর্যাদা কেবল কুরআনে কারীমের যে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত একে মুখস্থ করা তাঁর বান্দাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! এই কিতাব পড়ার মধ্যেও আশ্চর্য রকম স্বাদ রয়েছে। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো কিতাব নেই, যাকে বিভিন্ন কেরাতে ও ভিন্ন-ভিন্ন ঢংয়ে পড়া হয়। কুরআনকে সাত কেরাতে পড়া যায়। এটি পাঠকারীর কৃতিত্ব নয়। বরং ওই কিতাবের কৃতিত্ব, যাকে বিভিন্ন কেরাতে পাঠ করা যায়। ছোট্ট-ছোট্ট শিশুরা কখনও এক কিরাতে পড়ছে আবার অন্য কিরাতে পড়ছে। যদি এই বিভিন্নভাবে পড়া কারী সাহেবদের কৃতিত্ব হয়, তাহলে এরাই পৃথিবীর যেকোনো কিতাবকে বিভিন্ন কিরাতে পড়ে দেখাক; পারবে না। এই সুমধুর কণ্ঠের কারীরা যদি অন্য কোনো কিতাব এভাবে তেলাওয়াত করতে পারে তারপর বলবেন। সুতরাং এই কৃতিত্ব সেই মহান স্রষ্টার, যিনি এই বিস্ময়কর কিতাব তৈরি করেছেন এবং সবার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

---

১. সূরা কাফ : ৩৭

জীবিতদের শহর

একটা সময় ছিল, যখন এই কুরআনকে তাহাজ্জুদের নামাযে তেলাওয়াত করা হতো। মদীনার অলি-গলি দিয়ে কেউ যদি তাহাজ্জুদের সময় অতিবাহিত হতো, তাহলে প্রতিটি ঘর থেকে তার কানে এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ ভেসে আসত, যেন মৌমাছির গুণগুণ গুঞ্জরণ। আসলে সেটি ছিল জীবিতদের শহর।

কুরআন শোনার জন্য ফেরেশতাদের আগমন

এক সাহাবী নিজের ঘরে তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। কালামের শব্দে-শব্দে এমনভাবে শিহরিত হচ্ছিলেন যে, তার মন চাচ্ছিল একটু উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করতে, কিন্তু পাশে ঘোড়া বাঁধা ছিল এবং তারই পাশে একটা খাটে একটা শিশু শায়িত ছিল। তিনি লক্ষ করলেন, আওয়াজ যখনই একটু উঁচু হয়ে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াও লাফিয়ে ওঠে। অতএব, যদি উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করেন, তাহলে হয়তো ঘোড়ার লম্ফঝম্ফের কারণে বাচ্চাটার কোনো ক্ষতি হতে পারে, তাই আস্তে-আস্তেই তেলাওয়াত করতে থাকেন। সারাটা রাত এভাবেই কেটে গেল। নামায শেষ করে যখন দু'আর জন্য হাত তুললেন, তখন দেখলেন, তারকার মতো কয়েক গুচ্ছ আলো তার মাথার ওপর থেকে আকাশের দিকে হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি এই আলোগুলো দেখে সীমাহীন বিস্মিত হলেন।

সকালে সেই সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা আল্লাহর ফেরেশতা ছিল; তারা আরশে আযীম হতে তোমার কুরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য এসেছিল। যদি তুমি উঁচু আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করতে, তাহলে মদীনার লোকেরা আজ ফেরেশতাদের স্বচক্ষে দেখতে পেত। সুবহানাল্লাহ!

আবূবকর ও ওমর (রাযি.)-এর কুরআন পড়া

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ আনলেন। তাহাজ্জুদের সময় ছিল। একদিকে দেখলেন, হযরত আবূবকর (রাযি.) নামাযে নিচু আওয়াজে তেলাওয়াত করছিলেন। অপর দিকে ওমর (রাযি.) একটু উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করছিলেন। তাহাজ্জুদের নামাযে উভয়ভাবে তেলাওয়াত করা জায়িয আছে। নামায শেষ করার পর উভয় নবী

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলেন। তিনি হযরত আবূবকর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূবকর! তুমি নামাযে তেলাওয়াত নিচু আওয়াজে করছিলে কেন? তিনি উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সেই সত্তাকে কুরআন পড়ে শোনাচ্ছি, যিনি অন্তরের কল্পনাকেও জানেন। আমার উচুঁ আওয়াজে পড়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

তারপর নবীজি হযরত ওমর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, ওমর! তুমি কেন নামাযে কুরআন উঁচু আওয়াজে পড়ছিলে? তিনি উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঘুমন্তদের জাগ্রত করছিলাম, শয়তানকে বিতাড়িত করছিলাম। সুবহানাল্লাহ! যেখানে কুরআন পড়া হয়, শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয়। আজও যদি কোনো আল্লাহর বান্দা আবেগ ও ভালোবাসা নিয়ে কুরআন হড়ে, আল্লাহর রহমত তার ওপর বর্ষিত হবে এবং এর বরকতে সীনা আলোকিত হয়ে যাবে। এ কারণেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ.

'কুরআন মানুষকে অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে আহ্বান করে।'[১]

একেই বলে ইখলাস

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ নিয়ে এলেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.) তখন কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। সাহাবা কিরামের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.)-এর তেলাওয়াত খুব চমৎকার ছিল। পড়তেনও খুব ইখলাসের সাথে। নবীজি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত উবাই যখন দেখলেন, নবীজি তাঁর পাশে তাশরীফ এনেছেন, তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করে সেদিকে মনোযোগী হলেন। নবীজি তাকে বললেন, হে ইবনে কা'ব! চুপ হলে কেন? কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকো! উত্তরে হযরত উবাই বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরআন আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আপনার সামনে কিভাবে তেলাওয়াত করব?'

নবীজি : হ্যাঁ কা'ব! আমাকে এমনই হুকুম দেওয়া হয়েছে। (হযরত কা'ব (রাযি.) ইশারা-ইঙ্গিত ভালো বুঝতেন।

---

১. সূরা ইবরাহীম : ১

তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ রব্বুল ইয্যত কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন?

নবীজি : হ্যাঁ, আল্লাহ তোমার নাম নিয়ে বলেছেন, হে রাসূল! ইবনে কা'বকে বলুন, সে যেন কুরআন পড়ে। হে রাসূল! আমিও শুনব, আপনিও শুনুন। সুবহানাল্লাহ! তিনি কী অসাধারণ ইখলাসের সাথে তেলাওয়াত করতেন যে, তাঁর তেলাওয়াত শোনার আদেশ স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়!

আল্লাহর কাছে বিস্ময়কর অনুযোগ

আমাদের নবীকন্যা হযরত ফাতেমা (রাযি.) একবার শীতের রাতে তাহাজ্জুদের সময় দু-রাকাত নফল নামাযের নিয়ত বাঁধলেন। তেলাওয়াতের মুগ্ধতা তাকে এমনভাবে স্পর্শ করল যে, তিনি এক আয়াতের পর এক আয়াত পড়েই যাচ্ছিলেন। নামায ছাড়তে মন চাচ্ছিল না। অবশেষে সালাম ফিরালেন সুবহে সাদিকের কিছুক্ষণ পূর্বে। দু'আর জন্য হাত তুলে অঝোরে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তো মাত্র দু-রাকাত নামায পড়লাম, এতেই আপনার রাত শেষ হয়ে গেল? সুবহানাল্লাহ। তারা রাত ছোট হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে অনুযোগ করতেন। কারণ, তারা কুরআন তেলাওয়াতের যে স্বাদ পেতেন, তাতে মুগ্ধতার জগতে হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

কুরআনের সঙ্গে বন্ধনের এক বিস্ময়কর ঘটনা

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জিহাদী অভিযান থেকে ফিরছিলেন। একস্থানে বিশ্রামের জন্য কাফেলাকে অবস্থান করার আদেশ দিলেন। দুজন সাহাবীকে রাতের বেলা পাহারার জন্য নিযুক্ত করলেন। সবাই ঘুমিয়ে গেল প্রহরী দুই সাহাবীও পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলেন। তারপর তাঁরা পরামর্শ করল, যদি দুজনই রাত জাগতে থাকি, তাহলে হতে পারে, শেষ প্রহরে উভয়েরই ঘুম আসবে। আর দুশমন ঘুমন্ত কাফেলার ওপর হামলা করবে। বরং উত্তম হবে, যদি একজন এখন সজাগ থেকে পাহার দেয় আর অন্যজন ঘুমায়। পরে যে পাহারা দিয়েছে, সে ঘুমাবে; অন্যজন পাহারা দেবে। এভাবে ভাগাভাগি করে পাহারা দিলে দায়িত্বও পালন হবে। কিছুটা আরামও হয়ে যাবে।

যাহোক পরামর্শক্রমে একজন ঘুমিয়ে গেলেন। অপরজন জেগে-জেগে পাহারা দিতে লাগলেন। জাগ্রত সাহাবী কিছুক্ষণ পর ভাবলেন, আমি এভাবে

অকেজো বসে থেকে কী লাভ? তার চেয়ে বরং দু-রাকাত নামায পড়া-ই উত্তম। তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে সূরা কাহ্ফের তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। প্রতিটি আয়াতের উচ্চারণে অনুধাবনে তিনি শিহরিত হতে লাগলেন। ইতিমধ্যে শত্রুদের কেউ এসে দেখল, গোটা কাফেলা ঘুমিয়ে আছে। পাহারার কাজে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখল, পাহাড়ের চূড়ায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছেন। শত্রু দূর থেকেই তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি এসে নামাযরত সাহাবীর গায়ে গেঁথে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য যে, তিনি নামায ভাঙলেন না। তারপর আরও কয়েকটা তীর এসে তার গায়ে লাগল। তথাপি তিনি নামায ছাড়লেন না। কুরআন তেলাওয়াত করেই যাচ্ছেন। এদিকে রক্তে তার জামা ভিজে গেল। রক্ত বের হলে ওযু ভেঙে যায়। মাসআলাটি তখনও স্পষ্ট হয়নি। তিনি কুরআন পড়তেই লাগলেন।

একপর্যায়ে তার ভয় হলো যে, শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে দুর্বল হয়ে যদি বেহুঁশ হয়ে যাই, তাহলে এত বড় কাফেলাকে শত্রুর আক্রমণ থেকে কে সতর্ক করবে? এটা তো দায়িত্বে অবহেলা হয়ে যাবে। তিনি দ্রুত সালাম ফিরিয়ে সঙ্গীকে জাগালেন। বললেন, ভাই, উঠো; শত্রুরা তীর নিক্ষেপ করছে। আমার গায়ে এ পর্যন্ত চার-পাঁচটা তীর গেঁথেছে। রক্তে আমার জামা ভিজে গেছে। সঙ্গী সাহাবী অত্যন্ত সমবেদনা জানিয়ে বললেন, প্রথমে তীর লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই কেন আমাকে জাগালে না? তিনি উত্তর দিলেন। আমি নামাযে ছিলাম। সূরা কাহ্ফের তেলাওয়াত হচ্ছিল। সূরার মাঝামাঝি পৌঁছতেই তীর আসা শুরু করল। তেলাওয়াতে এত স্বাদ লাগছিল যে, সূরাটা শেষ না করে নামায ভাঙতে ইচ্ছে করছিল না। সুবহানাল্লাহ! কী স্বাদইনা পেয়েছিলেন তাঁরা নামাযে!

বন্ধুরা! আমাদের গায়ে যদি একটা মাছিও বসে, তখন আমাদের নামযের অবস্থা-ই পাল্টে যায়। সামান্য একটা মশার কামড় আমাদের নামাযের সমস্ত একাগ্রতা ধ্বংস করে দেয়। অথচ তাদের গায়ে তীরের পর-তীর-লেগে রক্ত ঝরছে। কিন্তু তাদের নামযের একাগ্রতায় কোনো পরিবর্তন আসে না। সুবহানাল্লাহ!

কুরআন তেলাওয়াতের সময় সাহাবা (রাযি.)-এর অবস্থা

আজ আমরা যেভাবে আইসক্রিম খাই এবং প্রতি চুমুকেই খুব মজা পাই, তদ্রূপ আল্লাহওয়ালারাও যখন কুরআন পড়েন, তখন প্রতি আয়াতে কুরআনের স্বাদ আস্বাদন করেন। তাদের অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন এসে যায়।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

'তারা যখন কুরআন শুনত, সত্যের সন্ধান পেয়ে তাদের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরত। তারা বলত, হে আমাদের প্রভূ! আমরা ঈমান এনেছি, তোমাকে বিশ্বাস করেছি। তাই আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করেনিন।'[১]

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.

'তারা আরও বলত, আমরা কেন আল্লাহ ও তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব কুরআনের ওপর ঈমান আনব না? আর কেনইবা এই আশা বুকে বাঁধব না যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করবেন? (অবশ্যই আমরা সেই তামান্না করি)[২]

তাদের এই আশাভরা দু'আ শুনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا.

'আল্লাহ তাদেরকে প্রত্যেক ওই জিনিস দিয়েছেন, যা তারা চেয়েছে।'[৩]

সুবহানাল্লাহ!

কুরআনের সঙ্গে ভালোবাসা

সর্বযুগে ও সর্বকালে এই কুরআনের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনকারীদের সংখ্যা ব্যাপক ছিল। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থের ব্যাপারে এমন মহব্বতের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমনটি কুরআনের ব্যাপারে পাওয়া যায়। একে নীরবে-নির্জনেও পড়া হয়েছে, মাহফিলভরা মানুষের সম্মুখেও পড়া হয়েছে। একে রাতের আঁধারেও পড়া হয়, দিনের আলোতেও পড়া হয়। একে নিচু আওয়াজেও পড়া হয়, উঁচু আওয়াজেও পড়া হয়। একে পড়ে-পড়ে কেউ কেঁদেছেন আবার শুনে-শুনেও কেউ কেঁদেছেন।

---

১. সূরা মায়েদাহ : ৮৩

২. সূরা মায়েদাহ : ৮৩

৩. সূরা মায়েদাহ : ৮৩

এর এক-একটি অক্ষরকে বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য মশক করেছেন, এক-একটি অক্ষরকে মুখস্থ করা হয়েছে, এর অর্থ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর সঙ্গে যারা ভালোবাসার বন্ধন গড়েছেন, তারা এর খেদমত করতে-করতে নিজের জীবন পার করে দিচ্ছেন। এমনকি তারা এও বলছেন যে, হে আল্লাহ! যদি আপনি হযরত নূহ (আ.)-এর হায়াতও দান করতেন, তাহলে সারাজীবন এই কুরআন শিখতে-শিখতেই পার করে দিতাম। বলুন, পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয় এমন কোনো ধর্মীয় কিতাব আছে কি, যার প্রতি মানুষ এত ভালোবাসা দেখিয়েছে?

কুরআনের একটি বিস্ময়কর মুজিযা

কুরআনে মাজীদ আল্লাহ তা'আলার এমন এক বিস্ময়কর কালাম, যার মুজিযা সর্বকালেই পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৮৭ইং সনের কথা। এই অধম আমেরিকায় কিছুসময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছিল। ওই সময় মিসরের বিখ্যাত কারী আব্দুল বাসিত – যার ক্যাসেট আপনারা প্রায়ই শুনে থাকেন – সেখানে এসেছিলেন। পরিস্থিতির আলোকে তিনি বিভিন্ন মাহফিলে তেলাওয়াত করতেন। এই অধম কোথাও উর্দূতে, কোথাও ইংরেজিতে যেখানে যেমন শ্রোতা হতো, তেমন করে কিছু দীনি কথাবার্তা উপস্থাপন করতাম। বিভিন্ন স্থানে এভাবেই প্রোগ্রাম হতে লাগল। আপনারা হয়তো জানেন, কারী আব্দুল বাসিত কতটা বিভোর হয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে কণ্ঠও এমন দিয়েছিলেন যে, যে-ই তার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনত, বাগবাগ হয়ে যেত। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যে, তিনি আমার নাম না নিয়ে আমাকে. 'বুযুর্গ লোক' বলে সম্বোধন করতেন।

একবার কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, কারী সাহেব! কুরআন তো আপনি খুব চমৎকার পড়েন, কিন্তু কখনও কুরআনের কোনো মুজিযা দেখেছেন কি? কারী সাহেব বললেন, একটি-দুটি নয়, কুরআনের হাজারো মুজিযা আমি দেখেছি। লোকটি বলল, তাহলে দু-একটি মুজিযা আমাদেরও শোনান। তিনি তখন এই ঘটনাটি শোনালেন। বললেন, আমি ওই সময়কার কথা বলছি, যখন জামাল আব্দুন নাসের মিশরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন কমিউনিষ্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। তখন তো কমিউনিজমের খুব চর্চা ছিল। সারা দুনিয়া এই লাল বিপ্লবকে

সমীহ করত। আজ জিহাদের বরকতে সেই সুপার পাওয়ারকে আল্লাহ তা'আলা খানখান করে দিয়েছেন। জামাল আব্দুন নাসের মস্কো পৌঁছল। তিনি সেখানে গিয়ে রাষ্ট্রীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দায়িত্বশীলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতান্তে তিনি মতবিনিময়ের জন্য কিছুসময় পৃথক করে রেখেছিলেন। সেই সময় তারা পরস্পরে গপশপে লেগে গেলেন। কথায় কথায় কমিউনিষ্ট নেতারা বলতে লাগল, জামাল আব্দুন নাসের! কেন যে তুমি ইসলামের মতো পুরাতন ধর্ম নিয়ে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছ! আমাদের লাল কিতাব ধরো, যা কমিউনিজমের সংবিধান। তুমি কমিউনিষ্ট হয়ে যাও; আমরা তোমাদের দেশে টেকনোলজি সরবরাহ করব। প্রযুক্তি বিজ্ঞানে তোমার দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করবে এবং পৃথিবীর দ্রুত উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে গণ্য হবে। ইসলাম ছেড়ে সমাজতন্ত্রে যোগ দাও।

জামাল আব্দুন নাসের তাদের উপস্থিত জবাব তো দিয়েছিলেন, কিন্তু এতে তার অন্তরের অস্থিরতা দূর হয়নি। ততক্ষণ বৈঠকও শেষ হয়ে গেল। তিনি দেশে ফিরে এলেন। সব সময় তার মধ্যে একধরনের ব্যাকুলতা কাজ করত যে, ইসলাম সম্পর্কে আমাকে আরও জানতে হবে। এর সত্যতা, সার্বজনীনতা ও চিরন্তনতাকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে হবে। আমি এর হক আদায় করতে পারিনি।

দু-বছর পর জামাল আবদুন নাসের রাষ্ট্রীয় সফরে পুনরায় রাশিয়া গেলেন। কারী আব্দুল বাসেত সাহেব বলছিলেন, আমার কাছে প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের স্বাক্ষরিত একটি বার্তা পৌঁছল, কারী সাহেব! আমার সঙ্গে আপনাকে মস্কো যেতে হবে; প্রস্তুতি নিন। কারী সাহেব বললেন, আমি সীমাহীন আশ্চর্য হলাম যে, কারী আব্দুল বাসেতের প্রয়োজন তো সউদী আরবে হয়, আরব আমীরাত, পাকিস্তান এবং মুসলিম আধ্যুষিত এলাকায় হয়। মস্কো-রাশিয়ায় যেখানে সবাই ইসলামবিমুখ, সেখানে কারী আব্দুল বাসেতের কী কারণে প্রয়োজন পড়ল?

যাহোক, আমি প্রস্তুতি নিয়ে তার সঙ্গে মস্কো পৌঁছলাম। সেখানে তিনি রাষ্ট্রীয় বৈঠকগুলো শেষ করলেন। পরে কিছু সময় মতবিনিময়ের জন্য নিদৃষ্ট ছিল। পূর্বের মতো সকল নেতৃবৃন্দ গপশপ করার জন্য একত্রিত হলেন। এবার জামাল আব্দুন নাসের অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বললেন, বন্ধুরা! ইনি আমার সঙ্গী; ইনি আপনাদেরকে কিছু পড়ে শোনাবেন। দয়া করে আপনারা শুনুন। তারা জিজ্ঞাসা করল, কী পড়বেন তিনি? প্রেসিডেন্ট উত্তর দিলেন,

ইনি কুরআন পাঠ করবেন। তারা সম্মতি দিয়ে বলল, ঠিক আছে পড়ুন; আমরা শুনি। ইতিমধ্যে আমাকে ইঙ্গিত করা হলো। আমিও শুরু করলাম। আমি সূরা ত্বহার ওই রুকুটিই পড়তে লাগলাম, যে অংশটি শুনে কোনো এককালে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তার (রাযি.)-এর মতো দূরদর্শী ও দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ঈমান এনেছিলেন।

طه.مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقَى. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى. تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى.... إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

কারী সাহেব বলেন, আমি প্রায় দুই রুকু তেলাওয়াত করে চোখ খুললাম। যা দেখলাম, তা কুরআনের মুজিযা ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। দেখলাম, আমার সম্মুখে উপবিষ্ট চার-পাঁচজন কমিউনিষ্ট নেতা নীরবে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন আর তাদের দুগণ্ড বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব! আপনারা কাঁদছিলেন কেন? তারা উত্তর দিল, আপনার সাথী যা পড়েছে, তা তো আমরা বুঝিনি; কিন্তু এক অসাধারণ আকর্ষণ আছে এই কালামে, যার প্রভাবে আমাদের অন্তর মোমের মতো গলতে লাগল; কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কী। সুবহানাল্লাহ!

এরা কুরআন মানে না, কুরআন বোঝে না; শুধু কুরআনের শব্দগুলোর উচ্চারণ শুনে, তার তেলাওয়াত শুনে তাদের অন্তর এমনভাবে আলোড়িত হলো যে, নিজেদের অজান্তেই তাদের গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল।

এক অমুসলিমের ওপর সূরা ফাতেহার প্রভাব

আমেরিকায় যদি কোনো ব্যক্তি খুব প্রশান্তি অনুভব করে, তখন সে বলে I am feeling natural high আমি প্রাকৃতিকভাবে পরম প্রশান্তি অনুভব করছি। সেখানে এক প্রভাবশালী আমেরিকান ছিল; তার জীবনে প্রশান্তি ছিল না। কারণ, তার মাথায় যখন-তখন প্রচণ্ড ব্যথা উঠত। কোনো ঔষধে কাজ হতো না। আমাদের এক বন্ধু মিষ্টার আহমাদ কোনো সরকারী কাজে আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেখানে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠলেন। পাশেই তার বাড়ি ছিল। একদিন মিস্টার আহমাদ নামায পড়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। এক আমেরিকান তাকে পিছন থেকে ডেকে বলল, মিস্টার আহমাদ! এদিকে আসুন। আপনাকে একটা চমৎকার গান শোনাব। মিস্টার আহমদ বলল, আমি গান-বাজনা পছন্দ করি না; আমি নামায পড়তে

যাচ্ছি। আমি আসতে পারব না। কিন্তু তার উপর্যপুরী অনুরোধের পর বলল, মিস্টার আহমাদ, আমি আপনাকে এমন গান শোনাব, যা আপনি প্রতিদিন মসজিদ থেকে শোনেন। মিস্টার আহমদ বললেন, আমি ভেবেছিলাম, আযানের কথা বলছে হয়ত; তাই তার সঙ্গে গেলাম। সে আমাকে তার বাড়ির একটা নির্জন কামরায় নিয়ে গেল। কামরায় টেবিলের ওপর একটা তবলা রাখা ছিল। সে কামরায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল। এবার চোখ বন্ধ করে তবলা বাজাতে লাগল। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। যা শুরু হয়েছে, তাতে আমার জামাত ছুটে যাবে নিশ্চিত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই এক আজব কাণ্ড দেখলাম। সে তবলার সুরে সুর মিলিয়ে সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত শুরু করে দিল এবং শেষ পর্যন্ত পড়ল। আমি তো বুঝে গেলাম সে কী পড়ছে।

গাওয়া শেষ হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে এই গান কে শিখিয়েছে? বলল, আমার মধ্যে প্রচণ্ড মানসিক অশান্তি ছিল। মিশরে আমার এক মুসলিম বন্ধু ছিল। আমি তাকে আমার মানসিক অশান্তির কথা জানাই। সেই আমাকে এই গান শিখিয়ে বলেছে, যখনই খুব বেশি অশান্তি লাগবে, তখন কোনো নির্জন কামরায় এসে এটি পড়বে; দেখবে, মনে শান্তি চলে এসেছে। তারপর থেকে যখনই আমি বিষণ্নতা অনুভব করি, এখানে এসে এভাবে গাই। আমার কছে পরম প্রশান্তি লাগে। তারপর বন্ধুদের বলি I am feeling natural high আমি প্রাকৃতিকভাবে পরম প্রশান্তি অনুভব করছি।

বন্ধুরা আমার! যারা কুরআন পাক জানে না, বোঝে না এবং মানেও না। যদি তারা এই কুরআন পাঠ করে প্রশান্তি লাভ করতে পারে, তাহলে আমরা যদি কুরআনের বিধিবিধান মেনে জীবন-যাপন করি, আমরা কি প্রশান্তি লাভ করব না?

কুরআন তার ধারককে সম্মানী করে

আমাদের পূর্ববর্তীরাও এই কুরআনের কারণেই মর্যাদা লাভ করেছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পর্বত থেকে এই কুরআন এনেছিলেন।

এক কবি বলেন–

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا * اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا.

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی * عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی.

'প্রভাব নিয়ে হেরা থেকে কওমের দিকে এল সঙ্গে একটি মুক্তির সনদ নিয়ে এল। সেখানে বিজলি চমকেছিল, নাকি কোনো হাদীর আহ্বান, যিনি গোটা আরব ভূখণ্ডকে প্রকম্পিত করেছিলেন।'

এই তো সেই কুরআন, যা আরবের মরু-অঞ্চলকে কাঁপিয়ে তুলেছিল।

কুরআনের ওপর সাহাবাদের আমল

সাহাবায়ে কেরাম এই কুরআনকে বুকে ধারণ করে বের হতেন। তাঁরা যেদিকেই ছুটতেন, যেখানেই তাঁদের কদম পড়ত, সেখানেই বিজয় তাদের পদচুম্বন করত। আফ্রিকার জঙ্গলের হিংস্র জীব-জন্তুরা সাহাবায়ে কেরামের জন্য জঙ্গল খালি করে দিয়েছিল একমাত্র এই কুরআনের বরকতেই। কুরআনের বরকতেই কৃষ্ণসাগর বল আর আরব সাগর, পাহাড়-পর্বত বল আর মরুভূমি; কোনো কিছুই আল্লাহর কালেমাকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কেউ একজন বলছিল–

بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسری سے دبے * چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے.

جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا * بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے.

'ঘটনা হলো, কয়েকজন উষ্ট্রারোহী কায়সার ও কেসরার কাছে হার মানেনি। যারা কাফুর আর লবণের মধ্যে পার্থক্য করবে ধোঁকায় পড়ে যেত, আজ তারাই দুনিয়ার ভাগ্য নির্ধারণকারী হয়ে গেছে!'

তারা পৃথিবীর ভাগ্যই পরিবর্তন করে দিয়েছিল। কারণ, তারা কুরআন পড়ার সাথে-সাথে তার ওপর আমলও করতেন। এদিকে কুরআন অবতীর্ণ হতো, ওদিকে তা আমলে পরিণত হয়ে যেত। তারা শুধু হাফেযে কুরআনই ছিলেন না, কুরআন অনুযায়ী আমলও করতেন। এর প্রচার-প্রসারও করতেন, এর আশেকও হয়ে যেতেন।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ঐতিহাসিক উক্তি

সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই এমন আছেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের কারণে এমন মর্যাদা দান করেছেন, যা তাঁরা কখনও অর্জন করতে পারতেন না। হযরত ওমর (রাযি.) একবার মক্কায় একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোনো পাহাড়ের গিরিখাদ হয়ে অতিক্রম করছিলেন। হঠাৎ একস্থানে থেমে গেলেন। গরমের মৌসুম ছিল। আমীরুল মুমিনীন থেমে গেছেন; তাই গোটা সৈন্যবাহিনীও থেমে গেল। ঘামে-গরমে সবাই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত।

আমীরুল মুমিনীন একটা গিরিখাদকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। একজন এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি কী দেখছেন; পুরো সৈন্যবাহিনী আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে? হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণের আগে ছোট বেলায় উট চরানোর জন্য এই গিরিখাদে আসতাম। ভালোভাবে উটও চরাতে পারতাম না। আমার উট ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘরে ফিরত। আমার পিতা খাত্তাব আমাকে বকাঝকা করতেন। ভর্ৎসনা করে বলতেন, ওমর! সামান্য উট পর্যন্ত চরাতে পার না, কর্মজীবনে কী করে খাবে? আজ সেই স্থান, উট, আর সেই কথাগুলো আমার মনে পড়ে গেল। তখনকার ওমর তো উটও চরাতে পারত না। আর আজকের বিশ্ব সেই ওমরকে আমীরুল মুমিনীন বলে চিনে।

এই কুরআন ও ইসলামের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা রাখাল ওমরকে খলীফাতুল মুসলিমীন বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি প্রায়ই বলতেন–

أَعَزَّنَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٰذَا الدِّيْنِ.

'এই দীনের কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মর্যাদার অধিকারী বানিয়েছেন।'

সম্মানিত উপস্থিতি! এই কুরআনকে পড়ুন। একে বুঝুন এবং জীবনকে এর অনুযায়ী ঢেলে সাজান। একে শুধু পড়লেই দায়িত্ব পালন হবে না; বরং এর বিধিবিধান অনুযায়ী আমলের মাধ্যমেই দায়িত্ব পালন হবে। আমাদেরকে কুরআনের ধারকও হতে হবে, আশেকও হতে হবে। দু'আ করবেন, এই কুরআনকে আল্লাহ যেন আমাদের অন্তরে ভরে দেন। আমীন।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম কুরআনের বরকত

আজও এই পৃথিবীতে কুরআনের আশেক পাওয়া যায়। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, লাহোরে এক আলেমে দীন সিলসিলায়ে আলিয়ায় বায়'আত হয়েছেন। এই অধম তাঁর মসজিদে দরসে কুরআনের একটি ক্লাস করলাম। তারপর তিনি নাশতার জন্য বাসায় দাওয়াত করলেন। তিনি বলছিলেন, আমার পিতা একজন আশেকে কুরআন ছিলেন। সবসময় কুরআন পড়তে থাকতেন। আমি বললাম, আপনার পিতার কোনো ঘটনা থাকলে তাও শুনিয়ে দিন। তিনি একটি ঘটনা শোনালেন। বললেন, আমার আব্বজান কুরআনকে এত ভালোবাসতেন যে, চলতে-ফিরতে সর্বদা কুরআন পড়তে থাকতেন। বসে-বসেও কুরআন পড়তেন। কোনো প্রশ্ন করলে, তেলাওয়াত পুরো করে

জবাব দিতেন। তারপর পুনরায় আবার তেলাওয়াত শুরু করে দিতেন। একবার কোনো বুযুর্গ তাকে বললেন, যদি আপনি দু-বছর যাবৎ প্রতিদিন এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করেন, তাহলে এই কুরআনের ফয়েয ও বরকত আপনার পরবর্তী বংশধর পর্যন্ত জারি থাকবে।

কথাটি আমার আব্বাজানের খুবই ভালো লাগল। তিনি বললেন, ঠিক আছে; আমি চেষ্টা করে দেখব। তারপর থেকে আমার আব্বাজানের অভ্যাস ছিল, তিনি প্রতিদিন এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। কী ঠাণ্ডা কী গরম, কী সুস্থতা, কী অসুস্থতা, ঘরে হোক কিংবা বাইরে, সুখে হোক কিংবা দুঃখে, সর্বাবস্থায় দেখেছি, দুই বছর যাবত তিনি প্রতিদিন এক খতম কুরআন পড়েছেন। তিনি বলছিলেন, এই ইল্‌মের বরকত এভাবে প্রকাশ পেল যে, আমার আব্বাজানের যতজন ছেলে মেয়ে রয়েছেন, সবাই কুরআনের হাফিয হয়েছেন। তাদের সন্তানদের মধ্যেও আজ পর্যন্ত যতজন ছেলেমেয়ে দুনিয়ায় এসেছেন, তাদের সাত হোক কিংবা তার চেয়ে বেশি, সবাই কুরআনের হাফেয হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! এক আশেকে কুরআনের বংশের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে কুরআনের বরকত পৌছিয়ে দিলেন।

কুরআনে কারীমের শাফায়াত

কুরআনে কারীম কিয়ামতের দিন শাফায়াত (সুপারিশ) করবে। হাদীছে এসেছে, কুরআনকে এক যুবকের আকৃতিতে পেশ করা হবে। কুরআনে কারীম আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যতের দরবারে শাফায়াত করে বলবে, হে আল্লাহ! যারা আমাকে হিফয করেছে, যারা আমাকে তেলাওয়াত করেছে, যারা আমার বিধান অনুযায়ী আমল করেছে, তারা আমার হক আদায় করেছে। তারা আমার বন্ধু, আমার সহমর্মী, আমার প্রেমিক। আমি তাদের মেহমান ছিলাম। তারা আমার মেহমানদারির হক আদায় করে দিয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমের শাফায়াত কবুল করে এই শ্রেণির লোকদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন।

সম্মানিত উপস্থিতি! কুরআনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন। কুরআনে কারীমকে রক্ষাকবচ বানিয়ে নিন। সদা-সর্বদা এর তেলাওয়াত করুন এবং এর আলোয় নিজের হৃদয়কে আলোকিত করুন। দুনিয়াতেও সফল হবেন, আখেরাতেও আল্লাহ অশেষ করুণায় আপনাদেরকে সফলকাম করবেন।

কুরআন তেলাওয়াতকারীর মর্যাদা

স্মরণ রাখবেন, যে ব্যক্তি কুরআনের আলেম হবে কিংবা হাফেয হবে অথবা কারী হবে এবং ইখলাসের সাথে কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ইখলাসের উসিলায় তাকে দুনিয়াতেও ব্যক্তিত্ব-মর্যাদা দান করবেন এবং আখেরাতও দান করবেন। দুনিয়াদাররা তার পায়ের কছে বসাকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করবে। যে ব্যক্তি নিজেকে এই কুরআনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেবে, কুরআন তাকেও মর্যাদাবান করে তুলবে।

কবি বলেন–

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن * گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان.

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مؤمن * قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن.

'মুমিনের প্রতিটি মুহূর্তই নতুন শান, নতুন ক্ষণ। বচনে, স্বভাবে তাদের আল্লাহর বুরহান।'

এই রহস্য কারুরই জানা নেই যে, একজন কুরআনের পাঠক মুমিন নিজেই কুরআন।

তারপর মানুষকে যদিও কুরআনের কারী মনে হয়, তথাপি যখন কুরআন অনুযায়ী আমল করতে থাকে, তখন তাকে জীবন্ত কুরআন বলেই মনে হয়।

জীবন্ত কুরআনের পরিচয়

হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাযি.)কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল?

তিনি উত্তর দিলেন–

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰن.

'নবীজির চরিত্র ছিল কুরআন।'

যদি কেউ কুরআনকে জীবন্ত ও চলন্ত অবস্থায় দেখতে চায়, তাহলে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে নিক। তিনি চলমান ও দৃশ্যমান কুরআন ছিলেন। আজও যদি কোনো ব্যক্তি কুরআনের আয়াতকে নিজের ওপর বাস্তবায়ন করে, তাহলে সেও জীবন্ত কুরআনে পরিণত হতে পারে। যেদিকেই পা রাখবে, সেদিকই রহমত ও বরকতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আড়াই বছরে সূরা বাকারার শিক্ষা

এর বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাযি.) আড়াই বছরে সূরা বাকারা শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর মাতৃভাষা তো আরবীই ছিল। তারপরও এই সূরায় এত সময় কী কারণে লাগল? বাস্তবতা হলো, তারা একদিকে কুরআন পড়তেন, অপরদিকে সে অনুযায়ী আমল শুরু করে দিতেন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর কুরআন অনুযায়ী আমলের ব্যাপারে বলা হয়—

كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللهِ.

'তিনি আল্লাহর বিধানের সামনে গর্দান ঝুঁকিয়ে দিতেন।'

হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর বিস্ময়কর ঘটনা

একদিন হযরত হুসাইন (রাযি.) ঘরে ছিলেন। একজন মেহমান এল। তিনি তাকে বসিয়ে দাসীকে বললেন, যাও! মেহমানের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসো। দাসী ঝোলজাতীয় কোনো খাবারের গরম পাত্র নিয়ে কামরায় প্রবেশ করছিল। হঠাৎ অসতর্কতাবশত হাত ফসকে তরকারির পাত্রটা মাটিতে পড়ে গেল এবং কিছু তরকারি হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর গায়ে পড়ল। তরকারি যেহেতু গরম ছিল আর গরম তরকারি গায়ে পড়লে চামড়া জ্বলে ওঠে, তাই তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে দাসীর দিকে তাকালেন। দাসী বুঝতে পারল, তিনি খুব ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তবে সে হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর ধৈর্যশীলতা, উদারতা ও খোদাভীরুতা সম্পর্কে খুব ভালো জানত। এজন্য সে ক্রোধ দেখামাত্রই বলে উঠল—

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ

'তারা ক্রোধকে হজম করে নয়।'[১]

এটি কুরআনের সেই আয়াতের অংশ, যেখনে আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার ভালো গুণগুলোর আলোচনা করেছেন। হযরত হুসাইন (রাযি.) সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, ঠিক আছে; আমি আমার ক্রোধ সংবরণ করে নিলাম। এবার দাসী পুনরায় বলে উঠল—

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

'তারা মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হয়।'[১]

---

১. সূরা আলে ইমরান : ১৩৪

হযরত হুসাইন (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে; আমি তোমাকে ক্ষমাও করে দিলাম। আবার দাসী বলে উঠল–

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

'আল্লাহ্ অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন।'[২]

এবার হযরত হুসাইন (রাযি.) জযবায় এসে বললেন, যাও; আমি আল্লাহর জন্য তোমাকে আযাদ করে দিলাম।

সুবহানাল্লাহ! কয়েক সেকেন্ড পূর্বে তিনি যে দাসীর দিকে তাকিয়ে ক্রোধে ফেটে পড়ছিলেন, কয়েক সেকেন্ড পর তাকেই তিনি আল্লাহর জন্য আযাদ করে দিলেন! তাঁরা একদিকে কুরআন শুনতেন, অপরদিকে কুরআন অনুযায়ী জীবনকে ঢেলে সাজাতেন।

কুরআন মাজীদের সঙ্গে আমাদের আচরণ

যখন কুরআনে মাজীদের সঙ্গে আমাদেরও আমলী সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তখন আল্লাহ্ আমাদেরও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আপনারা তো কুরআনের জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াক্‌ফ করেছেন; কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা গিয়ে দেখুন, কান্না আসবে। ঘরে-ঘরে কুরআনকে রেশমি গেলাফে জড়িয়ে তাকে-তাকে সাজিয়ে রাখা হয়; কিন্তু পড়া হয় না; পড়ার সুযোগ হয় না। আজকাল প্রায় ঘরেই প্রতিদিন টিভি চালু করা হয়, নাটক-সিনেমা প্রতিদিনই দেখা হয়, ঘন্টার-পর-ঘন্টা বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখা হয়, খবরের কাগজ, বিনোদন মাগ্যাজিন প্রতিদিনই পড়া হয়; কিন্তু মাসের-পর-মাস পেরিয়ে যায়, সেই ঘরগুলোতে কুরআন খুলে পড়ার মতো কোনো আল্লাহর বান্দা খুঁজে পাওয়া যায় না। ঢালাওভাবে সবাই কুরআনবিমুখ হয়ে জীবন যাপন করছে। কুরআনের কথা তাদের মনেই পড়ে না। কুরআনের কথা শুধু তখন মনে পড়ে, যখন কন্যা বা বধূকে যৌতুক দেওয়ার প্রসঙ্গ আসে কিংবা কসম খেয়ে কাউকে আশ্বস্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ছাড়া আগে-পরে কুরআনের কথা তারা বেমালুম ভুলে যায়।

হায় আফসোস! কুরআনের কথা যদি জীবনের বাঁকে-বাঁকে স্মরণ হতো, ব্যবসার সময় মনে পড়ত, অফিসের চেয়ারে বসে মনে পড়ত, কলমের

---

১. প্রাগুক্ত

২. প্রাগুক্ত

খোঁচায়-খোঁচায় মনে পড়ত, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে মনে পড়ত, তাহলে হয়তো আমাদের জীবনের দৃশ্য অন্য রকম দেখাত।

বিজয়ের মূল রহস্য

যখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল, ইসলামের শত্রুরা তখন বলাবলি করত, যখন কুরআনের তেলাওয়াত হবে, তখন তোমরা হৈ-চৈ শুরু করে দিয়ো–

لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.

'তাহলে কেউ স্থিরভাবে কুরআন শুনতে পারবে না। হতে পারে এতে তোমরা বিজয় লাভ করবে।'[১]

তারা ভেবেছিল, বিজয় এভাবেই আসবে। কিন্তু কুরআন বলছে, বিজয় এভাবে আসবে না; বিজয়ের রহস্য অন্য কোথাও লুকায়িত। কুরআন তো বিজয় লাভের পথকে সুগম করার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। যারা নিজেদের জীবনকে এই কুরআন অনুযায়ী পরিচালিত করবে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা ও সফলতা দান করবেন দুনিয়াতেও আখেরাতেও। কারণ, এই কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত, এর বিধানাবলি প্রতিষ্ঠিত এবং এর বরকত অবারিত।

সাহাবায়ে কেরাম সেই অবিশ্বাস্য বিজয়গুলো পেয়েছিলেন এই কুরআনেরই বদৌলতে। অন্যথায় ইসলামের সূচনালগ্নে কাফেরদের সংখ্যা ছিল বেশি আর মুমিন সাহাবাদের সংখ্যা নিতান্ত কম। তখন তো ঘরের দরজা বন্ধ করে ঈমানের কালেমা শেখানো হতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করছেন–

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'তোমরা স্মরণ করো, যখন তোমরা অল্প ছিলে, দুর্বল ও সহায়হীন ছিলে তোমরা শঙ্কা করতে যে, লোকেরা তোমাদের ক্ষতি না করে বসে। তারপর আল্লাহ তোমাদের আশ্রয় দিলেন এবং নিজ সহায়তায় তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তোমদের পবিত্র রিযিক দান করলেন, যেন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার শুকরিয়া আদায় কর।'[২]

---

১. সূরা হামীম সাজদাহ : ২৬

২. সূরা আনফাল : ২৬

আল্লাহর ঘোষণা

কাফের দুশমনরা তো চেয়েই ছিল যে, যেকোনো উপায়ে ইসলামের এই ছোট্ট চারাগাছটি কেটে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'তিনি ওই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন এই দীন সকল দীনের ওপর বিজয়ী হতে পারে যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।'[১]

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের বলেছেন, 'তোমরা কাফেরদের ভয় করো না।' অপরদিকে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত করে তিনি ইরশাদ করেন–

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

'তারা চায়, তারা আল্লাহর নূরকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিবে।'[২]

কিন্তু আল্লাহ বলেন–

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

'আল্লাহ স্বীয় নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।'[৩]

সুবহানাল্লাহ! যে নূরকে আল্লাহ তা'আলা আলোকিত করবেন, তাকে দুনিয়ার কোনো শক্তি কি নেভাতে পারবে?

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن * پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیگا.

فانوس بنکر جس کو روشن ہوا کرے * وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

'আল্লাহর নূর কুফরের আস্ফালন দেখে মুচকি হাসে। ফুঁ মেরে সেই নূর নেভানো যাবে না, ফানুস হয়ে বাতাস যাকে আলোকিত করে।'

সেই প্রদীপ কে নেভাবে, যাকে স্বয়ং খোদা আলোকিত করবেন?

---

১. সূরা সফ : ৯

২. সূরা সফ : ৮

৩. প্রাগুক্ত

কাফেরদের ব্যর্থ চেষ্টা

কাফেররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নবীজিকে হত্যা করা। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন–

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ.

'হে প্রিয় রাসূল! যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল যে, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন একজন করে নিয়ে সম্মিলিত জামাত নিয়ে রাতের গভীরে তাঁর ঘরের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা হবে এবং যখন তিনি নামযের জন্য বের হবেন তখন তাকে হত্যা করা হবে।'[১]

কাফেরদের কৌশলও কিন্তু দূরদর্শী ছিল। তারা পরিকল্পিতবাবে নবীজিকে হত্যা করে শহীদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ বলেন–

وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.

'তারা এমন গোপন দূরভিসন্ধি আঁটত যে, তাতে পাহাড় পর্যন্ত নড়বড়ে হয়ে যেত।'

তারপরও কুরআন ঘোষণা করছে–

وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ.

'তাদের সকল ষড়যন্ত নস্যাৎ করে দেওয়া হবে।'[২]

তিনি স্বীয় হাবীবকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন–

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

'হে প্রিয় রাসূল! তারা তো আপনার পূর্ববর্তী নবীদের সঙ্গেও এমন ষড়যন্ত ও দুর্ব্যবহার করেছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘর-বাড়িগুলো মূলসহ উপড়ে ফেলেছেন। ফলে তাদের ছাদগুলো তাদের ওপর গুড়িয়ে পড়ল এবং তাদের আযাব আপতিত হলো যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি।'

---

১. সূরা আনফাল : ৩০

২. সূরা ফাতির : ১০

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত অন্যত্র স্বীয় হাবীবকে সম্বোধন করে বলেন–

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

'যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল আপনাকে বন্দী করে রাখবে অথবা আপনাকে শহীদ করে দেবে অথবা আপনাকে দেশান্তর করে দেবে। তারাও তদবীর করেছে, আল্লাহও তদবীর করেছেন। আল্লাহ উত্তম তদবীরকারী।'[১]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা কিভাবে স্বীয় হাবীবকে কাফেরদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন! বন্ধুরা আমার! আমরা কুরআকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখব। এটিই আমাদের মূল সম্পদ। এর বিপরীতে যদি কাফির-মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তাহলে মহান শক্তিশালী আল্লাহ তাদের সকল ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ করে দেবেন। আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

'তোমরা হীনবল হয়ো না, দুশ্চিন্তাও করো না; যদি প্রকৃত মুমিন হও, তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।'[২]

مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں.
تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نقص ہے تیرے ایمان میں.

'মুমিনের জন্য কুরআনে বিজয়ের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তুমি মুমিন হয়েও যদি বিজয়ী না হও, তাহলে তোমার ঈমানে দুর্বলতা আছে।'

আজ তো আমাদের ঈমান দুর্বল, যার কারণে আমরা দুনিয়ায় লাঞ্ছিত হয়ে শাসিত ও নিপীড়িত হয়ে জীবন যাপন করছি। তা না হলে, আল্লাহ তো আমাদেরকে বিজয় দান করার জন্যই বসে আছেন।

আল্লাহর সাহায্য

স্মরণ রাখবেন, যে পাল্লায় আল্লাহর সাহায্যের ওজন এসে যায়, সেই পাল্লা সমগ্র বিশ্বের চেয়েও বেশি ভারী হয়ে যায়।

---

১. সূরা আনফাল : ৩০

২. সূরা আলে ইমরান : ১৩৯

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'কতবার এমন হয়েছে যে, একটি ক্ষুদ্র দল একটি বড় দলের ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে আল্লাহর আদেশে। আল্লাহ তো ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।'[১]

যদি এর ব্যখ্যা করি, তাহলে এভাবে হবে যে, 'কতবার এমন হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা চড়ুই দিয়ে ঈগলকে পরাজিত করেছেন।' সুতরাং আজ আমরা যদিও কাফেরদের বেশি সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালি দেখছি, তারপরও দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কুরআনকে বুকে জড়িয়ে নিন, কুরআন অনুযায়ী জীবনকে ঢেলে সাজান। দেখবেন, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আপনাকে বদরের মতো সাহায্য করবেন। আল্লাহ আরও বলেন–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ

আল্লাহ তোমাদেরকে নানা জায়গায় সাহায্য করেছেন।[২]

অন্যত্র বলেন–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ

'আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন।'

আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। অন্য আয়াতে আছে–

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

আমার রাসূলদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরও এই ইহলোকেও এবং সেদিনও যেদিন সাক্ষ গ্রহণ করা হবে।'[৩]

যখন ঈমানওয়ালাদের সাহায্য করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজের ওপর নিয়েছেন, তাহলে আমাদের দুঃশ্চিন্তার কোনোই কারণ নেই।

কত বড় নিরাপত্তা!

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা আমার! আমরা আমাদের শত্রুদের চিনি না।

---

১. সূরা বাকারা : ২৪৯

২. সূরা তাওবা : ২৫

৩. সূরা গাফির : ৫১

আল্লাহ বলেন–

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদের শত্রুকে চেন না। তোমাদের মধ্যে মুনাফিকরাও রয়েছে, বেশ-ভূষা পরিবর্তন করে আগন্তুক গুপ্তচরও আছে। তোমাদের জানা নেই, যার সঙ্গে তোমরা কথা বলছ, সে তোমার বন্ধু, না শত্র। কিন্তু আল্লাহ ঠিকই জানেন, কে বন্ধু, কে শত্রু। তিনি তো অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন। সুতরাং আমাদের রব যেহেতু আমাদের শত্রুদের চিনেন এবং জানেন, তাহলে স্মরণ রাখবেন–

لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

আল্লাহ কখনও কাফেরদের ঈমানদারদের পর্যন্ত পৌছতে দেবেন না।'[১]

সুবহানাল্লাহ! করুণাময় আল্লাহ কত বড় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ঘোষণা করেছেন। স্বয়ং আল্লাহই তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন। যেমন- আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলার সময় বলে থাকি আরে! তুই আমার বন্ধু পর্যন্ত যেতে হলে আমরা লাশ মাড়িয়ে যেতে হবে।' ঠিক এই বিষয়টিই আল্লাহ তা'আলা এখানে বর্ণনা করছেন যে, হে আমার মুমিন বন্দারা! যে তোমাদের পর্যন্ত পৌছতে চায়, তাকে প্রথমে আমার মুখোমুখি হতে হবে, তারপর তোমরা। আর যে আমার সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে চায়, তাকে আমি ছিন্নভিন্ন করে ফেলি। পৃথিবীতে তার কোনো নাম-নিশানাও বাকি থাকে না।

খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য

খন্দকের যুদ্ধে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার যুদ্ধবাজ কবিলাগুলো সম্মিলিতভাবে যখন মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল, তখন মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কাফির-মুশরিকদের সংখ্যা ছিল বিপুল। তারা বলাবলি করছিল, মুসলমানরা আমাদের হাতে টুকরা-টুকরা হয়ে যাবে। খন্দকের ওপারে একমাস যাবত লম্ফঝম্ফ দিয়েছে; কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। আল্লাহ বলেন–

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا.

'আল্লাহ কাফেরদের তাদের ক্রোধসহই ফিরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই অভিযানে তাদের কোনোই লাভ হয়নি।'[১]

---

১. সূরা নিসা : ১৪১

বস্তবতা হলো, সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলার ওপর পূর্ণ ভরসা করে তাকওয়া ও পবিত্রতার পথে পা বাড়িয়েছিলেন। আর সেজন্যই কাফেররা তাদের ওপর জয়ী হতে পারেনি।

ভিতর-বাহির পরিশুদ্ধ করার উপায়

এই অধমের পীর ও মুরশিদ একটি বিস্ময়কর কথা বলতেন, 'তোমার হাতে থাকবে কুরআন; তুমি দুনিয়ায় থাকবে পেরেশান। তোমার হাতে থাকবে কুরআন; তুমি দুনিয়ায় থাকবে নাকাম (বিফল)। তোমার হাতে থাকবে কুরআন, তুমি দুনিয়ায় থাকবে গোলাম (দাস)। গোলামি কার হবে? প্রবৃত্তির? শয়তানের? কোনো মানুষের? না, না, কুরআন বলছে 'হে আমার অনুসারী মুসলমানেরা! اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. পড়ো তুমি কুরআন; রব তোমার করবে ইকরাম। তোমার রব তোমাকে ইয্যত ও সম্মান দেবেন। তোমার ভিতর-বাহিরকে আলোকিত করে দেবেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা এতটাই করুণার উপযোগী হয়ে গেছে যে, আল্লাহর হাবীব কিয়ামতের দিন বলবে–

يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُورًا.

'হে আমার রব! আমার কওম কুরআনকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে।'[২]

সুতরাং আজ থেকেই কুরআনকে ভালোবাসতে শুরু করুন। এর দ্বারা নিজের অন্তরের ব্যাধিগুলো ভালো করে নিন।

পূর্ণ শেফা পাওয়ার উপায়

চিন্তা করে দেখুন! পূর্ণ শেফার ব্যবস্থাপত্র আমাদের হাতেই আছে। অথচ আমাদের অন্তরগুলো রোগে জর্জরিত। হিংসা-বিদ্বেষ, অহঙ্কার, আত্মতুষ্টি আরও কত কিছু। যখন কুরআন বুকে ঢুকে যাবে, তখন অন্তরের সকল ব্যধি দূর হয়ে যাবে। ব্যবস্থাপত্রও আমাদের হাতে, আবার মারাও যচ্ছি আমরাই। আজকের মুসলমানদের এ কথা বোঝাবার কি কেউ নেই যে, কুরআনের শেফামূলক ব্যবস্থাপত্র থেকে কোনো উপকৃত হচ্ছ না? এতে নিশ্চিত আরোগ্য রয়েছে। এ আল্লাহ তা'আলারই দেওয়া। আসুন! দেখি, কুরআন শেফা সম্পর্কে কী বলে।

---

১. সূরা আহযাব : ২৫

২. সূরা ফুরকান : ৩০

কুরআন বলছে–

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ.

তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহকে নিরাময় করেন।[১]

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.

এটি মানুষের অন্তরের নিরাময় এবং হেদায়াত।[2]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.

আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি, তা মুমিন বান্দাদের জন্য নিরাময় ও রহমত।[৩]

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.

হে নবী! আপনি বলুন, এটি মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও নিরাময়।[4]

এই আয়াতগুলোই হলো কুরআনের শেফামূলক ব্যবস্থাপত্র, যা মানবহৃদয়গুলো ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেয়। এই মোবারক সাবান ব্যবহার করুন; হৃদয় আবর্জনামুক্ত ও নিষ্কলুষ হয়ে যাবে, মন পরিষ্কার হবে। কিন্তু হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য কুরআনকে হৃদয়ে গেঁথে নিতে হবে। শুধু মুখে-মুখেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে। যখন হৃদয় কুরআনকে ধারণ করবে, তখন গোটা অন্তরজগত আলোকিত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনের হাফেয বানিয়ে দিন, কুরআনের আলেম বানিয়ে দিন, কুরআনের প্রচারক বানিয়ে দিন, কুরআনের আশেক বানিয়ে দিন, কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

– ৩য় খণ্ড সমাপ্ত –

---

১. সূরা তাওবা : ১৪

২. সূরা ইউনুস : ৫৭

৩. সূরা বানী ইসরাঈল

৪. সূরা হা-মীম সাজদা : ৪৪

খুতুবাতে যুলফিকার

চতুর্থ খণ্ড

কুরআন ও তাফসীরুল কুরআন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম

আল-কুরআনুল কারীম মূলত আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের পবিত্র কালামের সমষ্টি, যা তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। যেভাবে মানুষের চেয়ে আল্লাহর মর্যাদা বেশি, তদ্রূপ আল্লাহর কালামের মর্যাদাও মানুষের কালামের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি। আরবি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে–

كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَامِ.

'বাদশার কথা কথার বাদশা।'

এ কিতাবটি মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিশা দেয়। পথহারাদের দেয় পথের সন্ধান। অপদস্থতার তলদেশ থেকে তুলে এনে সুরায়্যা তারকার উচ্চতায় সমাসীন করে এবং আল্লাহ থেকে বিছিন্ন মানুষগুলোকে আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেয়।

কুরআন মাজীদ সত্য কিতাব

এই কিতাবটি স্বয়ং আল্লাহ নাযিল করেছেন। তিনি নিজের ব্যাপারে নিজেই বলেছেন–

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

'আল্লাহ থেকে বেশি সত্যবাদী আর কে হতে পারে?'[১]

---

১. সূরা নিসা : ১২২

অন্যত্রে বলেন–

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ

'হে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন।'[১]

সুতরাং এই চিরসত্য কালাম যে মহান সত্তার, তিনি সবচেয়ে বেশি সত্য। এই পবিত্র কালামকে যিনি দুনিয়ায় নিয়ে আসতেন, তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, যাঁর আমানত ও সততার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন–

ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ

'সে অত্যন্ত শক্তিশালী; আরশের পাশেই তার অবস্থান, সে অত্যন্ত অনুগত ও আমানতদার।'[২]

আমানতদারি বলা হয়, কোনো দ্রব্য যদি কারো কাছে আমানত রাখা হয়, তা হুবহু ফেরত দেওয়া, কোনো ধরনের পরিবর্তন না করা। এই আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল ইয্যত জিবরাঈল (আ.)-এর আমানতদারি ও সততার সাক্ষ্য দিলেন।

এমনিভাবে হেদায়াতের আলোকবর্তিকা, মানবতার মুক্তির দূত, আল্লাহর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – যাঁকে সেই চিরসত্য কালামের প্রচারক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে – তাঁর চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও মহানুভবতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'এবং আপনি অবশ্যই সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাব-চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।'[৩]

তিনি এমন ব্যক্তিত্ব, যাঁর দৃষ্টি বক্রতা থেকে মুক্ত। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

'তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেন না।'[৪]

---

১. সূরা আলে ইমরান : ৯৫

২. সূরা তাকভীর : ২০, ২১

৩. সূরা কালাম : ৪

৪. সূরা নাজম : ৩

মোটকথা, আল্লাহ রব্বুল ইয্যতও সত্যবাদী, কুরআন নিয়ে দুনিয়ায় আগমনকারী জিবরাঈলও সত্যবাদী এবং যাঁর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হলো, কুরআনের ধারক সেই রাসূলও সত্যবাদী। ফল দাঁড়াল, সত্যের কথা, সত্যের মাধ্যমে, সত্যের কাছে এসেছে। সুবহানাল্লাহ!

কুরআন আল্লাহর আমানত

সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এই মহান আমানত তাঁর বান্দাদের নিকট ঠিক-ঠিকভাবে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ তা'আলা যেভাবে এই কুরআনের শব্দগুলো নাযিল করেছেন, তদ্রূপ এর অর্থগুলোও তিনি বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন– ওহী অবতরণের প্রাথমিক যুগে যখন কুরআনে কারীমের কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো মুখস্থ করার জন্য খুব তাড়াহুড়া করতেন। আল্লাহ বললেন–

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

'হে নবী! কুরআন পড়তে গিয়ে আপনি জিহ্বাকে এত দ্রুত নাড়াচাড়া করবেন না; কুরআনকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমার।'[১]

কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্বও আল্লাহ তা'আলা নিজের ওপর নিয়েছেন এবং এর প্রকাশ ও প্রচারের দায়িত্বও নিজের ওপর রেখেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, কুরআনের শব্দগুলো যেভাবে আল্লাহ তা'আলার হেফাযতে বান্দাদের কাছে পৌঁছেছে, তদ্রূপ কুরআনের অর্থ-ব্যাখ্যাও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আদেশে যথাযথভাবে উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং কুরআন আমাদের নিকট দুভাবে সংরক্ষিত আছে। এক. ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত কুরআনের শব্দমালা। দুই. ওহী ও ইল্‌হামকর্তৃক প্রাপ্ত নবীজির বর্ণিত অর্থ ও ব্যাখ্যাসমূহ। কারো জন্য এই অনুমতি নেই যে, কুরআনে কারীমের হাদীছে বর্ণিত অর্থ ও ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে নিজ থেকে মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করবে। কারণ, কথা যার, তিনিই তাঁর কথার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন। এ তো ইনসাফের কথা হলো না যে, কথা বা বাণী যার, তাঁর ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রচার করবে। সুতরাং ওই শব্দমালাই গ্রহণযোগ্য হবে, যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং অর্থ ও ব্যাখ্যাও সেটাই গ্রহণ করা হবে, যা আল্লাহর রাসূল বর্ণনা করেছেন।

---

১. সূরা কিয়ামা : ১৬, ১৭

কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি

আজকাল কিছুলোক আরবি ভাষা বোঝার বাহানায় কুরআনে কারীমের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ খোঁজা শুরু করে দিয়েছে। অথচ কুরআনে কারীমে নিজের নয়, আল্লাহর স্বার্থ খোঁজা দরকার ছিল। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছে, সে অনেক বড়-বড় ফেতনা থেকে বেঁচে যাবে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল ইয্যত কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যাকে তাঁর প্রেরিত রাসূলের মাধ্যমে বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এখন তাফসীর কেবল তাকেই বলা হবে, যা সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন এবং যা উম্মতে মুসলিমার দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম অবিকৃত অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। কারো মনগড়া কথা বা মতবাদকে তাফসীর বলা যাবে না। 'তাফসীরুল কুরআন'-এর এটাই প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞা।

তাফসীর বির্‌রায় বা মনগড়া তাফসীর

নিজের মতামত ও রায় দিয়ে কুরআনের কোনো আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা স্থির করাকে 'তাফসীর বির্‌রায়' তথা মনগড়া তাফসীর বলে, তাফসীর বির্‌রায় সম্পর্কে হাদীছে এসেছে–

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْاٰنَ بِرَأْيِهٖ فَقَدْ كَفَرَ

'যেলোক নিজের মতবাদ ও মতামতের আলোকে (প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও) কুরআনের তাফসীর করল, সে কুফরি করল।'

বরং ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি এমন হয় যে, কারো কোনো আয়াতের তাফসীর জানা ছিল না; সে নিজের মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে অর্থ চিন্তা করে তাফসীর করল এবং তা সঠিকও হলো, তারপরও বলতে হবে, সে ভুল করেছে। যদি সে এভাবে বলে যে, এ আয়াতের তাফসীর এমন, তাহলেও এটা তার দুঃসাহস বলেই বিবেচিত হবে। কুরআনের প্রতিষ্ঠিত তাফসীরের বিপরীতে নিজের রায় পেশ করার অধিকার কারো নেই। এটা গোমরাহির দ্বার উন্মোচন করে দেয়।

এক ডাক্তারের ঘটনা

কুরআনে কারীমের একটি আয়াত পড়ে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত দীনদার বিভ্রান্তির শিকার হয়। আলেম হলে হয়তো হতো না।

আয়াতটি হলো, আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

'আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি; সুতরাং আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?'[১]

একদিন এক এম.বি.বি.এস, ডাক্তার এসে আমাকে বলল, হযরত! যে কিতাবকে আল্লাহ তা'আলা সহজ করে বানিয়েছেন, বান্দা তাকে এত জটিল কেন বানাচ্ছে? আমি বললাম, কী বলতে চাচ্ছেন; খুলে বলুন! সে উক্ত আয়াতটি পড়ে শোনাল। আমি বললাম, আচ্ছা বলুন তো, فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ এতে مُّدَّكِرٍ শব্দটির আসল রূপ কী ছিল? আর কোন কায়দার ভিত্তিতে এখানে ذ (যাল) অক্ষরটি د (দাল)-এ পরিণত হলো? সে এর কোনো উত্তর দিতে পারল না। তারপর আমি তাকে বোঝালাম, পবিত্র কুরআনে দু-ধরনের আয়াত রয়েছে। এক. উপদেশসংক্রান্ত। দুই. বিধানসংক্রান্ত। এর মধ্যে উপদেশসংক্রান্ত আয়াতগুলো বোঝা খুবই সহজ এবং উক্ত আয়াতটি সেই বিষয়সংশ্লিষ্ট। আর বিধানসংক্রান্ত আয়াতগুলো বোঝা ঐসব ওলামায়ে কেরামের কাজ, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইল্‌মের উঁচু মাকাম দান করেছেন।

ফোকাহায়ে কেরামের মাকাম

কুরআনে কারীমের আয়াতের মধ্যে ডুব দিয়ে, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে এর প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করা উম্মাহর ফোকাহায়ে কেরামের দায়িত্ব। যেমন- ফোকাহায়ে কেরাম ওযুসংক্রান্ত আয়াতগুলো থেকে প্রায় শতাধিক বিধান বের করেছেন। কুরআনের গভীরতা দেখুন। একটি বিষয়সংক্রান্ত আয়াতসমূহে শতাধিক মাসায়েল বের হয়ে এসেছে। এ কাজ কি সবার দ্বারা সম্ভব? এর জন্য চাই ইল্‌মের গভীরতা, প্রজ্ঞার পরিপক্বতা। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে এই সম্পদ দান করেছেন, তাকে 'খাইরে কাসীর' তথা বিপুল কল্যাণ দান করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে ওলামায়ে মোহাদ্দেছীনও ফোকাহায়ে কেরামের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁরা অকপটে স্বীকার করতেন, কুরআন ও হাদীছের তাত্ত্বিক যে জ্ঞান ফোকাহায়ে কেরামের কাছে আছে, তা আমাদের কাছে নেই। কারণ,

---

১. সূরা কামার : ১৭

মোহাদ্দেছীনে কেরাম কুরআন-হাদীছের অক্ষরের হেফাযত করেছেন আর ফোকাহায়ে কেরাম তার অর্থ, ব্যাখ্যা ও হেকমতের হেফাযত করেছেন। এ কারণেই ইমাম আযম আবূ হানিফা (রহ.) ইমাম শাফেঈ প্রমুখ ফোকাহায়ে ইসলামকে উম্মত আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তাঁরা কুরআন ও হাদীছের বিশাল ভাণ্ডার মন্থন করে উম্মতের জন্য শরীয়তের জটিল-জটিল সমস্যাগুলোর চমৎকার সমাধান দিয়ে গেছেন। উম্মত তাদের এই অবদানের বদলা দিতে পারবে না। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ, তারা এসকল মহান মণীষীর জন্য আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের দু'আ করবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও সতেরো হাদীছের ঘটনা

দেশের বাইরে একস্থানে একব্যক্তি এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! শুনেছি, ইমাম আবু হানিফা মাত্র সতেরোটি হাদীছ মুখস্থ জানতেন। যার পুঁজি এত অল্প, তাকে কিভাবে আপনারা ইমাম মেনে নিয়েছেন? আমি উত্তর দিলাম, আপনার একথাটা শোনার আগে আমি একশত পার্সেন্ট হানাফী ছিলাম; কিন্তু আপনার এই কথা শোনার পর এখন আমি একশত এক পার্সেন্ট হানাফী হয়ে গেলাম।

সে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, তা কিভাবে? আমি বললাম, একথা তো সারা দুনিয়া জানে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে প্রায় ছয় লক্ষ মাসায়েল ইজতিহাদ ও ইসতিম্বাত করা হয়েছিল। তো যে ইমাম মাত্র সতেরোটি হাদীছ থেকে ছয় লক্ষ মাসায়েল আবিষ্কার করতে পারেন, এই অধম তাঁকে ইমাম না মানলে আর কাকে মানবে? এমন ইমামকে আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই। আমি নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে তার কদমে সমর্পণ করি।

এবার তার হুশ হলো। বলল, ও আচ্ছা; এবার আমার বুঝে এসেছে। বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তা'আলা ইমাম আযম (রহ.)কে 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' এবং ইজতিহাদ-গবেষণায় ওই মর্যাদা দান করেছেন, যা সাধারণ মানুষের ধারণার ঊর্ধ্বে।

যাহোক, এই কুরআনের সেই ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য হবে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেছেন এবং সেগুলো বোঝার জন্য তাদের কাছে যেতে হবে। তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে থেকে সেগুলো শিখতে হবে। শুধু কিতাব পড়ে আমরা সব কিছু বুঝতে পারব না। সবার মেধা, মনন ও দূরদর্শিতা সমান নয়। শরয়ী ইল্‌মের যে গভীরতা তাদের অর্জিত ছিল, আমরা তো সেই গভীরতা পর্যন্ত পৌছাতে পারব না।

তাই বুযুর্গানে দীনের সঙ্গে-সান্নিধ্যে-সাহচর্যে থাকার মাঝেই কল্যাণ। যেমন- হাদীছে আছে–

اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ

'বরকত তোমাদের বড়দের সাথেই রয়েছে।'

এজন্য নিজের বড়দের সঙ্গে ইল্‌মী বন্ধন সুদৃঢ় রাখা খুবই জরুরি। এতে নিজের হেদায়াতের পথ সুগম থাকে। যার ইল্‌মী সম্পর্ক বড়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সে সুতাকাটা ঘুড়ির মতো পথহারা হয়ে যাবে। শয়তান যেকোনো সময় তাকে ফাঁদে ফেলে বিভ্রান্ত করতে পারে।

এই 'তাফহীম' (অনুআবন) ও 'তাদাব্বুর' (গবেষণা) শব্দদুটি মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। ভাইয়েরা আমার! শুধু আরবি ভাষার জ্ঞান দ্বারা কুরআনকে বোঝার চেষ্টাকে 'তাফহীমুল কুরআন' কিংবা 'তাদাব্বুরে কুরআন' বলে না।

ওলামায়ে কেরাম ও কুরআন অনুধাবন

সাধারণ মানুষের স্তর তো হলো এই যে, কুরআন শোনার পর সে এতটুকু বুঝতে পারবে যে, এখন জাহান্নাম ও জান্নাতের আলোচনা চলছে। অর্থাৎ– মোটা-মোটা উপদেশমূলক কথাগুলো তারা অনুধাবন করতে পারে। আর ওলামায়ে কেরামের কথা যদি বলি, তাহলে, তারা হলেন وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ যাঁরা ইল্‌মে দীনে গভীরতা রাখেন। এঁরা কুরআনের আয়াতের মধ্যে ডুব দিয়ে তথ্য ও তত্ত্বের মণি-মুক্তা বের করে আনেন। সুতরাং বিধান নিয়ে গবেষণা করা, ইজতিহাদ করে মাসআলা উদ্ভাবন করা ওলামায়ে কেরামের কাজ। সাধারণ মানুষের এর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। এই কঠিন কাজটি তিনি-ই করতে পারেন, যিনি নিজের জীবনকে ইল্‌মে দীন অর্জনের জন্য ওয়াক্‌ফ্ করতে পেরেছেন।

আরবি গ্রামার জানা কুরআন বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়

শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) বলতেন, কুরআনে কারীম বোঝার জন্য পনেরোটি শাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য। শুধু আরবি গ্রামার পড়ে কিংবা শুধু অনূদিত কিতাব পড়ে কুরআন বুঝতে চাওয়া গোমরাহির কারণ হতে পারে।

দেখুন, কুরআনে কারীমের একটি আয়াত আছে–

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

এখানে তিনটি শব্দ النَّجْمُ - الشَّجَرُ - يَسْجُدَانِ এই শব্দগুলো উর্দূতেও ব্যবহৃত হয়। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, 'তারকা ও গাছ সিজদা করে।' অথচ এই অর্থ ভুল। কারণ, মুফসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, النَّجْمُ এর একটি অর্থ যেভাবে তারকা হয়, তদ্রূপ অপর অর্থ হয় ডালবিহীন গাছ। এ দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় 'ডালবিহীন গাছ এবং ডালবিশিষ্ট গাছ উভয়ই স্বীয় রবকে সিজদা করে।'

এমনিভাবে কুরআনের আরেকটি আয়াত আছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর সত্য-সঠিক কথা বলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কাজগুলো ঠিক করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন।'[১]

এ আয়াতে يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ এর অর্থ কী? বাহ্যিকভাবে মনে হয়, এর অর্থ হলো, 'আল্লাহ আমাদের আমলকে ঠিক করে দেবেন।' কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, 'আল্লাহ তোমাদের আমলকে কবুল করবেন এবং তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন।'

এখানে শব্দ যদিও إِصْلَاحٌ আছে, কিন্তু অর্থ দেবে قَبُوْل -এর। তো এর দ্বারা বোঝা গেল, শুধু বাহ্যিক শব্দার্থ জানার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। আল্লাহর উদ্দেশ্য বুঝতে হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারস্থ হতে হবে, যাঁকে মহান সৃষ্টিকর্তা এ কাজের জন্যই প্রেরণ করেছেন।

চিঠি-পত্রের মাধ্যমে কুরআন বোঝা

আজ তো এমন যুগ এসে গেছে যে, চিঠি-পত্রের মাধ্যমে কুরআন বোঝার কাজ শুরু হয়েছে। সেনাবাহীনির এক মেজর আমাদের সিলসিলায়ে আলিয়ায় বায়'আত হন। তিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন, হযরত! আমার জীবন তো বদলে গেছে। এখন আমি কুরআনুল কারীম শিখতে ও বুঝতে চাচ্ছি। অমুক একাডেমি চিঠি-পত্রের মাধ্যমে কুরআন শিখাচ্ছে। আমি শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে

---

১. সূরা আহযাব : ৭০, ৭১

বললাম, এটাও একটা নতুন তামাশা! এ জাতীয় সকল কার্যক্রম জনসাধারণকে ওলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে সাধারণ মানুষ ওলামায়ে কেরাম থেকে দূরে সরে যায় এবং নিজে-নিজে কুরআন বোঝার চেষ্টা করে। আর এই অনুচিত কাজটা-ই জনসাধারণকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেয়।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) ও কুরআন অনুধাবন

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) কুরআনে মাজীদ নিজেরা-নিজেরা বোঝেননি; বরং নবীজি তাঁদের বুঝিয়েছে। অথচ আরবি তো তাদের মাতৃভাষা ছিল। সরফের গরদান ও নাহুর কায়েদা-কানুন তাঁদের পড়া লাগেনি। কুরআন তাঁদের মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারপরও তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এই আয়াতের অর্থ কী?

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) এই উম্মতের একজন বিদগ্ধ ফকীহাহ ও ইল্‌মে নববীর ধারক-বাহক ছিলেন। কুরআনে কারীমের কোনো-কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁরও খটকা লেগে যেত। একবার তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهٖ (যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে, তাকে তার বিনিময়ে শাস্তি দেওয়া হবে) এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক পাপী বান্দাই শাস্তির মুখোমুখি হবে। আর আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার কোনো পাপ নেই? সবার কিছু-না-কিছু পাপ অবশ্যই আছে। তাহলে সবাইকেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। উত্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বললেন, তার সারকথা হলো, সকল শাস্তি পরকালের জন্য জমা করে রাখা হয় না। দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের দুঃখ, রোগ-ব্যাধির কারণে বান্দার পাপ মুছে দেওয়া হয়। এতে তার অনেক গুনাহের কাফফারা হযে যায়। এবার তাঁর মনের খটকা দূর হলো।

বলুন তো, যাঁদের সম্মুখে কুরআন নাযিল হতো, যাঁদের বিছানায় ওহী অবতীর্ণ হতো, যাঁরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন, তাঁদের যদি কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি হতো এবং নবীজির কাছ থেকে জেনে নিতে হতো, তাহলে আজ আমরা নিজে-নিজে কুরআন পড়ে কিভাবে এই দাবি করতে পারি যে, আমি যেহেতু আরবি ভাষা জানি, তাই কোনো মাওলানার কাছে গিয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই? যা বোঝার নিজে-নিজেই বুঝতে পারব।

এবার আসুন! আমরা আমাদের বড়দের কিছু ইল্মী গভীরতা ও দূরদর্শিতার কিছু ঘটনা শুনি।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এক মজলিসে বসা ছিলেন। এক বৃদ্ধ এসে বলল, وَاوٌ اَوْ وَاوَيْنِ (এক ওয়াও, না কি দুই ওয়াও?)

ইমাম সাহেব বললেন, وَاوَيْنِ (দুই ওয়াও)

সে পুনরায় বলল, لَا وَلَا (না, না।) তারপর চলে গেল। উপস্থিত মজলিসের কেউই কিছু বুঝল না। অথচ যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের ইল্মী মাকাম পুরো পৃথিবী স্বীকার করে। যেমন- ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), যিনি বহু বড় মুহাদ্দিছ ও ফকীহ ছিলেন। কাসেম ইবনে মা'আন (রহ.) ও মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহ.)ও ছিলেন যাঁরা আরবি ভাষার পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। আরও ছিলেন ইমাম যুফার (রহ.), আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ (রহ.)-এর মতো দক্ষ কিয়াস ও ইসতিহসানের সম্রাটগণ। ছিলেন ইমাম দাউদ তাঈ'র মতো যুহ্দ ও তাকওয়ার পাহাড়ের মতো বিশাল-বিশাল ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু এই ইঙ্গিতসূচক কথাবার্তাগুলো তাদেরও বোধগম্য হলো না।

অবশেষে তাঁরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! লোকটি কী জিজ্ঞাসা করেছিল? তিনি উত্তর দিলেন, সে اَلتَّحِيَّات (তাশাহুদ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ এর মধ্যে দুটি وا আছে। সে জানতে চেয়েছিল, আমি কি দুই وا বিশিষ্ট اَلتَّحِيَّات পড়ব, নাকি এক وا বিশিষ্ট اَلتَّحِيَّات পড়ব? আমি তাকে উত্তর দিলাম, وَاوَيْنِ অর্থাৎ দুই وا বিশিষ্ট اَلتَّحِيَّات পড়ো। সে খুশি হয়ে বলল, সত্যিই আপনি ইল্মের شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ لَا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ এর মতো। اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ তারপর বলল, এবং لَا وَلَا বলে ইঙ্গিত করল, আপনার মতো আলেম না মাশরিকে (পূর্বে) আছে, না মাগরিবে (পশ্চিমে)।

আপেলের গায়ে ছুরি চালিয়ে প্রশ্নোত্তর

এমনিভাবে তিনি একদিন ক্লাসে ছাত্রদের দরস দিচ্ছিলেন। এক মহিলা মাসআলা জিজ্ঞাস করার জন্য এল। কিন্তু পুরুষের সামনে লজ্জার করণে জিজ্ঞাসা করতে পারল না। একটা ছোট্ট শিশুর হাতে একটা আপেল দিয়ে তা ইমাম সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিল। আপেলটার কিছু অংশ ছিল লাল আর কিছু অংশ হলুদ। ইমাম সাহেব আপেলটা ছুরি দিয়ে কেটে পাঠিয়ে দিলেন। কাটা আপেলটা নিয়ে মহিলা চলে গেল। সবাই বিষয়টি বুঝতে না পেরে

ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি উত্তরে বললেন, মহিলা মাসিক সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছিল। কিন্তু তোমরা বসা ছিলে বলে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেনি; আপেল পঠিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করেছে। সে বোঝাতে চেয়েছিল, মাসিকের রক্তের রং যদি হলুদ হয়ে যায়, তাহলে গোসল করতে পারবে কি-না? আমি আপেলের চামড়া কেটে ভিতরের সাদা রং দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত হলুদ রং সাদা রঙে পরিণত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোসল করতে পারবে না।

সুবহানাল্লাহ! চিন্তা করুন! প্রশ্নকারী কেমন ছিলেন আর তার উত্তরদাতা-ইবা কেমন ছিলেন! আজকালের লোকেরা এসব ইশারা-ইঙ্গিত কোত্থেকে বুঝবে? এ জাতীয় বড়-বড় মণীষীদের ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী লোকের সংখ্যাও যুগে-যুগে কম ছিল না। দুনিয়ায় যিনি যত বড় মর্যাদা অর্জন করেছেন, তাঁর হিংসুকের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বেশি ছিল।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হিংসুকদল

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর হিংসুকরা দু-ধরনের ছিল। কিছু লোক ছিল, যারা তার ইল্‌মী ব্যক্তিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য হিংসা করত। যেমন-এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, হযরত! আমরা শুনেছি, আপনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনিও প্রশ্ন করতে পারেন। সে বলল, বলুন, পায়খানার স্বাদ কেমন?

আচ্ছা; বলুন তো, কোনো ভদ্র লোক কি কখনও এমন নোংরা প্রশ্ন করতে পারে? কিন্তু সে ছিল হিংসুক। তাই কষ্ট দেওয়ার জন্যই এমন প্রশ্ন করল। আল্লাহ তা'আলা ইমাম সাহেবকে সীমাহীন ধৈর্য দান করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, এর স্বাদ মিষ্টিই হবে। সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল। তার প্রমাণ কি? তিনি বললেন, লবণাক্ত কিংবা তিতা জিনিসের ওপর কখনও মাছি বসে না।

এমনিভাবে হিংসুকরা ইমাম সাহেবকে লাঞ্ছিত করার জন্য একবার একটা পরিকল্পনা আঁটল। কারণ, মনের ঝাল মিটানোর এটাই সর্বশেষ হাতিয়ার। মুনাফিকরাও এই একই কাজ করেছিল। তারা নবীপত্নী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। এমনিভাবে কারূনও হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমনই ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। সে এক গ্রাম্য নারীকে ঠিক করল, হযরত মূসা (আ.) যখন ভাষণ দিতে জনসম্মুখে দাঁড়াবেন, তখন সে বলবে, হে লোকসকল! তোমরা মূসার ওয়াজ শুনছ?

অথচ তিনি আমার সঙ্গে অপকর্মের চেষ্টা করেছেন। এতে তিনি চরমভাবে লাঞ্ছিত হবেন এবং আমার কাছে আর যাকাত চাওয়ার জন্য আসবেন না।

ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে।

যাহোক, হিংসুকর, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সুখ্যাতির ওপর এমন একটি কলঙ্ক এঁকে দিতে হবে, যেন সাধারণ মানুষ তাঁকে ঘৃণা করতে থাকে। তারা এক যুবতী বিধবা নারীকে এ কাজের জন্য ঠিক করল যে, তুমি যেকোনো কৌশলেই হোক ইমাম সাহেবকে রাতের নির্জনতায় তোমার ঘরে নিয়ে আসবে; বাকি কাজ আমরা করব। এর জন্য তোমাকে মোটা অঙ্কের বিনিময় দেওয়া হবে।

নারীরা এমনিতেই দ্রুত প্রতারণার শিকার হয়। সে রাযি হয়ে গেল। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ওঁত পেতে রইল। যখন রাতের বেলা ইমাম সাহেব সেই নারীর ঘরের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সে পর্দার সাথে ঘর থেকে বের হয়ে একদম ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে খুব কাকুতি-মিনতি করে বলল, হযরত! আমার স্বামীর জীবনের শেষ অবস্থা। তিনি কোনো অসীয়ত করতে চাচ্ছেন, যা আমার বুঝে আসছে না। আপনি দয়া করে একটু ঘরে এসে শুনুন, তিনি কী বলছেন।

ইমাম সাহেব সরল বিশ্বাসে তার ঘরে প্রবেশ করলেন। যুবতী তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ইতোমধ্যে ভিতরে ওঁত পেতে থাকা হিংসুক দুষ্কৃতিকারীরা আত্মপ্রকাশ করে বলতে লাগল, ইমাম সাহেব একজন যুবতী নারীর নির্জন ঘরে খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছেন। তারা ঝামেলা বাঁধিয়ে দিল। স্থানীয় লোকেরা যুবতী ও ইমাম সাহেব উভয়কে পুলিশের সোপর্দ করে দিল। বিচারক আদেশ দিলেন, আপাতত তাদের জেলখানায় বন্দি করে রাখো; কাল সকালে বিচার করা হবে।

আদেশমতো দুজনকে একটা অন্ধকার সেলে আটকে রাখা হলো। ইমাম সাহেব অযু অবস্থায়ই ছিলেন। তাই নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন লম্বা সময় পেরিয়ে গেল, তখন সেই যুবতী নিজের অন্যায়ের কারণে বিচলিত হয়ে গেল যে, হায় রে! এমন একজন পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি মিথ্যা অপবাদ দিলাম!

ইমাম সাহেব যখন নামাযের সালাম ফেরালেন, তখন যুবতী এসে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং অনুতপ্ত হলো। এবং হিংসুকদের পুরো ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিল। ইমাম সাহেব বললেন, শোনো; যা হওয়ার তা তো হয়েই

গেছে। এবার আমি তোমাকে একটা উপায় বলে দিচ্ছি। যদি তা করতে পার, তাহলে তুমিও বেঁচে যাবে, আমিও বেঁচে যাব।

সে বলল, সেটা কী?

তিনি বললেন, তুমি কেঁদে-কেটে হলেও পাহারাদার সিপাহীকে রাজি করার চেষ্টা করো, সে বলবে, আমাকে পথ থেকে ধরে আনা হয়েছে; আমার ঘরে যওয়া খুবই জরুরি; আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলুন। যখন তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তুমি বের হবে, তখন সোজা আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে পুরো বিষয়টি খুলে বলবে এবং তোমার এ বোরকাটা পরে তাকে আমার কাছে চলে আসতে বলে তুমি পালিয়ে যাবে।

যুবতী পাহারাদারকে রাজি করিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেবের স্ত্রী সেই যুবতীর বোরকা পরিধান করে জেলখানায় এসে উপস্থিত হলো।

সকাল বেলা বিচারক উভয় আসামীকে আদালতে ডেকে পাঠালেন। হিংসুকদের বিশাল জামাত তখন সেখানে উপস্থিত। ইমাম সাহেবকে বিচারকের সম্মুখে দাঁড় করানো হলো। বিচারক বললেন, 'আবু হানিফা! তুমি এত বড় আলেম হয়েও এমন অপকর্মে লিপ্ত হতে পারলে?'

ইমাম সাহেব বললেন, মাননীয় বিচারক! আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

বিচারক বললেন, আপনাকে রাতের অন্ধকারে একজন বেগানা নারীর সঙ্গে একই ঘরে পাওয়া গেছে।

ইমাম সাহেব তাঁর শ্বশুরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, দয়া করে ওই বৃদ্ধকে ডাকুন, যেন তিনি সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারেন। বৃদ্ধ এসে বোরকা পরিহিতা যুবতীকে সামান্য পর্যবেক্ষণ করেই বলল, আরে! এ তো আমার মেয়ে! আমি অমুক মাহফিলে আমার মেয়েকে আবু হানিফার বিবাহবন্ধনে দিয়েছিলাম!

বিচারক ইমাম সাহেবকে বেকসুর খালাস দিয়ে দিলেন।

এমনিভাবেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে হিংসুকদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিলেন।

ইমাম সাহেবের কিছু বিরুদ্ধবাদী এমনও ছিল, যারা ব্যক্তি হিসেবে মুখলিস ছিলেন। তবে উড়ো অপবাদ শুনে ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। হাদীছে এসেছে, মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে শোনা কথা যাচাই না করে বলে বেড়াতে থাকে। মাশায়েখগণ

এ পর্যন্ত বলেছেন যে, যদি তোমাদের সম্মুখে এসে কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি আমার চক্ষু ফুটো করে দিয়েছে এবং তার চক্ষু বাস্তবেই আহত হয়, তারপরও স্বচক্ষে ওই ব্যক্তিকে না দেখে তা বিশ্বাস করো না। হতে পারে, এই ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির দুই চক্ষু আগেই ফুটো করে দিয়েছে। এবার আসুন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিরোধীদের ভিন্নরূপ দেখি।

ইমাম আরজায়ী (রহ.) শামে বসবাস করতেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বহু আগেই শুনেছিলেন। একবার ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর যোগ্য শিষ্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রহ.) ইমাম আরজায়ী (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে তিনি বললেন, 'হে খোরাসানী! (এটি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের নেসবতী নাম) আবু হানীফা লোকটা কে? শুনেছি, সে নাকি বড় পথভ্রষ্ট? আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রহ.) বলেন, কথাটা শুনে আমি নীরব রইলাম। বাড়ি এসে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বর্ণিত মাসায়েলসম্বলিত খাতাটি হাতে নিলাম। সেখানে প্রত্যেক মাসআলা قَالَ نُعْمَانُ বলে শুরু হয়েছিল। আমি খাতাটি ইমাম আরজায়ী (রহ.)-এর সামনে রাখলাম। তিনি খাতাটি পড়ে খুবই চমৎকৃত হলেন। বললেন, হে খোরাসানী! এ নোমান লোকটি কে? এর ইল্‌মী মাকাম তো অনেক উঁচু, ইজতিহাদে অসীম গভীরতা! তুমি তাঁর কাছে গিয়ে উপকৃত হও! আমি বললাম, হযরত! এই নোমানই সেই আবু হানীফা, যার সম্পর্কে আপনি আজে-বাজে অনেক কিছু শুনেছেন। শুনে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন, হায় আফসোস! আমরা শুনেছি কী আর বাস্তবতা কী! যাও খোরাসানী! তাঁর কাছে যাও। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করো এবং উপকৃত হও।

নতুন আপদ

আজকাল একটি নতুন আপদ মুসলমানদের ওপর আপতিত হয়েছে। তা হলো, ইংরেজি শিক্ষিতরা খুব জোরেশোরে একটি স্লোগান তুলেছে যে, 'কুরআন-হাদীছের কিতাবও আছে, আরবি ভাষার অভিধানও আছে, আছে তাফসীরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি, তাহলে ইউনিভার্সিটির ছেলেদের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে ধরনা দিতে হবে কেন? নিজে-নিজে পড়েই তো কুরআন বোঝা সম্ভব। কেউ-কেউ তো ইন্টারনেটে বসে কুরআন শিখছে। আমাদের দেশের এক মন্ত্রী সাহেব আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, হযরত! আমার ছেলে মাশাআল্লাহ প্রতিদিন ইন্টারনেটে বসে এক পৃষ্ঠা তাফসীর বুঝে নেয়। আর সে এ বিষয়টি আনন্দের বলে প্রকাশ করছে। অথচ হেদায়াতের ওপর থাকতে কুরআনে কারীমের সেই ব্যাখ্যা ও তাফসীরই জানতে হবে, যেটি

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ পেশ করেছেন। তাফসীর পেশ করার অধিকার আমরা কোথায় পেলাম? আমাদের যোগ্যতা-ইবা কী আছে যে, নিজে-নিজে তাফসীর ও ব্যাখ্যা অবিষ্কার করব?

অমুসলিম এক ইংরেজের ঘটনা

আমাকে একবার এক ইংরেজ বলল, আমি নতুন মুসলমান হয়েছি। আমার কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। আপনি সেই প্রশ্নগুলোর জবাব শুধু কুরআন থেকে দেবেন। আমি বললাম, কী বলতে চাচ্ছেন আপনি? সে বলল, না, মানে হাদীছ তো কখনও সহীহ হয়, আবার কখনও জয়ীফ হয়। কিন্তু কুরআন তো সর্বদাই সহীহ; তাই একথা বললাম। চিন্তা করুন, আজকালের ইংরেজী শিক্ষিতরা 'জয়ীফ' শব্দটির অর্থ বুঝতেই ব্যর্থ হয়েছে। এটি যে একটি পারিভাষিক অর্থবিশিষ্ট শব্দ, সে বিষয়টি একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছে।

ভাষার পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন হয়

কখনও-কখনও একটি শব্দ আরবি ভাষায় এক অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার সেই শব্দটিই উর্দূভাষায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝুন। আরবি ভাষায় بَنْدَر শব্দটি সুদর্শন মানুষের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথচ উর্দু ভাষায় এটি একটি জংলী প্রাণীর নাম। মানে বানর। যেমন- বর্তমানে সউদী আরবের রাষ্ট্রদূত যিনি আছেন, তার নাম হলো বান্দর ইবনে সুলতান কিন্তু জনাব! তিনি উর্দু ভাষার বান্দর (বানর) নন, বরং আরবি ভাষার বান্দর (সুদর্শন লোক)। আমাদের উর্দুভাষীরা যখন এই নাম শোনেন, তখন হতবাক হয়ে যান। আবার এক সউদী যুবরাজেরও নাম 'বান্দর'।

যাহোক, বলার উদ্দেশ্য হলো, শব্দ যদিও এক, কিন্তু ভাষার পরিবর্তনের কারণে এর অর্থও পরিবর্তন হয়ে যায়।

এমনিভাবে ذلیل শব্দটি আরবি-উর্দু উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। উর্দুতে এর অর্থ হচ্ছে লাঞ্ছনা, অপমান। কিন্তু আরবিতে এর অর্থ হচ্ছে দুর্বল, অসহায়। যেমন- কুরআনে মাজীদে আছে–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের প্রান্তরে সাহায্য করেছেন, যখন তোমরা দুর্বল ছিলে।'[১]

---

১. সূরা আলে ইমরান : ১২৩

যদি কেউ এখানে أَذِلَّةٌ এর অর্থ লাঞ্ছনা দিয়ে করে, তাহলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে; বরং কাফের হয়ে যাবে। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এমন অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করা স্পষ্ট কুফর। এখানে أَذِلَّةٌ শব্দের অর্থ দুর্বল, সহায়হীন।

যাহোক, বোঝা গেল, ভাষার ভিন্নতার কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। এবার বলুন, শুধু উর্দু ভাষায় কুরআন পড়ে কিভাবে তার ব্যাখ্যা করার সাহস করতে পারি? এজন্যই ওলামায়ে কেরামের খেদমতে বসেই কুরআন কারীম বুঝতে হবে।

কুরআন কারীম ঘোষণা করছে−

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

"এটি এমন এক কিতাব, যা বহু মানুষকে হেদায়েত করে আবার বহু মানুষকে পথভ্রষ্টও করে।"[১]

যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমের মধ্যে নিজের স্বার্থ খুঁজবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর যে এতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও মর্জি খুঁজবে, সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। তাফসীর সংক্রান্ত এ কয়েকটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো মস্তিষ্কে বসিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন।

পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ

কোনো শব্দ যখন তার আভিধানিক অর্থ ছাড়িয়ে কোনো পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন সেটি একটি বিশেষ অর্থের সঙ্গে নির্দিষ্ট হয়ে যায় – সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। যখন আমরা কলেজে পড়ছিলাম, তখনকার কথা। ফিজিক্সের এক প্রফেসর ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের পড়ালেন Whert stone bridge এটি একটি ইংরেজী পরিভাষা। এক ছাত্র বলে উঠল, স্যার Whert অর্থ গম, stone অর্থ পাথর আর bridge অর্থ সেতু বা পুল। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় 'গম পাথর সেতু' বিষয়টি বুঝিনি স্যার।

স্যার তাকে বুঝিয়ে দিলেন, এখানে Whert stone এক বিজ্ঞানীর নাম, যিনি পাথর সংক্রান্ত একটি ধারণা দিয়েছিলেন। এ কারণে তাকে Whert stone bridge নামে ডাকা হয়। এর শাব্দিক অর্থ এখানে অপ্রযোজ্য।

---

১. সূরা বাকারা : ২৬

ইহুদি সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি

দেখুন ভাই! পারিভাষিক শব্দের কখনও অর্থ করা হয় না। যেভাবে নামের কোনো অর্থ করা হয় না। ইহুদিরা এ নামের অর্থ করার ভুলটা করেছিল। তাদের কিতাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আহমাদ' নামটি উল্লেখ করে তার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কিন্তু তারা এর অর্থ করল, The praised one (অতি প্রশংসিত ব্যক্তি) এ ব্যক্তিটি কে এটা কিভাবে বোঝা যাবে? এতে কি একটা অস্পষ্টতা তৈরি হয়নি? যেমন- এক ব্যক্তির নাম Mr. Black তাকে মিস্টার কালো বলা যাবে না। কী বলেন? এমনিভাবে যার নাম Mr. Brown তাকে মিস্টার হলুদ বলা যাবে না। কারণ, মিস্টার ব্ল্যাক ও মিস্টার ব্রাউন দুজন মানুষের নাম। আর নামের কখনও অর্থ করা হয় না।

এমনিভাবে যে শব্দ পরিভাষায় রূপ নেয়, তারও অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ওই নির্দিষ্ট অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যায় না। নিলে ভুল হয়। সুতরাং হাদীছের ক্ষেত্রে 'যয়ীফ' শব্দটি একটি পরিভাষা। এর দ্বারা সেই পারিভষিক অর্থ উদ্দেশ্য, যা মুহাদ্দিছীনে কেরাম নির্ধারিত করেছেন। আজকাল সাধারণ লোকেরা 'যয়ীফ হাদীছে'র অর্থ করে 'ভুল হাদীছ'। নাউযুবিল্লাহ! অথচ ভুল ও মিথ্যা হাদীছের জন্য 'মাউযু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইসলামের শত্রুরা যে মিথ্যা হাদীছগুলো নিজেরা বানিয়ে নবীজির দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, মুহাদ্দিছীনে কেরাম সেগুলো ছাটাই করে পৃথক করে ফেলেছেন এবং সেগুলোর নাম দিয়েছেন 'মাওযু'আত' অর্থ 'জাল ও মনগড়া হাদীছ'।

'যয়ীফ' হাদীছও আমলযোগ্য হয়

কিন্তু হাদীছের কিতাবসমূহে কিছু হাদীছ এমনও পাওয়া যাবে, যেগুলোর ব্যাপারে 'যয়ীফ' শব্দটি লেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু তাতে বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই। 'যয়ীফ হাদীছ' ও 'মউযু হাদীছে'র মধ্যে ঠিক সেই ব্যবধান, যে ব্যবধান 'জীবিত অসুস্থ' আর 'মৃত' ব্যক্তির মধ্যে। দুর্বল আর মৃত ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য আমরা সবাই বুঝি। দুর্বল দুর্বল হলেও তাকে দিয়ে কাজ নেওয়া যায়; কিন্তু মৃত ব্যক্তি কোনো কাজেই আসে না। 'যয়ীফ' হাদীছের মধ্যে বর্ণনাকরীর ব্যাপারে হয়তো কোনো মুহাদ্দিছের আপত্তি থাকে। অন্যথায় এটি তো হাদীছই। তবে হ্যাঁ 'যয়ীফ' হাদীছ দ্বারা ফারায়েয ও ওয়াজিবাত বিধানগুলোকে প্রমাণিত করা যায় না। কিন্তু ফাযায়েলের ক্ষেত্রে

'যয়ীফ' হাদীছ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য। এ কারণেই সিহাহ সিত্তা কিতাবগুলোতেও আপনি 'যয়ীফ' হাদীছের বিশাল সম্ভার দেখতে পাবেন। যদি এগুলো আমলযোগ্য না-ই হতো, তাহলে 'মউযু' হাদীছের মতোই 'যয়ীফ' হাদীছকে মুহাদ্দিছীনে কেরাম তাদের কিতাবে উল্লেখ করতেন না।

নতুন ফেতনা

আজকাল নতুন এক ধরনের ফেতনা শুরু হয়ে গেছে যে, তিরমিযী শরীফকে দুভাগে ভাগ করে ছেপে দেওয়া হয়েছে। এক. সহীহ তিরমিযী। দুই. যয়ীফ তিরমিযী। সহীহ তিরমিযী দেখে বড়ই অবাক হলাম যে, তার ভলিয়ম চিকন ও স্বল্প পৃষ্ঠাবিশিষ্ট। নিচে লেখা আছে, 'আমরা যয়ীফ হাদীছগুলোকে এই কিতাব থেকে বের করে দিয়েছি।' এরা 'যয়ীফ' হাদীছগুলোকে 'মউযু' মনে করে ইমামদের রচিত কিতাব থেকে বের করে দিয়েছে। এরা ইমাম তিরমিযীর চেয়েও বড় মুহাদ্দিছ হয়ে গেল নাকি? আল্লাহর পানাহ! যারা হাদীছের শাস্ত্রের 'যয়ীফ' শব্দের অর্থ বুঝতে ভ্রম করল, তারা হাদীছের অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে না জানি কি চমক দেখান! আল্লাহই ভালো জানেন।

'জরাহ' এর মাপকাঠি

মুহাদ্দিছীনে কেরামের পরিভাষায় 'জরাহ' (কোনো বর্ণনাকারীর স্মৃতি বা চরিত্রসংক্রান্ত ত্রুটি বর্ণনা)-এর যে মাপকাঠি, তা যদি আমাদের ব্যাপারে যাচাই করা হয়, তাহলে আমরা সবাই ত্রুটিযুক্ত। কারণ, তাদের 'জরাহ'-এর মাপকাঠি খুবই উন্নত। কোনো ব্যক্তি জীবনে একবারও যদি ভুল করে থাকেন, তাহলে মুহাদ্দিছ তাঁকে হাদীছ গ্রহণের জন্য নিরাপদ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করেননি এবং তার থেকে কোনো হাদীছও গ্রহণ করেননি। এমনিভাবে যদি কাউকে দেখলেন, তিনি খালি মাথায় বাজারে ঘুরে ফিরছেন, যা ফাসেকদের স্বভাব, তার এ কাজের কারণে মুহাদ্দিছীনে কেরাম তার কাছ থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেননি।

এক মুহাদ্দিছ বহুদূর পথ অতিক্রম করে অন্য এক মুহাদ্দিছের নিকট গমন করলেন। গিয়ে দেখলেন, মুহাদ্দিছ সাহেব একটা টুকরিতে কিছু পাথর নিয়ে তার দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যাওয়া ঘোড়াকে দেখাচ্ছেন। ঘোড়াটা মনে করল, তাকে দানাপানি দেখানো হচ্ছে; ফলে সে দ্রুত ছুটে এল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি তাকে ধরে ফেলল। আগন্তুক মুহাদ্দিছ যখন এ দৃশ্য দেখলেন, তখন তিনি তার

থেকে হাদীছ সংগ্রহ না করে দেশে ফিরে গেলেন। একজন জিজ্ঞাসা করল, তার থেকে হাদীছ কেন সংগ্রহ করলেন না? উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি একটা প্রাণীকে ধোঁকা দিতে পারে, হাদীছের ব্যাপারেও সে এমন করতে পারে। সুবহানাল্লাহ!

'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্রে প্রায় সাত লক্ষ্য মুহাদ্দিছের জীবনবৃত্তান্ত সংরক্ষিত আছে। সুবহানাল্লাহ! এ হলো এক সত্যবাদীর বাণীসম্ভার, যা আল্লাহ তা'আলা এক সত্যবাদী জামাতের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। হাদীছ শরীফও ওই পবিত্র মুখ থেকে বের হয়েছে, যে মুখ থেকে আমরা কুরআন পেয়েছি। এ কেমন ইনসাফ যে, আমরা কুরআনকে তো সত্য বলে স্বীকার করব আর হাদীছকে করব অস্বীকার? অথচ কুরআন-হাদীছ একই ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বাণী। সুতরাং বলা যায়, হাদীছের অস্বীকার মূলত কুরআনেরই অস্বীকার। হাদীছের প্রামাণ্যতা মূলত নবুওতের প্রামাণ্যতার অপর নাম। যে হাদীছ অস্বীকার করল, সে নবুওতকেই অস্বীকার করল। কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান নবুওতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আর সেই অর্থ ও ব্যাখ্যাগুলোকেই হাদীছ বলা হয়। সৌভাগ্যবান তারা, যারা ইল্‌মে নবুওত শিক্ষা করার জন্য সময় বের করেন এবং ওলামায়ে কেরামের খেদমতে বসে ইল্‌মে নবুওত বোঝার চেষ্টা করেন। এবার আসুন! কুরআনে কারীম সম্পর্কে কিছু কথা শোনা যাক।

কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য

কুরআন কারীমকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও মু'জিযা দান করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে পেশ করা হলো।

এক. প্রভাবশক্তি : এই কিতাব প্রভাবশক্তির বিচারে দুনিয়ার সকল কিতাবের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। এর প্রভাব ও আকর্ষণ এতই প্রবল যে, কাফেরের কানে এর আওয়াজ পৌঁছাতেই সে এদিকে মনোনিবেশ করত।

এ কারণেই কাফেরনেতারা তাদের অধীনদের বলত–

لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

'তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না; বরং হৈ-চৈ করো, যেন তোমরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পার।'

প্রভাবশীলতা ও হৃদয়স্পর্শিতায় এই কুরআনের কোনো উপমা নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক অভ্যাস ছিল, তাঁর কাছে

যে-ই আসত, তিনি তার সামনে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন। যেমন- উকায মেলা থেকে লোকেরা যখন ঘরপানে রওনা করত, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তার পাশে বসে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। লোকেরা শুনে এতই মুগ্ধ হতো যে, বাড়ি না গিয়ে নবীজির পাশে বসে কুরআন শুনত। দুনিয়ার কোনো কিতাব এমন নেই, যাকে আল্লাহ কুরআনের মতো প্রভাবশালী করে সৃষ্টি করেছেন। এর শব্দ ও অর্থ হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমাদের হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) বলেন, নদীর রাস্তা কে বানায়? নদী নিজেই। এমনিভাবে এ কুরআন হলো রহমতের সেই নদী, যা মানুষের অন্তরে নিজেই নিজের পথ তৈরি করে নেয়।

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا * اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی * عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی

'হেরা গুহা থেকে স্বীয় জাতির নিকট এল একজন। সঙ্গে নিয়ে এল একটি জীবনবিধান। তা কি মেঘের গর্জন ছিল, নাকি একজন পয়গম্বরের আহ্বান, যা গোটা আরবভূমিকে কাঁপিয়ে তুলেছিল।'

দুই. সহজে মুখস্থ হয়ে যায় : খুব সহজেই মুখস্থ হওয়ার ক্ষেত্রেও এই কুরআনের কোনো তুলনা নেই। দুনিয়ার কোনো কিতাবের এত হাফেয পাওয়া যাবে না। অথচ কুরআনের লক্ষ-লক্ষ হাফেয সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। কী ছোট, কী বড়, কী পুরুষ, কী নারী! সকল শ্রেণি ও পেশার লোকেরা একে সযত্নে বুকে ধারণ করে আছে। কিছু দিন পূর্বে করাচিতে এক বৃদ্ধ হেফয সম্পন্ন করেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তার ভ্রূ ও চোখের পলক পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। পুরো শরীরে আমি একটাও কালো চুল দেখতে পাইনি। এই বার্ধক্যেও তিনি কুরআন হেফয করলেন। এটি কুরআনেরই একটি মু'জিযা।

বাদশা হারুনুর রশীদের সামনে একটা ছোট্ট শিশুকে আনা হলো। বয়স পাঁচ বছর। পুরো কুরআন তার বুকে সংরক্ষিত ছিল। কিতাবে লেখা হয়েছে, বাচ্চাটাকে যখন তার পিতা বাদশা হারুনুর রশীদের সম্মুখে কুরআন পড়ে শোনানোর জন্য আনল, তখন সে তার বাবাকে বলছিল, 'আব্বু! আমাকে বাতাসা কিনে দাও না!' বাবা বলল, বাদশাকে কুরআন পড়ে শোনাও, তাহলেই বাতাসা কিনে দেব। বাচ্চা বলল, না, আগে কিনে দাও, তারপর

শোনাব। সুবহানাল্লাহ! কত কচি শিশুর অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে হেফাযত করলেন। বাদশা তাকে ভিন্ন-ভিন্ন পাঁচ জায়গা থেকে প্রশ্ন করলেন আর সে ঠিক-ঠিকভাবে নির্ভুল তেলাওয়াত করে শোনাল। সুবহানাল্লাহ! পাঁচ বছরের শিশু الحمد لله থেকে الناس, পর্যন্ত পুরো ত্রিশ পারা কুরআনের হাফেয! এটি কুরআনের মু'জিযা ছাড়া আর কী হবে? বড়রাও হাফেয, ছোটরাও হাফেয। আল্লাহ্ একে মুখস্থ করা কত সহজ করে দিয়েছেন!

তিন. সবচেয় বেশি পঠিত কিতাব : এই কিতাবের যে পরিমাণে তেলাওয়াত হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো কিতাবের এ পরিমাণ তেলাওয়াত হয়নি। যেমন- হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কিংবা অন্য কোনো বুযুর্গের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সন্তানকে ডেকে ঘরের এক কোনে নিয়ে বললেন, বেটা! এ স্থানটাতে বসে আমি প্রায় ছয় হাজারবার কুরআনে কারীম খতম করেছি।

আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তিনি প্রতি রমযানে একষট্টিবার কুরআন খতম করতেন।

ত্রিশ খতম দিনে, ত্রিশ খতম রাতে এবং এক খতম তারাবীহর নামাযে। কিছু-কিছু লোক আছেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নাম শুনলে তাদের গা জ্বলে ওঠে। তারা প্রশ্ন করে, আচ্ছা, তেষট্টি খতম কুরআন পড়া, তাও এক মাসে, এ কি সহজ কথা? বন্ধুরা! দূর অতীতের কথা বাদই দিলাম, নিকট অতীতের আকাবিরদের আমল পেশ করছি। হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) নিজের তত্ত্বাবধনানে যে কিতাবটি লিখিয়েছেন, তার নাম 'ইয়াদে আয়্যাম'। তাতে তিনি লিখেছেন, রমযান মাসের তারাবীতে যে পারাগুলো আমার তেলাওয়াত করা লাগত, সেগুলো দিনের বেলা তিনবার পড়ে নিতাম।

فَأُولَئِكَ آبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ * إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ.

Incy clopeadia of bortanica এ পড়েছিলাম , আব্দুল্লাহ নামক এক তুর্কী যুবক তিন ব্যক্তির সম্মুখে আট ঘন্টায় এক খতম কুরআন পড়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়েছে। একবার বিন্নুরে আমার এক দীনি প্রতিষ্ঠানে যাওয়া হয়েছিল। সেখানকার একজন বড় আলেম খুব মুত্তাকী, পরহেযগার ও আল্লাহওয়ালা মানুষ। অধমকে তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর এই মাদরাসাটি হেফযে কুরআনের জন্য খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। আমি এই

প্রসিদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আমরা কুরআন ইয়াদ করানোর ব্যাপারে খুব পরিশ্রম করাই। বললাম, পরীক্ষা কিভাবে নেন? বললেন, আমরা পাঁচজন শিক্ষক এক সাথে বসে ছাত্রকে বলি, 'পুরা কুরআন এক দাঁড়ানোয় শোনাও'। খুব সহজ পরীক্ষা। পড়তে-পড়তে যদি আটকে যায়, তাহলে দ্বিতীয়বার পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষকগণ পৃথকভাবে তার ভুল, লোকমা ও কতবার আটকে গেছে সেগুলো খাতায় নোট করেন। তিনি আমাকে একটা বাচ্চা দেখালেন, যার রেকর্ড বইয়ে লেখা ছিল, এ বাচ্চাটি ৫ জন শিক্ষকের সামনে ৬ ঘন্টা ৩৫ মিনিটে এমনভাবে পুরা কুরআন হেফয শুনিয়েছে যে, কোনো ভুল, লোকমা যায়নি এবং একবারের জন্যও আটকায়নি। সুবহানাল্লাহ! এটি কুরআনের মু'জিযা নয় তো কী? এটি কোনো মানুষের কৃতিত্ব নয়, বরং আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের কালামের মু'জিযা।

চার. নবীগণের পবিত্রতা বর্ণনাকারী কিতাব : যুগে-যুগে নবীগণের ওপর যেসব মিথ্যা অপবাদ লাগানো হয়েছিল, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত এই কিতাবের মাধ্যমে ঐসব মিথ্যা অপবাদের জবাব দিয়ে তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মত তাদের নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর ওপর অপবাদ দিয়েছিল, হযরত মূসা (আ.)কেও এ অপবাদের নিশানা বানানো হয়েছিল, কুরআনে কারীমের স্থানে-স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের পবিত্রতা বর্ণনা করে অবাধ্য সম্প্রদায়ের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। এমনকি এক মহামিথ্যাবাদী কাফের যখন নবীজিকে গালমন্দ করল এবং তাঁর ওপর অপবাদ দিল, তখন আল্লাহ রব্বুল ইয্যতও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেননি। বরং একদিকে তিনি প্রিয় রাসূলকে যেমন সান্ত্বনা দিলেন, অপর দিকে অপবাদ দানকারী মিথ্যুক কাফেরের চরিত্র-অভ্যাসের গোমর ফাঁস করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ.

'আপনি এমন ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, যে খুব কসম খায় এবং যে খুব হীন, নিন্দা করতে অভ্যস্ত, চোগলখোর, সৎকাজে বাধা প্রদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রুক্ষস্বভাব ও অত্যন্ত নীচু বংশের লোক।'[১]

পাঁচ. যুক্তি-প্রমাণে অসাধারণ উপস্থাপনা : এই কুরআন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনায়ও অসাধারণ ক্ষমতাবান ও অদ্বিতীয়। এমন-এমন যুক্তি পেশ

১. সূরা কালাম : ১০-১৩

করে যে, উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা প্রশ্ন শুনে মাথা ঘুরে যায়। বিশ্বাস করুন, বড়-বড় কাফেররা এই কুরআনের যুক্তি-প্রমাণের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। এটি মূলত আল্লাহ তা'আলার কালামের শান। পড়তে গেলেই কালামের শব্দবিন্যাস ও উপস্থাপনা দেখেই বোঝা যায়, এটি কোনো সাধারণ বাণী নয়। বরং এটি সকল বাদশার বাদশা মহান আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের কালাম। যেমন-

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

'তিনি সেই সত্তা, যিনি মানবজাতিকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।'[১]

সুবহানাল্লাহ! দেখুন-না, বলার ভঙ্গি কত প্রতাপশালী! কেমন শাহী কালাম!

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَّكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

'তারপর তিনি তাদের বংশপরিচয় ও আত্মীয়তার বন্ধন দান করেছেন। আপনার রব অত্যন্ত ক্ষমতাবান।'[২]

কী অসাধারণ কালাম! প্রতিটি শব্দ হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছে। কাঁপিয়ে তুলছে অন্তরজগত। অন্যত্র আছে–

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ

'কেমন করে তোমরা আল্লাহর অবাধ্য হতে পারছ?'[৩]

কী শক্তিশালী কালাম! এমন ভঙ্গি তো কেবল আল্লাহই অবলম্বন করতে পারেন। এমন মজবুত দ্বিধাহীন কথা তো কেবল আল্লাহরই হতে পারে!

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'কেমন করে তোমরা আল্লাহর অবাধ্য হতে পারছ, অথচ তোমরা এক সময় মৃত ও অস্তিত্বহীন ছিলে? তারপর তিনি তোমাদের জীবন দান করলেন, পুনরায় তোমাদের মৃত্যু দিলেন, তারপর আবার তোমাদের তিনি জীবিত করবেন, তারপর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।'[৪]

---

১. সূরা ফুরকান : ৫৪
২. সূরা ফুরকান : ৫৪
৩. সূরা বাকারা : ২৭
৪. সূরা বাকারা : ২৭

ছয়. বিপর্যস্ত ও বেদনাবিধুরকে সমবেদনা জানায় : যারা দুঃখ-কষ্টে বিপর্যস্ত, দুশ্চিন্তা-দুর্দশায় বেদনাহত, এ কুরআন তাদের সমবেদনা জানায়, সান্ত্বনা দেয়। অন্যদের কথা তো পরে, স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কিতাব তেলাওয়াত করে প্রশান্তি লাভ করতেন। ইরশাদ হচ্ছে–

كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ

'হে প্রিয় রাসূল! আমি অল্প-অল্প করে কুরআন এজন্য নাযিল করি, যেন আপনার অন্তরে প্রশান্তি চলে আসে।'

এটি অন্তরে প্রশান্তি আনয়নকারী কিতাব। কখনও যদি বেশি দুশ্চিন্তার শিকার হন, তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। বন্ধুরা! যদি নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন অথবা পরিবারের কারো রুক্ষ আচরণে মন খারাপ হয়, তাহলে আপনি সেই দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির সময় আল্লাহপাকের পবিত্র কালাম কুরআন হাতে তুলে তেলাওয়াত করতে থাকুন; দেখবেন, কয়েক পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করতেই কুরআন আপনার অন্তরে প্রশান্তি এনে দেবে। আপনার সকল দুর্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। আমাদের বুযুর্গরা একে রাতের নির্জনতায় একে তেলাওয়াত করতেন এবং অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতেন। তাই আপনিও পড়ুন এবং প্রশান্তি লাভ করুন।

সাত. কুরআনের বিস্ময়কর সৌন্দর্য ও রহস্য চিরন্তন : এই কিতাবের বিস্ময়কর রহস্য ও সৌন্দর্য কোনোদিন শেষ হবে না। মুফাসসিরীনে কেরাম এই কিতাবরে লুকায়িত ইল্‌ম ও হেকমতের রহস্য উদ্‌ঘাটনে সারাটা জীবন পার করে দিয়েছেন। যতবার এর রহস্যসাগরে ডুব দিয়েছেন, ততবার নতুন-নতুন রহস্য, তথ্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু এর শেষ কেউ দেখতে পারেনি, পারবেও না। এ কিতাবে প্রত্যেক শাস্ত্রের লোকেরাই নিজেদের শাস্ত্রীয় হেকমত ও জ্ঞান-সাধনার তত্ত্ব-উপাত্ত খুঁজে পান। যেমন- কেউ যদি ডাক্তার হন, তাহলে তিনি ডাক্তারি তথ্য-উপাত্ত দেখতে পাবেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানবের রূপ দিয়েছি।'

একজন ডাক্তার যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করেন, তখন ব্যাখ্যা এভাবে বেরিয়ে আসে যে, কান প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে এবং চক্ষু সৃষ্টি হয়েছে পরে। চিকিৎসাবিজ্ঞানও এ কথাই বলে যে, মায়ের পেটে শিশুর সর্বপ্রথম কানই তৈরি হয়। আর চক্ষু সৃষ্টি হয় পরে। বিজ্ঞানের Fact হলো মানুষের

পুরো দেহের মধ্যে সর্বপ্রথম যে অঙ্গটি পরিপূর্ণ হয়, তা হলো কান। কলিজা বা জিহ্বা আগে সৃষ্টি হয় না। এর কারণ কী? এর কারণ হলো, মাথার ভারসাম্য ঠিক রাখে মস্তিষ্ক। কানের মধ্যে পানির বেশ কটা টিউব থাকে। সেই টিউবের পানি লেভেল পরিবর্তনের সংকেত মস্তিষ্ক পেয়ে যায়। তারপর মস্তিষ্কই সিদ্ধান্ত নেয়, মাথার ভারসাম্য ঠিক আছে, কি নেই? বার্ধক্যে এই সিস্টেম নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষের মাথা বেঁকে যায়। অথচ তারা বিষয়টি বুঝতে পারে না। যেহেতু মাথার ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য মস্তিষ্কেকে কানই সংকেত দেয়, সেজন্য কানকেই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে।

এক কানাডিয়ান ডাক্তার একটি বই লিখেছেন, যার নাম হলো, 'কুরআনের আয়াত ও নতুন বিজ্ঞান'। তিনি কুরআনে কারীমের পনেরোটি আয়াতের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেই বাস্তবতাকেই প্রমাণ করছে, যা আল্লাহ তা'আলা চৌদ্দশত বছর আগে তাঁর প্রিয় রাসূলকে দান করেছেন। এবার সেই আয়াতটি যদি কোনো প্রকৌশলী পাঠ করেন, তখন তিনি এতে ইঞ্জিনিয়ারিং সাইন্স দেখতে পান

এক ব্যক্তি বলতে লাগল, আরে ভাই, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞান কুরআনে কারীমে আছে। যেমন- বাদশা জুলকারনাইন যখন লৌহপ্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে লোহার টুকরোগুলো এনে দাও। এতে প্রমাণিত হয়, লোহা ও সিমেন্টের ব্যবহার আগেও ছিল। একেই তো কংক্রিট বলা হয়। সে বলল, জনাব! আমরাও লোহাই বাঁধি। লোহা দ্বারা উদ্দেশ্য লোহার বড়-বড় টুকরোগুলো। দেখুন, লোহার পিলারের কথা কুরআনে আছে। একবার গুলশান হাবীব করাচির স্টিল মিলে আমার বয়ান ছিল। তারা প্রধান ফটকে লিখে রেখেছিল–

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ

'আমি নাযিল করেছি লোহা, যার মধ্যে আছে প্রবল শক্তি।'[১]

আজকাল তো লোহা ব্যবসায়ীরা কুরআনেও লোহা দেখতে পাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ! এই কিতাবের বিস্ময় কখনও শেষ হবে না। পাঠকারীরা পাঠ করতেই থাকবে এবং গবেষকরা গবেষণা করতেই থাকবে। ডুবুরীরা কুরআন থেকে মণি-মুক্তা বের করতেই থাকবে। জীবনকে তা দিয়ে রাঙাতেই থাকবে। আর এই ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

১. সূরা হাদীদ : ২৫

আট. ওলামায়ে কেরামের পিপাসা মিটবে না : এ কুরআনের মধ্যে ইল্‌ম ও হেকমতের ভাণ্ডার এত বেশি সুসমৃদ্ধ যে, এর রত্নও কোনোদিন ফুরোবে না, ওলামায়ে কেরামের পিপাসাও কোনো দিন নিবারিত হবে না। এ কিতাব যত বেশি তেলাওয়াত করা হয়, ততই এর প্রতি আকর্ষণ ও স্বাদ বেড়ে যায়। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীতে এটিই একমাত্র কিতাব, যাকে পাঠ করে, তাফসীর করে ওলামায়ে কেরামের মন কোনোদিন ভরবে না, বরং উত্তরোত্তর আগ্রহ বাড়তেই থাকবে। এটিই এই কুরআনের মু'জিযা। আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত আমাদেরকে এই কিতাবখানি পড়ার, বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

বিপ্লবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আল্লাহর পর তুমিই সবচেয়ে সম্মানিত

রবিউল আউয়াল মাসে সায়্যিদুল আউওয়ালীন ওয়াল আখিরীন, মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় জীবনের কয়েকটি দিককে উদ্ভাসিত করা হয়। কোথাও পবিত্র জন্মগ্রহণের আলোচনা হয়। কোথাও ইশ্‌কে রাসূল তথা নবীপ্রেমের আলোচনা হয়। কোথাও রাসূলের আনুগত্য প্রসঙ্গে কথা হয়। আবার কোথাও তাঁর মোবারক অভ্যাস নিয়ে আলোচনা হয়। আবার কোথাও তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শের বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ– বক্তার সম্মুখে যেন এক মহাসাগর। আর সেই মহাসাগর থেকে বক্তা এক অঞ্জলি পানি নিলেন। এর বেশি কিছু পারলেন না। তাঁর প্রশংসাকারী কোনো ব্যক্তিই তাঁর প্রশংসার হক আদায় করতে পারেনি। শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে গেল–

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.

'আল্লাহর পর তুমিই সম্মানিত। কথা সংক্ষেপ।'

তাছাড়া যে মাহান ব্যক্তিত্বের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত করেছেন, যার সম্মান ও মর্যাদার সাক্ষ্য কুরআন মাজীদ দিচ্ছে–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

সেখানে আমাদের মতো ক্ষুদ্র তালেবে ইল্‌ম সেই মহামানবের কী প্রশংসা-ইবা করতে পারি।

ہزار بار بشویم دہن زمشک وگلاب * ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

‘হে প্রিয় রাসূল! যদি মেশ্‌ক ও গোলাবের পানি দিয়ে শতবারও আমাদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নিই, তারপরও আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মুখে আপনার নাম উচ্চারিত হওয়া বেআদবি বলে গণ্য হবে।’

ইন্টারনেটে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

আজকের এই মাহফিলে ইংরেজি শিক্ষিত ভাইদের ব্যাপারে কিছু কথা বলা হবে। তাদের অন্তরে কী-কী প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায় এবং যখন তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত অধ্যয়ন করে, তখন তাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন সে বিষয়টিই আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে। আমাদের অধিকাংশ তরুণ-তরুণী আজকাল ইন্টারনেটে প্রচুর সময় ব্যয় করে। সেই সুবাদে তারা এমন কিছু আপত্তিকর রচনা ও প্রবন্ধ পাঠ করে, যাতে আমাদের প্রিয় নবীজির নামে ভুল ও আপত্তিকর তথ্য দেওয়া থাকে।

হিন্দুদের দুরভিসন্ধি

গতকাল এক যুবক কম্পিউটার থেকে একটা লেখা বের করে আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, আমাদের প্রতিবেশী দেশের কোনো হিন্দু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এই-এই মন্তব্য করেছে। এমন-এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। লেখাটা পড়ে আমরা খুব পেরেশান হয়ে গেলাম। সুতরাং আপনি আমাদের এর উত্তর দিন। সেই মন্তব্য ও প্রশ্নই আজকের মূল আলোচ্য বিষয়। এ ব্যাপারে আপনাদেরকে নিরেট ওই কথাগুলোই বলা হবে, যা আপনাদের জন্য খুবই জরুরি। জীবনে কখনও যদি কোনো কাফেরের সঙ্গে তর্ক হয়, তখন আপনি এমন যুক্তি-দলিল দিয়ে কথা বলবেন, যেগুলো যেমন হবে ওজনি, তেমন হবে ক্ষুরধার। কথা যেন হয় দ্বিধা-সংকোচহীন ও শক্তিশালী, যেন বক্তা-শ্রোতা উভয়ের অন্তরই থাকে প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত। এজন্য এখানে প্রামাণ্য যুক্তির পরিবর্তে যৌক্তিক প্রমাণাদি পেশ করা হবে। আর এ অর্থেই আজকের মাহফিল আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের বেশি দাবিদার।

আরব হলো পৃথিবীর ভৌগোলিক হৃদপিণ্ড

আবরভূমিকে যখন বিশ্বমানচিত্রে দেখা হয়, তখন তিন দিক থেকে পানি দিয়ে স্থলভাগ থেকে বিছিন্ন মনে হয়। শুধু চতুর্থতম দিক দিয়ে স্থলভাগের সঙ্গে সংযুক্ত দেখা যায়। যদি আপনি বিশ্বমানচিত্র সামনে তুলে ধরেন, দেখবেন ভৌগোলিকভাবে আরবভূমিকে বিশ্বের হৃদপিণ্ড বলে মনে হয়। ঠিক অন্তর যেভাবে মানুষের বুকের মধ্যখানে ঝুলে থাকে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় হাবীবকে এই ভূ-অঞ্চলে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

রাসূল প্রেরণের জন্য আরবভূমিকে নির্বাচনের রহস্য

এই অঞ্চলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে প্রেরণে বেশ কয়েকটি রহস্য রয়েছে।

এক. এটি ছিল সাহসী লোকদের অঞ্চল : এ মরু অঞ্চল কখনও বসন্ত দেখেনি। দেখেনি ফুল-ফল আর প্রজাপতির ওড়াউড়ি। শোনেনি পাখির গান আর মনমাতানো ফুলের সুবাস। অথচ তার পাশেই অন্যান্য দেশ ও জনগোষ্ঠির মধ্যে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সামাজিকতা ও সব ধরনের জীবনোপকরণ বিদ্যমান ছিল। এক দিকে আপনি রোমসম্রাট ইরানের শক্তিশালী সাম্রাজ্যও দেখতে পাবেন। হাবশা ও ইয়ামানেও আমজনতা রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করত। তাদের কাছে দুনিয়ার সব ধরনের বিলাসিতার উপায়-উপকরণও ছিল। কিন্তু আরবভূমির মরুচারীদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন, সেখানে একটি ভিন্ন পৃথিবী দেখতে পাবেন। লোকেরা গোত্রে-গোত্রে বিভক্ত হয়ে ছিল। শাসনব্যবস্থা ছিল 'লাঠি যার মুল্লুক তার'-এর মতো।

অত্যাচার ও অবিচার মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। সমাজের মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। গুটিকতক লোক যা চাইত, তা-ই করে ফেলত; ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারত না। নারীদের যেমন অবমূল্যায়ন করা হতো, তেমনি অসহায়-দুর্বলদের প্রতি ছিল না কোনো সহানুভূতি। শক্তি দিয়েই সকল সমস্যার সমাধান করা হতো। মূর্খতা ও অসভ্যতার অন্ধকারে ডুবে ছিল সবাই। নিকটবর্তী বড়-বড় রাজা-বাদশারা এই অঞ্চলের রাজত্ব করতে অপছন্দ করত। এই মরুভূমির প্রতি তাদের কোনোই আকর্ষণ ছিল না। কারণ, তারা জানত, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা রুক্ষস্বভাব ও যুদ্ধবাজ। তারা আইনকে আইন মনে করে না। এখানকার মাটি অনূর্বর, অকেজো। কিছু পাহাড়ি উপত্যকা রয়েছে; তাও শুষ্ক ও পাথুরে।

অবশিষ্ট পুরো এলাকা-ই বিস্তৃত বালুকাময় ময়দান। সমস্ত রাজা-বাদশা এই মরুচারীদের নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল।

এমন একটি রুক্ষ্ম অঞ্চলে নবী প্রেরণের মাঝে অনেক রহস্য ছিল। তার মধ্যে একটি হলো, এখানকার লোকগুলো ছিল দুর্দান্ত সাহসী। 'হ্যাঁ' ও 'না'-এর মাঝে কোনো তৃতীয় বিষয় তারা বুঝত না। যদি কোনো বিষয়ে একমত হয়েছে, তো মন-প্রাণ দিয়ে তার সমর্থন ও সহযোগিতা করবে। আর যদি কোনো বিষয়ে বিরোধিতা করেছে, তো সর্বাত্মকভাবে তার মোকাবেলা করবে। অর্থাৎ– তারা বন্ধুও ছিল, আবার শত্রুও ছিল। এমন খাঁটি স্বভাবের লোকগুলোই রিসালাতের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার বেশি উপযুক্ত ছিল। আর সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের মধ্যেই প্রেরণ করলেন, যেন এই জিদ্দী ও তেজোদ্দীপ্ত লোকগুলো যদি রিসালাতের কথাগুলো মেনে নেয় এবং তার পক্ষে সুদৃঢ় হয়ে জমে যায়, তাহলে বাকি দুনিয়ার লোকদের কথা মানানো সহজ হয়ে যাবে। মোটামুটি বলা যায়, তারা দুনিয়ার সবচেয়ে অবাধ্য ও দুর্দান্ত জাতি ছিল।

তারপর যখন আল্লাহ রব্বুল ইয্যত স্বীয় হাবীব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে সততা ও সত্যবাদিতার বীজ বপন করলেন। আসমান থেকে ওহীয়ে ইলাহীর বর্ষণ হলো এবং সেই অনূর্বর জমিনে ইল্‌ম ও আখলাকের এমন পুষ্পোদ্যান ফুটে উঠল যে, এমন বসন্ত ও ফুলের সৌরভ হয়তো দুনিয়া ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি।

দুই. জীবনোপকরণের সঙ্কীর্ণতায় জর্জরিত অঞ্চল : সেই অঞ্চলে প্রচণ্ড গরম ছিল। পানি ও অন্যান্য জীবনোপকরণের প্রচণ্ড অভাব ছিল। ফলে জীবন ছিল দুর্বিষহ। সেই দুর্বিষহ জীবন যাপনে অভ্যস্তরাই ছিল অপর হেকমতের মূল প্রাণশক্তি। দ্বিতীয় হেকমত হলো, মরুভূমির এমন দুর্বিষহ জীবনের মাঝে থেকেও যখন তারা দীনকে কবুল করবে এবং দীনের দাওয়াত নিয়ে দিকে-দিকে ছুটবে, তখন যেসব অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নত ও আরামদায়ক, তাদের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়া দুষ্কর মনে হবে না। কারণ, যারা কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তারা স্বাভাবিক পরিস্থিতির সাময়িক কষ্টকে পাত্তা দেয় না। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, গোটা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সফরকারী প্রথম জামাতের গৌরব তাঁরা নিজেদের নামে লিখিয়ে নিল।

তিন. ভাষালঙ্কার ও সাহিত্যরুচির মিলনমেলা : জাযিরাতুল আরবের লোকেরা নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বড়ই গৌরব বোধ করত। তারা নিজেদেরকে আরব বলত আর বাকি দুনিয়ার সবাইকে বলত 'আজম' তথা বোবা। তাছাড়া আরবি ভাষা-সাহিত্যের শ্রেষ্টত্ব আপন জায়গায় স্বীকৃতও বটে। সুতরাং তৃতীয় হেকমতটি হলো, এরা যেহেতু উৎকৃষ্ট ভাষা ও সাহিত্যের অধিকারী এবং মনের ভাব প্রকাশ ও উপস্থাপনায় অনন্য, তাই আল্লাহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের মধ্যেই রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, যেন তারা দীনের দাওয়াতের কাজে উৎকৃষ্ট ভাষা ও উপস্থাপনাকে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর তাওহীদের দাওয়াত উত্তম থেকে উত্তমতররূপে দিতে পারে।

চার. হীরার মত স্বচ্ছ ও প্রকাশ্য জীবন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকিত জীবনের যেকোনো দিকেই দেখা হোক, মানবজাতির জন্য সেখানে অনুপম আদর্শ রয়েছে। হীরার বৈশিষ্ট্য হলো, তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেভাবেই দেখুন, তার সব দিকেই আলোয় ঝলমল করতে থাকবে। আমাদের নবীজির পবিত্র জীবনও এমনই ঝলমলে। জীবনের যে দিকটিই জানতে বা দেখতে চাইবেন, হীরার মতো সর্বময়ী ঝলমলে মনে হবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সময়ে দুনিয়ায় আগমন করেছেন, যা ইতিহাসের আলোকে একটি উজ্জ্বল সময়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি যখনই নবীজির জীবন সম্পর্কে কথা বলবেন, এ কথাটি অবশ্যই পরিষ্কারভাবে বলবেন যে, আমাদের নবীজিই একমাত্র সেই সত্তা, যাঁর পুরো জীবন ইতিহাসের দিবালোকে কেটেছে। তাঁর জীবনের ছোট্ট-ছোট্ট কথা ও কাজগুলো পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। আপনি খ্রিষ্টানদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বলুক। কয়েকটি ঘটনা ব্যতীত কিছুই তারা বলতে পারবে না। ইহুদিদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেছেন? তাঁর শৈশব-কৈশোর ও যৌবন কিভাবে কেটেছে? তাঁর বৈবাহিক জীবন কেমন ছিল? তাঁর আদর্শ কী ছিল? তিনি কবে ইন্তেকাল করেছেন? দেখবেন, তাঁর দিবা-রাত্রির জীবনাদর্শগুলোর কিছুই তাদের কাছে সংরক্ষিত নেই। আজ ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত।

আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, জনাব! আজ আপনাদের ইহুদি সমাজের কোনো তরুণ যদি চায় সে নিজের পয়গম্বরের আদর্শ অনুযায়ী

জীবন-যাপন করবে, তাহলে তার দিকনির্দেশনার জন্য আপনাদের নিকট কোনো আদর্শ আছে কি? দেখবেন, তারা স্বীকার করবে, 'আমাদের কাছে এমন কোনো বিস্তারিত জীবনবিধান নেই।'

তাদের কাছে তো কিছুই নেই। এবার আসুন, এমন কোনো মহামানবের ব্যাপারে কথা বলি, যাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবনের ছোট-বড় এক-একটি কথা ও কাজকে কিতাবের মধ্যে সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। ওলামায়ে মুহাদ্দিছীন সেই দুঃসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছেন। তাঁরা যখন যা প্রয়োজন, তা-ই নবীজীবন থেকে সুন্নাত ও আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন। নবীজির ভ্রূ কেমন ছিল? নবীজির চোখের পলকগুলো কেমন ছিল? চোখগুলো কেমন ছিল? কিভাবে তাকাতেন? তাঁর চুলদাড়ি কেমন ছিল? সিনা মোবারক, হাত মোবারক, পা মোবারক কেমন ছিল? জুতা কিভাবে পায়ে দিতেন? পোশাক কেমন ছিল? পাগড়ি কেমন ছিল, কিভাবে বাঁধতেন? বিছানা কেমন ছিল, কিভাবে শুতেন? ঘরের অভ্যন্তরে বৈবাহিক জীবন কেমন ছিল? মসজিদের জীবন কেমন ছিল? জিহাদের ময়দানে কখন কোথায় কী করেছিলেন? তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন কেমন ছিল?

মোটকথা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের যে বিষয়টিই আপনি জানতে চাইবেন, সব তথ্যই সংরক্ষিত আছে। অতএব আজ যদি কোনো শিশু চায়, সে শিশুদের ব্যাপারে নবীজি শিক্ষা ও আদর্শ কী ছিল তা জানবে, তাহলে তাও সে পেয়ে যাবে। যদি যুবকরা বলে, আমাদের ব্যাপারে নবীজির শিক্ষা কী? তাহলে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা তারা পেয়ে যাবে। শ্রমিকের জন্য আদর্শ, কারখানার মালিকের জন্য আদর্শ এমনকি পরিবারের প্রধানের জন্যও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অনুপম আদর্শ খুঁজে পাওয়া যাবে। সুবহানাল্লাহ!

আমি যখন কতিপয় খ্রিষ্টানকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করি, তখন তারা উত্তর দিল, জনাব! আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের কাছে বাইবেল ব্যতীত কিছুই নেই। আমরা আমাদের যিশুখৃস্ট সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই বলতে পারব না। তারপর আমি বললাম, আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক দাঁত কেমন ছিল? তাঁর শরীরের পশম কেমন ছিল? চুলদাড়ি কটা সাদা ছিল? আমরা আপনাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব। এমনকি যদি তাঁর মহরে নবুওত সম্পর্কে জানতে চান, তাও হাদীছের কিতাবে সংরক্ষিত আছে। যদি বলেন, নবীজির উষ্ট্রির রং

কেমন ছিল? তার নাম কী ছিল? আলহামদুলিল্লাহ! তাও কিতাবে লিখে দেওয়া আছে। এমন ঐতিহাসিক ও দলিলভিত্তিক জীবনী আজ পর্যন্ত কারুর ভাগ্যে জোটেনি। বড়-বড় বাদশা, সেনাপ্রধান, দার্শনিক আরও কত কী অতিবাহিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এমন একজন কি দেখাতে পারবেন, যার জীবনের প্রতিটি কথা-কাজ এত বিপুল পরিমাণে কিতাবে সংরক্ষিত আছে?

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই একমাত্র সেই ব্যক্তিত্ব, যার জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুই অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষিত আছে। লক্ষ-লক্ষ হাদীছ পড়ে দেখুন; বাস্তবতা আপনার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। সুতরাং অত্যন্ত গর্ব ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একথা স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমাদেরকে এমন একজন নবীর উম্মত বানিয়েছেন, যাঁর জীবনের প্রতিটি সুন্নাহ ও আদর্শ আজও সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

ফরাসি লেখক 'হেটী'র স্বীকারোক্তি

মিস্টার হেটী একজন ফরাসি লেখক। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লিখেছেন–

He was born in the full light of his tory

'তিনি ইতিহাসের পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন।'

এবার ভাবুন, একজন অমুসলিমই যখন স্বীকার করে নিল, নবীজির জীবনকর্ম পূর্ণ জ্যোতির মতো উদ্ভাসিত, তাহলে সেখানে কি আর সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে?

নবীজির শানে মাইকেল হার্ট-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লোকদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন, যাদের কাছে কোনোই শিক্ষা ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا

'আল্লাহ তা'আলা নিরক্ষর ও মূর্খদের নিকট স্বীয় রাসূলকে প্রেরণ করেছেন।'[১]

---

১. সূরা জুমুআ : ২

রাসূলও এমন এক ব্যক্তি হয়েছেন, যিনি জীবনে কারো কাছে কিছুই লেখা-পড়া করেননি। আপনারা পনেরো-বিশ বছর আগে একটি বইয়ের আলোচনা শুনেছিলেন। নাম হলো The hundred. বইটি মাইকেল হার্ট রচনা করেছিল। অথচ সে একজন খ্রিস্টান। সে নিজের ধারণা ও অনুভূতির আলোকে ইতিহাস থেকে এমন একশত মহান ব্যক্তিত্বের জীবন-কর্ম লিপিবদ্ধ করেছেন, যাঁরা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। সেখানে কয়েকজন বিজ্ঞানীর জীবনীও এনেছেন। কতক আম্বিয়া (আ.)-এর জীবনীও এনেছেন। কতিপয় সেনাপ্রধানের জীবনীও এসেছে। কিন্তু এ একশত মহামানবের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম যাঁর নাম আনলেন; তিনি হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিনি লিখেছেন–

My choice of Muhammad to lead the ranKig of the most influetcial personaleties in the history will surprise some of the readers.

'আমি সেই একশত মহামানবের কথা আলোচনা করেছি, যাঁরা ইতিহাসকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এনেছি। এতে হয়তো কেউ-কেউ অবাক হবেন। কিন্তু এর পক্ষে আমার কাছে একটি শক্তিশালী দলিল আছে। তাহলো, পৃথিবীতে আদিকাল থেকে যত মহামানবই আগমন করেছেন, তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করে একটি বিষয় লক্ষ করেছি, সকলেই ছোটবেলায় কোনো-না-কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিবিড় তত্ত্বাবধানে থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। নিজের সমকালের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপণ করেছেন। বোঝা গেল, তাঁরা প্রথমে প্রচলিত শিক্ষা অর্জন করার পর তাকে ভিত্তি করে কর্মজীবনে কোনো বড় ধরনের সফলতা অর্জন করেছেন। কিন্তু সারা দুনিয়ায় শুধু একজন ব্যক্তি আছেন, যাঁর জীবন ঘেটে দেখা যায়, তিনি জীবনে কখনও একটি অক্ষর শেখার জন্যও কারো সম্মুখে ছাত্র সেজে হাঁটু গেড়ে বসেননি। তিনি হলেন পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি দুনিয়া থেকে ইল্‌ম ও আদর্শ অর্জন করেননি; কিন্তু দুনিয়াকে দিয়েছেন প্রচুর। তিনি পৃথিবীবাসীকে এমন শিক্ষা ও আদর্শ উপহার দিয়েছেন, যা আজ পর্যন্ত না কেউ দিতে পেরেছে, না পারবে। তাই আমার মন চাইল, যাঁর শিক্ষা ও আদর্শ এত মহান, যদিও তিনি বিধর্মী;

তারপরও তাঁকেই আমার ইতিহাসে মহামানবদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত করলাম।'

বন্ধুরা আমার! একজন কাফের যদি নবীজির নামে এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, তাহলে বোঝা গেল, আমাদের নবীজি গোটা জাতির জন্য রহমতস্বরূপ।

গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার তিনটি উপায়

প্রথম উপায় : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়ায় আগমন করেন, তখন মানবতা চরম দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। চতুর্দিকে শুধু যুলুম আর অত্যাচার বিরাজ করছিল। এমন চরম খারাপ অবস্থায় যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার দৃষ্টি নিজের দিকে নিবদ্ধ করতে চাইতেন, তাহলে তা মোটেও কঠিন ছিল না। উদাহরণস্বরূপ যদি তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিতেন, হে লোকসকল! আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে আছি; না আমরা খেতে পারছি, না পরতে পারছি। অতএব, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো করতে হবে। তাই আসুন, আমি আপনাদেরকে খাদ্য, কাপড় ও আবাসনের উন্নতি লাভের একটি উপায় বলে দিচ্ছি, তাহলে কেউ ঘরে বসে থাকত না। কারণ, এটি এমন এক বিপ্লবী ঘোষণা ছিল যে, গোটা আরব ওই ঘোষণার সমর্থনে এগিয়ে আসত। কিন্তু নবীজি গ্রহণযোগ্যতা লাভের এই পথটি পরিহার করেছেন।

দ্বিতীয় উপায় : দ্বিতীয় উপায় এই ছিল, যা তিনি অবলম্বন করতে পারতেন। যদি তিনি ঘোষণা দিতেন, লোকসকল! এ দুনিয়ার চতুর্দিকে শুধু জুলুম আর জুলুমই দেখা যাচ্ছে – শান্তি-নিরাপত্তার কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। তোমরা আমার কাছে এসো; শান্তি ও নিরাপত্তাময় জীবন পেতে হলে আমার হাতকে শক্তিশালী করো, আমাকে সহযোগিতা দাও। আমি এই ভঙ্গুর সমাজে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে দেখাব। তো যারা অত্যাচার-অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তারা সবাই একে-একে নবীজির পাশে এসে দাঁড়াত। কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য নবীজি এ পথটি অবলম্বন করেননি।

তৃতীয় উপায় : তৃতীয় একটি উপায় এও ছিল যে, নবীজি ঘোষণা দিতেন, হে আরবের লোকসকল! আমাদের ডানে-বাঁয়ে অনেকগুলো সুসভ্য ও প্রগতিশীল সাম্রাজ্য আছে। এসো, আমরা যারা আরবি ভাষায় কথা বলি, আমরাও একটি আরব সাম্রাজ্যের ঘোষণা দিই, যাতে কায়সার-কিসরার মতো আমাদেরও একটি সালতানাত হয়ে যায়; পৃথিবীতে আমরাও আরব

সালতানাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি। ভাষাকেন্দ্রিক এই আহ্বান এমন শক্তিশালী একটি স্লোগানে পরিণত হতে পারত, যা শুনে আরবরা এক পতাকাতলে সমবেত হয়ে বিপ্লব ঘটাতে পারত। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সহজ উপায়গুলোর কোনোটিই গ্রহণ করেননি।

সবচেয়ে দুষ্কর উপায় অবলম্বন

বরং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই উপায়, ওই পথটিই অবলম্বন করলেন, যা ছিল সবচেয়ে দুষ্কর ও দুর্গম। তাহলো, তিনি আল্লাহর পয়গাম প্রাপ্ত হলেন, 'হে নবী! আপনি লোকদের বলুন, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই।'

নবীজি আরবদের একত্রিত করে বললেন–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ.

'হে লোকসকল! বলো, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই; তাহলেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে।'

নবীজি যেইমাত্র এ আহ্বান করলেন, গোটা আরব তার বিরোধী হয়ে গেল। কিন্তু তিনি পাহাড়সম দৃঢ়তা ও অবিচলতা নিয়ে সবধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেলেন এবং পরিশেষে দুনিয়া থেকে শির্‌ক-বিদ'আত ও মূর্তিপূজা নির্মূল করেই ক্ষান্ত হলেন।

কষ্ট সহ্যের বিনিময়ে পুরস্কার

কষ্টের পর সুখ আসে, সঙ্কটের পর আসানি আসে। আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট করেছেন, অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মানুষের প্রতি এমন করুণা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে, মক্কায় যেদিন তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছিলেন, সেদিন পূর্বের মুশরিক পৌত্তলিকরা আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল, মানুষ দলে-দলে এসে মুসলমান হচ্ছে। এছাড়া নবীজি বিদায় হজের ভাষণে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'আজকের পর এই ভূখণ্ডে শয়তান আর মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করা হলো।'

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা সেই ভূখণ্ডটিকে শির্‌ক ও মূর্তিপূজা থেকে চিরদিনের জন্য হেফাযত করেছেন।

শুরু জীবনের সঙ্কটসমূহ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়াতে তাশরীফ আনেন, তখন থেকেই নবীজির জীবনে বিস্ময়কর কষ্ট ও সঙ্কট বাসা বেঁধে নিয়েছিল। পৃথিবীর আলো দেখার পূর্বে মাতৃগর্ভে থাকাবস্থাই তিনি পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। তারপর বয়স যখন ছয় হলো, তখন একমাত্র স্নেহের আশ্রয়স্থল মমতাময়ী মা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। আট বছর বয়সে দাদাকেও হারালেন। তারপর চাচা আবুতালিবের তত্ত্বধানে বড় হতে লাগলেন। পঁচিশ বছর বয়সে বিবাহ করে দাম্পত্যজীবন শুরু করেন। তারপর একটি সময় এল, যখন তাঁর জীবনসঙ্গিনীও দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। অবশেষে চাচা আবুতালিবও ইন্তেকাল করলেন। আপনি লক্ষ করুন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের যে আশ্রয়গুলো থাকে, সেগুলো সব ছিঁড়ে গেল। কেন? কারণ, তাতে এই হেকমত ছিল, আল্লাহ্ স্বীয় রাসূলকে এই আহ্বান নিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, হে আমার রাসূল! দুনিয়াবাসীদের জানিয়ে দাও, হে মাখলুকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা! এসো এক স্রষ্টার নিরাপত্তা গ্রহণ করো; তিনি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

বন্ধুরা আমার! যদি নবীজি কারো আশ্রয়ের ছায়াতলে বড় হতেন, তাহলে লোকেরা প্রশ্ন করতে পারত, যিনি নিজে কারো আশ্রয় পেয়ে বড় হয়েছেন, তিনি কিভাবে দুনিয়ার আশ্রয় থেকে মুখ ফিরাতে বলেন? অতএব, নবীজি দুনিয়াবাসীকে শিক্ষা দিলেন, যদি আমি এতিম হয়ে একটি বিপ্লবী জীবন কাটাতে পারি, তাহলে তোমরা আশ্রয় পেয়েও তা কেন পারবে না। এসো, জীবনভর মাখলুকের আশ্রয় তালাশ না করে এক আল্লাহকে নিজের আশ্রয় বানিয়ে নাও। মহান আল্লাহ তোমাদের দুনিয়াতেও সফলতা দান করবেন, আখেরাতেও সফলতা দান করবেন।

সামাজিক বয়কট

যখন আবুতালিবের পাহাড়ি ঘাঁটিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হলো, তখন গোটা কুরাইশ গোত্র এ মর্মে ঐক্যবদ্ধ হলো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ সামাজিক বয়কট করা হোক। তাদের না কোনো খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হবে, না তাদের থেকে কোনো খাদ্যদ্রব্য নেওয়া হবে। তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক বা সহমর্মিতা রাখা যাবে না। যখন সমাজের লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিরোধিতা শুরু করে, তখন একজন মানুষকে কত কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে সময় পার করতে হয়!

চরম যন্ত্রণা

নবীজি ইরশাদ করেন, দীনের খাতিরে এ পৃথিবীতে যে পরিমাণ কষ্ট আমাকে দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো পয়গাম্বরকে এত কষ্ট দেওয়া হয়নি। দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য নবীজি এত কষ্ট স্বীকার করলেন, তারপরও একাজ ছাড়লেন না। বরং আল্লাহর পয়গাম আল্লাহর বান্দাদের পর্যন্ত পৌঁছালেন এবং তাদের জীবনকে বদলে দিলেন।

একটি মৌলিক বিষয় মনে রাখবেন, কেউ যদি কোনো বিষয়ে দাওয়াত বা কোনো পয়গাম দেয়, তাহলে তার কাছে বসবাসকারীরাই তার জন্য সর্বোত্তম সাক্ষী হয়ে থাকে। তারাই তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারবে। একারণেই সাধারণত বলা হয়, যদি কোনো মানুষের জীবন সম্পর্কে জানতে হয়, তাহলে তার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করো। তার বাড়ির চাকর-বাকর, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করো। কারণ, এই ব্যক্তির ভিতর ও বাহির সম্পর্কে এদের থেকে অন্য কেউ বেশি বলতে পারবে না।

নিকটাত্মীয়দের ইসলাম গ্রহণ

নবীজির ওপর যখন প্রথম ওহী নাযিল হলো, তখন তিনি সর্বপ্রথম নিজের ঘরে এসে মহান আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। হযরত খাদীজা (রাযি.) হলেন সেই ভাগ্যবতী প্রথম নারী, যিনি নবীজির মুখ থেকে সর্বপ্রথম কুরআন শুনেছিলেন। কোনো পুরুষের ভাগ্যে এই মর্যাদা নসিব হয়নি। নবীজির প্রথম জীবনসঙ্গিনী যখনই আল্লাহর পয়গাম শুনলেন, সঙ্গে-সঙ্গে ইসলাম কবুল করে নিলেন। তারপর নবীজির গোলাম হযরত যাইদ (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজির বন্ধুদের মধ্যে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) ছিলেন সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু।

তিনিই যখনই পয়গাম শুনলেন, সঙ্গে-সঙ্গে ইসলাম কবুল করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে এমন চুম্বকীয় আকর্ষণ ছিল যে, তাঁর মুখে নবুওতের দাবি শোনার সঙ্গে-সঙ্গে বংশের সকল নিকটআত্মীয় তাঁর কথা বিশ্বাস করে নিয়েছিল। কারণ, তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও উদারতা সর্বজনস্বীকৃত ছিল। সে কারণে নবুওত লাভের পূর্বেই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। জীবনচরিত্রের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও অন্যদের চেয়ে আমাদের নবীজির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইসলাম প্রচার

লোকেরা বাড়ি-ঘরে জীবন যাপনকালে স্ত্রীদের প্রায়ই একথা বলে যে, ঘরে আমরা যা কিছুই করি, যেভাবেই চলি, এগুলো ঘরেই থাকবে। বাইরের লোকজন যেন এগুলো কিছুই জানতে না পারে। আপনি দেখবেন, সব স্বামী তাদের স্ত্রীদের এ পরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের নবীজির ঘরের জীবন ও বাইরের জীবন সব কিছুই হাদীছে সংরক্ষিত আছে। কারণ, তিনি স্ত্রীদের আদেশ করে রেখেছিলেন, তোমরা আমাকে যা কিছু করতে দেখবে, এসব শিক্ষা আমার উম্মতদের নারী-পুরুষ সবার কাছে পৌঁছানো তোমাদের ওপর ফরজ। যখন নবীজি মসজিদের জীবনে আসেন, তখন সেখানেও এই শিক্ষা দেন যে, তোমরা আমাকে যা কিছু করতে দেখবে কিংবা আমার মুখে যা কিছু শুনবে, তা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। সুবহানাল্লাহ!

আমাদের প্রিয় নবীজির জীবনচরিত্র এত উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য ছিল যে, তিনি তাঁর পারিবারিক জীবনকে প্রকাশ করার জন্য যেমন আদেশ করেছিলেন, তেমনি সামাজিক জীবনের আদর্শগুলোও অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আদেশ করেছিলেন। বিষয়টি খুব সাধারণ নয়। অনেক কঠিন কাজ। ফলে নবীজির মুহতারামা স্ত্রীগণ তাঁদের সঙ্গে তিনি একান্ত নির্জন মুহূর্তগুলোতে যা কিছু করতেন, যা কিছু বলতেন উম্মতের নারীদের প্রশ্নের উত্তরে তারা সেসব গোপন বিষয়ে নবীজির সুন্নাত ও আদর্শগুলো প্রকাশ করে দিতেন।

নবুওতের উৎকৃষ্ট প্রমাণ

পূর্ববর্তী নবীগণ যখন নবুওত লাভ করেছিলেন, তখন তাদের জাতি তাদের কাছে নবুওতের প্রমাণ চেয়েছিল। উত্তরে হযরত মূসা (আ.) লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুকে জীবিত করে দেখিয়েছিলেন। বিভিন্ন নবী-রাসূল তাঁদের নবুওতের সত্যতা প্রমাণের জন্য নানা রকমের মু'জিযা পেশ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের নবীজির কাছে যখন নবুওতের দলিল চাওয়া হলো, তখন তিনি এক ঐতিহাসিক উত্তর দিলেন। তিনি বললেন–

لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

'আরে, আমি তো তোমাদের মাঝেই আমার সারাটি জীবন কাটিয়ে দিলাম! (কিছুই কি দেখনি?) তোমরা কি বুঝতে পারছ না?'[১]

---

১. সূরা ইউনুস : ১৬

তোমরা কি আমার জীবনে কোনো কলঙ্ক দেখেছ? শোনো, আমার নবুওতের সত্যতার জন্য আমার জীবনই সবচেয়ে বড় দলিল।

সুবহানাল্লাহ!

কী পূত-পবিত্র জীবন ছিল তাঁর। ফুলের পাপড়ির চেয়েও বেশি কোমল ছিল তাঁর জীবন। দুধের মতো ছিল স্বচ্ছ ও নির্মল। এত নিষ্কলুষ জীবন ছিল তাঁর যে, কাফেররা সারাটি জীবনে একটিবারও তাঁর দিকে আঙুল তোলার সাহস পায়নি। যারা বুদ্ধিমান, তাদের জন্য এর মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে। উত্তম চরিত্রকে দেখতে হয়তো সাধারণ মনে হবে; কিন্তু এর দ্বারা অনেক দামি জিনিস ক্রয় করা যায়। তরবারির জবাব মানুষ তরবারি দিয়ে দিতে পারে; কিন্তু উত্তম চরিত্রের জবাব তরবারি দিয়ে দেওয়া যায় না।

নবীজির উত্তম চরিত্র

দেখুন, নবীজিকে পাগল বলা হয়েছে, কবি বলা হয়েছে, জাদুকর বলা হয়েছে! কিন্তু তাঁর ওপর চারিত্রিক অপবাদ কেউ আরোপ করতে পারেনি। এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে বলবে, আমি নবীজির জীবনে অমুক চারিত্রিক স্খলন পেয়েছি। তাঁর চারিত্রিক আদর্শ শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়; বরং গোটা বিশ্বের মানবজাতির জন্য আদর্শ। তিনি তাঁর উত্তম চরিত্রের অনুপম আদর্শ দেখিয়ে বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। নবীজির স্বভাব-চরিত্রে এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, যে যতখানি তাঁর সাহচর্যে আসত, সে তাঁর প্রতি ততখানি অনুরক্ত হয়ে যেত। এ কারণে হাদীছে এসেছে–

فُتِحَتِ الْمَدِيْنَةُ بِالْأَخْلَاقِ

'নবীজির উত্তম চরিত্রই মদীনাকে জয় করে নিয়েছে।'

উন্নত চরিত্রের তরবারি

কোনো দেশে একলোক প্রশ্ন করল, আপনাদের নবীজি তো তরবারির জোরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমি বললাম, তা কিভাবে? সে বলল, তাঁর আশেপাশে ছিল কিছু দুর্দান্ত যুদ্ধবাজ। তারা তলোয়ারের জোরে সারা দুনিয়াকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। আমি তাকে দুটি প্রশ্ন করলাম। একটি হলো, আচ্ছা বলুন তো, সেই দুর্দান্ত যুদ্ধবাজদের তাঁর পাশে কে এনে দিয়েছিল? সে উত্তর দিল, তারা তো তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় এসেছিল। সেই উন্নত চরিত্রের তরবারিই তাদের মতো তাবৎ দুনিয়ার সকল মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। তারপর তাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে

আপনি বললেন, নবীজির যুদ্ধবাজ সাহাবীরা তরবারির জোরে দুনিয়া বিজয় করেছিলেন। তাহলে বলুন, তরবারি কি নিজে নিজেই চলে, না একে চালানোর জন্য কোনো শক্তিশালী হাতের প্রয়োজন পড়ে? সে বলল, তরবারি তো নিজে-নিজে চলতে পারে না; অবশ্যই তার জন্য শক্তিশালী হাতের প্রয়োজন আছে। আমি বললাম, সেই হাতগুলোকে কে বিজয় করেছিল? নিশ্চয়ই সেই হাতগুলো এমন মহান হাতের সংস্পর্শে এসেছিল, যার মধ্যে ছিল দুনিয়া বিজয়ের শক্তি। সেই মহান হাতের ছোঁয়া পেয়ে তাদের মধ্যে এমন সাহস, রণকৌশল ও উন্নত চরিত্র এসে গিয়েছিল যে, তার পর তারা যেদিকে ছুটেছে, সেদিকই পদানত হয়েছে।

হযরত উম্মে জামীল (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ

লক্ষ করুন, উম্মে জামীল নামে এক আরব নারী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার পথে সব সময় কাঁটাযুক্ত খড়কুটা ঢেলে রাখত তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার ঘরে কোনো পুরুষ লোক ছিল না। তার কন্যাই তার সেবা-শুশ্রূষা করত। মা-মেয়ে তখন জীবনের সব চেয়ে দুঃসময় পার করছিল। প্রতিবেশীদের এতটুকুও সময় নেই যে, তারা তার খোঁজ নেবে। এতটা দুর্বিষহ হয়ে গিয়েছিল তাদের জীবন।

একদিন মা-মেয়ে বসে-বসে গল্প করছিল। ক্ষুধায় মায়ের মুখ থেকে কথা ফুটছিল না। ক্ষীণ শব্দে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ দরজায় খটখট শব্দ শুনতে পেল। মা বলল, যাও তো মা! দেখো কে এসেছে। মেয়ে দরজা খুলে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বাইরে আবুবকর ও ওমর (রাযি.)কে সঙ্গে নিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে আছেন। কাঁপতে-কাঁপতে মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, মা, তুমি যে মুহাম্মাদের পথে সর্বদা কাঁটা দিয়ে রাখতে, আজ তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছেন। আমাদের কাছে তো কিছুই নেই! তারা তো আমাদের গলাটিপে হত্যা করে ফেলবে! এখন কী উপায় হবে মা? দুর্বল অসুস্থ বৃদ্ধা অত্যন্ত আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, কী আর উপায় হবে? আমরা এখন অসহায়। তারা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে। গিয়ে জিজ্ঞেস করো কী চায় সে? প্রয়োজনে আমি ক্ষমা চাইব, জীবন ভিক্ষা চাইব।

অনুমতি নিয়ে নবীজি ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, উম্মে জামীলের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ। অসুস্থতায় দুর্বল হয়ে বিছানায় বসে আছে। দৃষ্টি তার অবনত। প্রশ্ন করল, মুহাম্মাদ! কেন এসেছ তুমি আমার বাড়ি? নবীজি

সমবেদনা জানিয়ে বললেন, কয়েকদিন পর্যন্ত আমার চলার পথ কাঁটামুক্ত ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এ কাজটা তো আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তুমিই করতে। পথে কাঁটা না দেখে আমি কিছুটা আশ্চর্য হলাম। খবর নিয়ে জানলাম, তুমি অসুস্থ। তাই তোমার খোঁজ নিতে এলাম।

বৃদ্ধা বিস্ফারিত নয়নে মুহাম্মাদকে দেখছে! নতুনভাবে দেখছে। কৃতজ্ঞতায় তার দুচোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। চিন্তা করুন, নবীজির এ উন্নত চরিত্রের ফলে তাঁর অন্তরে কী পরিমাণ ভালোবাসা উথলে উঠেছিল? নবীজির পথে কাঁটা নিক্ষেপকারী নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কাঁদল এবং সঙ্গে-সঙ্গে মা-মেয়ে কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল!

তিনশত লোকের ইসলাম গ্রহণ

হাদীছে এসেছে, এক গ্রামলোক মসজিদে নববীতে এসে বসল। কিছুক্ষণ পর তার পেশাবের বেগ হলো। সে উঠে গিয়ে মসজিদের এক কোণে পেশাব করতে লাগল। সাহাবায়ে কেরাম দেখে তাকে বাধা দিতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বারণ করে বললেন, এ যা করছে, করতে দাও; বাধা দিও না।

কিছুক্ষণ পর যখন সে প্রশাব থেকে ফারেগ হলো, তখন তাকে কাছে ডেকে নবীজি বললেন, 'মসজিদ আল্লাহর ঘর'। আল্লাহ হলেন মহান। তাই তাঁর ঘরও মর্যাদাবান। এমন ঘরে প্রশাব করা ঠিক নয়, একে পাক-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। নবীজি তাকে বিষয়টি এত মমতার সঙ্গে বোঝালেন যে, সে খুব মুগ্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বলল, আমি আমার বাড়ি ফিরে যেতে চাই। নবীজি তাকে পরার জন্য একটি পোশাক দিলেন। যখন দেখলেন, সে পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছে, তখন একটি বাহন দান করলেন।

সে পোশাকটি গায়ে জড়িয়ে বাহনে আরোহণ করে বাড়ির দিকে রওনা হলো। যখন নিজ গোত্রে প্রবেশ করল, তখন খুব জোরে-জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ও আমার ভাই! ও আমার মামা! ও আমার চাচা! আমার কথা শোনো! সবাই তার কাছে ছুটে এসে বলল, কী হয়েছে তোমার? এভাবে চিৎকার করছ কেন? সে বলল, আমি এমন একজন শিক্ষক দেখেছি, যিনি আল্লাহর রাসূল, অত্যন্ত দয়াবান, মহৎপ্রাণ, ক্ষমাশীল ও দানশীল। আমি এত বড় অপরাধ করেছি; কিন্তু তিনি আমাকে বকলেনও না, মারলেনও না, গালিও দিলেন না, কোনো ধরনের কঠোর আচারণও করলেন না; বরং অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমাকে বোঝালেন, কাজটা ঠিক হয়নি। তারপর আসার সময় তিনি এই পোশাক আর বাহনটা হাদিয়া দিলেন।

শুনে সবাই বলাবলি করতে লাগল, আচ্ছা; এমন মহান চরিত্রবান রাসূলকে আমরাও এক নজর দেখতে চাই। তুমি আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। তারপর সেই গোত্রে প্রায় তিনশত লোক নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মদীনায় এল এবং মুসলমান হয়ে ঘরে ফিরল। সুবহানাল্লাহ!

মক্কাবিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

আসুন! আমাদের প্রিয় নবীজির জীবনের মহানুভবতা দেখতে চান তো মক্কাবিজয়ের দিনের ঘটনা পড়ুন। নবীজি বিজয়ী হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। আজ তিনি বিজয়ী সুলতান। সঙ্গে শত-শত বীর যোদ্ধা। শত্রুরা দুর্বল, অসহায়। একদিন এরাই অত্যাচারের পাহাড় ভেঙে মুসলমানদের জন্মভূমি থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছিল। সুতরাং আজ প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। কিন্তু নবীজি তা না করে কী করেছেন? অত্যন্ত বিনম্র ও শান্তিপূর্ণভাবে বাহনের পিঠে সিজদাবনত হয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

রাতে আতঙ্কে-উৎকণ্ঠায় মক্কার নারীদের ঘুম আসছিল না। হায়! আজ আমাদের না জানি কী উপায় হয়। তারা হযরত বিলালের সাথে কী আচরণ করেছিল তা মনে পড়ল। হযরত সুমাইয়ার সাথে কী করেছিল তা মনে পড়ল। অন্যান্য সাহাবাদের সঙ্গে অত্যাচার-নির্যাতনের লোমহর্ষক আচরণগুলো মনে পড়ে গেল। অতীতের স্মৃতিচারণ করে-করে তাদের জীবনের আশা ফুরিয়ে যাচ্ছিল।

রাতের শেষ প্রহর। চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে নারীরা তাদের পুরুষদের বলল, মক্কার প্রতিটি অলি-গলি নিথর-নিস্তব্ধ। কোনো হৈ-চৈ নেই, বিজয়ের উল্লাস নেই। বিজয়ী সেনারা কারো ঘরে হানাও দিচ্ছে না। না কোনো ঘর থেকে আত্মচিৎকার ভেসে আসছে! এ মুসলমানরা তাহলে গেল কোথায়? তারা করছে কী? পুরুষরা বলল, হয়তো তারা পরবর্তী করণীয় নিয়ে পরামর্শ করছে। নারীরা বলল, এভাবে ঘরে বসে থেকো না। একটু বাইরে গিয়ে দেখো, ওরা কোথায়? কী করছে? এমন যেন না হয় যে, তারা হঠাৎ আমাদের ঘরে হামলা করে বসে, আমাদের ইয্যত-সম্মান লুটে নেয়, আমাদের হত্যা করে। কে জানে, আগামী দিনের ঊষার আলো আমরা দেখতে পাব কি-না? কিছুই বলা যাচ্ছে না।

তারপর পুরুষরা কম্পিত পায়ে ঘর থেকে বের হলো। দেখল, রাস্তা, অলি-গলি নীরব-নিস্তব্ধ। একজন মুসলিম সৈন্যও কোথাও নেই। খুঁজতে-খুঁজতে অবশেষে তাদেরকে পাওয়া গেল কাবা ঘরের চৌহদ্দিতে। কাবার

পাদদেশে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সকল সাহাবায়ে কেরাম সেখানে। কেউ তাওয়াফ করছেন, কেউ হাজরে আসওয়াদ চুমু খাচ্ছেন। কেউ মাকামে ইবরাহীমীতে সিজদায় পড়ে আছেন। সবার চোখ অশ্রুসিক্ত। মুখে মহান আল্লাহর প্রশংসার তাসবীহ। একটি বিজয়ী জাতি লুটপাট ছেড়ে এ কেমন আচরণ করছে? এমন অনুপম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কেউ কি কখনও দেখেছে?

মক্কার পৌত্তলিকরা এ বিস্ময়কর আচরণ দেখে বুঝতে বাকি রইল না, এরা কোনো যুদ্ধবাজ জাতি নয়। এরা মহান আল্লাহর দরবারে সেজদাকারী খোদাভীরু জাতি। এরা অত্যচারে প্রতিশোধ নেয় ক্ষমা আর উদারতা দিয়ে। ঘোষণা হলো, নবীজি সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করে দিলেন। ঊষার আলো ফুটতেই মানুষ দলে-দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। নবীজির প্রিয় চাচা হযরত হামযার মৃতদেহ কেটে কলিজা চর্বনকারিণী হিন্দাও রহমতের নবীর দরবারে এসে উপস্থিত হলো। বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন।

হে হিন্দা! তুই তো হযরত হামযার (রাযি.) কলিজা টুকরো-টুকরো করে হার বানিয়ে গলায় পরেছিলি! আজ সেই বাজি কেন হেরে গেলি? আজ এখানে কেন এসেছিস? তুই তো খুব আগুন ঝরিয়ে বলতি, প্রতিশোধ নেব, প্রতিশোধ! কিন্তু আজ এখানে হাঁটু গেড়ে কেন বসে আছিস? হ্যাঁ বন্ধুরা! দোজাহানের বাদশা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত চরিত্র ও সাহাবায়ে কেরামের আত্মদানের ফলাফল ছিল এটি। তাঁদের ধৈর্য, উদারতা, খোদাভীরুতা ও কল্যাণকামিতা অত্যাচারীদের পাষাণ হৃদয়গুলোকে ভেঙে খান-খান করে দিয়েছিল। দর্প-অহঙ্কার ও হঠকারিতা সব কিছু গুড়িয়ে গিয়েছিল সেই সোনালী কাফেলার পদতলে। হিন্দা সেখানে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। মক্কার পৌত্তলিকরা কালিমা পাঠ করার পর নিজেদের অনুভূতি এভাবে ব্যক্ত করছে যে, 'আমরা যখন কাফের ছিলাম, তখন নবীজির প্রতি আমাদের এত প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ ছিল, যা অন্য কারো প্রতি ছিল না। আজ কালেমা পাঠ করার পর মনে হচ্ছে, অন্তরে তাঁর প্রতি যতটা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আছে, অন্য কারো জন্য ততটা নেই।' নবীজির মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাটি এমন এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল, যা গোটা আরববাসীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। এতটা ক্ষমা ও উদারতা তারা আর কখনও দেখেনি।

আজ পৃথিবীর এক জাতি অন্য জাতির ওপর বিজয় লাভ করলে কী করে? কেমন আচরণ করে? তথাকথিত সভ্য ও সমৃদ্ধ দেশগুলোর অতীত ইতিহাস একটু পড়ে দেখুন; তারা যখন কোনো দেশ জয় করেছিল, তখন বিজিতদের সঙ্গে তাদের আচরণ কেমন ছিল? আপনি হতাশ হবেন। তাদের প্রতি আপনার ঘৃণা হবে। ধিক্কার দিতে বাধ্য হবেন। পক্ষান্তরে আমাদের বিশ্বনবীর বিজয়-পরবর্তী কর্ম-আদর্শও দেখুন। হৃদয় জুড়িয়ে যাবে। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠবে। সুবহানাল্লাহ!

হযরত ওসমান ইবনে তালহা (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ

মক্কা মুকাররমায় বাইতুল্লাহ শরীফের চাবি ছিল হযরত ওসমান ইবনে তালহা (রাযি.)-এর কাছে। মক্কাবিজয়ের পর নবীজি তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে বাইতুল্লাহর দরজা খুললেন এবং ভিতরে প্রবেশ করে আল্লাহর ইবাদাত করলেন। সকল সাহাবায়ে কেরাম জানতেন, আজ বাইতুল্লাহর চাবি নবীজির কব্জায়। যখন নবীজি বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন সাহাবাগণ অপেক্ষা করছিলেন, এখনই বাইতুল্লাহ শরীফের চাবি হয়তো তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউকে দান করবেন। কারণ, এটি অত্যন্ত মর্যাদার একটি ব্যাপার ছিল। কিন্তু সবাইকে হতবাক করে তিনি ওসমানকে ডেকে বললেন, এই চাবি আগেও তোমার কাছে ছিল, এখনও তোমারই হাতে সঁপে দিচ্ছি। কিয়ামত পর্যন্ত এই চাবি তোমার বংশধরের মধ্যেই থাকবে। কেউ তোমাদের হাত থেকে এটি নিতে পারবে না। কেবল সে নিতে পারবে, যে জালেম।

সাহাবায়ে কেরাম বিস্ফারিত নয়নে ইনসাফের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করছিলেন। কুরাইশরা হতবাক। হাশেমীরা হতবাক। অন্যান্য কবিলার লোকেরা হতবাক। নবীজি যাকে ইচ্ছা তাকেই চাবিটি দিতে পারতেন। মুহাজিরদের দিতে পারতেন, আনসারদের দিতে পারতেন। কিন্তু কাউকে দিলেন না। যার কাছ থেকে নিয়েছিলেন, তারই হাতে ফিরিয়ে দিলেন। বিজয়ের দর্প ও দম্ভকে চরিতার্থ হতে দিলেন না। হাতে চাবি আসতেই সে বলল, চাবি তো আমার হাতে দিলেন; এবার আমার হাতটাও আপনি গ্রহণ করুন, যেন কাবার রব আমার ওপর রাজি হয়ে যান। নবীজি তার হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিলেন আর সে সঙ্গে-সঙ্গে কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল।

সুবহানাল্লাহ!

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ

দুনিয়া হৈ-চৈ করছে, ইসলাম নাকি যুদ্ধবাজদের হাতে প্রচার লাভ করেছে! আরে ভাই! বলো তো দেখি, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) তো নবীজিকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছিলেন। তাঁকে তো কোনো যুদ্ধবাজ বাধ্য করেনি; কিন্তু তারপরও কিছুক্ষণ পর তাঁকে নবীজির দরবারে অবনতমস্তকে বসে থাকতে কেন দেখা গিয়েছিল? কেউ তো তাঁকে তরবারিহাতে বলেনি, 'এসো ওমর! মক্কার এই এতিমের সামনে মাথাটা ঝুঁকাও; অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে!' বোঝা গেল, এসব হলো ইসলামবিদ্বেষীদের অপপ্রচার। আসল কথা হলো, নবীজির উন্নত আখলাক-আদর্শই সকলের মন জয় করে নিয়েছিল।

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযি.)-এর জীবনী দেখুন। তিনি সেচ্ছায় এসে নবীজির সামনে হাঁটু গেড়ে আদবের সাথে বসে কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়েছিলেন। কই, তার সঙ্গে কোনো যুদ্ধবাজ লড়াকু তো সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি! তিনি তো নিজেও একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। এসব বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে সামনে ভেসে আসে, তা হলো, নবীজির উন্নত চরিত্রের চুম্বকীয় আকর্ষণই ঐসব বীর পুরুষদের জীবনে বিপ্লব এনে দিয়েছিল। কারণ, হযরত খালেদ (রাযি.) এমন এক বাহাদুর যোদ্ধা ছিলেন, যে কারো কাছে হার মানতে জানত না। তরবারি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা-ই তাঁর বংশগত ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু তিনি যখন নবীজির উন্নত চরিত্রের পরশ পেলেন, তখন তাঁর তরবারি অকেজো হয়ে গেল। তরবারিটা পিছনে ফেলে দোজাহানের বাদশা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদতলে আশ্রয় নিলেন। সুহাইল ইবনে আমর দাওসী ও ছুমামা ইবনে উছালের হৃদয়ও নবীজির উন্নত আখলাকই জয় করে নিয়েছিল এবং তাঁরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

দুনিয়ায় এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে, যেখানে মুসলমানদের কোনো সৈন্যবাহিনীও যায়নি, কোনো যুদ্ধবাজও যায়নি, তারপরও সেখানে ইসলামের আলো জ্বলেছিল। বাস্তবতা হলো, ইসলামের মধ্যে এমন রূহানী আকর্ষণ রয়েছে, যা সেই লোকগুলোর হৃদয়গুলোকে নিজের দিকে টেনে এনেছিল। এ ছিল মূলত উন্নত চরিত্রেরই বিজয়, যা কিনা পুরো দুনিয়াকে নিজের সামনে নত করে ছেড়ে দিল। সুবহানাল্লাহ!

মুহাম্মাদি বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

এ পর্যন্ত দুনিয়ায় কয়েক ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। একটি বিপ্লব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। সেই মুহাম্মাদি বিপ্লবের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে মগজে বসিয়ে নিন। কথাগুলো এতই শক্তিশালী ও প্রমাণসমৃদ্ধ, যার সঠিক জবাব আজ পর্যন্ত কোনো কুফরিশক্তি দিতে পারেনি, পারবেও না। আপনারা জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তারা নিরুত্তর হয়ে যাবে।

এক. স্বল্প সরঞ্জাম নিয়ে বিপ্লব : সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় বিপ্লব কিভাবে এত অল্প সরঞ্জাম দিয়ে সংঘটিত করলেন? এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোনো বিপ্লবী নেতা দেখাতে পারেনি। এটি কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। নিশ্চয়ই এটি মহান আল্লাহর সাহায্যেরই প্রতিফলন।

দুই. অকল্পনীয় স্বল্প সময়ে বিপ্লব সংঘটন : যেকোনো বিপ্লব সংঘটনের জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। মুহাম্মাদি ইনকিলাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, এটি মাত্র দশ বছরের মধ্যেই সফলতার মুখ দেখেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করলেন, মূলত তখন থেকেই স্বাধীনভাবে নির্বিঘ্নে কাজ করার সূচনা হয়েছিল। দশ বছরের মধ্যে পবিত্র কুরআনও পরিপূর্ণভাবে নাযিল হয়ে গিয়েছিল আবার ইসলাম প্রচারের কাজও ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নবীজি পৃথিবীবাসীকে ইল্‌ম ও আখলাক তথা জ্ঞান ও উন্নত চরিত্রের বিপ্লব ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষী, এত অল্প সময়ে এত বড় বিপ্লব কেউ সফল করতে পারেনি।

তিন. রক্তপাতহীন বিপ্লব

মুহাম্মাদি বিপ্লবের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, এত বড় বিপ্লবসাধনে পৃথিবীর ইতিহাসে রক্তপাত ও প্রাণনাশের ঘটনা সবচেয়ে কম ঘটেছে। ইতিহাসের কিতাবসমূহে লেখা হয়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে মুসলমান শুহাদা ও নিহত কাফেরদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ১০৬২ (এক হাজার বাষট্টি) জন। সেই হিসেবে এ বিপ্লবকে 'রক্তপাতহীন বিপ্লব' বলা যায়।

বন্ধুরা আমার! আমাদের এ দেশটি একটি মুসলিম দেশ। এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণ নিরাপত্তাও আছে। তারপরও বিভিন্ন শহরে খোঁজ নিয়ে দেখুন, ব্যক্তিগত সংঘাত-সংঘর্ষে এক দু-মাসে অন্তত হাজার মানুষের প্রাণ

নাশ হয়েছে। কিন্তু আমার নবীজির দীর্ঘ দশ বছরের জবিনে প্রাণ নাশ হয়েছে মাত্র ১০৬২ (এক হাজার বাষট্টি) জনের।

মনোযোগ দিয়ে শুনুন! বাগদাদে হালাকুখানও একটা বিপ্লব ঘটিয়েছিল। কিন্তু সেই বিপ্লবে এক দিনে শুধু বাগদাদেই দুই লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। এ তো ছিল এক দিনের কথা। তাহলে দীর্ঘ দিনের বিপ্লবে কতজন মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল, তার কোনো হিসাব নেই। ফরাসি বিপ্লবে ২৫ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল। রাশিয়ায় কমিউনিজম বিপ্লবে প্রায় ৪০ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। আমাদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে এক কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। কিন্তু আমাদের নবীজি এত অল্পসংখ্যক প্রাণহানির বিনিময়ে গোটা পৃথিবীকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। এটি এমন বিপ্লব, যার কোনো তুলনা নেই।

পরিপূর্ণ সুবিচার

আরেকটি বিষয় লক্ষ করুন। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে বড়-বড় ব্যক্তিত্বরা এসেছেন। কেউ রাষ্ট্রপ্রধান, কেউ সেনাপ্রধান, কেউ দার্শনিক, কেউ চিকিৎসাবিদ। এরা সবাই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছেন। কেউ সাহিত্যের অঙ্গনে, কেউ দর্শনে, কেউ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে, কেউ আবার সাংস্কৃতির ময়দানে স্বীয় কৃতিত্বের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। কিন্তু এদের প্রত্যেকের জীবনী যখন পড়ি, তখন একটি বিষয়ে প্রত্যেকের জীবনে মিল খুঁজে পাই। আর তাহলো প্রত্যেক বিপ্লবী নেতার জীবনীর শেষে একথা লেখা থাকে, তিনি আরও বহু অঞ্চল বিজয় করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আয়ু তার সঙ্গ দেয়নি।

আমি বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের জীবনী পড়েছি। তাদের প্রত্যেকের জীবনকথার শেষ দিকে লেখা আছে, তিনি যদি আরও আয়ু পেতেন, তাহলে পৃথিবীবাসীর জন্য আরও অনেক সাহিত্যরত্ন রেখে যেতে পারতেন। এভাবে প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, লেখক শুধিজন সকলের জীবনীর শেষে পাওয়া যায়, তাঁরা যদি আরও হায়াত লাভ করতেন, তাহলে পৃথিবীবাসীকে যুগান্তকারী আরও অনেক রত্নভাণ্ডার উপহার দিতে পারতেন। অর্থাৎ– সকলের মধ্যেই অপূর্ণতার একটা আক্ষেপময় হাহাকার যে, হায়! এটা পূর্ণ হলো না! হায়! ওটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল! অপূর্ণতার এই হাহাকার যেন প্রত্যেকের জীবন থেকে ভেসে এসেছে।

কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র বক্তিত্ব, যিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সাহাবীর সমাবেশে সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে লোকসকল! বলো; আমি কি যথাযথভাবে আল্লাহর পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি? সবাই সমস্বরে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, আপনি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।' নবীজি তখন আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ

'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।'

সুবহানাল্লাহ!

পুরো মানবেতিহাসে আমি কেবল আমাদের নবীজির জীবনকেই পরিপূর্ণ জীবন হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। কারণ, তিনি যে জীবনাদর্শ রেখে গেছেন, তাতে না আছে অপূর্ণতার হাহাকার, না আছে আরও পাওয়ার আবদার। তাহলে এমন ব্যক্তিত্বকে জীবনের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে কেন গ্রহণ করব না, যাঁর জীবন পরিপূর্ণ, যাঁর জীবনে অপূর্ণতার হাহাকার নেই?

পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক

বন্ধুরা আমার! মানুষ যখন চোখ তুলে উপরের দিকে তাকায়, তখন আকাশ দেখা যায়। আপনি মাটিতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চোখদুটো মেলে ধরুন; আকাশ দেখতে পাবেন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে উপরে তাকান; আকাশই নজরে পড়বে। নির্জন দ্বীপে দাঁড়িয়ে কিংবা ধূসর মরু-অঞ্চলের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকান; সবখানে আকাশই আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। তদ্রূপ, জীবনের বাঁকে-বাঁকে আমলী জিন্দেগির যেকোনো অঙ্গনে দিকনির্দেশনার জন্য যখনই দৃষ্টি উঠাই, তখনই নবীজির মোবারক জিন্দেগি হেদায়াতের আসমান হয়ে চোখে ধরা দেয়। যদি যৌবনের শিক্ষা ও আদর্শ খুঁজি, তাহলে নবীজির যৌবনকাল আমাকে পথ প্রদর্শন করে। এমনিভাবে জীবনের যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো পরিবেশে যদি আমার দিকনির্দেশনার প্রয়োজন পড়ে, আমি চোখ তুলে হেদায়াতের আসমান থেকে সেই আদর্শ গ্রহণ করে নেই।

সুবহানাল্লাহ!

একমাত্র নবীজির জীবনই এমন আদর্শিক ও পরিপূর্ণ জীবন, যেখানে প্রতিটি মানব-মানবীর জন্য জীবনের প্রতিটি অঙ্গের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। জীবনবিধান হিসেবে এমন পরিপূর্ণ আদর্শ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।

শিক্ষক হিসেবেও তিনি পরিপূর্ণ ও অদ্বিতীয়

বন্ধুরা! ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যক্তিপূজার স্থানে আল্লাহপূজা তথা একত্ববাদের ভিত কে রচনা করেছেন? আমার প্রিয়নবীজিই তো এই কাজটি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'সৃষ্টির আনুগত্য করতে গিয়ে স্রষ্টার নাফারমানি করা যাবে না।'

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনুমাননির্ভরতা ছেড়ে বাস্তবতার পথ ধরতে কে শিখিয়েছেন? তিনিও আমার নবীজি।

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রকৃতিপূজার পথ ছেড়ে আল্লাহর কুদরতে বিশ্বাসের শিক্ষা কে দিয়েছেন?

আমার প্রিয়নবীজি।

রাজনীতিতে পারিবারতন্ত্রের বলয় থেকে বেরিয়ে উন্নত চরিত্র ও দক্ষতার ভিত্তিতে জনগণের কল্যাণকামী খলীফা নির্বাচনের শিক্ষা কে দিয়েছেন?

আমার প্রিয় নবীজি।

ইল্ম ও আমলের ময়দানে অনুমাননির্ভরতা বর্জন করে বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়ার শিক্ষা কে দিয়েছেন?

আমার নবীজি।

সামাজিক শাসনব্যবস্থায় অত্যাচার-অবিচারকে 'না' বলে ন্যায় ও ইনসাফকে আঁকড়ে ধরার শিক্ষা কে দিয়েছেন?

আমার নবীজি।

আমাদের নবীজি-ই তো সাম্য ও ইনসাফের জন্য বিপ্লব করে পৃথিবীবাসীর মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। আজ দুনিয়ায় যত ধরনের সভ্যতা ও বিপ্লব দেখা যায়, সবই নবুওতের এই উজ্জ্বল সূর্যের কিরণ বলেই মনে হচ্ছে।

এই তো কিছুদিন আগে আমেরিকায় একটি বিষয় ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল। বিষয়টি হলো, সেখানকার সুপ্রিম কোর্টের ভিতরে

কর্তৃপক্ষ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মূর্তি তৈরী করেছিল। পুরো আকৃতি তো বানায়নি; তবে মোটামুটি একটি পবিত্র মানুষের মূর্তি বানিয়ে তার নিচে লিখে দিল, 'মুসলমানদের পয়গম্বর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' এই দৃশ্য দেখে সেখানকার মুসলিম অধিবাসীরা অত্যন্ত মর্মাহত হলো। তারা বিষয়টির নিন্দা জানিয়ে সে দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি লিখল, আপনারা এই কাজটা কেন করলেন? এ দ্বারা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হয়েছে। অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টভবন থেকে এ চিঠির যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল, তা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিল। তার ব্যাখ্যায় বলা হলো, সুপ্রিম কোর্ট আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিচারিক প্রতিষ্ঠান। এটি ন্যায়-ইনসাফের উজ্জ্বল প্রতীক। আমরা চাই, এখানে প্রতিটি কথাই ন্যায়, সত্য ও ইনসাফের সাথে উচ্চারিত হোক। আমরা পুরো ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি পৃথিবীর মধ্যে ইনসাফের সর্বোচ্চ শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত পেশ করতে কারা সক্ষম হয়েছে? আমরা মুসলিম-অমুসলিম, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস মন্থন করেছি। সর্বোচ্চ ইনসাফের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদানকারী মহান ব্যক্তি হিসেবে আমরা যাঁকে পেয়েছি, তিনি হলেন মুসলমানদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা তাঁর মহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে তাঁর নাম সুপ্রিম কোর্টে লিখে দিয়েছি।

বন্ধুরা! যেখানেই আদল ও ইনসাফের কথা হবে, সেখানেই পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারিত হবে। এটি আমাদের গৌরব। মুসলিম জাতির মর্যাদা।

ব্রিটেন ও সুইডেনের প্রিন্সরাও প্রভাবিত

আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনাদর্শ বিধর্মী কাফেরদের হৃদয়কেও প্রভাবিত করেছে। কখনও ব্রিটেনের প্রিন্সের অভিব্যক্তি শোনা যায়, 'মুসলমানদের পয়গম্বর থেকে আমি অনেক দিকনির্দেশনা পেয়েছি। আবার কখনও শোনা যায়, সুইডেনের প্রিন্স ১২০টি ধর্ম ও জীবনাদর্শ অধ্যয়ন করে অবশেষে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। রহস্য হলো, আমাদের নবীজির জীবনাদর্শে ওই আকর্ষণ রয়েছে, যা বিধর্মীদের অন্তরকেও প্রভাবিত করেছে।

নবীজির সততা আবুজাহ্লের দৃষ্টিতে

আবুজাহ্ল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকৃষ্ট দুশমন ছিল। নবীজি ইরশাদ করেন, মূসার ফেরাউন ছোট ছিল; কিন্তু আমার ফেরাউন (আবুজাহ্ল) অনেক বড়। বদরের প্রান্তরে এক কাফের আবুজাহ্লকে প্রশ্ন করেছিল, হে আবুল হাকাম! তোমার মর্যাদা আমি স্বীকার করি; তুমি কুরাইশ গোত্রের সর্দার। কিন্তু সত্যি করে বলো তো, মুহাম্মাদকে তোমার কাছে সত্যবাদী বলে মনে হয়, নাকি মিথ্যাবাদী? আবুজাহ্ল উত্তর দিয়েছিল, আমি স্বীকার করি, তিনি সত্যবাদী। তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি। প্রশ্নকারী বলল, যখন তোমরা তাকে সত্যবাদী বলেই বিশ্বাস কর, তাহলে তার পয়গামকে কবুল করে নিচ্ছ না কেন? সে উত্তর দিল, এতে আমার নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আরে জনাব! আমাদের নবীজির উন্নত চরিত্র তো আবুজাহ্লের মতো কট্টর কাফেরের অন্তরও জয় করে নিয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে জাহেলী যুগের সম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে তার ভাগ্যে ঈমান নসিব হয়নি।

যাহোক হেদায়াত আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে চান, তাকে হেদায়াত দান করেন। অন্যথায় তারাও আমাদের নবীজির সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করত।

আমাদের করণীয়

আমাদের উচিত, আমরা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও আদর্শ শিখব এবং সে অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করব।

কারণ,

مرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا * صداقت ذات تھی جسکی امانت نام تھا جسکا.

وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کردی * کلی آغاز تھی جس کی چمن انجام تھا جس کا.

'আমার আদর্শ ছিলেন তিনি, যাঁর গোটা জীবনই ছিল আদর্শের আহ্বান। সততা যাঁর আস্তিন ছিল, আমানত যাঁর নাম ছিল। জাতিকে যিনি তিলে-তিলে কামিয়াবির গন্তব্য দেখিয়েছিলেন, যার সূচনা ছিল ফুটন্ত ফুলকলি, যার পরিণতি হলো সুরভিত পুষ্পোদ্যান।'

যখন নবীজি তাশরীফ আনলেন, তখন কওম অজ্ঞতার অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। নবীজি সেই কওমের নবীনদের মধ্যে মেহনত করলেন।

যখন তারা দীনের ব্যাপারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখল, তখন পুরো দুনিয়ায় সত্যের পয়গাম নিয়ে তারা দিগ্বিদিক ছড়িয়ে গেল এবং

چڑھتے سورج سے تاج ما گا سمندروں سے خراج مانگا.

এ কবিতাটি তখন তাদের নামে উৎসর্গ হয়ে গেল। আসুন, সেই মহামানব আল্লাহর পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মহানুভবতাকে সালাম জানিয়ে আমরাও মনে-মনে তাঁর মতো একটি আদর্শ জীবন যাপনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরও পবিত্র জীবন দান করুন, গুনাহমুক্ত উত্তম চরিত্রের জীবন দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর প্রিয় রাসূলের জীবনাদর্শ অনুযায়ী জীবনের বাকি দিনগুলো পার করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کردے* دہر میں اسم محمد صلعم سے اجالا کردے

'ইশকের শক্তি দিয়ে নিচুকে উঁচু করে দাও। যামানাকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম দ্বারা আলোকিত করে দাও।'

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

সম্পর্কের মর্যাদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنُّوْرُ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ اِنْفَتَحَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আমাল দু'প্রকার

আমাল দু'প্রকার। আমালে সালেহাহ্ ও আমালে সায়্যিআহ্। আমালে সালেহাহ সৎ কর্মসমূহকে বলে আর আমালে সায়্যিআহ্ বলা হয় গুনাহ্ ও পাপাচারকে। যে কাজ আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের আদেশ ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী হয়, তা আমালে সালেহাহ তথা সৎকর্মসমূহের মধ্যে গণ্য হয়। আর যা কিছু এর বিপরীত হবে, সেগুলো আমালে সায়্যিআহ তথা পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাতেন তথা অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর আমলের প্রভাব

মানুষের বাতেনের ওপর আমালের প্রভাব পড়ে। একবার এক সাহাবী এসে নামাযে শরিক হলেন; কিন্তু ওযু করার ক্ষেত্রে কোনো ক্রটি হয়তো হয়ে গিয়েছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে বললেন, 'কে সেই ব্যক্তি, যার কারণে আমাদের নামাযে ব্যাঘাত ঘটেছে?' মুহাদ্দিছীনে কেরাম এ হাদীছ থেকে মাসঅলা উদ্ভাবন করেছেন, ওযুর ক্রটি একটি যাহেরী আমল ছিল; কিন্তু তাও বাতেন তথা অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। যদি নিকটবর্তী ব্যক্তির আমল অন্য ব্যক্তির বাতেনের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে মানুষের যখন নিজের আমল খারাপ হয়ে যায়, তা নিজের অন্তরের ওপর কী পরিমাণ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে ভেবে দেখেছেন?

গুনাহের কারণে অন্তর কালো হয়ে যায়

হাদীছে এসেছে, মানুষ যখনই কোনো গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। যদি সে সত্যিকার তাওবা করে নেয়, তাহলে সেই দাগ মুছে যায়। যদি তাওবা না করে এবং অন্য আরও গুনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে আরেকটা দাগ লেগে যায়। যদি তাওবা একেবারেই না করে, তাহলে এই কালো দাগটা গুনাহের সাথে-সাথে এমনভাবে গাঢ় ও বিস্তৃত হতে থাকে যে, এক পর্যায়ে মানুষের অন্তর পর্যন্ত কালো হয়ে যায়। একে رين القلب বা মনের ঝং-মনের কালো দাগ বলা হয়। পবিত্র কুরআনেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন,

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'অবশ্যই তাদের পাপাচারের কারণে তাদের অন্তরে ঝং লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।'[১]

আর ইস্তিগফারের কারণে অন্তরের এই কালিমা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে গুনাহের কারণে এই কালো দাগ বাড়তে থাকে। যে ব্যক্তি কালেমা পাঠ করে না, তার অন্তর কালো হয়ে থাকে। আর যে কলিমা পাঠ করে, তার অন্তর ঈমানের নূরে আলোকিত হয়ে যায়।

আল্লাহর দৃষ্টিতে কুফর ও ঈমান

আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কুফর ও কাফেরের সঙ্গে জাতশত্রুতা আছে। ঈমান ও মুমিনের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রয়েছে গভীর ভালোবাসা। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

'আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু।'[২]

আল্লাহর মতো বাদশার কালাম এভাবে হওয়া উচিত ছিল, 'ঈমানদাররা আল্লাহর বন্ধু'। কিন্তু তিনি একে ঘুরিয়ে সম্পর্কের নিসবত নিজের দিকে করাকে পছন্দ করেছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি কত করুণাময়! এই নিসবতের মূল্য আল্লাহর কাছে অনেক।

---

১. সূরা তাতফীফ : ১৪

২. সূরা বাকারা : ২৫৭

মাখলুক দু'ধরনের

আল্লাহ তা'আলার দরবারে মাখলুক দু-ধরনের। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ

'আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।'[১]

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ

'তোমাদের মধ্যে কেউ কাফেরও আছে, কেউ ঈমানদারও আছে।'[২]

তো এ হিসেবে বান্দাদের মধ্যে দুটি ভাগ করা হয়েছে। কাফেরদের অন্তরে অন্ধকারের অবস্থা এমন হয় যে, কুরআনে তাদের জন্য একটি বিস্ময়কর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন-

فِيْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ.

সমুদ্রে যখন উত্তাল তরঙ্গ জেগে ওঠে, তখন ঢেউয়ের-পর-ঢেউ এসে উপকূলে আছড়ে পড়ে। ওই সময় যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্নও হয়, তখন ঢেউয়ের-ওপর-ঢেউ এবং মেঘাচ্ছন্নতার কারণে সমুদ্রের তলদেশে এমন অন্ধকার সৃষ্টি হয় যে, মানুষ ঠিকমতো তার হাতও দেখতে পায় না।[৩]

কুরআন কাফেরদের অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এই দৃষ্টান্তটিই তুলে ধরেছে। যেমন- সমুদ্রের বুকে তরঙ্গের-ওপর-তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে। আকাশেও ঘন কালো মেঘ জমেছে। এ অবস্থায় যদি কেউ নিজের হাত বের করে দেখতে চায়, সে কখনও তা দেখতে পাবে না। কেন?

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

'যার জন্য আল্লাহ কোনো নূর রাখেননি, তার জন্য কোনো নূরই নেই।'[৪]

সম্পর্কের মর্যাদা

সম্মানিত সুধী! যদি আল্লাহ তা'আলা এতটুকু বলে দিতেন যে, 'আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু' তো কথা অর্থগতভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু তিনি

১. সূরা তাগাবুন : ২

২. সূরা তাগাবুন : ২

৩. সূরা নূর : ৪০

৪. সূরা নূর : ৪০

এর সঙ্গে আরও একটু কথা সংযুক্ত করেছেন, যার দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি বলেন,

يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ

'আল্লাহ ঈমানদারদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান।'[১]

যেহেতু তিনি মুমিনদের অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতায় পড়ে থাকা পছন্দ করেন না, তাই কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ

'এটি এমন কিতাব, যা আমি আপনার ওপর নাযিল করেছি, যেন আপনি মানুষদের বের করেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।'[২]

অর্থাৎ– কুরআনে কারীম এমন কিতাব, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে যায়। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত যেসব বান্দাদের ভালোবাসেন, তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। এই আলো একমাত্র ঈমানদারদের নসিব হয়। কালেমা পাঠ করার দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন এক মুরীদের কোনো আত্মীয় একবার খুব অসুস্থ হয়ে গেল এবং প্রায় মৃত্যুশয্যায় পড়ে গেল। মুরীদ আমাকে খুব অনুরোধ করল, হযরত! দয়া করে শেষ সময়ে একটু তার পাশে থাকুন। হয়তো শেষ মুহূর্তে তার ভিতরে পরিবর্তন আসবে। হযরত বলেন, 'আমি সেখানে গেলাম। দীর্ঘক্ষণ ধরে তার ওপর তাওয়াজ্জুহ দিলাম। কিন্তু তার অন্তরের অন্ধকারে কোনো ধরনের পরিবর্তন হলো না। আমি খুবই আশ্চর্য হলাম, এমন তো কখনও হয়নি! ইতিপূর্বে যখনই আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে কারো ওপর তাওয়াজ্জুহ দিয়েছি, তখন আল্লাহর সাহায্য পেয়েছি এবং সালেকীনের (মুরীদের) অন্তরের অন্ধকার দূর হয়েছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য লাগল, এত তাওয়াজ্জুহ দেওয়ার পরও তার অন্তরে কোনো প্রভাব হলো না! তারপর নিজের অজান্তেই আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগ দিলাম। তখন অন্তরে

---

১. সূরা বাকারা : ২৫৭

২. সূরা ইবরাহীম : ১

ভাব (ইল্‌কা) এল, আপনার তাওয়াজ্জুহে তার অন্তরের অন্ধকার দূর হবে না। কারণ, কাফেরদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কাফেরদের আন্তরিকভাবে ভালোবাসার কারণে তার হৃদয়ে এমন ঘোর অন্ধকার জমেছে যে, কালের মুজাদ্দিদের বারবার তাওয়াজ্জুহেও তা দূর হবে না।

বিশ্বাসের ত্রুটি

হযরত খাজা ফজলে আলী কুরাইশী (রহ.)-এর খলীফাদের মধ্যে হযরত খাজা আহমদ সাঈদ (রহ.) পূর্ব আহমাদপুরে বসবাস করতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, আমি কখনও-কখনও মুরীদদের অন্তরের ওপর তাওয়াজ্জুহ দেই এবং তার প্রভাব অনুভব করি। কিন্তু কিছু লোক এমনও পাওয়া যায়, যাদের অন্তরের সঙ্গে তাওয়াজ্জুহের ফয়েজ ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে এবং আমার কানে আওয়াজ আসে, আমার জন্য এই অন্তরে স্থান নেই। যখন খুব ভালোভাবে যাচাই করলাম, তখন জানতে পারলাম, লোকটা বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির শিকার।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে নিসবতের মর্যাদা

কারো সঙ্গে যার গভীর সম্পর্ক ও নিসবত থাকে, সে ওই সম্পর্কের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করে। একবার চরম দুর্ভিক্ষের সময় এক ছেলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট কিছু খাদ্যের জন্য এসেছিল। তিনি তাকে খাদ্য দিলেন। পরে ছেলেটি তাকে কী যেন বলল। তাতে তিনি প্রচণ্ড খুশি হয়ে আরও খাদ্য দিলেন। এ ছাড়া আরও অনেক হাদিয়া-তোহফাও দিলেন। আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে প্রিয় পয়গম্বর! আপনি এই ছেলেটাকে এত সম্মান কেন করলেন? তিনি আরজ করলেন, হে দয়াময়! আমি প্রথমে তাকে ততটুকুই দিয়েছিলাম, যতটুকুর সে প্রাপ্য ছিল। কিন্তু সে আমাকে বলল, আমি সেই ছেলে, যে শিশু অবস্থায় আপনার চারিত্রিক পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছিলাম। এ কথা শুনে আমার অন্তরে তার প্রতি মহব্বত উথলে উঠল। আমার দুর্দিনে যে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল, আজ সে অসহায়ত্বে হাত মেলে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে; আমি কিভাবে তার সঙ্গে অকৃতজ্ঞতা করব? তাই হে দয়াময়! আমি তাকে পুরস্কৃত করেছি। আমি আমার অধিকৃত সম্পদ থেকে তাকে মন ভরে দান করেছি।

তারপর পুনরায় ওহী এল, হে পয়াগম্বর! যে আপনার পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছিল, আপনি তাকে এত কিছু দিয়েছেন; আপনি আপনার শান অনুযায়ী

তাকে দিয়েছেন। মনে রাখবেন, যে বান্দা দুনিয়াতে আমার মাবুদ হওয়া সাক্ষ্য দেবে, আমার রব হওয়ার সাক্ষ্য দেবে, যে দিন সে কেয়ামতের মাঠে আমার সামনে উপস্থিত হবে, তখন আমিও তাকে এমন কিছু দেব, যা আমার শান ও মর্যাদা অনুযায়ী হবে। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহর দাসীর ওপর দয়া : ক্ষমার বদলে ক্ষমা

একব্যক্তির স্ত্রী কোনো একটা ভুল-ভ্রান্তি করে ফেলল। সে কোনো একটা জিনিস নষ্ট করে ফেলল। স্বামী চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারত। কারণ, এই অধিকার স্বামীর আছে। তারপরও সে ভাবল, বেচারী তো আমারই স্ত্রী। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে; তাকে আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দেই এবং সে ক্ষমা করে দিল। কিছুদিন পর তার মৃত্যু হলো। কোনো ঘনিষ্টজনের সঙ্গে স্বপ্নে তার সাক্ষাৎ হলো। জিজ্ঞাসা করল, কী খবর তোমার? কবরে তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হলো? সে উত্তর দিল, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার সঙ্গে খুবই ক্ষমাশীল আচরণ করেছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, ক্ষমাশীল আচরণ কেমন? সে উত্তর দিল, একবার আমার স্ত্রী কোনো এক বিষয়ে আমার ক্ষতি করে ফেলেছিল। আমি চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারতাম। কিন্তু আমি তাকে শুধু আল্লাহর বান্দী হিসেবে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। মৃত্যুর পর আল্লাহ আমাকে বললেন, তুমি দুনিয়াতে তোমার স্ত্রীকে আমার বান্দী মনে করে ক্ষমা করে দিয়েছিলে; যাও আজ আমিও তোমাকে আমার বান্দা মনে করে ক্ষমা করে দিলাম। ক্ষমার বদলে ক্ষমা।

সম্পর্কের মূল্য ও মর্যাদা

যারা ঈমানদার, আল্লাহর সঙ্গে তাদের একটা সুসম্পর্ক আছে। আর সেই সম্পর্কের গুরুত্ব ও মূল্য আল্লাহর দরবারে অপরিসীম। সব মানুষই তো আল্লাহর বান্দা। কিন্তু যেলোক কালেমা পাঠ করে ঈমান আনল, সে আল্লাহর সঙ্গে ঈমানের সম্পর্ক স্থাপন করল।

সম্পর্কের কারণে মর্যাদার পার্থক্য

দুটা ইট একই ভাটিতে পোড়ানো হয়েছে। একলোক এসে ইটদুটা নিয়ে গেল। একটা ইট লাগাল মসজিদের ফ্লোরে অপরটা লাগাল টয়লেটে। দেখুন, ইটদুটা দেখতে একই রকম, বানিয়েছে একই ব্যক্তি, মূল্যও এক, স্থাপনকারীও একজনই; কিন্তু একটার সম্পর্ক মসজিদের সাথে হয়ে গেছে

আর অপরটার সম্পর্ক হয়ে গেছে টয়লেটের সঙ্গে। যে ইটের সম্পর্ক টয়লেটের সঙ্গে হয়েছে, তার ওপর আমরা খালি পায়ে দাঁড়ানোও পছন্দ করব না। আর যার সম্পর্ক আল্লাহর ঘরের সঙ্গে হয়েছে, তার কী মর্যাদা যে তার ওপর আমরা কপাল রেখে সিজদা করি। উভয় ইটের মর্যাদার মধ্যে এই পার্থক্য কেন হলো? জিনিস তো একই ছিল, দামও তো ছিল এক। আবার উভয়ের ব্যবহারও হয়েছে একইভাবে। কিন্তু সম্পর্ক ও স্থানের ব্যবধানে মর্যাদায় ব্যবধান হয়ে গেছে।

কুরআনে কারীমের মলাটের মর্যাদা

ফুকাহায়ে কেরাম মাসআলা লিখেছেন, যদি কুরআনে কারীমের উপর কোনো কাগজের কিংবা চামড়ার ঢাল লাগানো হয় এবং ভালোভাবে সেঁটে দেওয়া বা সেলাই করার কারণে তা এখন কুরআনের অংশ হয়ে যায়, তাহলে কুরআনের কাগজকে যেমন ওযু ব্যতীত স্পর্শ করা যাবে না, তদ্রূপ সেই ঢালকেও ওযু ব্যতীত স্পর্শ করা যাবে না। কেউ যদি বলে, কুরআন তো কাগজে লেখা – মলাটে নয়; মলাট ভিন্ন জিনিস, কাগজ ভিন্ন জিনিস। তো এর উত্তরে তারা বলেন, ঢাল অবশ্যই কুরআনের অংশ ছিল না, বরং ভিন্ন জিনিসই ছিল। কিন্তু সেলাই করার পর এটি যখন কুরআনের সঙ্গে সেঁটে গেছে, তো এবার সে কুরআনের অংশ হয়ে গেছে। সংশ্রবের কারণে আল্লাহ মলাটকেও সেই মর্যাদা দান করেছেন, যা কুরআনের মর্যাদা। আজ আমাদের জন্য বিনাওযুতে সেই মলাট স্পর্শ করা হারাম।

স্বজাতির প্রতি হযরত ঈসা (আ.)- এর ভালোবাসা

হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের জলীলুল কদর একজন নবী ছিলেন। হাশরের মাঠে যখন তার কওমকে হিসাবের জন্য ডাকা হবে, তখন আল্লাহ বলবেন, এই খ্রিস্টানরা তোমার স্বজাতি। এরা বলে, আমাদের পয়গম্বর আমাদেরকে বলেছেন,–

اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ

‘আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে নাও, মাবুদ বানিয়ে নাও।’[১]

---

১. সূরা মায়েদা : ১১৬

তখন হযরত ঈসা আ. সত্য-সত্য বলবেন, হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে এমনটা বলিনি। তারপর যা বলবেন, তা আরও আশ্চর্যজনক। বলবেন,

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ

'হে আল্লাহ যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, দিতে পারেন; তারা তো আপনারই বান্দা।'[১]

সুবহানাল্লাহ! চিন্তা করে দেখুন, তিনি এত কিছুর পরও এ কথা বললেন না, হে আল্লাহ! এরা মিথ্যাবাদী, এদের ধ্বংস করে দিন। কারণ, এরা তো নিজের উম্মতই ছিল। যদিও গুনাহ করেছে, পাপ করেছে, কিন্তু তারপরও নিজের উম্মত বলেই এত মায়া করেছেন। তারপর বলেন,

وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ

'হে আল্লাহ! যদি আপনি এদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে এরা তো আপনারই বান্দা; আপনি মহা ক্ষমতাবান, অত্যন্ত হেকমত ও রহমতওয়ালা।'[২]

হযরত আলী (রাযি.)-এর মূল্যবান উক্তি

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত ঈমানের সম্পর্ককে খুব মহব্বত করেন। এ কারণেই হযরত আলী (রাযি.) ইরশাদ করেন, হে আল্লাহ! আমার জন্য এই সম্মানই যথেষ্ট যে, আপনি আমার প্রতিপালক, আমার জন্য এটি অনেক বড় গৌরবের বিষয় যে, আমি আপনার বান্দা, আপনার দাস। সুবহানাল্লাহ! চিন্তা করুন, কথা কত সাদাসিধা! অথচ এতে যেন মহব্বতের ঢেউ খেলছে।

ঈমানদারদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সওদা

ঈমানদাররা কালেমার বরকতে এমন মর্যাদা লাভ করেছে যে, স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

'আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে ঈমানদারদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।'[১]

---

১. সূরা মায়েদা : ১১৮

২. সূরা মায়েদা : ১১৮

সুবহানাল্লাহ! তিনি নিজেই এই ক্রয় বিক্রয়য়ের কথা আলোচনা করেছেন। বান্দা তো কালিমা পাঠ করে ঈমানদারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল আর বাকি চুক্তি আল্লাহ নিজেই সম্পাদন করলেন। কবি বলেন,

جب تک بکے نہ تھے کوئی پچھتا نہ تھا * تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا.

'এ কারণেই আল্লাহওয়ালারা 'আল্লাহ' নামের মালা গলায় পরে চলতে থাকে আর আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ায় তাদের সম্মানিত করেন।'

সর্বোত্তম যুগ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

'সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ। তারপর তৎসংলগ্ন পরবর্তী যুগ। তারপর তৎসংলগ্ন পরবর্তী যুগ।'

তো নবীজির সঙ্গে তাঁর যুগের একটি সম্পর্ক হয়েছে, যার কারণে অন্যান্য যুগের ওপর সেই যুগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- কতক মুফাসসির বলেছেন, وَالْعَصْرِ বলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলের যুগের কসম খেয়েছিলেন। নবীজির হায়াতের কসম খেয়েছেন لَعَمْرُكَ হে প্রিয়নবী! আপনার হায়াতের কসম। এমনিভাবে لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ আমি এ শহরের কসম খাচ্ছি। وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ এমতাবস্থায় যে, আপনি এ শহরে বসবাস করছেন।

এ স্থানগুলো নিয়ে আল্লাহ তা'আলার কসম খাওয়ার কারণ এই যে, নবীজির সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণে এই স্থানগুলোও মর্যাদাবান হয়ে গেছে। তো সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাকীম তিরমিযী (রহ.)- এর শিক্ষণীয় ঘটনা

হাকীম তিরমিযী (রহ.)কে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার হেকমতও দান করেছিলেন। তিনি তিরমিযের অধিবাসী ছিলেন। আমু দরিয়ার অববাহিকায় আজও তিনি চিরশায়িত আছেন। এই অধম তাঁর মাযার যেয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তিনি তাঁর যুগের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছও ছিলেন আবার চিকিৎসকও ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন আকর্ষণীয় রূপ-

---

১. সূরা তাওবা : ১১১

সৌন্দর্য দান করেছেন যে, দেখেই তাঁর প্রতি যে কেউ আকৃষ্ট হয়ে যেত। সঙ্গে-সঙ্গে চরিত্রমাধুর্যেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজ অঞ্চলে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় করেছিলেন।

তিনি যৌবনে একদিন তাঁর চিকিৎসাকেন্দ্রে বসা ছিলেন। হঠাৎ একজন নারী এসে তাঁর সামনে নিজের চেহারা খুলে বসে পড়ল। দেখতে সে খুবই সুন্দরী ছিল। বলল, বহুদিন আমি সুযোগটার সন্ধানে ছিলাম; আজ পেয়েছি। আমার বড় ইচ্ছা, আপনার মাধ্যমে আমি আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করব; আপনি দয়া করে নিষেধ করবেন না।

ইমাম তিরমিযীর (রহ.) অন্তর তখন আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠল। এমন কুপ্রস্তাব শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্নার অবস্থা এমন ছিল যে, সেই নারী লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। তারপর বহু বছর পেরিয়ে গেল। তিনিও বিষয়টি ভুলে গেলেন। বহু বছর পর যখন তাঁর চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গেল এবং ডাক্তারী পেশাও ছেড়ে দিলেন, তখন একদিন নামাযের মুসল্লায় সেই নারীর কথা মনে পড়ল। মনে-মনে বললেন, সেদিন ইচ্ছা করলে সেই নারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারতাম; কোনো বাধা ছিল না। এখন তাওবা করে নিতাম; কী হতো?

এ অনুভূতি মনে আসার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আবার কাঁদতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন, হে দয়াময়! যৌবনে মনে গুনাহের ইচ্ছা জাগতেই এমন কান্না আসত যে, তা দেখে একজন নারী পর্যন্ত লজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। আজ এই বার্ধক্যে এসে আমার এত অধঃপতন হলো যে, গুনাহের চিন্তা মনে জাগতে শুরু করেছে! এভাবে কাঁদতে-কাঁদতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আল্লাহর কী মহিমা! স্বপ্নে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ পেলেন। নবীজি জিজ্ঞাস করলেন, হাকীম তিরমিযী! কেন কাঁদছ, কী হয়েছে তোমার? তিনি উত্তরে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন যৌবন ছিল, শক্তি-সামর্থ্য সব ছিল, তখন খোদাভীতি এত বেশি ছিল যে, গুনাহের নাম শোনামাত্র অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকতাম। একজন নারী পর্যন্ত আমার কান্না দেখে লজ্জিত হয়ে ফিরে গিয়েছিল। আজ আমি বৃদ্ধ। চুলদাড়ি সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। সামনে মৃত্যুর কঠিন বিপদ। কিন্তু আমার মন এতটাই কালো হয়ে গেছে যে, সেখানে এখন গুনাহের বাসনা জাগছে! যৌবনের কোনো এক কুলটা নারীর কথা বারবার মনে পড়ছে। এই অধঃপতন দেখে আমার কান্না পাচ্ছে, বড় বেশি অস্থিরতা অনুভব করছি।

নবীজি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এটা তোমার অধঃপতনের কিছুই নয়। প্রকৃত ব্যাপার হলো, যখন তোমার যৌবন ছিল, সে যুগটি ছিল আমার যুগের অনেক নিকটবর্তী, নবী যুগের নৈকট্যের বরকতে তোমার আত্মিক অবস্থা অনেক ভালো ছিল। পাপের কল্পনাও মনে জাগত না। আর এখন তুমি বৃদ্ধ হয়েছ। আমার যুগ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছ। তাই এখন পাপের কল্পনা মনে জেগে ওঠে। এ নিয়ে এত অস্থির হওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহর দিকে মন ফিরাও। তিনি বড়ই দয়াবান ও করুণাময়।

বুযুর্গানে দীনের নিকট সম্পর্কের মাহাত্ম

আমাদের সালফে সালেহীন ও বুযুর্গানে দীনের নিকট সম্পর্কের গুরুত্ব ও মাহাত্ম অনেক বেশি ছিল। তারা এর অনেক কদর করতেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

এক বুযুর্গের সামনে দস্তারখানায় যখনই রুটি রাখা হতো, তিনি প্রথমে ঠাণ্ডা রুটিগুলো খেয়ে পরে গরমগুলো খেতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত! ঠাণ্ডা-গরম উভয় রকমের রুটিই তো আপনার সামনে রাখা থাকে। গরম রুটির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি থাকে। কারণ, গরম রুটি খেতে যেমন নরম, তেমন সুস্বাদু। আর ঠাণ্ডা রুটি তো ঠাণ্ডাই হয়ে গেছে; একে বরং পরে খাওয়াই উত্তম। কিন্তু আপনি ঠাণ্ডা রুটিকেই কেন প্রথমে গ্রহণ করেন?

আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টি কোথায় দেখুন। তিনি বললেন, দেখো ঠাণ্ডা-গরম উভয় ধরনের রুটিই তো আমার সামনে থাকে; কিন্তু উভয়ের মাঝে খানিক পার্থক্যও আছে। ঠাণ্ডা রুটিকে তাওয়ায় আগে সেঁক দেওয়া হয়েছে এবং গরম রুটিকে সেঁক দেওয়া হয়েছে পরে। সুতরাং গরম রুটির তুলনায় ঠাণ্ডা রুটি কিছুক্ষণের জন্য হলেও নবীযুগের নিকটবর্তী হওয়ার সৌভাগ্যময় নিসবত অর্জন করেছে। আর গরম রুটি সেই তুলনায় দূরবর্তী সময়ে অবস্থান করেছে। সুতরাং যে রুটির সঙ্গে নবীযুগের নিকটবর্তী হওয়ার নিসবত লেগে আছে, তাকে আগে এবং পরের নেসবতওয়ালাকে পরে গ্রহণ করি।

সুবহানাল্লাহ! চিন্তা করুন। দস্তারখানায় বসে এমন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বিষয়গুলো পর্যন্ত তাদের দৃষ্টির আড়ালে যেত না। সেখানেও তারা সম্পর্ক ও নেসবতের মূল্যায়ন করেন।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে নেসবতের মর্যাদা

হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর খেলাফতের যুগে নিজের বড় ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর জন্য মাসিক বেতন (বাইতুল মালের পক্ষ

হতে প্রদত্ত রেশন) পরিমাণে কম আর হযরত উসামা ইবনে যাইদ (রাযি.)-এর বেতন বেশি নির্ধারণ করেছিলেন। উসামা (রাযি.)-এর পিতা হযরত যাইদ (রাযি.) ছিলেন নবীজির পালকপুত্র। মাসিক বেতনের নির্ধারিত পরিমাণ যখন ঘোষণা করা হলো, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, আব্বাজান! ইল্‌ম ও মেধা তো আল্লাহ তা'আলা আমাকে বেশি দিয়েছেন। অথচ উসামার বেতন আমার চেয়ে বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। উত্তরে হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, শোনো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার চেয়ে উসামাকে বেশি ভালোবাসতেন। এমনিভাবে উসামার পিতাকে তোমার পিতার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। এ কারণেই আমি উসামার বেতন বেশি নির্ধারণ করেছি। আল্লাহু আকবার।

জুনাইদ বাগদাদীর নেসবতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) নিজযুগের একজন শ্রেষ্ঠ পাহলোয়ান ছিলেন। শাহী পাহলোয়ান হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। বাদশা ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, যে ব্যক্তি আমাদের শাহী পাহলোয়ানকে পরাস্ত করতে পারবে, তাকে বিপুল পরিমাণে পুরস্কৃত করা হবে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের একলোক অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ও দুর্বল ছিল। দরিদ্রতার কষাঘাতে ছিল জর্জরিত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়ার কারণে কারো সামনে হাত পাতা কিংবা কোনো সুওয়াল করাও পছন্দ করতেন না। সে শাহী ঘোষণা শুনল, 'শাহী পাহলোয়ান জুনাইদকে যে পরাস্ত করতে পারবে, তাকে বিপুল পরিমাণে পুরস্কৃত করা হবে।' ভদ্রলোক ভাবল, জুনাইদকে তো যুগের রুস্তম মনে করা হয়। আমি তো তাকে পরাস্ত করতে পারব না। কারণ, আমি দুর্বল, শীর্ণ ও হতদরিদ্র। সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়ার কারণে কারো কাছে কিছু চাইতেও লজ্জা লাগে। তবে সাহস করে একটি কৌশল খাটিয়ে দেখি কাজে লাগে কি-না! তিনি জুনাইদ পাহলোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়ার ঘোষণা দিয়ে দিলেন। বাদশা তাকে দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। বললেন, এ লড়াইয়ে তুমি জিততে পারবে না। তুমি অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, না, ইনশাআল্লাহ আমিই জিতব।

কুস্তি লড়ার জন্য স্থান ও সময় নির্ধারিত হলো। যখন উভয় লড়াকু মুখোমুখি হলো, তখন দুর্বল লোকটি জুনাইদ পাহলোয়ানকে লক্ষ করে বলল, 'জুনাইদ! তুমি যুগের রুস্তম! তোমার অনেক সম্মান আছে! অনেক টাকা পয়সা আছে। বাদশাও তোমার প্রতি উদার। কিন্তু আমাকে একটু দেখে

নাও! দরিদ্রতা আমার শক্তি-সামর্থ্য সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। আমার ঘরে বহু দিন যাবত পেটভরে খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা হয় না। সম্ভ্রান্ত বলে কারও কাছে হাতও পাতা সম্ভব হচ্ছে না। তুমি যদি আজ আমার হাতে পরাস্ত হও, তাহলে সাময়িকভাবে অপমানিত হবে ঠিক; কিন্তু তোমার এ অনুগ্রহে আমার ঘরের অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। দেখো জুনাইদ! আমার প্রতি রহম করতে পার কি-না!

কিছুক্ষণ পর লড়াই শুরু হলো। জুনাইদ কী করবে ভেবে স্থির করতে পারছে না। চাইলে মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে তুলে তাকে ধূলিলুণ্ঠিত করে দিতে পারে। কিন্তু সে তো নবীপরিবারের দোহাই দিয়ে করুণা চেয়েছে। নবীজির সম্পর্কের দোহাই কোনো সাধারণ বিষয় নয়। জুনাইদের অন্তর ঘুরে গেল। সে মনে-মনে বলল, হে শাহী পাহলোয়ান জুনাইদ! এ মুহূর্তে মান-সম্মানের কথা ভুলে যাও। নবীজির সম্পর্কের প্রতি সম্মান দেখাও, তোমাকে আল্লাহ ইয্যত দান করবেন। আর সেটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারপর কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর জুনাইদ নিজেই চিত হয়ে পড়ে গেল আর দুর্বল লোকটি তার বুকের উপর চেপে বসল এবং চিৎকার করে বলতে লাগল, আমি জুনাইদকে পরাস্ত করেছি।

বাদশা কুস্তির এই ফলাফল কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর বিশ্বাস, কিছু একটা কারণ অবশ্যই এখানে লুকিয়ে আছে। তাই তিনি ঘোষণা দিলেন, দ্বিতীয়বার কুস্তি লড়া হোক। বাদশার কথামতো দ্বিতীয়বার লড়াই হলো। জুনাইদ সামান্য ধস্তাধস্তি করে নিজেই চিত হয়ে পড়ে গেল এবং দুর্বল লোকটিকে নিজের বুকের ওপর উঠিয়ে নিল। ফলাফল হলো, জুনাইদ হেলে গেল। দুর্বল লোকটি পুরস্কার নিয়ে বীরদর্পে ময়দান ত্যাগ করল। বাদশা জুনাইদকে অনেক বকাঝকা করলেন। এমনকি একথাও বললেন যে, মন চায় জুতার মালা পরিয়ে তোমাকে পুরো শহরে ঘোরাই। তুমি দুর্বল একটা লোকের কাছে পরাজিত হয়েছ!

জুনাইদ সাময়িক অপমান সয়ে গেল। ঘরে ফিরে স্ত্রীকে সবকিছু খুলে বললে সেও হতবাক হয়ে গেল। পরিবারের সবাই পেরেশান হয়ে গেল। সবার মুখে একটা-ই কথা, এত দিনের সুখ্যাতি তুমি একজনের জন্য মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে? ! কিন্তু জুনাইদের মন ছিল স্থির ও প্রশান্ত।

জুনাইদ রাতে যখন ঘুমাল, তখন দোজাহানের বাদশা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে স্বপ্নে তার যেয়ারত হলো। তিনি বললেন,

জুনাইদ! তুমি আমার জন্য এইঅপমান সহ্য করেছ। মনে রেখো, আমি তোমার সম্মানের ডংকা সারা দুনিয়ায় বাজিয়ে দিব।

পরবর্তী কালে তা-ই হলো। পাহলোয়ান জুনাইদ – যে শুধু শারীরিক জগতের পাহলোয়ান ছিল – আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রূহানী জগতের পাহলোয়ান বানিয়ে দিলেন। আজ তাসাওউফ জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) নামে যাঁকে সারা পৃথিবী জানে, তিনি আর কেউ নন, সেদিনের পরাজিত সেই জুনাইদ পাহলোয়ান। যেখানেই তাসাওউফের কথা হয়, সেখানেই জুনাইদের আলোচনা আসে।

ছাহেবে নেসবতের হাদিয়ার প্রতি মর্যাদা

দুজন বুযুর্গ ছিলেন ছাহেবে নেসবত। পরস্পরে মহব্বতও ছিল সুগভীর। একবার একজন অপরজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার মনস্থ করলেন। চিন্তা করলেন, কিছু একটা হাদিয়া নিয়ে যাই। কারণ, হাদীছে আছে, 'তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও; তাহলে মহব্বত বাড়বে।' কিন্তু কী নিয়ে যাব; আমার কাছে তো কিছুই নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে চলে গেলেন জঙ্গলে। কিছু কাঠ কেটে বোঁচকা বেঁধে মাথায় তুললেন। সোজা চলে গেলেন বুযুর্গের বাড়ি। কাঠের গাট্টি দিয়ে বললেন, হাদিয়া এনেছি আপনার জন্য! তিনি হাসিমুখে তা গ্রহণ করে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। পরিবারের লোকদের ওসিয়ত করলেন, এ কাঠগুলো একজন ছাহেবে নেসবত বুযুর্গের হাদিয়া। এগুলো যত্ন করে রাখো। আমার মৃত্যুর পর আমার গোসলের জন্য যে পানি গরম করা হবে, তা যেন এ কাঠের আগুনে গরম করা হয়।

তাসাওউফের উদ্দেশ্য

তাসাওউফের মধ্যেও একধরনের নেসবত আছে। এটি এক ধরনের নূর, যা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। মানুষ যখন শরীয়তের বিধি বিধানের ওপর দৃঢ়তার সাথে আমল করে, তখন এই নেসবত তার নসিব হয়। স্মরণ রাখবেন, তাসাওউফের উদ্দেশ্য রং দেখানো নয়। কোনো কাশ্‌ফ অর্জন করা নয়, কারামত অর্জন করা নয় কিংবা মামলা-মকদ্দমায় বিজয়ী হওয়া নয়, নয় কোনো দু'আ কবুল হওয়া অথবা নামাযে বিশেষ হালত সৃষ্টি হওয়া। বরং তাসাওউফের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, শরীয়তের বিধিবিধানের ওপর দৃঢ়তার সাথে আমল করার তাওফীক নসিব হওয়া। এ কারণেই বলা হয়,

اَلْاِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكَرَامَةِ

'ইবাদতে দৃঢ়তা কেরামতের চেয়েও মূল্যবান।'

নেসবতের মাকাম : শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর ব্যখ্যা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ্ ফাতহুল কাদীর- এ নেসবতের চারটি প্রকার বর্ণনা করেছেন।

এক. নেসবতে ইনইকাসী : প্রথম নেসবতের নাম 'নেসবতে ইনইকাসী'। এটি সবচেয়ে দুর্বল নেসবত। যখন মুরীদ তার শায়খের সাহচর্যে থাকে, তখন শায়খের অন্তরের অবস্থা তার অন্তরে রেখাপাত করতে থাকে। মুরীদের অন্তরে তখন দুনিয়ার মায়া-মহব্বত কমে যায় এবং আল্লাহর মহব্বত জেগে ওঠে, গুনাহের ইচ্ছা হ্রাস পায়, নেক আমলের আগ্রহ বেড়ে যায়। তবে এসব অবস্থা অস্থায়ী। যখনই মুরীদ শায়খের সাহচর্য থেকে দূরে সরে যায়, তখন ধীরে-ধীরে তার অন্তরের আলো ম্লান হতে থাকে। এ কারণেই মুরীদরা বলে, যখন শায়খের সোহবতে থাকি, তখন অন্তরে এক ভিন্ন রকমের ভাব বিরাজ করে। কিন্তু মজলিস থেকে বের হতেই সেই ভাব ও অবস্থা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কারণ হলো, শায়খের উপস্থিতিতে সেই কাইফিয়াত মুরীদের অন্তরে রেখাপাত করে, যার কারণে মুরীদের অন্তরের এই অবস্থা সৃষ্টি হয়। এ কাইফিয়াতের উদাহরণ এমন যে, কোনো ব্যক্তি যদি আগুনের পাশে বসে, তাহলে তার গায়ে তাপ লাগে, কিন্তু যখন আগুনের কাছ থেকে উঠে যায়, তখন সেই তাপ ধীরে-ধীরে হ্রাস পায়। কারণ, এই তাপ ক্ষণস্থায়ী, যা এক পর্যায়ে শেষ হয়ে যায়। এমনিভাবে কেউ যদি আতর মাখে, তাহলে তার পাশে উপবিষ্ট লোকটি যতক্ষণ পাশে বসা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুবাস পেতে থাকবে। কিন্তু যেইমাত্র উঠে দূরে চলে যাবে, সুবাস পাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। 'নেসবতে ইনইকাসী' একেই বলে।

দুই নেসবতে ইলকায়ী : দ্বিতীয় ধরনের নেসবতকে 'নেসবতে ইলকায়ী' বলে। এটি এমন নেসবত, যা অর্জনের জন্য মুরীদ তার শায়খের সোহবতে এতটুকু সময় অতিবাহিত করে যে, সেই নেসবতের কিছু বরকত মুরীদের অন্তরে জমে যায় এবং অন্তরের অংশে পরিণত হয়।

এর উদাহরণ হলো, যেমন- কোথাও অগ্নিকুণ্ডে অনেক আগুন জ্বলছে। সেখান থেকে কেউ নিজের একটি প্রদীপ জ্বালাল। এবার অগ্নিকুণ্ডেও আগুন

আছে, প্রদীপওয়ালার কাছেও আগুন আছে; তবে প্রদীপের আগুন বড়ই দুর্বল। এর আলোও কম, আবার দুর্বলও। তেল ফুরিয়ে গেলে কিংবা বাতাসের ঝাপ্টা লাগলে নিভে যায়। তো 'নেসবতে ইলকায়ী' একটি দুর্বল নেসবত।

তিন. নেসবতে ইসলাহী : তৃতীয় প্রকারের নেসবত হলো 'নেসবতে ইসলাহী'। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধিমূলক নেসবত। এই নেসবত শায়খের খেদমতে দীর্ঘদিন পার করার পর অর্জিত হয়। নেসবত পাওয়ার জন্য মুরীদ শাইখের সম্মুখে নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন, গোসলদানকারীর হাতে কোনো লাশ পড়ে আছে। শায়খ তাকে কষ্ট-মুজাহাদা করিয়ে, আত্মশুদ্ধির ভাট্টিতে জ্বালিয়ে পাকা-পোক্ত করতে থাকেন। তারপর যে নেসবত অর্জিত হয়, তাকে 'ইসলাহী নেসবত' বলে।

এর উদাহরণ হলো, যেমন- কেউ নদী থেকে একটা খাল কেটে নিজের দিকে নিয়ে এল। এবার বাগানে যদি ছোট-খাট কোনো নাপাকি থাকে, তাহলে এই পানির স্রোতে সেগুলো ভেসে যাবে। যদি খড়কুটো থাকে, তাও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। নেসবতে ইসলাহীও তেমন। এই নেসবতের বরকতে আল্লাহ রব্বুল ইয্যত এমন ব্যক্তিদের সগীরা গুনাহগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন এবং তারা এ জাতীয় পাপসমূহ থেকে আত্মরক্ষার তাওফীক প্রাপ্ত হবে।

নেসবতে ইসলাহীর বরকত : নেসবতে ইসলাহী তথা আত্মশুদ্ধির সম্পর্কের মধ্যে অনেক বরকত নিহিত আছে। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে যে আমিত্ব ও আত্মগৌরববোধ থাকে, তা মিটে যায় এবং সমস্ত খারাপ স্বভাব ভালো স্বভাবে পরিণত হয়।

হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) তাঁর শায়খ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহ.)-এর খেদমতে সময় কাটিয়ে ছিলেন। হযরত হাজী সাহেব তার খুব ভালোভাবে ইসলাহ করেছেন। এমনকি তিনি তাকে নিজের খুব কাছে রেখে সেলসেলায়ে আলিয়া চিশতিয়ার দীক্ষা দিয়েছেন। একবার হযরত হাজী সাহেব দস্তরখানে বসলেন। সঙ্গে হযরত গাঙ্গুহী ও হযরত ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদবাদীও ছিলেন। দস্তারখান বিভিন্ন রকমের বাহারী খাবারে সাজানো। হাজী সাহেব একটা বাটিতে কিছু ডাল ঢেলে একটা রুটি হযরত গাঙ্গুহীর হাতে দিয়ে বললেন, যাও! ওই পিছনে দস্তারখানের কোনায় গিয়ে এগুলো খেয়ে নাও। তারপর নিজে দস্তারখানে বিছানো সুস্বাদু খাবার খেতে লাগলেন।

আজ যদি কোনো পীর তার মুরীদের সঙ্গে এমন করত, তবে পীরের প্রতি সে খারাপ ধারণা করত, এ আবার কেমন পীর? তার মধ্যে মানবতা, ভদ্রতা এবং সৌজন্যবোধটুকু পর্যন্ত নেই। নিজেকে বহু কিছু মনে করে আর অন্যকে মনে করে জীব-জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। এ তো প্রকাশ্য অহঙ্কার! আল্লাহ মালুম আরও কত কী মন্তব্য ভেসে আসত। আরও কত ফতুয়া লেগে যেত। কিন্তু হযরত গাঙ্গুহী ছিলেন প্রকৃত সত্যসন্ধানী। তিনি জানতেন, শায়খের এই আচরণে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো হেকমত লুকায়িত আছে। তাই তিনি নিঃশব্দে উঠে গিয়ে যথাস্থানে বসে খেতে লাগলেন। দস্তারখানে বহু রকমের সুস্বাদু খাবার রাখা আছে হাজী সাহেবের সামনে। তিনি মজা করে খাচ্ছেন। অপর দিকে একটা রুটি আর সামান্য ডাল নিয়ে বসে পড়েছেন গাঙ্গুহী (রহ.)।

খাওয়া চলছে। কিছুক্ষণ পর হাজী সাহেব গাঙ্গুহীকে বললেন, 'মিয়াঁ রশীদ আহমাদ! আমার তো মন চায়, তোমাকে দরজার বাইরে জুতার ওপর বসে খানা খেতে বলি। কিন্তু তোমার প্রতি করুণা করলাম; তাই দস্তারখানের কোনায় বসে খাওয়ার সুযোগ দিলাম।

কথাগুলো বলে তিনি গাঙ্গুহী (রহ.)-এর দিকে তাকালেন। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন, আমি তো আসলে আপনার দরবারের জুতার ওপরও বসার যোগ্য ছিলাম না। এ তো আপনার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, আমার মতো অযোগ্যকে আপনার দস্তারখানের একটা কোনায় বসার সুযোগ দিয়েছেন। হাজী সাহেব তাঁর যোগ্য শিষ্যের দিকে তাকিয়ে উত্তর শুনলেন। দেখলেন, এমন নির্মম কথা শুনেও শিষ্যের চেহারায় কোনো প্রকার উত্তেজনা বা অহংবোধ দেখা গেল না। বরং ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বিনয়ী অভিব্যক্তি। তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! কাজ হয়ে গেছে। এই পরীক্ষার পরই হযরত হাজী সাহেব ভরমজলিসে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)কে খেলাফত দিয়ে দিলেন।

নফ্‌স নামক অজগরটাকে কিভাবে মারতে হবে?

বিভিন্ন মাশায়েখগণের আরও অনেক ধরনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়, যেগুলো দ্বারা তারা মুরীদদের নফসের পরিশুদ্ধি করেছেন। এক শায়খ তাঁর খাদেমকে আদেশ দিলেন, অমুক ব্যক্তির পাশ দিয়ে কোনো দুর্গন্ধযুক্ত আর্বজনা নিয়ে যেয়ো এবং দেখো এতে তার অবস্থা কী হয়। খাদেম আবর্জনার টুকরি নিয়ে যখন সুফী সাহেবের পাশ দিয়ে গেল, দেখল, সুফী

সাহেব নাক উঁচিয়ে মুখ বাঁকিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলন, এই, তুমি দেখছ না, আমি এখানে বসে আছি?

খাদেম শায়খকে সংবাদ জানাল। তিনি বললেন, তান মানে এখনও অনেক কাজ বাকি। কিছুদিন পর আবার খাদেম শায়খের নির্দেশে সেই সুফীর পাশ দিয়ে আবর্জনার টুকরি নিয়ে গেল। কিন্তু সে আজ চুপচাপ বসেই ছিল। কিছু করেনি। অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে। শায়েখ বললেন, এবার একটা কাজ করবে। যখন পাশ দিয়ে যাবে, তখন কিছু ময়লা তার গায়ে ঢেলে দেবে। তারপর কী বলে আমাকে জানাবে। খাদেম আজ যাওয়ার সময় কিছু ময়লা তার গায়ে ঢেলে দিল। সূফী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বলন, তুমি কি দেখছ না, এখানে কেউ আছে কি নেই? খাদেম গিয়ে শায়খকে জানাল। শায়খ বললেন, হু এখনও নফস নামক অজগরটা মরেনি।

মেহনত-মুজাহাদা আরও কিছুদিন চলল। এবার চাকরকে নিদের্শ দিলেন, আগামীতে পুরো ময়লার টুকরটা-ই তার গায়ে ঢেলে দিয়ো। তারপর তার অবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করো।

পরদিন খাদেম সুফী সাহেবের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ময়লার পুরো টুকরিটাই তার গায়ে ঢেলে দিল। সুফী সাহেব দাঁড়িয়ে তার কাপড় পরিষ্কার করতে লাগল আর বলতে লাগল, 'ভাই! আপনার কোনো সমস্যা হয়নি তো? ব্যথা পাননি তো?'

খাদেম শায়েখকে রিপোর্ট জানাল। শায়খ আলহামদুলিল্লাহ পড়ে বললেন, 'এখন নফস নামক অজগরটা মারা পড়েছে। 'আমিত্ব' মিটে গেছে। এখন আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারপরই শায়খ তাকে খেলাফত প্রদান করলেন।

এ জাতীয় মেহনত মুজাহাদা করানোর পর শায়খ যখন কারো পরীক্ষা নেন এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন এই কর্মপন্থাকেই 'ইসলাহী নিসবত' বলে।

একবুযুর্গ কাউকে খেলাফত দেওয়ার পূর্বে বললেন, যাও; এই মুরগিটা এমন স্থানে গিয়ে জবাই করবে, যেখানে কেউ দেখবে না। একই আদেশ আরও কয়েকজন মুরীদকে দিলেন। সবাই মুরগি জবাই করতে চলে গেল। কেউ গাছের আড়ালে জবাই করল। কেউ উঁচু প্রাচীরের আড়ালে। মোটামুটি সবাই মুরগি জবাই করে ফিরে এল। কিন্তু যাকে খেলাফত দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তিনি জীবন্ত মুরগিটা নিয়ে ফিরে এসে কাঁদতে লাগল। পীর সাহেব

বললেন, কী ব্যাপার ভাই! তুমি কাঁদছ কেন? তোমার হাতে মুরগি জীবিত কেন? জবাই করলে না যে? সে বলল, হযরত আপনার আদেশ মান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি; তাই কাঁদছি। পীর সাহেব বললেন, কেন মান্য করতে পারনি? সে বলল, হযরত! আপনি মুরগিটা এমন স্থানে গিয়ে জবাই করতে বলেছেন, যেখানে কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু আমি যেখানেই গিয়েছি, আমার আল্লাহর দৃষ্টির আড়াল হতে পারিনি। ঘরে, জঙ্গলে, গুহায়, নির্জনে যেখানে গিয়েছি, দেখি, আমার আল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাই মুরগিটা জবাই করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পীর সাহেব বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! এই খোদাভীতির পরীক্ষা-ই তো আমার উদ্দেশ্য ছিল। তারপর তিনি তাকে খেলাফত দিয়ে দিলেন।

মুরীদদের পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত মাশায়েখদের বাতেনী দূরদর্শিতা দান করে থাকেন। কখনও-কখনও মুরীদ বলতেই পারে না, তার কোন বিষয়ে পরীক্ষা হচ্ছে। সে তো উদাসীনতার সাথেই নিজের সময় পার করে। কিন্তু শায়খ তা অবশ্যই দেখেন। তার অন্তরের কী অবস্থা, তার খোঁজ রাখেন। যখন অন্তরের পাত্র পরিষ্কার ও নির্মল হয়ে যায় এবং সেখান থেকে আমিত্ব বের হয়ে যায়, তখন শায়খের অন্তরের নূর তার অন্তরে আলো জ্বালে। এমন খেলাফত অনেক বেশি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।

চার. নেসবতে ইত্তেহাদী : নেসবত তথা সম্পর্কের চতুর্থ একটি প্রকার রয়েছে, যার নাম 'নেসবতে ইত্তেহাদী' তথা একাত্মতার সম্পর্ক। এটি সবচেয়ে বেশি কামেল নেসবত। আর এই নেসবতটি অর্জন হয় শায়খের সঙ্গে কামেল মহব্বত ও আত্মনিবেদনের মাধ্যমে। শায়খের সঙ্গে যখন এমন মহব্বত হয়ে যাবে, যেন অন্তর থেকে এ আওয়াজ ভেসে আসে–

من تو شدم تو من شدی * من تن شدم تو جاں شدی

تا کس نہ گوید بعد ازیں * من دیگرم تو دیگری.

'আমি তুমি হয়ে গেলাম আর তুমি আমি হয়ে গেছ। আমি দেহ হলাম তুমি প্রাণ হয়ে গেলে। যেন তারপর আর কেউ বলতে না পারে, আমি অন্য কেউ, তুমি ভিন্ন কেউ।'

শায়খের সঙ্গে যখন মহব্বতের অবস্থা এই মাত্রায় পৌঁছবে, তখন আল্লাহ তা'আলা শায়খের অন্তরের নূরানিয়াত মুরীদের অন্তরে ঢেলে দেন। তারপর

সে হয়ে যায় শায়খের জিন্দা নমুনা। মানুষ সেই মুরীদকে দেখলেই তার শায়খের কথা মনে পড়ে যায়। একেই বলে 'নেসবতে ইত্তিহাদী'। এ জাতীয় নেসবতের উদাহরণ অনেক আছে। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ হলেন সায়্যিদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাযি.)। নবীজির প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের কারণেই তিনি এই নেসবত অর্জন করেছেন।

আবুবকর সিদ্দিক (রাযি.)-এর নেসবতে ইত্তেহাদীর প্রমাণ

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) আমাদের সেলসেলায়ে আলিয়ার প্রাণকেন্দ্র। তাই আসুন, তাঁর কিছু আলোচনা শুনি।

১নং প্রমাণ : হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মধ্যে সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। এক মাহফিলে নবীজি ইরশাদ করলেন, আমি তিনটি জিনিস খুব পছন্দ করি। সিদ্দীকে আকবর শুনেই বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমারও তিনটি জিনিস খুব পছন্দ। তিনি বললেন, কী কী? হযরত সিদ্দীকে আকবর বললেন, এক নম্বরে আপনার নূরানী চেহারার দিকে চেয়ে থাকা। দুই নম্বরে আপনার জন্য আমার সম্পদ খরচ করা এবং তিন নম্বরে আমার কন্যার আপনার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে খেদমত করা।

সুবহানাল্লাহ! কল্পনা করুন, তিনি পছন্দের যে তিনটি জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন, তার প্রত্যেকটিই নবীজিকে কেন্দ্র করে। মুরশিদের অস্তিত্বই তাঁর পছন্দের জিনিস। শায়খকে ভালোবাসার এর চেয়ে আর বড় কোনো উপমা হতে পারে না। এমন মহব্বতই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) অন্তরের তার মুরশিদ দোজাহানের বাদশা হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ছিল। আর এই ইশকে রাসূলেরই কারণে আল্লাহ তাকে 'নেসবতে ইত্তেহাদী' দান করেছেন।

২ নং প্রমাণ : হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا صَبَّ اللهُ فِيْ صَدْرِيْ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ صَبَبْتُه فِيْ صَدْرِ أَبِيْ بَكْرٍ

আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে যা কিছু ঢেলেছেন, আমি তার সবটুকুই আবূবকরের অন্তরে ঢেলে দিয়েছি।

সুবহানাল্লাহ! এটি হলো নেসবতে ইত্তেহাদীর দ্বিতীয় প্রমা।

৩ নং প্রমাণ : একবার হযরত ওমর (রাযি.) স্বপ্নে দেখলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর বৃষ্টি পড়ছে। যেখানে নবীজির কদম

মোবারক, সেখানে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মাথা। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো নবীজির দেহ মোবারক স্পর্শ করে আবুবকর-এর ওপর গড়িয়ে পড়ছে। হযরত ওমর (রাযি.) নিজেকেও তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। হযরত ওমর বললেন, আবূ বকরের গায়ের পানির কিছুটা ছিটে-ফোঁটা আমার গায়েও এসে পড়ছিল। আর আমিও তাতে ভিজতে লাগলাম।

ঘুম থেকে উঠে সকালে নবীজির খেদমতে গিয়ে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি রাতে এ-এ স্বপ্নে দেখেছি। নবীজি ইরশাদ করলেন, ওমর! এ ছিল ইল্‌মে নবুওত (আসমানী ইল্‌ম), যা বৃষ্টির মতো আমার ওপর বর্ষিত হচ্ছিল। আবুবকর যেহেতু আমার সঙ্গে নেসবতে ইত্তেহাদীর সম্পর্ক রাখে, তাই সে আমার কাছ থেকে বেশি বরকত লাভ করছে। আর তার সাথে সম্পর্কের কারণে তুমিও সেখান থেকে কিছু ইল্‌মের অংশীদার হয়েছ।

নবুওতের কামালাত সবচেয়ে বেশি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) অর্জন করেছেন আর বেলায়েতের ইল্‌ম হযরত আলী (রাযি.) সবচেয়ে বেশি অর্জন করেছেন। এ সব হলো কালামাতে নবুওত নেসবতে ইত্তেহাদীর তৃতীয় প্রমাণ।

৪ নং প্রমাণ : আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে একবার সমস্ত সাহাবা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ওমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছে নবীজি কাফেরদের সঙ্গে সন্ধির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেললেন। সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা ইহরাম খুলে ফেলো এবং কুরবানির জন্তুগুলো জবাই করে দাও। তারপর মদীনায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করো। সাহাবায়ে কেরাম সীমাহীন আশ্চর্য হলেন, আরে আমরা তো ওমরার উদ্দেশ্যে এসেছিলাম! এখন ওমরাহ না করে কিভাবে মদীনায় ফিরে যেতে পারি! এ ছাড়া আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, একদিকে নবীজি চরম অপমানজনক শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন অপর দিকে ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে, এটা 'ফাতহুম মুবীন' প্রকাশ্য বিজয়। তখন হযরত ওমর (রাযি.) হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কাফেরদের সকল লজ্জাকর শর্ত মেনে নিলাম না? অথচ তারা আমাদের কোনো শর্তই মেনে নেয়নি? নবীজি বললেন, দেখো ওমর! আল্লাহ তা'আলা একেই 'ফাতহুম মুবীন' (প্রকাশ্য বিজয়) বলেছেন।

হযরত ওমর নীরবে সেখান থেকে উঠে এসে হযরত আবূবকরের নিকট এসে বললেন, আবুবকর! আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের মর্যাদা দান করেননি? আমরা কি তাদের অপমানজনক শর্তগুলো মেনেই সন্ধি করলাম? হযরত আবুবকর উত্তর দিলেন, ওমর বাহ্যিকভাবে তুমি যা দেখছ, আমিও তা-ই দেখছি। কিন্তু একেই আল্লাহ তা'আলা 'ফাতহুম মুবীন' (প্রকাশ্য বিজয়) বলেছেন।

সুবহানাল্লাহ! সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেবল হযরত আবুবকরই ছিলেন এমন ব্যক্তি, যিনি এই সন্ধিকে সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে বুঝতে পেরেছেন। অন্যরা কিছুক্ষণের জন্য তা বুঝতে পারেনি। যখন নবীজি স্বীয় মাথা মুণ্ডিয়ে কুরবানির জন্তু জবেহ করলেন এবং স্বীয় ইহরাম খুলে ফেললেন, তখন অন্য সব সাহাবার অন্তরও খুলে গেল এবং তাঁরা নবীজির অনুকরণ করলেন। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর অন্তর নবীজি বলার সঙ্গে-সঙ্গেই খুলে গিয়েছিল। সবার আগে সর্বপ্রথম। এতেই বোঝা যায়, তিনি 'নেসবতে ইত্তেহাদী'র অধিকারী ছিলেন।

৫ নং প্রমাণ : হিজরতের সময় নবীজির সফরসঙ্গী ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)। মদীনায় প্রবেশ করার সময় মদীনাবাসীর আন্তরিক ভক্তি ও ভালোবাসাসিক্ত অভ্যর্থনায় তারা মুগ্ধ হলেন। ছোট-বড়, আবাল-বৃদ্ধ সকলেই এসেছিল তাকে অভিবাদন জানাতে। তারা দেখল, সামনে একজন এবং পিছনে একজন। উভয়ের হাসি, কথা, চলন-বলন প্রায় একই রকম। তারা হযরত আবুবকরকে পয়গম্বর মনে করে তাকেই সালাম-মুসাহাফা করতে লাগল। তিনি তা করে গেলেন অবলীলায়, যেন নবীজির কষ্ট না হয়। যখন সবাই মুসাহাফা করে বসে পড়ল, তখন নবুওতের সূর্য মজলিসে উদিত হলো। উপস্থিত সবাই দেখল, এতক্ষণ তারা যাকে পয়গম্বর ভাবছিল, সেই আবুবকর উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি চাদর দিয়ে শামিয়ানার মতো করে নবীজিকে ছায়াদানের ব্যবস্থা করলেন। এবার মদীনাবাসী বুঝতে পারল কে নবী আর কে উম্মতী?

জান কুরবান হোক হযরত সিদ্দীকে আকবরের ওপর, তিনি নবীজির সুন্নাতের অনুসরণে এতটাই নিখুঁত ছিলেন যে, মদীনাবাসী পার্থক্য করতে পারেনি, কে গোলাম আর কে মনিব? চলনে-বলনে, পেশাকে-আশাকে উভয়ের মাঝে এতটাই মিল ছিল যে, আসল-নকল পার্থক্য পর্যন্ত করা যাচ্ছিল না।

আবুবকর (রাযি.)-এর ঈমান উম্মতের ঈমানের চেয়ে ভারী

এই 'নেসবতে ইত্তেহাদী'র কারণেই আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কে এত বিশাল মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। নবীজি ইরশাদ করেন,

لَوْ أُتْزِنَ إِيْمَانُ أَبِيْ بَكْرٍ مَعَ إِيْمَانِ أُمَّتِيْ لَرَجَحَ

'যদি আমার পুরো উম্মতের ঈমানকে আবুবকরের ঈমানের সাথে ওজন করা হয়, তাহলে আবূবকরের ঈমান ভারী হবে।'

সুবহানাল্লাহ!

একটি ইল্মী প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে একটি ইল্মী বিষয়ও আলোচনা করে ফেলি। তাহলো, কখনও-কখনও শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন জাগে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ

'যদি আমার পরে কেউ নবী হতো, তাহলে সে হতো ওমর।'

তো নবীজি এখানে হযরত সিদ্দীকে আকবরের (রাযি.) নাম কেন নিলেন না? কারণ, তাঁর ফযিলত ও মর্যাদা তো অনেক বেশি। এ প্রশ্নের উত্তর দারুল উলূম দেওবন্দের সাদরুল মুদারিসীন হযরত মাওলানা ইয়াকূব নানুতবী (রহ.) খুব ভালোভাবেই দিয়েছেন। তিনি বলেন, নবীজি এখানে বলেছেন, 'যদি আমার পরে কেউ নবী হতো'। তিনি বাক্যের মধ্যে بَعْدُ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর আরবি ভাষালঙ্কার অনুযায়ী بَعْدُ শব্দটি غَيْرٌ এর জন্য ব্যবহার হয়, যার অর্থ হচ্ছে অন্য, পর, দূরের লোক ইত্যাদি। তো হযরত আবুবকর (রাযি.)কে তো আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীবের সান্নিধ্য পূর্বে দান করেছেন। কুরআনে তো বহু পূর্বেই إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا বলে তাকে নবীজির সঙ্গী বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি তো আগেও নবীজির সঙ্গে ছিলেন, এখনও আছেন। তাই بَعْدِيْ শব্দের দূরত্ব তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তারপর শব্দের মেসদাক ও উদ্দেশ্য থাকলে, তা কেবল ওমর এর নাম হতে পারে।

নেসবত অর্জন করার উপায়

সম্মানিত উপস্থিতি! নেসবত ও সম্পর্ক স্থাপন করা একটি সহজসাধ্য কাজ। তবে এর জন্য তিনটি কাজ করা আবশ্যক।

এক. ক্ষুধার্ত থাকা। মানুষ যত পেট ভরে আহার করবে, অলসতা ও গাফলত ততটাই তার ওপর চেপে বসবে। আর আজ তো সকল অধঃপতন এই পেট ভরে আহার করার কারণেই। তাসাওউফের যিকির ও মুরাকাবা এ কারণেই কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। আমরা ঢেকুর তুলে আহার করি, পেট ভরে খাই, মজা করে ঘুমাই; তারপর বলি, হযরত! কোনো অবসরই হয় না। ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেন, যেব্যক্তি দু'বেলা পেটভরে আহার করে, সে ক্ষুধা কী জিনিস, ক্ষুধার জ্বালা কেমন জানে না। তাতারখানিয়ায় লেখা আছে, পেটভারে আহারকারী বক্তার নসীহতে যেমন ক্রিয়া থাকে না, তেমনি পেটভরে আহারকারী শ্রোতার মধ্যে তেমন ক্রিয়া হয় না।

দুই. দ্বিতীয় বিষয়টি হলো পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। স্মরণ রাখবেন, নেক কাজ করা সহজ; কিন্তু পাপ থেকে, গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন। আপনি ঘন্টার-পর-ঘন্টা যিকির-মুরাকাবা না-ই করলেন, কিন্তু গুনাহ্ থেকে অবশ্যই আত্মরক্ষা করুন। যে পরিমাণ গুনাহ্ থেকে বাঁচবেন, সেই পরিমাণ আল্লাহর সাথে নেসবত ও সম্পর্কের পথ সুগম হতে থাকবে।

তিন. তৃতীয় বিষয়টি হলো কাউকে কষ্ট না দেওয়া। অহেতুক কাউকে কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

তো এ তিনটি বিষয়কেই এই মাহফিলের সারসংক্ষেপ মনে করুন। যারা এ বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন, তার জন্য নেসবত অর্জন করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা খুবই সহজ হয়ে যায়।

ইসমে আযমের হেফাযতের গল্প

সম্মানিত হাযিরীন! নেসবত অর্জন করার জন্য সর্বপ্রথম নিজের অন্তরকে পবিত্র করে নিন। অন্তর পবিত্র না হলে সেখানে নেসবতের নূর কিভাবে বাকি থাকবে? একটি গল্প শুনুন! একব্যক্তির মনে ইসমে আযম শেখার খুব সখ জাগল। সে তার শায়খকে বলল, হযরত! আমাকে ইসমে আযম শিখিয়ে দিন। শায়খ একটা পাত্রে কিছু রেখে ঢাকনা বন্ধ করে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটি অমুকের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু সাবধান! একে খুলে দেখ না যেন।

সে পাত্রটা নিয়ে গন্তব্যের দিকে ছুটে চলল। পথে তার মাথায় কুবুদ্ধি জাগল। ভাবল, দেখি; এর মধ্যে কী আছে? পাত্রের মুখ খুলতেই একটা ইঁদুর লাফ দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে গেল। যার কাছে পাত্রটা পৌঁছানোর কথা ছিল, তার কাছে পাত্রটা খালি পৌঁছানো হলো। বিষয়টি যখন শায়খ জানলেন, তখন বললেন, কিভাবে ইঁদুরটা পালিয়ে গেল? সে বলল, হযরত! আমি তো শুধু পাত্রটা একটু ফাঁক করে দেখছিলামমাত্র। শায়খ বললেন, তোমাকে তো আমি তা করতে নিষেধ করেছিলাম। এই সামান্য জিনিস যদি হেফাযত করতে না পার, তাহলে ইসমে আযমের মতো এত মহান আমানত কিভাবে হেফাযত করবে?

সারকথা, মাশায়খগণের অন্তরের নূরও কেবল ওই সকল লোকদের দেওয়া হয়, যারা এর মর্যাদা রক্ষা করতে পারে এবং যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে।

নেসবতের জন্য পাত্রের পরিছন্নতা

মুহতারাম হাযিরীন! প্রত্যেক আল্লাহর বান্দাই চায় যে, আমিও নেসবত পেয়ে যাই। কিন্তু নেসবতের জন্য প্রথমে পাত্রটা পরিষ্কার-পরিছন্ন করে নাও। যদি কেউ একটা অপরিষ্কার পাত্র আপনার হাতে দিয়ে বলে, নিন জনাব! এতে দুধ ঢেলে দিন, তাহলে আপনার বিবেক আপনাকে বাধা দিয়ে বলবে না, এমন অপরিষ্কার পাত্রে দুধ ঢালা ঠিক হবে না? আপনি কি তখন বলবেন না, এই পাত্রে দুধ ঢালা মানে দুধ নষ্ট করা। এটা গর্হিত কাজ। তো যেভাবে অপরিছন্ন পাত্রে দুধ ঢালা যায় না, তদ্রূপ অপরিষ্কার অন্তরেও নেসবতের নূর ঢালা যায় না। গুনাহের কারণে যে অন্তর অপবিত্র হয়ে যায়, তা নেসবত পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এর জন্য অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হয়, মেহনত-মুজাহাদা করতে হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ পাওয়া যায়। আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোশ আসে। তার অন্তরের পাত্র ভরিয়ে দেয়। স্মরণ রাখবেন, যে ঘরে কোনো ছবি লাগানো থাকে, সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবেন না। যে অন্তরে গাইরুল্লাহর ছবি আঁকা থাকে, বলুন তো সেখানে আল্লাহর রহমতের তাজ্জালি কিভাবে পড়তে পারে?

এ কারণে প্রথমে অন্তরগুলোকে পরিষ্কার করে পুত-পবিত্র করে নিন। আপনার কাজ অন্তর পরিষ্কার করে নেওয়া আর আল্লাহর কাজ নেসবত ঢেলে দেওয়া।

শায়খ একজন ডাকপিয়নের মতো

যদি আপনি অন্তর পরিষ্কার করে নেন, তাহলে আপনার শায়খ আপনার নেসবত আটকে রাখতে পারবেন না। আর যদি কোনো শায়খ নেসবত পাওয়ার উপযুক্ত কাউকে পাওয়া সত্ত্বেও তাকে নেসবত প্রদান না করেন, তাহলে এমন শায়খের নেসবত রহিত করা হবে। বহুবার এমন হয়েছে যে, কোনো শায়খ কারো ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া সত্ত্বেও যখন নেসবত প্রদান করেননি, তখন তাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে, 'এই নেসবত একটি মূল্যবান আমানত, এটি তোমার ঘরের কোনো বস্তু নয় যে, যেমন খুশি ব্যবহার করবে।

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَ.

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতকে তার উপযুক্ত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।'[১]

সুতরাং এই নেসবত একটি আমানত। আর শায়খের ভূমিকা হলো ডাকপিয়নের মতো। আপনি আপনার অন্তরকে মেহনত-মুজাহাদা, আগ্রহ-তলব, বিনয়-বিনম্রতা ও লিল্লাহিয়্যাত দ্বারা পরিষ্কার করে নিন। তারপর দেখবেন, আল্লাহ তা'আলা শায়খের অন্তরে ওই কাইফিয়্যাত ঢেলে দেবেন, যার দ্বারা আল্লাহর বান্দার অন্তর আলোকিত হয়ে নেসবতের উপযোগী হয়ে যাবে। তারপর দেখবেন, তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা গোটা দুনিয়াকে আলোকিত করবেন।

উপসংহার

আজ নেসবত পাওয়ার জন্য তো বহু লোক আছেন। কিন্তু নেসবতকে ধারণ করার জন্য অন্তর প্রস্তুতকারীদের সংখ্যা নিতান্তই কম। পুরো পৃথিবী সফর করে দেখুন; এমন কামেল লোকের দেখা পাওয়া খুবই কঠিন। সবার মধ্যে খাহেশাতের পূজা, নফসের পূজা এবং মনপূজার ব্যাধি রয়ে গেছে। আল্লাহকে ভুলে দুনিয়া নিয়েই পড়ে আছে।

بتوں توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے.

'মূর্তিগুলো গুড়িয়ে দাও। পাথরের হোক কিংবা বিশ্বাসের।'

---

১. সূরা নিসা : ৫৮

যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মনের মূর্তিগুলো ভেঙে না ফেলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নেসবতের নূর অর্জিত হবে না। আজ যে অন্তরের দিকেই দৃষ্টিপাত করা হয়, সেখানেই দেখা যায়, দুনিয়ার মোহে ভরে আছে। আমার মুরশিদে আলম বলতেন,

حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا * بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا.

'হৃদয়ের অবস্থা বলতে পারি এমন কাউকে তো পেলাম না। মূর্তির পূজারী তো পেলাম অনেক; কিন্তু আল্লাহর খাঁটি বান্দা পেলাম না।'

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরও নেসবতের নূর দান করুন, যেন আমাদের আখেরাত ঠিক হয়ে যায়। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

আল্লাহর অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

তাকওয়া কিভাবে অর্জিত হবে?

যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তাকে মোত্তাকী, পরহেযগার, খোদাভীরু বলে। আল্লাহ্ পরহেযগার লোকদের ভালোবাসেন, তাদের আমলগুলোকে কবুল করে তাদের নিজের খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই পরহেযগারী আল্লাহর ভয় ব্যতীত অর্জিত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহর ভয় না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোনো নিয়মানুবর্তিতার আওতায় আসে না। আজ তো আল্লাহর স্মরণ অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে। দৃষ্টি আল্লাহর দিক থেকে সরে গেছে এবং মানুষের অন্তরগুলো গুনাহ ও পাপাচারের দিকে ঝুঁকে গেছে। এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তাই যেভাবে আমরা আল্লাহর নিকট তাঁর ভালোবাসার জন্য দু'আ করি, এমনিভাবে তার ভয়ও যেন নসিব হয়ে যায় তার জন্য দু'আ করা উচিৎ। খোদাভীতি যার নসিব হয়ে গেছে, তার জন্য পাপ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়। সাথে-সাথে যদি মহব্বতে ইলাহীও নসিব হয়ে যায়, তখন তার জন্য আগ্রহের সাথে ইবাদাত করাও সহজ হয়ে যায়।

গুনাহ্ থেকে বাঁচার গুরুত্ব

শুনে রাখুন এবং অন্তরের কান দিয়ে শুনুন। আমরা সকলেই কালেমা পাঠ করে স্বীকার করে নিয়েছি, হে পালনকর্তা! আমরা আপনার সকল আদেশ মান্য করব। এ কারণেই আমাদের সম্বোধন করে আল্লাহ রব্বুল ইয্যত বারবার ইরশাদ করেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

'হে ঈমানদার লোকেরা!'

অর্থাৎ আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, হে পালনকর্তা! এখন থেকে আমাদের জীবন আপনার বিধিনিষেধ অনুযায়ী যাপিত হবে। আমাদেরকে এমনভাবে চলতে হবে, যেন গুনাহ ও পাপাচার থেকে বেঁচে বাকি জীবন কেটে যায়। স্মরণ রাখবেন, যেলোক স্বেচ্ছায় গুনাহ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলাও তার দু'আগুলো কবুল করতে থাকেন। মানুষ যখন পাপ করে, আল্লাহ তা'আলা তখন তার ওপর অসন্তুষ্ট হন। কোনো বান্দা যদি নফল আমল করে; কিন্তু গুনাহ করা ছেড়ে দেয়, তাহলে এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়। কারো পক্ষে হয়ত নফল ইবাদাত বেশি করা সম্ভব হয় না, যিকির-আযকার বেশি করতে পারে না, অনেক বেশি অযীফা আদায় করতে পারে না, তো এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু গুনাহ থেকে পরিপূর্ণ আত্মরক্ষা করতে হবে। এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যা পাপ। এ কারণেই মাশায়েখগণ বলে থাকেন, যে ব্যক্তি খুব ইবাদাত করে আবার মুখের গুনাহ করে, চোখের গুনাহ করে, অন্তরও কল্পনার গুনাহ করে সে ওই ব্যক্তির স্তরে কখনই পৌঁছাতে পারবে না যে, ইবাদাত বেশি করতে না পারলেও গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে।

খোদাভীতির স্তর

খোদাভীতিও আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। ইমাম গয্‌যালী (রহ.) এর তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন।

এক. জনসাধারণের খোদাভীতি : সর্বনিম্ন স্তরের খোদাভীতি হলো জনসাধারণের খোদাভীতি। মানুষ যখন কোনো কবীরা গুনাহ করে ফেলে, তখন তার এই উপলব্ধি থাকে যে, আমি ইচ্ছাকৃত গুনাহ করে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করেছি, যখন আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হব, তখন আমাকে এর সাজা দেওয়া হবে। যেমন- কোনো ছোট শিশু কাঁচের পাত্র ভেঙে ফেলে, তখন তার মধ্যে এই আতঙ্ক কাজ করে যে, এখন তো আম্মু আমাকে মারবেন। অথবা একটি অপরাধ করে ঘরে ফিরলে এই ভয়ে শঙ্কিত থাকে যে, এখন আব্বু এসে আমাকে মারবেন। তো গুনাহের পর জনসাধারণের খোদাভীতি অনেকটা এমনই।

দুই. সালেহীন নেককারদের খোদাভীতি : দ্বিতীয় স্তরের খোদাভীতি আরও উন্নত। একে সালেহীনদের খোদাভীতি বলে। এর অর্থ হলো, মানুষ

নিজে তো নেক আমল করেই এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তথাপি তার অন্তরে সর্বদা এই শঙ্কা কাজ করে যে, কী জানি আল্লাহ আমার আমলগুলো কবুল করছেন কি-না? তার বিশ্বাস হলো, আমার এ যোগ্যতা কোথায় যে, আমার ইবাদাতসমূহ আল্লাহর শান অনুযায়ী হবে? তার মধ্যে এই ভয় কাজ করে যে, আল্লাহ না করুন, আমার ইবাদাত যেন আমার মুখের ওপর নিক্ষিপ্ত না হয়। এই খোদাভীতি অনেক উঁচু স্তরের খোদাভীতি। কারণ, এতে মানুষ নেক আমলও করে আবার তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কাও বোধ করে।

میری قسمت سے الٰہی! پائیں یہ رنگ قبول

پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لئے

'হে প্রভু! ভাগ্যজোরে আমি এই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছি। কিছু ফুল আমি কুড়িয়ে এনেছি আপনার আঁচলের জন্য।'

আমাদের সালফে সালেহীনগণের ব্যাপারে কিতাবে লেখা আছে, তারা রাতের পর রাত বিনিদ্র ইবাদাতে কাটিয়ে দিয়েছেন। ঈশার ওযু দিয়ে ফযরের নামায আদায় করতেন। তারপরও সকাল বেলা তাদের চেহারায় এমন লজ্জা ফুটে উঠত, যেন রাতভর তারা গুনাহে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের দু'আগুলোতে এভাবে বিনয় প্রকাশ করতেন,

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ.

'হে আল্লাহ! আমরা তোমার হক আদায় করে ইবাদাত করতে পারিনি। তোমার মারেফাতের হক অনুযায়ী মারেফাত অর্জন করতে পারিনি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন।'

তিন. আরেফীনদের খোদাভীতি : তৃতীয় স্তরের খোদাভীতি মূলত আরেফীন (আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্তরা)দের খোদাভীতি। এটি এমন লোকদের খোদাভীতি যাদের অন্তর আল্লাহর মারেফাত দিয়ে টইটম্বুর থাকে। তাদের জীবন শতভাগ শরীআহ ও সুন্নাত অনুযায়ী হয়ে থাকে। আল্লাহর ভয়ে তারা কাঁপতে থাকে। তাদের শঙ্কা হলো বাতেনী যে নেয়ামত আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমাদের দান করেছেন, জানা নেই মৃত্যু পর্যন্ত সেই নেয়ামত রক্ষা করতে পারব কি-না। আমাদের পরিণতি কী হবে তাও জানা নেই। এই ভয়ই আল্লাহওয়ালাদের প্রকম্পিত করে। তারা মনে করেন, যদিও জাহেরিভাবে আমাদের আমলের তাওফীক দেওয়া হয়েছে; আমরা নামাযও পড়ি, কুরআন তেলাওয়াতও করি, যিকির-আযকারও করি, দীনি মেহনত-মুজাহাদাও করি;

কিন্তু এ তো জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা করে রেখেছেন। মৃত্যু যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এ চিন্তাই তাকে পীড়া দিতে থাকে। তারা জানে, যদি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ক্ষমা ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তাহলে এ সকল ইবাদাত-বন্দেগী, মেহনত-মুজাহাদা সব নিস্ফল হয়ে যাবে। বাস্তবতা এটাই যে, জীবনভর যদি আমরা আল্লাহ্র দরবারে সিজদায় পড়ে থাকি, তবুও আমাদের ইবাদাত তার শান অনুযায়ী হবে না। ব্যস! এ তো কেবল মহান করুণাময় আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যতের অপার মহিমা যে, তিনি আমাদের এসব টুটা-ফাটা ইবাদাতও কবুল করে নেন।

সায়্যিদুনা আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খোদাভীতি

আল্লাহ্ তা'আলার মহান ও মর্যাদা সম্পর্কে যে যত বেশি জানে-বোঝে, সে তত বেশি শঙ্কিত হয় এবং কেঁপে ওঠে।

এই উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)। কারণ, তাঁর অন্তরে খোদাভীতির এক বিশেষ কাইফিয়াত তৈরি হতো। এক দিকে তো তিনি নবীজির মুখ থেকে সুসংবাদগুলো শুনেছেনই, যেমন- 'গুহার সঙ্গী' 'ছানিয়াছনাইনি' 'সিদ্দীক' 'আশারায়ে মুবাশ্শারার, (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত) অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ এর বিশেষ মর্যাদা এ সব ফযীলত তো তিনি লাভ করেছেনই; কিন্তু অপর দিকে তাঁর অন্তরে সর্বদা এই আতঙ্ক থাকত যে, জানা নেই, মৃত্যু পর্যন্ত এই ফযীলতগুলো সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হবে কি-না? তাই তিনি সর্বদা আল্লাহ্র দরবারে দাঁড়ানোর বিষয়ে খুব আতঙ্কিত থাকতেন। প্রায়ই বলতেন, হায় যদি আমার মা আমাকে জন্মই না দিতেন। হায়! যদি আমি কোনো মুমিনের গায়ের পশম হতাম। হায়! যদি আমি ঘাস হতাম, খড়-কুটা হতাম। কারণ, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনাকে ভীষণ ভয় করতেন।

'অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা' শব্দটির ব্যখ্যা

আল্লাহ তা'আলার 'অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা' সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেওয়া উচিত। যেমন- একজন অফিসার তার অধীন কোনো কর্মচারীর ওপর অসন্তুষ্ট হন, তখন তিনি কর্মচারীর সম্মুখে তো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাকে চাকরিচ্যুত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ঠিকই নেন। তাকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন করা কিংবা এমন কোনো দুর্নীতি বা

অপবাদের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয় যে, শেষ পর্যন্ত সেই কর্মচারী চাকরি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। সাধারণত এ জাতীয় গোপন তদবীরকেই 'অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা' বলা হয়।

ভালো-মন্দর তাকদীর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে

আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের ব্যাপারে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি,

وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى

'ভালো মন্দ সম্পূর্ণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তার পক্ষ থেকেই সব কিছু হয়।'

এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা যখন কারো ব্যাপারে কল্যাণের সিদ্ধান্ত নেন, তখন পরিস্থিতি এমনভাবে অনুকূলে এনে দেন যে, তার জন্য কল্যাণ লাভ করা সহজ হয়ে যায়। আর যখন কারো ব্যাপারে বরবাদীর সিদ্ধান্ত নেন, তখন পরিবেশ-পরিস্থিতি এমনভাবে ঘোলাটে করে দেন যে, তার পরিণতি খারাপ হয়ে যায়।

'ভালো'র ব্যাপারে আল্লাহর 'অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা'

আল্লাহ তা'আলা যখন কিয়ামতের দিন তার বান্দাদের ব্যাপারে ক্ষমা করার ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি এমন প্রক্রিয়া অবলম্বন করবেন যে, বান্দাদের বিভিন্ন ছোট-ছোট কাজকে বাহানা করে তাদের ক্ষমা করে দেবেন। এটি 'ভালো'র ক্ষেত্রে আল্লাহর 'অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার' দৃষ্টান্ত।

এক মুহাদ্দিছের ক্ষমা

এক মুহাদ্দিছ সাহেবের ইন্তিকালের পর তাঁর কোনো ঘনিষ্টজন স্বপ্নযোগে তাঁর সঙ্গে স্বাক্ষাতে মিলিত হলেন। সাক্ষাতান্তে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ আপনার সঙ্গে কী আচারণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, একটি আমলকে আমি খুব ছোট মনে করতাম; কিন্তু আল্লাহর দরবারে তা-ই কবুল হয়ে গেছে এবং তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে বলল, সেই আমলটি কী? মুহাদ্দিছ বললেন, একবার আমি হাদীছ লিখছিলাম। কালি নেওয়ার জন্য দোয়াতে কলম ঢোকালাম। কলম তুলে লিখতে গেলাম তো এমন সময় একটা মাছি এসে কলমের ওপর বসে কালি পান করতে লাগল। আমি চিন্তা করলাম, মাছিটা হয়তো তৃষ্ণার্ত; তাই কিছুক্ষণের জন্য কলমটা থামিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণ পর মাছিটা কালি পান করে উড়ে গেল। আমিও লিখতে শুরু করলাম। এ আমলটি তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু সেটি

আমলনামায় সংরক্ষিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বললেন, তুমি দুনিয়ায় আমার একটি ক্ষুদ্র জীবের প্রতি দয়া দেখিয়ে সেদিন তাকে কলমের কালি পান করতে দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ কলমটা থামিয়ে রেখেছিলে। আজ আমিও তোমার প্রতি দয়া দেখিয়ে জাহান্নাম থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি দিলাম। যাও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

আদবের কারণে ক্ষমার ওয়াদা

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, 'আমি মাকতুবাত লিখেছিলাম। লেখার মাঝে যখনই কলম থেমে যেত, আমি নখ দিয়ে কলম পরিষ্কার করে পুনরায় লিখতাম। এভাবে কিছু কালি আমার আঙুলে লেগে শুকিয়ে গেল। মাঝে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। হঠাৎ বাইতুল খালায় (টয়লেটে) যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। বাইতুল খালায় প্রবেশ করে সবে প্রকৃতিক কাজের জন্য বসব, এমন সময় আঙুলে লেগে থাকা কালির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও মনে পড়ল যে, যদি এক্ষুনি প্রকৃতিক কাজ সারি, তাহলে পানি ব্যবহারের সময় কালিগুলো ধুয়ে নাপাক পানির সাথে মিশে নাপাক স্থানে চলে যাবে। আর তা শিক্ষা-উপকরণের জন্য একটি অবমাননাকর কাজ। তাই আমি প্রকৃতিক কাজ না সেরে উঠে বাইতুলখালা থেকে বের হয়ে একটি পবিত্র স্থানে এসে কালিগুলো ধুয়ে ফেলি। ধোওয়া শেষ হতেই আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমার অন্তরে ইলহাম করলেন, 'আহমাদ সারহিন্দী! তোমার এই আদবের কারণে আমি জাহান্নামের আগুন তোমার ওপর হারাম করে দিলাম।

বাগদাদের খলীফা বাদশা হারুনুর রশীদের স্ত্রী যুবাইদা খাতুন 'নাহরে যুবাইদা' নামক খাল খনন করে বাগদাদ থেকে আরবের মরু অঞ্চল পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়েছিলেন। সেই নারীর ছোট বেলার গল্প। একবার তিনি বান্ধবীদের সঙ্গে দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন। দোলনা দোলা অবস্থায় তার মাথার ওড়না সরে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর আযানের শব্দ ভেসে এল। সেই নেকবখ্‌ত নারী সঙ্গে-সঙ্গে দোলনা থেকে নেমে ওড়না দিয়ে মাথাটা ঢেকে নিল। তারপর তিনি জীবনের সময়গুলো পার করে ইন্তেকাল করলেন। মৃত্যুর পর এক আত্মীয় তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কী খবর যুবাইদা? কী ফয়সালা হলো তোমার ব্যাপারে? তিনি বললেন, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমার সঙ্গে খুব ক্ষমাশীল আচরণ করেছেন। প্রশ্নকারী স্বপ্নেই বলল, আপনি যে বিশাল খাল খনন করে মুসলমানদের কষ্ট দূর করেছেন, সেটিই কাজে

লেগেছে তাই না? তিনি বললেন, খাল তো খনন করেছিলাম। তবে সেটি আমার মাগফিরাতের কারণ হয়নি। সে বলল, তাহলে কী কারণে মাগফিরাত হলো? তিনি বললেন, ছোট বেলায় আমি একদিন দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। বাতাসে মাথার ওড়না পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আযানের শব্দ শুনতেই আমি আল্লাহ তা'আলার আযমত ও সম্মান রক্ষার্থে মাথাটা ওড়না দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম। আল্লাহ কাজটি এত পছন্দ করেছিলেন যে, এর উসিলায় তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, যুবাইদা! তুই আমার নামের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছিলে, তার উসিলায় আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করা দিলাম। খাল খনন ও অন্যান্য আমলের তো কোনো খবরই ছিল না। এটাও আল্লাহ তা'আলার 'অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার' একটি উত্তম দৃষ্টান্ত ।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার এত বেশি রহমতের ছড়াছড়ি হবে যে, হযরত কারী তায়্যিব সাহেব (রহ.) বলেন, একটি সময় এমন আসবে যে, শয়তানের মনেও আশা জেগে উঠবে, হয়তো আজ আমার অপরাধগুলোও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার রহমতে যখন এমন জোয়ার আসবে, তখন অবশ্যই ঈমানদার পাপীদেরও আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

কালেমায় তায়্যিবার বরকতে ক্ষমা

কিয়ামতের দিন মানুষের ক্ষমার কয়েকটি ধরন হবে। কাউকে এ বাহানায়, তো কাউকে ওই বাহানায় ক্ষমা করে দেবেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা এক ঈমানদার বান্দাকে ডাকবেন। এর গুনাহের রেজিস্ট্রার হবে ৯৯ টি। তার অন্তরে এই বিশ্বাস থাকবে যে, আজ আযাব থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। শাস্তি আমার হবেই। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত বলবেন, 'তোমার একটি আমল আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। আমি তাও আজ তোমার আমলনামার সঙ্গে ওজন করব। কিছুক্ষণ পর এক ফেরেশতা একটি ছোট চিরকুট নিয়ে আসবে। আরবিতে একে 'বেতাকা' বলে। এ হাদীছটি 'হাদীছে বেতাকা' নামেই প্রসিদ্ধ। চিরকুটটি নেকের পাল্লায় রাখা হবে। চিরকুটটি রাখতেই নেকের পাল্লা এত ভারী হয়ে যাবে যে, ৯৯ রেজিস্ট্রারবিশিষ্ট গুনাহের পাল্লাটি শূন্যে উঠে যাবে আর নেকের পাল্লা যাবে নিচে নেমে। সেই বান্দা জিজ্ঞাসা করবে, আল্লাহ গো! এটি কী ছিল? উত্তর আসবে, বান্দা আমার! তুমি যে কালিমা পাঠ করেছিলে, এ কাগজে তোমার সেই কালেমাই লেখা ছিল। দেখো, এ কালেমা তোমার গুনাহের ৯৯ রেজিস্ট্রার থেকে অনেক বেশি ভারী হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ!

নফল ইবাদাতের বরকতে ক্ষমা

সেদিন এমন কিছু লোকও থাকবে, যাদের গুনাহ ৯৯ রেজিষ্ট্রারের চেয়েও বেশি থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যও ক্ষমার উপকরণ তৈরি করে দেবেন। তার সুরত হবে এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকবেন। শরীয়তে একটি মাসআলা আছে, যদি কেউ কারো বাহন ভাড়া নিয়ে বলে, আমার ৪০ কেজি ওজনী একটি বস্তা অমুক জায়গায় পৌঁছে দাও। ভাড়া এত। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বস্তার ওজন ১০ কেজি বেশি। অর্থাৎ ৫০ কেজি। তাহলে শরীয়তের হুকুম হলো, অতিরিক্ত ১০ কেজির জন্য বাড়তি ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

তো এমনিভাবে আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যত কিয়ামতের দিন তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বললেন, হে প্রিয় রাসূল! আমি আপনার উম্মতের ওপর ফরজ-ওয়াজিব আমলসমূহের বোঝা রেখেছিলাম। কিন্তু আপনি আমার এত বেশি ইবাদাত করেছেন যে, আপনার ইবাদাতের প্রাচুর্য দেখে আপনার উম্মতও সুন্নাত-নফলের শিরোনামে অনেক ইবাদাত করেছে এটা একটা বাড়তি বোঝা ছিল তাদের জন্য। তাই তাদের জন্য বাড়তি পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা এখন আমার ও আপনার ওপর আবশ্যক হয়ে পড়েছে। নবীজি তখন জিজ্ঞাসা করবেন, হে আল্লাহ্! তার বাড়তি পারিশ্রমিক কী হতে পারে? উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করবেন, 'হে রাসূল! আপনি তাদের জন্য আমার নিকট সুপারিশ করুন। আমি আপনার সুপারিশ কবুল করব এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেব। তারপর উম্মতে মুহাম্মাদির ঐসব লোক, যারা সুন্নাত ও নফল ইবাদাতগুলো খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিৎ আদায় করেছিল, আল্লাহ্ এসব সুন্নাত ও নফল ইবাদাতকে বাহানা বানিয়ে তাদের ক্ষমা করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ্!

সর্বশেষ ক্ষমা

অবশেষে এমন একটি সময় আসবে, যখন ময়দানে গুনাহ্গার ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এদের জন্যও ক্ষমার একটি বাহানা তৈরি করে দেবেন। তিনি ফেরেশতাদের ডেকে বলবেন, হে ফেরেশতারা! আমি যখন তোমাদের বলেছিলাম, অচিরেই আমি জমিনে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব, তখন তোমরা উত্তরে বলেছিলে,

قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ

'হে আল্লাহ! আপনি কি এমন লোকদের প্রতিনিধি বানাতে চান, যারা জমিনে বিশৃঙ্খলা করবে, রক্তপাত করবে?'[১]

তো ফেরেশতারা শোনো! তোমরা সেদিন আমার বান্দাদের নিন্দা করে গিবত করেছ। আর আমার শরীয়তের কানুন হলো, যখন কেউ কারো গীবত করে, তখন গীবতকারীর আমলনামা থেকে নেকী কেটে গীবতকৃতের আমলনামায় দিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু তোমরা মানবজাতির গীবত করেছ তাই তোমাদের কোটি-কোটি বছরের ইবাদাতের ছাওয়াব আমি মানবজাতির সবার মধ্যে বন্টন করে দিচ্ছি। এভাবে বাহানা করে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের ইবাদাতের ছাওয়াবকে মানবজাতির আমলনামায় বন্টন করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ!

'মন্দ'র ব্যাপারে আল্লাহর 'অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা'

আল্লাহ তা'আলার গোপন তদবীর ও অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা যেভাবে 'ভালো'র মধ্যে হয়ে থাকে, তেমনি 'মন্দ'র ব্যাপারেও তার এই নিয়ম চালু থাকে। এ কারণেই আরিফ বিল্লাহগণ সর্বদা নিজেদের পরিণতি ও আঞ্জাম নিয়ে শঙ্কিত থাকেন।

স্মরণ রাখবেন, ব্যহিকভাবে অনেক সময় মনে হয় বান্দা দীনের কাজ করছে, অথচ ভিতরে ভিতরে সে দীন থেকে দূরে সরে যায়। এটাও আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার কারণেই হয়ে থাকে। 'মন্দ'র ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে। এগুলো জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সৌভাগ্যের কারণ হতে পারে।

এক. যার ব্যাপারে 'মন্দ'র ফয়সালা হয়ে গেছে, এমন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা ইল্‌মে দীন তো দান করেন, তবে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক ছিনিয়ে নেন।

দুই. অনেক সময় আমলেও তাওফীক দিয়ে দেন, কিন্তু এখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত হতে বঞ্চিত করে দেন।

তিন. আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য তো দিয়ে দেন, কিন্তু তাদের প্রতি আদব, সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অন্তর থেকে বের করে দেন। অর্থাৎ যাহেরীভাবে সে দীনের কাজই করছে বলে মনে হবে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে হবে বঞ্চিত।

---

১. সূরা বাকারা : ৩০

মিসরের জামে মসজিদে এক মুআয্যিন আযান দিত। দৃশ্যত সে দীনের কাজ করছে বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তার মধ্যে আল্লাহ্‌র কোনো ভয়ই ছিল না। গুনাহ্ ও পাপাচারের প্রভাবে তার অন্তর কালো হয়ে গিয়েছিল। একবার সে আযান দেওয়ার জন্য মিনারায় উঠল। উঁচু মিনারের আশে-পাশে অনেক ঘর-বাড়ি আছে। এক বাড়ির জানালা দিয়ে সে কোনো সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেল। এতে তার মন ঘুরে গেল। আযান না দিয়ে সে মিনারা থেকে নিচে নেমে এল। ওই বাড়িতে গিয়ে জানতে পারল, ও এক খ্রিস্টান পরিবারের মেয়ে। তারা কিছুদিন হলো, এ এলাকায় এসে বসবাস করছে। সে মেয়ের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিয়ের প্রস্তাব দিল। খ্রিস্টান বলল, তোমার মনের বাসনা পূরণ হতে পারে যদি একটা শর্ত মেনে নিতে পার। তা হলো তুমি তোমার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। মুআয্যিন এতে স্বানন্দে সম্মতি জানাল। এবার উভয়ে মিলে খ্রিস্টানদের গির্জায় পৌঁছল। এখনও তিন-চার সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠতে পারেনি, সে পা পিছলে চিত হয়ে পড়ে গিয়ে মারাত্মভাবে আহত হলো এবং মাথা ফেটে রক্তক্ষরণ হয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল।

চিন্তা করুন, মিনারায় চড়ে ছিল আযান দিতে; কিন্তু অন্তরে গুনাহ্ ও পাপাচারের কালিমা লেগে থাকার কারণে আল্লাহ্ তার ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। তাই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে দিলেন যে, সে যখন মিনারা থেকে নেমে গীর্জায় পা রাখল, তখন ঈমান হারিয়ে অভিশপ্ত হয়ে গেল।

হাদীছে এসেছে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন হলো, তোমরা দেখবে, একব্যক্তি সকালে ঘর থেকে বের হবে ঈমান অবস্থায় কিন্তু রাতে বিছানায় যাবে ঈমানহারা হয়ে। এগুলো এমন কথা, যা আল্লাহওয়ালাদের অন্তরকে কাঁপিয়ে তোলে। তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে কেঁদে-কেঁদে দু'আ করে, হে আল্লাহ! হে দয়াময়, হে করুণাময়! আমাদের ঈমান যেন নষ্ট না হয়। আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনি ইল্‌ম ও আমলের যে দৌলত আমাদের দান করেছেন, তা থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমাদেরকে আপনার রহ্‌মতের চাদরে ঢেকে নিন।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর খোদাভীতি

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর একটি ঘটনা। যখন তাঁকে মালটার বন্দীশালায় আবদ্ধ করা হলো, তখন তাঁর সঙ্গে তার জাঁনেসার শাগরিদ হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)

ও মাওলানা উযাইরগুল (রহ.)সহ আরও কয়েকজন ছিলেন। কোনোভাবে জানা গেল, ইংরেজরা এই কয়েদীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এদেরকে আমরণ এ বন্দিশালাতেই রাখা হবে এবং এত পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হবে, যেন এখানেই তাদের মৃত্যু হয়ে যায়। কোনোভাবেই তাঁদের দেশে পাঠানো যাবে না। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বিষয়টি শুনে খুব কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। সব সময় কান্নার ভাব তাঁর চেহারায় লেগেই থাকত। অল্প কিছুতেই চোখের পানিতে বুক ভেসে যেত। শাগরিদগণ খুবই আশ্চর্য হলেন যে, আমাদের মুহতারাম ওস্তাদ তো দৃঢ়তা ও অবিচলতায় পাহাড় ছিলেন। তিনি মৃত্যুর কথা শুনে কাঁদছেন কেন? কয়েকদিন এভাবেই কেটে গেল। খাওয়ায় মন নেই, শোওয়ায় মন নেই। সব সময় শুধু কান্না আর কান্না। তাঁর ছাত্ররা পরস্পর বলাবলি করত, আসলে হযরতের কী যে হয়ে গেল! মৃত্যু যখন হবেই, তাহলে তা আল্লাহর পথে হচ্ছে এ তো সৌভাগ্যের কথা। আমরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করব; এ নিয়ে কান্নার প্রয়োজন কী?

অবশেষে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল, এ বিষয়ে হযরতকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে এবং সান্ত্বনা দেবে। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) যখন নীরবে বসে কাঁদছিলেন, তাঁরা তিনজন গিয়ে হযরতের খেদমতে বসলেন। তারপর কথা উঠালেন, 'হযরত! মানুষ যখন আল্লাহর পথে থাকে এবং সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হয়, তাহলে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। আমরা যদি মারাও যাই, তাহলে শহীদদের তালিকায় আমাদের নাম লেখা হবে। মাওলানা উযাইরগুল (রহ.) যখন এ কথা বললেন, তখন হযরত খুব ক্রোধান্বিত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, উযাইরগুল! তুমি কী জান? আমি তো আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার গুণকে ভয় করছি। তিনি কখনও-কখনও বান্দার প্রাণও নেন আবার তা কবুলও করেন না। একথা শুনে ছাত্রদের চোখের পাতা ভিজে গেল। হায়! হায়! আমরা কী ভেবেছি আর হযরতের দৃষ্টি কোথায়!

আল্লাহওলাদের কান্নাকাটি

সম্মানিত উপস্থিতি! যার মধ্যে যত বেশি ইল্‌ম হবে, যে যত বেশি এগিয়ে থাকবে, নেক আমল যত বেশি করবে, তার মধ্যে খোদাভীতিও তত বেশি হবে। সে তত বেশি প্রকম্পিত হবে। কারণ, সে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ সম্পর্কেও জানে, তার মর্যাদা সম্পর্কেও জানে, তাঁর শক্তিমত্তা, প্রতাপশালীতা ও অমুখাপেক্ষিতা সম্পর্কে সে পূর্ণ অবগত থাকে। তাই সে আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সাথে কাকুতি-মিনতি করে কাঁদে, 'আল্লাহ গো! আমি আপনার

বেনিয়াযী ও অমুখাপেক্ষিতাকে ভয় পাই, আমি আপনার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনাকে ভয় পাই; আপনি আমার প্রতি দয়া করুন! হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ঈমানের যে দৌলত দান করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত এই দৌলত অক্ষুণ্ন রাখুন। হে আল্লাহ! আপনার দেওয়া মারেফাতকে মৃত্যু পর্যন্ত কলঙ্কমুক্ত রাখুন। আমীন।

আল্লাহওয়ালাদের এ ভয় জীবদ্দশায় কখনও দূর হয় না, আজীবন থাকে। যতবড় মর্যাদার অধিকারীই হোন, যত সুসংবাদপ্রাপ্তই হোন মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বলা যায় না, পরিণতি কী হবে? এ কারণেই বলা হয়, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে থাক, মৃত্যু আসা পর্যন্ত। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে কোনো নেক বান্দাই আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে শঙ্কামুক্ত নয়। সবার মধ্যেই এই ভয় থাকতে হবে। যারা গুনাহ বেশি করে, তাদের আরও বেশি ভয় করা উচিৎ। গুনাহ যদি কেউ নাও করে, শুধু নেকিই করে, তবুও এ ভয় থেকেই যায় যে, হায়! আমার ইবাদাতগুলো কবুল হলো কি হলো না। যদি মারেফাত অর্জিত হয়ে যায়, তখন তো শঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাবে যে, এমন আবার না হয় যে, মৃত্যুর আগেই মারেফাতের এই দৌলত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তাই সর্বদা অন্তরে নেয়ামত হারানোর ভয় থাকা উচিত।

শায়খ আব্দুল্লাহ উন্দলুসী (রহ.)-এর ঘটনা

শায়খ আব্দুল্লাহ উন্দলুসী (রহ.) হযরত শিবলী (রহ.)-এর মুরশিদ ছিলেন। খ্রিস্টানদের বসতি হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। ওই বসতির সামনে একটা ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি সেখানকার একটা কূপে ওযু করার জন্য পৌছলেন আসরের নামায পড়ার জন্য। সেখানে কোনো মেয়ের ওপর দৃষ্টি পড়তেই তাঁর মনটা ঘুরে গেল। সীনাটা তাঁর খালি হয়ে গেল। মুরিদদের বললেন, তোমরা ফিরে যাও; আমি এখানেই থাকব। আমাকে মেয়েটির বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। মুরীদরা সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল। সবাই বলল, মুহতারাম! এ কী করছেন আপনি?

ইনি সেই শায়খ, যাঁর এক লাখ হাদীছ সনদসহ মুখস্থ ছিল। কুরআনের হাফেয ছিলেন। শত-শত মসজিদ তাঁর ঈমানদীপ্ত বয়ানে মুখরিত হতো। কত খানকাহ তার পদধূলিতে ধন্য-ধন্য করত। আজ তিনি বলেছেন, বন্ধুরা! তোমরা ফিরে যাও; আজ তোমাদের দেওয়ার মতো কিছুই আমার কাছে নেই। তারপর তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করে মেয়েটির বাড়ির দিকে রওনা হলেন। মেয়েটির বাবা ছিল গ্রামের প্রধান। শায়খ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমি তোমার মেয়েকে বিবাহ করতে চাই। তুমি কি এতে সম্মত

আছ? মেয়ের বাবা বলল, বিবাহ পরে হবে; আগে আমাদের গ্রামে থাক, আমাদের কিছু খেদমত করো। পরস্পরে যখন জানা-শোনা হয়ে যাবে, তখন বিয়ে হয়ে যাবে।

শায়খ রাজি হয়ে গেলেন। মেয়ের বাবা বলল, আপনাকে প্রাথমিকভাবে শূকরের পাল চড়াতে হবে। শায়খ তাতেও রাজি হয়ে গেলেন। এবার তার অবস্থা হলো, ভোর বেলা শূকরের পাল সঙ্গে নিয়ে বের হতেন। সারা দিন চড়ানোর পর সন্ধায় ফিরে আসতেন।

এদিকে মুরীদরা ফিরে গিয়ে যখন ঘটনা বলল, তখন সবাই হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। কেউ-কেউ তো বেহুশও হয়ে গেল। বহু খানকাহ বন্ধ হয়ে গেল। সবাই আশ্চর্য হলো, হে আল্লাহ! আপনার অমুখাপেক্ষিতার মুআমালা এমন লোকদেরও নিস্তার দেয় না। পুরো এক বছর এভাবেই কেটে গেল। হযরত শিবলী (রহ.) শায়খের খাঁটি মুরীদ ছিলেন। তিনি জানতেন, আমার শায়খ একজন বড় মাপের বুযুর্গ। এ ঘটনায় নিশ্চয়ই কোনো হেকমত আছে। তার ইচ্ছে হলো, একটু গিয়ে দেখি, শায়খ কী অবস্থায় আছেন? তারপর তিনি সেই খ্রিস্টান বসতিতে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের শায়খ কোথায়? একজন উত্তর দিল, অমুক জঙ্গলে গিয়ে দেখুন, সেখানে শূকরের পাল চরাচ্ছেন। শিবলী (রহ.) সেখানে গিয়ে দেখলেন, শাইখ শূকর চরাচ্ছেন। মাথায় সেই পাগড়ি, পরনে সেই জুব্বা এবং হাতে সেই লাঠি, যেগুলো নিয়ে তিনি শহরের বড় জামে মসজিদে জুমার খুতবা দিতেন। আর আজ শাহী বেশভূষা নিয়েই শূকরের খেদমতে দাঁড়িয়ে আছেন।

হযরত শিবলী (রহ.) নিকটে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, হযরত! আপনি তো কুরআনের হাফেয ছিলেন। কুরআন আপনার মুখস্থ আছে? তিনি বললেন, না; আমি সব ভুলে গেছি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনো আয়াত কি মনে আছে? অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, একটি আয়াত মনে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনটি? তিনি বললে

وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ

'আল্লাহ যাকে অপমান করেন তাকে কেউ সম্মানদানকারী থাকে না।'[১]

অর্থাৎ- তিনি পুরো কুরআন ভুলে গেলেন; শুধু সেই আয়াতটিই স্মরণ রয়েছে, যার সাথে তার লাঞ্ছনাকর জীবনের সম্পর্ক রয়েছে। হযরত শিবলী

১. সূরা হজ্জ : ১৮

(রহ.) কাঁদতে লাগলেন, হায় আফসোস, হযরত পুরো কুরআন ভুলে গেছেন! পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, হযরত! আপনি তো লক্ষ-লক্ষ হাদীছ মুখস্থ বলতে পারতেন। এখন কটি স্মরণ আছে? শায়খ উত্তর দিলেন শুধু একটি হাদীছ মনে পড়ে,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ

'যে তার দীন ইসলামকে বদলে ফেলে, তাকে হত্যা করো।'

এই উত্তর শুনে শিবলী (রহ.) পুনরায় কাঁদতে লাগলেন। এবার শায়খও কাঁদতে শুরু করলেন। কিতাবে লেখা আছে, তারপর শায়খ অঝোরে কাঁদতে থাকেন। তারপর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এ পর্যন্ত এনে ঠেকাবেন কল্পনাও করতে পারিনি। আমি আপনার করুণার আশ্রয় চাই; আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

আল্লাহ তা'আলা শায়খের তাওবা কবুল করেন এবং তাঁকে তাঁর পূর্বের হালতে ফিরিয়ে দেন। হযরত শিবলী (রহ.) পরবর্তী কালে শায়খকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনার এই অবস্থা হওয়ার কারণ কী? তিনি বললেন, আমি সেই বসতিতে পা রাখতেই দেখলাম, একটা ক্রুশ ঝুলে আছে। ভাবলাম, এরা কেমন বিবেকহীন মানুষ, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে পূজা করে। আল্লাহ তা'আলা আমার এই মনোভাবের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে ধরে বসলেন। বললেন, আব্দুল্লাহ! তুমি যে ঈমানের দৌলত লাভ করেছ, তা কি তোমার বিবেকের কারণে? নাকি আমার দয়ার কারণে? এতে তোমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। সবই তো আমার ক্ষমতায়। আমিই তো দয়া করে তোমাকে ঈমানের ওপর অবিচল রেখেছি। তাহলে কিভাবে তাদের বিবেক নিয়ে খারাপ ধারণা করতে পারলে? আল্লাহ তা'আলা আমার এই চিন্তার কারণে সাময়িকভাবে আমাকে ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত করে দিলেন, কেন তুমি এমন করে চিন্তা করলে, কেন একথা বললে? তোমার বলা উচিত ছিল, তাদের এই অবস্থা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে। তিনি চাইলে এতে পরিবর্তন আসতে পারে – অন্যথায় নয়।

আল্লাহওলাদের বিনিদ্র রজনী

আল্লাহওলারা এই অদৃশ্য ব্যবস্থাপনাকে ভয় পান। এ নিয়ে তাঁদের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। তাঁরা রাতের বেলা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়েন। আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে কেঁদে-কেঁদে দু'আ করেন, আল্লাহ গো!

আপনার করুণা ও তাওফীকেই দীনের কাজ করছি। আজ আমার যা কিছু আছে, সবই আপনার দান। আমার ভিতর-বাহির সব আপনার কাছে দৃশ্যমান। আমার ওপর জগদ্বাসীকে হাসাবেন না। আল্লাহ্ওলাদের ভয় এমনই হয়। এই নেয়ামত আল্লাহ আমাদেরও দান করুন। আমীন।

অপরাধ স্বীকার

প্রভু আমার! আমাদের সালফে সালেহীন তো বড় বুযুর্গ ছিলেন। তাদের হিম্মত ছিল বিশাল। সাহসও ছিল অসীম, তাদের আত্মদান-মুজাহাদাও ছিল প্রচুর। হে আল্লাহ! আমরা তো দুর্বল, সাহস নেই, শক্তি নেই, যোগ্যতাও নেই। আমাদের এই ক্রুটিপূর্ণ ইবাদাতগুলো আপনি কবুল করে নিন। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি দয়া করুন। হিসাব-নিকাশ সহজ করুন। হাদীছে আছে,

مَنْ نُوْقِشَ فِيْ الْحِسَابِ فَقَدْ عُذِّبَ

'যার হিসাব কঠিন হবে, সে আযাবের জালে জড়িয়ে যাবে।'

হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করুন। আমরা দুর্বল, আপনি শক্তিমান। আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের ওপর আপনি রাজি-খুশি হয়ে যান। আল্লাহুম্মা আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ইল্‌মের দর্শন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ. وَقَالَ اللهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁর বিশেষ কুদরত ও ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন। তাদের সৃষ্টি করার পূর্বে আসমান-জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। এই চাঁদ-তারা, স্বচ্ছ জলধারা, সবুজ শ্যামল গাছ-পালা, শান্তির বসুন্ধরা সব কিছুই তিনি মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। কোনো কবি বলেছিলেন,

جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں ہے جہاں کیلئے.

'পৃথিবী তো তোমার জন্য; কিন্তু তুমি পৃথিবীর জন্য নও।'

অপর এক কবি বলেন,

کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے * چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے.

بحر و بر شمس و قمر ماو شما کے واسطے * یہ جہاں تیرے لئے ہے تو خدا کے واسطے.

'ফসলের ক্ষেতগুলো সবুজ-শ্যামল তোমার আহারের জন্য। চন্দ্র-সূর্য-তারকারাজি আলোদানের জন্য। জল-স্থল, চন্দ্র-সূর্য আমাদেরই জন্য। এজগত তোমার জন্য আর তুমি খোদার জন্য।'

তো দুনিয়ার এসব নেয়ামতরাজি আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। আল্লাহ চাইলে রূহের জগতেই তিনি মানুষকে বেলায়েত দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না

দিয়ে বেলায়েত অর্জনের জন্য তাদের দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। তাকে মাথা দিয়েছেন, সঙ্গে সেজদার জন্য জমিনও দিয়েছেন। পা দিয়েছেন, তো সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য মসজিদও দিয়েছেন। হাত দিয়েছেন, তো খরচ করার জন্য সম্পদও দিয়েছেন, যেন মানুষ তার দেহকে সৎ কাজে ব্যবহার করে এবং স্বীয় স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের আদেশ অনুযায়ী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী করাও ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। বান্দা তো তাকেই বলে, যার মধ্যে বন্দেগী আছে, অন্যথায় সে সরাসরি গান্দা (অপছন্দ) হয়ে যায়, মিথ্যা ও প্রতারণার উৎস হয়ে যায়।

زندگی آمد برائے بندگی * زندگی بے بندگی شرمندگی.

'যিন্দেগি দেওয়াই হয়েছে বন্দেগির জন্য। বন্দেগি ছাড়া জিন্দেগি মূলত লজ্জা ছাড়া কিছু নয়।'

ইল্‌মের প্রয়োজন

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে মাত্র তিনটি কদম প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই তিন কদম না উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব হবে না। এই তিন কদমের মধ্যে প্রথম কদম হলো ইল্‌মে ইলাহী অর্জন করা।

کہ بے علم نتواں خدارا شناخت.

'বে-ইল্‌ম মূর্খ কখনও স্বীয় প্রতিপালককে চিনতে পারে না।'

অর্থাৎ ইল্‌ম হলো আল্লাহর পরিচয় পাওয়ার একমাত্র রাস্তা। আমরা এমন তাসাওউফকে স্বীকার করি না, যা মানুষকে ইল্‌মের পথে যেতে বাধা দেয়। সাময়িকভাবে কোনো ব্যস্ততার কারণে ইল্‌মচর্চা স্থগিত করা এক জিনিস আর সরাসরি ইল্‌মের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা ভিন্ন জিনিস। মানুষের সঙ্গে যেহেতু সর্বদা মুফতী সাহেবরা থাকেন না, এজন্য কখন কোন কাজ করার জন্য শরঈ বাধা আছে, কখন বাধা নেই এগুলো কে বলবে? এজন্য প্রয়োজনীয় হালাল-হারাম, পাক-নাপাকি, ফরজ-ওয়াজিব ইত্যাদির ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। কেউ-কেউ নিজের মূর্খতা আড়াল করার জন্য কোনো বুযুর্গের এমন উক্তি পেশ করে, যা তিনি বিশেষ মুহূর্তে কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন। আরে ভাই! ইল্‌মের বিষয়ে আর বাড়াবাড়ি করো না।

তিনি তো এমন কথা বলেছেন; কিন্তু এখানে তো পূর্বাপর যাচাই করে বলা দরকার ছিল। এ জাতীয় মন্তব্য পেশ করে ইল্‌মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে খাট করা যাবে না। এটা যেমন প্রকাশ্য খেয়ানত, তেমনি বুযুর্গানে দীনের ওপর নির্জলা মিথ্যা অপবাদও বটে। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইল্‌মে শরীয়ত ব্যতীত বুযুর্গির কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, আমরা দুই বন্ধু ছিলাম। আত্মশুদ্ধির পথে উভয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাসও প্রায় একই রকম ছিল। কিন্তু বন্ধু থেকে আমি আগে বেড়ে গিয়েছিলাম শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত আমাকে তার চেয়ে বেশি ইল্‌ম দান করেছেন। হ্যাঁ ভাই! ইল্‌মওলারা যখন এ পথে চলে, তখন সফলতাও উচ্চাঙ্গের হয়। গাধা আর ঘোড়া যেমন সমান হতে পারে না, তদ্রূপ আলেম আর জাহেলও কখনও সমকক্ষ হতে পারে না।

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিন ধরনের

মানবদেহে আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত তিন ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। এক. ইল্‌মের অঙ্গ। দুই. আমলের অঙ্গ। তিন. সম্পদের অঙ্গ।

প্রথম প্রকার তথা ইল্‌মের অঙ্গ দ্বারা উদ্দেশ্য ওইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেগুলো ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমন- কান, চোখ, মস্তিষ্ক। এ তিন অঙ্গ দিয়ে মানুষ ইল্‌ম অর্জন করে। কিছু ইল্‌ম শুনে-শুনে অর্জিত হয়। যেমন- ছোট শিশুরা যে ভাষা শিখে, তা কি পড়ে শিখে? না। বরং মা-বাবা যদি ইংরেজী বলে তাহলে সেও ইংরেজী বলে। মা-বাবা যদি আরবি বলে, তাহলে শিশু বাচ্চাটিও আরবি বলতে শুরু করে। তো এই কচি বাচ্চা যা কিছুই শিখছে, তা কেবল কান দিয়ে শোনার মাধ্যমেই শিখছে। এমনিভাবে কিছু ইল্‌ম মানুষ চোখ দিয়ে দেখার মাধ্যমে অর্জন করে। আবার কিছু মস্তিষ্ক ব্যবহার করে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করে। মোটকথা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি এগুলো ইল্‌ম অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আর কাল কেয়ামতের মাঠে এই তিন অঙ্গকেন্দ্রিক ইল্‌ম সম্পর্কেই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

'কান, চোখ, অন্তর সবগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[১]

---

১. সূরা বানী ইসরাইল : ৩৬

জিজ্ঞাসা করা হবে এ মাধ্যমগুলো দ্বারা কোন ধরনের ইল্‌ম শিক্ষা করেছ? সেই অনুযায়ী আমল করেছ কি-না? নাকি এই যোগ্যতাগুলো যেখানে-সেখানে ব্যবহার করে ধ্বংস করে দিয়েছ?

তারপর দ্বিতীয় হলো আমলের অঙ্গ। অর্থাৎ ঐসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেগুলো কাজ করে। যেমন- হাত-পা ইত্যাদি। তৃতীয় হলো, সম্পদের অঙ্গ। যেমন- ফুসফুস, পাকস্থলি ইত্যাদি, যেগুলোতে রক্ত চলাচল করে। তো এ রক্ত হলো সম্পদ, যা উল্লিখিত অঙ্গগুলোতে একত্রিত হয়। এবার যদি রক্ত চলাচল না করে উক্ত অঙ্গগুলোতেই জমে পড়ে থাকে, চলাচল না করে, তাহলে সেখানে ইনফেকশন হয়ে যাবে। তাহলে বোঝা গেল, যদি কারো কাছে সম্পদ থাকে এবং সে তা খরচও না করে, তাহলে এই ইল্‌মও এক সময় বদদীনীর কারণে বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে যাবে।

ইল্‌ম অর্জন করা একটি স্বভাবজাত চেতনা

মানুষের মধ্যে কিছু জযবা ও আগ্রহ স্বভাবজাত হয়ে থাকে। যেমন- ক্ষুধা লাগা, পিপাসা লাগা। এমনিভাবে ইল্‌ম অর্জন করা এবং অজানাকে জানার আগ্রহও স্বভাবজাত বিষয়। এর প্রমাণ হলো, মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠেই পত্রিকার পিছনে ছোটে। তার মধ্যে পত্রিকা পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত পত্রিকা না পড়বে কিংবা রেডিও বা টিভি দেখে যতক্ষণ পর্যন্ত সংবাদ জেনে না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নাস্তাও ভালো লাগবে না। সমকালীন কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা-পর্যালচনা না করলে যে, জনাব কী ঘটেছে? অমুক-অমুক কী বলেছেন? বর্তমানে কী অবস্থা? তো এ জাতীয় যত কথা-বার্তাই আমরা পরস্পরে বলাবলি করি, এগুলো দ্বারা মূলত আমরা আমাদের সেই স্বাভাবজাত জযবা ও আগ্রহকে পরিতুষ্ট করি।

ইল্‌ম একটি নূর (আলো)

হাদীছে এসেছে, ইল্‌ম এক ধরনের আলো। এর বিপরীত দিকটা দেখুন, মূর্খতা অন্ধকারের মতো। আলো ব্যতীত যেমন পথ অতিক্রম করা যায় না, তেমনি ইল্‌ম ব্যতীত মানুষ শরীয়তের গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। আপনি যদি কোনো এলাকা থেকে অন্ধকার দূর করতে চান, তাহলে অন্ধকারকে গালি দিলে তো কাজ হবে না। বকাঝকা করেন আর হুমকি-ধমকি দেন আর যা-ই করেন, অন্ধকার দূর হবে না। অন্ধকার দূর করতে হলে আলো জ্বালাতে হবে। আপনি বাতি জ্বালান; অন্ধকার আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে। তো

যদি কারো মধ্যে মূর্খতা থাকে, তাহলে তো দূর করার পদ্ধতি এই নয় যে, ইল্‌মের বিরোধিতা করবেন, এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে মূর্খতাকে আড়াল করার চেষ্টা করবেন। বরং আপনি ইল্‌ম অর্জন করুন; দেখবেন মূর্খতা নিজে-নিজেই দূর হয়ে যাবে।

আসমানি ওহীর প্রথম শব্দই ইল্‌মসংক্রান্ত

পবিত্র কুরআন যখন সর্বপ্রথম নাযিল হলো, তখন আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত সর্বপ্রথম যে শব্দটি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী নাযিল করলেন, তা হলো, اِقْرَأْ। এর অর্থ 'পড়ো'। তো পড়ার শব্দ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ওহীর সূচনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ দীনে ইসলামের মধ্যে পড়া আর ইল্‌ম অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

এখন এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, জনাব! শুধু পড়লেই কি হয়ে যাবে? তো উত্তর হলো, না; কালামে ইলাহী এখনও পুরো হয়নি। আরও বাকি আছে,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۞ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞

'পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, প্রভু বড়ই দয়াময়। কেমন প্রভু? যিনি আপনাকে কলম দ্বারা ইল্‌ম শিখিয়েছেন।'[১]

তো এখানে قلم শব্দটি উল্লেখ করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করলেন যে, শুধু পড়েই দায়িত্ব শেষ নয়, লিখতেও হবে। আমাদের দীন এমন শানওয়ালা যে, চোদ্দশত বছর পূর্বে যখন মূর্খতা গোটা আরব সমাজকে গ্রাস করে নিয়েছিল, তখন ইসলামই সর্বপ্রথম পড়া-লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে জাহালাতের শক্ত প্রাচীরে আঘাত হেনেছিল। আর বিপ্লবী আহ্বান কার মুখ থেকে এসেছিল? সেই পয়গম্বরের মুখ থেকে যিনি নিজের ব্যাপারে বলতেন, আমি তো নিরক্ষর, আমি তো উম্মী। আমার আল্লাহর কুদরত দেখো, লেখা-পড়াজানা লোক হলে দুনিয়ার মানুষ বলতে পারত 'মুহাম্মদ তার ওস্তাদের শিক্ষা প্রচার করছে'। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা হতে দেননি। নবীজির নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও এত উন্নত সাহিত্য, দর্শন ও আদর্শ বিশিষ্ট কুরআন উপস্থাপন করা-ই আসমানী ওহীর সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ। সুবহানাল্লাহ।

---

১. সূরা আলাক : ১-৪

ওলামায়ে কেরামের ইহ্সান

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, যদি নিয়ত বিশুদ্ধ হয়, তাহলে তালিবে ইল্মের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। বাস্তবতাও এটিই। যদি ওলামায়ে কেরাম না হতেন, তাহলে আজ সকল মানুষ জানোয়ারের মতো জীবন যাপন করত। এটা ওলামায়ে কেরামের অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তারা শরীয়তের বিভিন্ন মাসআলা আবিষ্কার করে আমাদের জন্য দীন বোঝা সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত এই মর্যাদা কেবল ওলামায়ে কেরামকেই দান করেছেন। তারা এ দীনের ধারক, প্রচারক ও আহবায়ক। এ ইল্ম তারা এক সিনা থেকে অন্য সিনায় অর্জন করেছেন।

ইল্ম ও সাধারণ জ্ঞানের পার্থক্য

ইল্ম এবং সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে। একবার হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, ইল্ম কাকে বলে? কেউ বলল, 'জানা', কেউ বলল, 'চিনা', কেউ অন্য উত্তর দিল। হযরত নীরবে শুনে গেলেন; কোনো মন্তব্য করলেন না। ছাত্ররা এবার আরজ করল, হযরত আপনিই বলে দিন। তখন হযরত বললেন, ইল্ম এমন একটি আলো, যা অর্জিত হওয়ার পর আমল করা ব্যতীত প্রশান্তি আসে না। কারণ, মানুষের মস্তিষ্কে যেসব জ্ঞান রয়েছে; অথচ সেগুলো বাস্তবজীবনে নেই, সেগুলো সাধারণ জ্ঞান – ইল্ম নয়। এ কারণেই শরীয়ত 'ইল্মে নাফে'র (উপকারী ইল্ম) জন্য দু'আ করার আদেশ দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে ইল্মে নাফে' দান করুন। ইল্মে নাফে' তাকেই বলবে, যার ওপর আমল করা হবে। কিন্তু যদি শুধু সাধারণ জ্ঞান হয়, শুধু জানে কিন্তু আমল করে না, তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দেয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বেআমল পীর ও বেআমল আলেম

পবিত্র কুরআনে বেআমল পীরদের কুকুরের সঙ্গে আর বেআমল আলেমদের গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বালআম বাউর নামে এক লোক বনী ইসরাঈলের পীর ও সূফী ছিল। যুগের নবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে সে পথভ্রষ্ট হয় এবং যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা হতে বহু নিচে পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে বলেন,

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

'তার দৃষ্টান্ত হলো কুকুরের মতো।'[১]

এমনিভাবে যেসব ইহুদি আলেম তাদের দীন অনুযায়ী আমল করেনি বরং নিজেদের হীনস্বার্থের জন্য তাওরাতে বিকৃতি সাধন করেছিল, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

'এরা গাধার মতো, যাদের ওপর বোঝা চাপানো ছিল।'[২]

আমলের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত যাকে ইল্ম দান করেন, সে বড়ই সৌভাগ্যবান মানুষ। আল্লাহর পথে সে একটি কদম উঠানোর তাওফীকপ্রাপ্ত হয়েছে; কিন্তু এখনও কাজ শেষ হয়নি। বরং এ কেবল শুরু। তার পরবর্তী কদম হলো 'আমল'। এক বুযুর্গ বলেন, ইল্ম আমলের দরজায় করাঘাত করে। যদি খোলে, তাহলে সৌভাগ্য। আর যদি না খোলে, তাহলে সর্বদার জন্য হারিয়ে যায়। বাস্তবেই আপনি দেখুন, যাদের ইল্ম অনুযায়ী আমল নেই, তারা অল্প কিছু দিনেই ইল্ম হতে রিক্ত হয়ে যায়। নামে যদিও আলেম থাকে; কিন্তু ইল্মের হাকিকত তাদের অন্তর থেকে বিদায় নেয়। যেমন- ইল্ম হলো মেহমান। যতক্ষণ-না তা আমলের ছাঁচে ঢালা না হয়। 'রাসিখ ফিল ইল্ম' তখন হয়, যখন ইল্ম অনুযায়ী আমল হয়। এ কারণেই বলা হয়,

اَلْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرٍ بِلَا ثَمَرٍ

'আমল ব্যতীত ইল্ম ফলহীন গাছের মতো।

আমল দিয়েই ইল্মের ওজন তৈরি হয়

একটি ইল্মী রহস্য আলোচনা করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত ইল্ম অনুযায়ী আমল না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইল্মে ওজন আসবে না। এর প্রমাণ হলো, যখন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাবড়ে গেলেন। তিনি দ্রুত ঘরে গিয়ে বলতে লাগলেন,

১. সূরা আরাফ : ১৭৬

২. সূরা জুমুআহ : ৫

دَثِّرُوْنِيْ - دَثِّرُوْنِيْ - زَمِّلُوْنِيْ - زَمِّلُوْنِيْ

'আমাকে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে দাও-আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।'

স্ত্রী হযরত খাদীজা (রাযি.) কে বললেন, আমার ভীষণ ভয় লাগছে। মনে হয়, আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আম্মাজান হযরত খাদীজা (রাযি.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অসম্ভব; কিছুই হবে না আপনার।

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ

'আপনি আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর রাখেন।'

تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ

'উপার্জনে অক্ষম লোকদের কামাই করে সাহায্য করেন।'

وَتَحْمِلُ الْكَلَّ

'সহায়হীনদের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেন।'

وَتقري الضَّيْفَ

'মেহমানদের আপ্যায়ন করেন।'

وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

'হক্কের পক্ষে সহযোগীতা করেন।'

মুহাদ্দিছীনে কেরাম এখানে একটি বিশেষ তত্ত্ব লিখেছেন। হযরত খাদীজা (রাযি.) নবীজির ইল্‌মী কামালাত তথা জ্ঞানবিষয়ক কৃতিত্বগুলো প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেননি। এ কথা বলেননি যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে, আপনি আল্লাহর পয়গম্বর, আপনি দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশা। বরং ঐ গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলোই উল্লেখ্য করেছেন, যেগুলো আমলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। বোঝা গেল, হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর দৃষ্টি ছিল আমলের দিকে। তিনি নবীজির সাহচর্য পাওয়ার সুবাদে জানতেন, মানুষের মধ্যে ইল্‌মের পর যখন আমল এসে যায়, তখন আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত এমন বান্দাদের ধ্বংস করেন না।

সমগ্র পৃথিবীর সৌভাগ্যের উৎস

গোটা পৃথিবীতে যত সৌভাগ্য রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে সেগুলোকে একত্রিত করে দিয়েছেন।

আয়াতটি হলো,

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

'আল্লাহ নবীগণ, সত্যবাদীগণ এবং সৎকর্মশীলগণের ওপর তাঁর রহমত বর্ষণ করেছেন।'[১]

এখানে 'নবীগণ' এবং 'সত্যবাদীগণ' উভয় শ্রেণির বেশি সম্পর্ক 'ইল্‌মের' সাথে। এক শ্রেণি নবুওতের দাবি করেছেন, অপর শ্রেণি তার সত্যায়ন করেছেন। আর বাকি দুই শ্রেণি 'শহীদগণ' ও 'সৎকর্মশীলগণ' এদের সম্পর্ক বেশির ভাগ আমলের সঙ্গে। তো একথা স্পষ্ট বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সবধরনের সৌভাগ্যকে ইল্‌ম ও আমলের মধ্যে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। আমল ছাড়া ইল্‌মও বিপজ্জনক, আবার ইল্‌ম ছাড়া আমলও বিপজ্জনক।

হযরত ইউসুফ (আ.) : শূন্য থেকে পূর্ণতায়

স্মরণ রাখবেন, যখন ইল্‌ম অনুযায়ী আমল হয়, তখন মানুষ এক ভিন্ন ধরনের শক্তি অর্জন করে। এর প্রমাণস্বরূপ পবিত্র কুরআন থেকে দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি। একটি হলো হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা। যখন তিনি ইল্‌মওয়ালা ছিলেন না, তখন সাধারণ বিক্রয়যোগ্য পণ্য হয়ে মিসরের বাজারে উঠেছিলেন।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে ইল্‌মে ওহী দান করলেন এবং সেই ইল্‌ম অনুযায়ী তিনি শতভাগ আমলও করলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে অজ্ঞাত কূপ থেকে তুলে মিসরের রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিলেন আর তার ভাইয়েরা এ কথা জানতেন যে, ইউসুফকে হত্যা করা অনেক বড় অন্যায় ও মহাপাপ। তারপরও হিংসার বশবর্তী হয়ে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করে তারা হযরত ইউসুফ (আ.)কে কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন আর নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, আমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করে নিব; তিনি বড়ই ক্ষমাশীল।

তো বোঝা গেল, যারা ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করবে না, বরং গুনাহ করে বলবে, পরে তাওবা করে নিব, এদের পরিণতি হযরত ইউসুফ এর ভাইদেরই মতো হবে।

---

১. সূরা নিসা : ৬৯

অপরদিকে ঘটনাটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্য পরীক্ষা ছিল। একবার জুলায়খার পক্ষ থেকে গুনাহের আহ্বান এল। কঠিন পরীক্ষা ছিল সেটি। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন,

مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاى

'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই! তিনিই আমার রব এবং আমার সর্বোত্তম ঠিকানা।'[১]

যখন তিনি আল্লাহকে ভয় করে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করলেন, তখন আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, সে আমার মুখলিস বান্দাদের একজন। তারপর আরেকটি পরীক্ষা এল। বেশ কিছু বছর তাঁকে জেলে কাটাতে হলো। অবশেষে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর এমন সময় এল যে, জেলখানা থেকে তাঁকে বের করে সোজা সিংহাসনে বসানো হলো। গোটা কওম দুর্ভিক্ষের কষাঘাতে জর্জরিত। হযরত ইউসুফের ভাইয়েরাও দুর্ভিক্ষের কারণে মানবেতর জীবন যাপন করছে। খাদ্যের জন্য তারা তার কাছে এসে সাহায্য প্রার্থনা করল।

আল্লাহ তা'আলার শান দেখুন। উভয় দিকে একই পিতার সন্তানরা। এ দিকেও নবীর সন্তান, অপর দিকেও নবীর সন্তান। কিন্তু আমল ও কর্মের কারণে উভয়ের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেছে। হযরত ইউসুফ (আ.) দিচ্ছেন আর তাঁর ভাইয়েরা নিচ্ছেন। ইনি উপবিষ্ট সিংহাসনে আর তারা দাঁড়িয়ে মাটির আসনে। তার পরের ঘটনা আপনারা জানেন। তারা তাঁর কাছে একটু বাড়তি খাদ্য চেয়েছিল। তিনি সেই সুযোগে কৌশল করে ছোট ভাই বিনইয়ামীনকে কাছে নিয়ে এলেন। কথপোকথনের এক পর্যায়ে তিনি ভাইদের বললেন,

مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ

'তোমরা ইউসুফের সঙ্গে কী আচরণ করেছিলে?'[২]

ভাইয়েরা হতবাক হয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিই ইউসুফ। আল্লাহ আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন।

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

---

১. সূরা ইউসুফ : ২৩

২. সূরা ইউসুফ : ৮৯

'নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ তা'আলা সেই সব সৎকর্মশীলদের বিনিময়কে ধ্বংস করবেন না।'[১]

তো প্রত্যেক যামানায়, প্রত্যেক যুগেই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের মতো যে ব্যক্তি গুনাহ করবে আবার তাওবার আশায় গুনাহ ত্যাগও করবে না, তাকে মাটির আসনেই বসানো হবে। আর যে ইউসুফ (আ.)-এর মতো গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে জীবন যাপন করবে, তাকে আল্লাহ রব্বুল ইয্যত মর্যাদার মুকুট পরিধান করাবেন।

রানী বিলকিসের সিংহাসন ইল্‌মের ডানায়

দ্বিতীয় ঘটনা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর। তিনি তাঁর অনুগত জিনদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, রানী বিলকিসের সিংহাসনটা কে নিয়ে আসবে? এক জিন বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি এ স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি তা নিয়ে আসতে পারব। তিনি বললেন, এভাবে অনেক দেরি হয়ে যাবে। অন্য কোনো উপায় বলো। তারপর আরেকজন – যার কাছে কিতাবের ইল্‌ম ছিল – দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী!

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

'আপনার চোখের পলক পড়ার আগেই আমি তা নিয়ে আসতে পারব।'[২]

হযরত সুলাইমা (আ.) একবার চোখের পলক মারার পরই দেখতে পেলেন, তার সামনে সিংহাসন উপস্থিত। এই দৃশ্য দেখে তিনি বললেন,

هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

'এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ।'[৩]

এখানে বোঝা গেল, মানুষ যখন ইল্‌মের ওপর আমল করে, তখন সেটি আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

ইখলাস ও অমুখাপেক্ষিতার প্রয়োজনীয়তা

সাধারণ মানুষের ইসলাহ ও পরিশুদ্ধির চেয়ে ওলামায়ে কেরামের ইসলাহের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। কারণ, সাধারণ মানুষের বিচ্যুতির

---

১. সূরা ইউসুফ : ৯০

২. সূরা নামল : ৪০

৩. সূরা নামল : ৪০

দ্বারা দীনের ওপর কোনো দাগ লাগে না। কিন্তু ওলামায়ে কেরামের বিচ্যুতির কারণে দীনের ওপর আঁচড় লেগে যায়। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, আমাকে এক ছোট্ট শিশু নসীহত করেছিল; আজও আমি তা ভুলিনি। কেউ জিজ্ঞাসা করল, কী ছিল সেটি? বললেন, বৃষ্টি হয়েছিল। আমি পথ চলছিলাম। সামনের দিক থেকে একটি ছোট্ট শিশু এল। আমি তাকে বললাম, খুকী! একটু সাবধানে চলো; পা পিছলে পড়ে যাবে। সে আমাকে বলল, আচ্ছা! কিন্তু আমার চেয়ে আপনি বেশি সাবধানে চলবেন। আমি পড়লে তো একা পড়ব; কিন্তু আপনি পড়ে গেল গোটা জাতি পিছলে যাবে।

এ মজলিসে যেসব আলেম আছেন, একটু কান খুলে মনযোগসহকারে শুনুন। কথাটি হয়তো কারো কাছে খারাপও লাগতে পারে। তিতা অষুধ তিতা হলেও রক্ত কিন্তু দ্রুত পরিষ্কার করে। কথাটি হলো, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইল্ম দান করেছেন, তার জন্য নিজের মধ্যে ইখলাস ও অমুখাপেক্ষিতা তৈরি করা খুবই জরুরি। এটি এ পথে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কদম।

ইল্‌মের শান ও মর্যাদা

মুহতারাম ওলামায়ে কেরাম! অমুখাপেক্ষিতা ছাড়া ইসলামের সৌন্দর্য রক্ষা পায় না। ইস্তিগনা তথা অমুখাপেক্ষিতা না থাকলে ইল্‌মের শান বাকি থাকে না। এজন্য ওলামায়ে কেরামের উচিত, তারা অমুখাপেক্ষিতার সাথে জীবন যাপন করবে। মানুষের পকেটের দিকে না তাকিয়ে আল্লাহ তা'আলার খাযানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। রিযিক তাকে মসজিদ কমিটি দেবে না, দেবেন আল্লাহ। এরা তো সেখান থেকে খাবেন, যেখান থেকে আল্লাহ তাঁর নবীদের খাইয়েছেন। কারণ, এরা নবীগণের ওয়ারিস। আজ উম্মতের মধ্যে এ কারণেই বেশি বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে আছে। ওলামায়ে কেরামের মধ্যে লোভ-লালসা ঢুকে গেছে। তারা মসজিদে হক কথা বলেন না, পাছে মসজিদ কমিটি অসন্তুষ্ট না হয়ে যান। মহল্লার মানুষ না জানি কী বলে ইত্যাদি। না; মুহতারাম! এমনটা আপনার শানে শোভা পায় না। আপনি অত্যন্ত ইস্তিগনা ও অমুখাপেক্ষিতার সাথে হক কথা বলেই যাবেন। এটাই আপনার পূর্বসূরী ও বুযুর্গানে দীনের গৌরব ছিল। আপনি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। আল্লাহ আপনাকেও তাদের মতো গৌরবান্বিত করবেন।

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর অমুখাপেক্ষিতা

মানুষ যখন অমুখাপেক্ষিতার সাথে কাজ করে, তখন দুনিয়া তার পিছনে ছুটতে থাকে। হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) বলতেন, যে আমাকে অভাবী

ও মুখাপেক্ষিতা ভেবে হাদিয়া দেয়, আমার অন্তর তার হাদিয়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তবে সুন্নাত মনে করে কেউ দিলে সেটা অবশ্যই গ্রহণ করব। একবার একব্যক্তি এসে হযরতকে কিছু হাদিয়া পেশ করল। হযরত অনুভব করলেন, এ ব্যক্তি তো করুণার অনুভূতি নিয়ে হাদিয়া দিচ্ছে। তাই হযরত তার হাদিয়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিও পিছু ছাড়ছে না। বলছে, হযরত! গ্রহণ করুন, হযরত! গ্রহণ করুন। হযরত কয়েকবার এমন করার পর কঠোর ভাষায় বলে দিলেন, না; আমি তোমার হাদিয়া গ্রহণ করব না। হযরতের চেহারার জালালী ভাব দেখে সে পিছু হটে গেল। হযরত যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তার দৃষ্টি হযরতের জুতার ওপর পড়ল। সে ভাবল, মসজিদ থেকে বের হয়ে হযরত জুতা তো পরিধান করবেনই। সুতরাং জুতার ভিতরে রেখে দেওয়া যাক। তারপর সে ওই হাদিয়ার পয়সাগুলো জুতোর ভিতরে রেখে চলে গেল। হযরত কাসেম নানুতবী রহ.ও মসজিদ থেকে বের হতে জুতায় পা রাখতে গিয়ে দেখলেন, ওই হাদিয়ার পয়সাগুলো জুতার ভিতরে রাখা। তিনি মুচকি হেসে বললেন, এ তো দেখি ওই পয়সাগুলোই। আগে শুনেছি আর আজ স্বচক্ষে দেখলাম, যে দুনিয়াকে লাথি মারবে, দুনিয়া এসে তার জুতায় ধরা দেবে।

হযরত থানবী (রহ.)-এর অমুখাপেক্ষিতা

একবার হযরত থানবী (রহ.)-এর হাতে এক বড় নবাব বায়‘আত গ্রহণ করল। লোকটি বড়ই ধনবান। ওই সময় মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন হতো মাত্র পাঁচ রূপী। সে হযরতের জন্য একলক্ষ রূপী পাঠিয়ে দিল। হযরত তার চিঠি পড়ে অনুভব করলেন, সে তো করুণা করার মনোভাবে হাদিয়া পাঠিয়েছে। হযরত সেই লক্ষ রূপীর মানিঅর্ডার ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। সে খুব বিস্মিত হলো। পাল্টা জবাব দিল, হযরত! আমি আপনার হাতে বায়‘আত হয়েছি। এক লক্ষ রূপী আপনাকে হাদিয়া দিয়েছি। আমার মতো ধনবান মুরীদ আপনি কোথাও পাবেন না। হযরত তার চিঠির পাল্টা জবাব দিলেন, ‘আমি তোমার মতো ধনবান মুরীদ যদি না পাই, তাহলে মনে রেখো, আমার মতো পীরও তুমি কোথাও পাবে না।’

একটি চমৎকার ইসলাহী কথপোকথন

এই অধমের কাছে একবার একব্যক্তি এল। বলতে লাগল, হযরত! আমরা এই করি, ওই করি, এটা পালন করি, ওটা পালন করি। আমি বললাম, কেন কর? সে বলল, সমস্যাটা-ইবা কী?

আমি বললাম : যদি আপনার ঘরে উন্নত মানের কার্পেট থাকে আর আপনি তার ওপর ছালার চট বিছিয়ে দেন, তাহলে কেমন লাগবে?

লোকটি : হ্যাঁ, ভালো তো লাগবে না, কিন্তু এতে সমস্যাইবা কী? আমি বুঝতে পারলাম, লোকটার বুদ্ধি-শুদ্ধিতে একটু সমস্যা আছে।

বললাম : জনাব, আপনার নাম কী?

লোকটি : আব্দুর রহমান।

আমি : আচ্ছা আজ থেকে আমি আপনাকে আব্দুর রহমান বেকুব বলে ডাকব; কী বলেন?

লোকটি : আপনি এভাবে কেন বলবেন?

আমি : কেন? এতে সমস্যাই কি? যদি সকল ক্ষেত্রে একথাই প্রমাণ হিসেবে সামনে আসে যে, 'সমস্যা কী?' তাহলে নামের সঙ্গে 'বেকুব' যোগ করলে সমস্যা কী?

লোকটি : না, না, হযরত! আমার নাম তো আব্দুর রহমান অন্য কিছু নয়।

তারপর আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, তোমার নামের সঙ্গে যেমন একটা খারাপ শব্দ তুমি সহ্য করতে পারলে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর প্রিয় রাসূলের সুন্নাতের সঙ্গে বিদ'আতের কোনো জোড়া-তালি পছন্দ করেন না।

স্মরণ রাখবেন! কোনো কওমের মধ্যে যখন কোনো বিদ'আত এসে যায়, তখন তার বিপরীতে আল্লাহ্ সেখান থেকে একটি সুন্নাতকে উঠিয়ে নেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সেই সুন্নাতটি আর তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেন না। সুতরাং বিদ'আত পরিহার করে সুন্নাতের পথকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা সবার জন্য জরুরি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আকাবিরকে উত্তম বিনিময় দান করুন যে, তাঁরা না বাড়াবাড়িতে ছিলেন, না ছাড়াছাড়িতে। বরং তারা এক হাতে ইল্ম আর অপর হাতে আমল নিয়ে এগিয়ে গেছেন। আর এটাই 'সিরাতে মুসতাকীম' তথা দ্বীনের সরল পথ। আল্লাহ্ আমাদের সরল পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের ব্যাখ্যা

আমি একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের ব্যাখ্যা দিচ্ছি। ভালো করে শুনে নিন। যখন ইল্মও পরিপূর্ণ হবে, আমলও পরিপূর্ণ হবে, তখন সবকিছুতেই জোড় দেখতে পাবেন। অন্যথায় সবকিছুতেই বিচ্ছেদ ও ভিন্নতা দেখতে পাবেন। প্রকৃত আলেমের পরিচয় হলো, সে সুফী সম্প্রদায়ের মূল্যায়নকারী হবে এবং

প্রকৃত সুফীর পরিচয় হলো, সে ওলামায়ে কেরামের মূল্যায়নকারী হবে। অন্তরের পাতায় লিখে রাখুন। যখন ইল্মও অসম্পূর্ণ হবে এবং ইশকে মাজাযীও অসম্পূর্ণ হবে, তখন উভয়টাকে সাংঘর্ষিক মনে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি ঘটনা মনে পড়েছে; শুনুন।

খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর সিমা'র মাহফিল

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়াহ (রহ.) একজন জযবা ও হালাতওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। আধ্যাত্মিক না'ত শুনতে খুব পছন্দ করতেন। আধ্যাত্মিক না'ত শুনে তার মধ্যে ওয়াজ্‌দ্'র হালত তৈরি হয়ে যেত। সেযুগে একেই 'মাহফীলে সিমা' বলা হতো। এসব না'তে সারেঙ্গী, তবলা ও বাদ্যযন্ত্র কিছুই থাকত না। এই যে আজ-কাল বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শোনা যায়, এসব এ যুগের লোকেরা সংযোজন করে নাম লাগাচ্ছে বুযুর্গদের। একটু কিতাবাদি পড়ে দেখুন সেকালের মাহফিলে সিমা' বলতে কি ধরনের মাহফিলকে বোঝানো হতো। 'আওয়ারিফুল মা'আরিফে' লেখা আছে, যেখানে বাদ্যযন্ত্র হবে, সে সিমা শোনা হারাম। যেখানে বেগানা নারী-পুরুষ সমবেত হয়, সেখানে বসা হারাম। খাজা নিযামুদ্দীন (রহ.) যখন ইশকিয়্যা আশআর শুনতেন, তখন তার ওপর ওযাজদ'র হালত এসে পড়ত। সেকালে হাকীম জিয়াউদ্দীন নামের এক বুযুর্গ ছিলেন, যাকে সেযুগের বাদশা প্রধান পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন যে, দেশের যেখানেই শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ড দেখবে, সঙ্গে-সঙ্গে তাতে বাধা প্রদান করবে। তাকে কাজী বলা হতো। তো তিনি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, কে কোথায় শরীয়তপরিপন্থী কাজ করছে। কাউকে এমন পাওয়া গেলে সঙ্গে-সঙ্গে তা বন্ধ করে দিতেন।

একবার তিনি জানতে পারলেন, হযরত খাজা নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.) শহরের বাইরে কোথাও শামিয়ানা টাঙিয়ে সিমা'র মাহফিল শুনছেন। কাজী সাহেব জানতে পেরে প্রশাসনিক লোকজন নিয়ে মাহফিলে উপস্থিত হলেন। মাহফিলে তখন একদিকে কবিতা আবৃত্তি হচ্ছিল, অপরদিকে মানুষজন ওয়াজদের কারণে লাফালাফি করছিল। তারা বলতেও পারবে না, কাজী সাহেব তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কিছুক্ষণ তো তিনি সহ্য করলেন। পরক্ষণেই ভাবলেন, নাহ, একে এখানেই শেষ করে দিতে হবে। তারপর তিনি শামিয়ানার রশি কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, চতুর্দিকের রশিগুলো কেটে ফেলার পরও শামিয়ানা পূর্বের ন্যায় যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। মাটিতে পড়েনি। কাজী সাহেব স্বীকার করলেন,

এরা সত্যিকারের ওয়াজদের হালতে আছে, যা তাদের ইশক-মহব্বতের সত্যতাকে প্রমাণ করে। তারপর তিনি দলবল নিয়ে নীরবে সেখান থেকে চলে গেলেন। এতদ্বসত্ত্বেও তিনি বলতেন, আমি একে বিদ'আতই মনে করি।

হাকীম জিয়াউদ্দীন (রহ.) ও সুন্নাতের আদব

কিছুদিন পর হাকীম জিয়াউদ্দিন (রহ.) অসুস্থ হয়ে গেলেন। খাজা নিযামুদ্দীন (রহ.) যখন জানতে পারলেন, ভাবলেন, যুগের এত বড় একজন মুত্তাবিয়ে সুন্নাতে আলেম তিনি, তাঁকে দেখতে যাওয়া উচিত। খাজা নিযামুদ্দীন (রহ.) তাঁকে দেখার জন্য তাঁর বাড়িতে পৌঁছে ভিতরে সংবাদ পাঠালেন, নিযামুদ্দীন আপনাকে দেখতে এসেছে। হাকীম সাহেব ভিতর থেকে উত্তর পাঠালেন, 'এটি আমার শেষ সময়। কখন প্রাণ চলে যায় বলতে পারি না। জীবনের শেষ মুহূর্তে কোনো বিদ'আতীর চেহারা দেখা আমি পছন্দ করছি না।'

এবার চিন্তা করুন, কি কঠিন উত্তর পাঠালেন। খাজা নিযামুদ্দীন (রহ.) তখন বুঝতে পারলেন, হাকীম সাহেব সুন্নাতের মহব্বতে আত্মহারা হয়ে এমন কঠিন উত্তর দিচ্ছেন, তখন তিনিও পাল্টা জবাব পাঠালেন, গিয়ে বলো, 'এক বিদ'আতী আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ঠিক, কিন্তু বিদআত থেকে তাওবা করার জন্য। যখন এই জবাব হাকীম সাহেবকে শোনানো হলো, তখন তিনি শায়িত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত জোশের সঙ্গে উঠে বসলেন। মাথার পাগড়িটি খুলে খাদেমের হাতে দিয়ে বললেন, আমার বিছানা থেকে দরজা পর্যন্ত এটি বিছিয়ে দাও এবং হযরতের কাছে আবেদন জানাও, তিনি যেন জুতাসহ এই পাগড়ি মাড়িয়ে সসম্মানে ভিতরে প্রবেশ করেন।

বোঝা গেল, যখন ইল্‌মও পরিপূর্ণ হয় এবং আমলও পরিপূর্ণ হয়, তখন পরস্পরে মর্যাদার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত আমাদের ইল্‌ম ও আমল দান করুন এবং তাতে ইখলাস তৈরি করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

গ্রন্থরচনা ও লেখালেখির গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

ইসলামের মর্যাদা

দীনে ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্য আল্লাহকর্তৃক নির্ধারিত ও আমলযোগ্য জীবনবিধান। সময়ের পরিবর্তনের চাহিদা বুঝে সে অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন করা ইসলামের একটি মহান বৈশিষ্ট্য। ফুকাহায়ে কেরাম 'ফিকহে ইসলামীকে' এমনভাবে সঙ্কলন করে দিয়েছেন যে, সেই নকশে হায়াতকে অনুসরণ করলে যেকোনো যুগের যেকোনো মাসআলা সম্পর্কে নিমিষেই দিকনির্দেশনা নেওয়া যেতে পারে। এমন কোনো স্থান, সময় কিংবা পরিস্থিতি নেই, যেখানে ইসলাম মানুষকে তার জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারবে না। নেই; এমন কিছুই নেই।

দুনিয়ার তাবৎ ধর্মগুলোর বিলুপ্তির কারণ

ইহুদি ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্ম আজ প্রাণশূন্য হওয়ার পিছনে মূল কারণ হলো, সেই ধর্মের আলেম ও পাদ্রীরা প্রত্যেকেই নিজ-নিজ যুগে সুবিধামতো নিজেদের কিতাবের বিধানের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে। এর অর্থ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রচুর কারচুপি করেছে। যেখানে নিজের স্বার্থ দেখত, সেখানেই মনমতো ব্যাখ্যা দিত। তো যেখানে ধর্মীয় গ্রন্থ হেফাযতের দায়িত্ব তাদের ওলামায়ে কেরামের ওপর ন্যস্ত ছিল, আর সেই ওলামায়ে কেরামই তার মধ্যে বিকৃতি ও তাহরীফ করতে লাগল, তখন তাদের মূল কিতাব কিভাবে সংরক্ষিত থাকবে? পরিণতি স্পষ্ট যে, আজ সেসব ধর্মীয় গ্রন্থ একটিও বিকৃতিমুক্ত নয়।

দীনে ইসলামের হেফাযত

দীনে ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার হিফাযতের দায়িত্ব স্বংয় আল্লাহ তা'আলা নিজের ওপর নিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْن.

'এই নসিহতনামাকে আমিই নাযিল করেছি এবং এর হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও আমার।'[১]

স্বংয় সৃষ্টিকর্তাই যখন এ কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব নিলেন, তো এখন ওলামায়ে কেরামের একটি হকপন্থী জামাত এমন থাকবে, যারা এ দীনের মধ্যে কোনো ধরনের বিকৃতি বা বিচ্যুতি আসতে দেবেন না। যেখানেই সে অপব্যাখ্যা বা বিকৃতি সাধনের চেষ্টা করবে, সেখানেই আলেমগণ তা চিহ্নিত করে তার বিরোধিতা করবেন। এই জামাতকে কুরআনে পাকে 'আল্লাহর দল' বলা হয়েছে।

أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

'অবশ্যই আল্লাহর এই দলটি সর্বদাই সফল থাকবে।'[২]

হাদীছে আছে,

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء

'ওলামায়ে কেরাম নবীগণের ওয়ারিস।'

তাই ঈমানের পর তাদের মৌলিক দায়িত্ব হলো দীনের হেফাযত করা।

ইংরেজী শিক্ষিতদের এক আশ্চর্য ভাবনা

আজকাল ইংরেজী শিক্ষিত ভাইদের অধিকাংশই এই দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন যে, আলেমদের ইংরেজী ভাষা, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান পড়া উচিত। কিন্তু তারা এ কথা ভুলে যায় যে, তাদের ওপরও তো আরও বড় গুরুদায়িত্ব অর্পিত আছে। আর তা হলো দীনের হেফাযত। এরা চৌদ্দশত বছর পূর্বের দীনকে অবিকৃত অবস্থায় যেমন ছিল তেমনভাবেই হেফাযত করবেন। এজন্য দৃষ্টিভঙ্গি এর বিপরীত হওয়া দরকার ছিল। তা হলো, সকল ইংরেজী শিক্ষিত লোকের দীন শেখা উচিত, ওলামায়ে কেরামের জন্য ইংরেজী বা প্রযুক্তি-বিজ্ঞান শিক্ষা করা

---

১. সূরা হিজর : ৯

২. সূরা মুজাদালা : ২২

জরুরি নয়। এগুলো সবার নিজ-নিজ রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি। তবে একটি কথা ভালো করে মনে রাখবেন যে, এই ওলামায়ে কেরাম যুগের পরিস্থিতির সামনে মাথা নত করে না। বরং তারা দীনকে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যেভাবে পেয়েছে, অবিকল সেভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করে। তাই এখন আর তাদের জন্য ইংরেজী পড়ার দরকার নেই। তবে যারা ইংরেজী পড়ে, তাদেরকে দীনও পড়িয়ে দাও। এটাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

দাসত্বের দুটি শতাব্দী

মুসলমানরা এই উপমহাদেশে যেভাবে দাসত্বের দুটি শতাব্দী পার করেছে, যদি তখনকার ধর্মীয় নেতৃত্ব আমাদের মতো বোকাদের হাতে হতো, তাহলে দীনের কী যে অবস্থা হতো, তা কেউ জানে না। হয়তো হাজারো দীনে ইলাহী আবিষ্কার হতো। আজকালের তরুণরা তো ইংরেজদের কৃষ্টিকালচারের অন্ধপূজারী। তারা প্যান্ট, কোট-টাই লাগিয়ে চলা-ফেরা করতে বেশি পছন্দ করে। কবি বলেন,

انھوں نے دین کہاں سیکھا بھلا جا کے مکتب میں

پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

'তারাইবা মক্তবে গিয়ে দীন শিখল কোথায়? বড় হলো কলেজে চক্কর খেতে-খেতে আর মরল স্যারের অফিসে!'

এ কারণেই বলি, যদি সেই চরম মুহূর্তে দীনি নেতৃত্বের ভার আমাদের কাঁধে ন্যস্ত হতো, তাহলে ইংরেজী কৃষ্টি-কালচার ও স্বভাব-চরিত্রকেই পরবর্তী প্রজন্মের সামনে সুন্নাতে ইসলামিয়ারূপে পেশ করতাম। আল্লাহ আমাদেরও বাঁচিয়েছেন, সুন্নাতকেও বাঁচিয়েছেন।

নিউওয়র্কে এক টাই আলেমের অভদ্র উক্তি

কিছুদিন আগে নিউওয়র্কে একলোক কোট-প্যান্ট-টাই লাগিয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিল। এমন লোকদের আমরা 'টাই আলেম' বলি। সে খুতবা দিতে গিয়ে বলতে লাগল, কুফরের অনুসরণ কুফর নয়। আজকের যুগে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকতেন, তাহলে তিনিও কোট, টাই, প্যান্ট ইত্যাদি পরিধান করতেন। (তার মুখে মাটি পড়ুক) সৌভাগ্যবশত সেই মজলিসে এক আশেকে নবী ছিল। একথা শুনে সে সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলল, জনাব! আপনি তো আমার প্রিয় রাসূলের কথা বলছেন

যে, এ যুগে তিনি থাকলে তিনিও, কোট, টাই, প্যান্ট পরিধান করতেন। কিন্তু শুনুন। আমি সেই রাসূলের দাসের দাসের দাসের দাসও হতে পারিনি। এ অধম আমিই তো ইংরেজদের পোশাককে ঘৃণা করি, আপনি কি করে বলতে পারলেন, তিনি এটা পছন্দ করবেন? তারপর সে একটি দামী কথা বলন, মাওলানা! নিজের ধ্যান-ধারণা একটু মেজে-ঘষে ঠিক করে নিন। বুঝে-শুনে কথা বলুন। নবীগণ দুনিয়াতে কারো অনুসরণ করার জন্য আসেন না। বরং তাঁদের আগমন হয়, লোকেরা যেন তাদের অনুসরণ করে জীবন সাজায়। সে একেবারে সঠিক উত্তর দিয়েছিল। এই উত্তরের পক্ষে কুরআনের দলিলও আছে। যেমন- আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ.

'আমি বিভিন্ন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি শুধু তাদের অনুসরণ করার জন্য।'[১]

যদি নবীগণ অনুসরণকারী হতেন, তাহলে তো হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের সাথে মিলে যেতেন, কোনো সংঘর্ষ হতো না। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী যুগের রসম-রেওয়াজ অনুযায়ী জীবন যাপন করতেন, এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-রক্তপাতের কোনো প্রয়োজন হতো না। কিন্তু ব্যাপারটা এমন ছিল না। তাই তাঁরা শির্ক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মতো অটল হয়ে সংগ্রাম করেছেন। সিসাঢালা প্রাচীর হয়ে বাতিলের মোকাবেলা করেছেন। আর এ কারণে তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে অসহনীয় কষ্ট, ত্যাগ ও তিতিক্ষা। অবশেষে চূড়ান্ত বিজয় তাঁদেরই ঝুলিতে এসে ধরা দিয়েছে।

সত্যের জয়

হাদীছে এসেছে, সবচেয়ে বেশি বিপদ এসেছে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওপর। তারপর তাঁদের মতোদের ওপর, তারপর তাদের মতোদের ওপর। তো এসব কষ্ট-মুজাহাদা এজন্য ছিল যে, তাঁদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পদ্ধতির জীবন দান করা হয়েছে আর তাঁরা সেই পদ্ধতির ওপর জমে গিয়েছিলেন। কুফরি শক্তি সর্বদা আঘাত হানত। কিন্তু তাঁরা স্বীয় মিশনে পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হক দিয়ে বাতিলকে প্রতিহত করেন এবং হকের পক্ষে চূড়ান্ত বিজয়ের ফয়সালা করেন।

---

১. সূরা নিসা : ৬৪

ক্লিনসেভ এক মুফতীয়ে আযম

মানুষ যখন দেশের বাইরে পা রাখে, তখন স্বদেশের ওলামায়ে কেরামের কদর বুঝে আসে। বিশ্বাস করুন, বহির্বিশ্বের অবস্থা এতটা অধঃপতনের স্বীকার হয়েছে, ইংরেজী কৃষ্টি-কালচার সেখানে এমন ব্যাপকতা লাভ করেছে, গোমরাহি সবখানে এমনভাবে চেপে বসেছে যে, সেখানকার ওলামায়ে কেরাম পর্যন্ত তার অগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়েছে। আমি একবার এক দেশের মুফতীয়ে আযমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। আমি সীমাহীন আশ্চর্য হলাম যে, সে পরিষ্কার ক্লিনসেভ (দাড়িছাঁচা) মুফতী। এত বড় দেশ যে, তার কাছে পারমাণবিক শক্তি পর্যন্ত আছে। অথচ এমন শক্তিশালী দেশটা সুন্নাত থেকে বঞ্চিত। বরং সুন্নাতকে তারা এমন মনে করে, যেমনটা সাধারণ মানুষ মুস্তাহাব আমলকে গুরুত্বহীন মনে করে।

তুর্কিস্তানে মসজিদের অবমাননা

আপনি তুর্কি দেশগুলোতে গিয়ে দেখুন। আপনি মসজিদের কাতারগুলোর আশে-পাশে সিগারেটের ছোট-ছোট টুকরা দেখতে পাবেন। ঘটনা হলো, কিছু লোক যখন নামায পড়ে আর কিছু অপেক্ষা করে, তখন তারা সিগারেট টানতে থাকে, যখন জামাত দাঁড়ায়, তখন সিগারেট নিভিয়ে আল্লাহু আকবার বলে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। মসজিদগুলোর এই দুরবস্থা সেখানকার ওলামায়ে কেরামের নৈতিক অধঃপতনের কারণেই হয়েছে।

নারীদের করুণ দশা

সেখানকার নারীরা স্কার্ট পরতে শুরু করেছে। তাদের পা হাঁটু পর্যন্ত খোলা থাকে। মাথা খুলে বেপর্দায় চলার সুযোগ পেল কিভাবে? শুধু ওলামায়ে কেরামের দুর্বলতার কারণে। এখন সেখানকার পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে, আপনি সেখানে মুসলিম বসতিগুলোতে গিয়ে দেখুন, আপনি বুঝতেই পারবেন না, এ মুসলমানদের বসতি, না ইংরেজদের বসতি।

সুন্নাত নিয়ে এ কেমন ধৃষ্টতা!

সেখানে গ্রামে-গঞ্জে ইল্‌ম ছিল না। এমন কয়েকটি মসজিদও নজরে পড়েছে যে, মসজিদে একটি জুব্বা রাখা আছে। সঙ্গে একটি পাগড়ি আর এক গুচ্ছ নকল দাড়ি। ইমাম সাহেব নামাযের সময় সুট-প্যান্ট পরিধান করে আসেন। মুসল্লায় যাওয়ার পূর্বে জুব্বা পরিধান করে পাগড়ি বাঁধে। আর যে

কথাটি বলতে গিয়ে কলিজা ফেটে যাচ্ছে, তা হলো মসজিদে রাখা নকল দাড়ি লাগিয়ে তারা নামাযের ইমামত করে যাচ্ছেন। সুন্নাত নিয়ে উপহাসের এমন গল্প হয়ত আপনি আর কখনও শোনেননি।

হৃদয়নিংড়ানো শুকরিয়া

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমাদের আসলাফ ও আকাবিরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমরা যদি তাঁদের জুতা মাথায় নিয়ে ফিরি, তবুও তাদের পূর্ণ হক আদায় হবে না। তাঁরা যদি আমাদের বুকের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে যান, তবুও এক বিন্দুও দুঃখ হবে না। কারণ, তারা নিজেদের দীনি দায়িত্ব এমনভাবে পালন করে গেছেন, যাতে কোনো ত্রুটি ছিল না। আর সে কারণেই তাদের এই ঋণ আমরা কোনোদিন শোধ করতে পারব না। লক্ষ করে দেখুন, আজ পৃথিবীর যেখানেই হোক ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র হলে পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরামই সর্বপ্রথম গর্জে উঠে প্রতিবাদ করেন। এ দেশের মূল্য বুঝে আসে বহির্বিশ্বে গেলে। এখানে থেকে তো সবাই অর্থনৈতিক অনুযোগ-অভিযোগ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের দীন ও ঈমান এখানেই সবচেয়ে নিরাপদ। তোমরা এর মূল্যায়ন করলে না। বাইরের দেশে গিয়ে যদিও দু-চার পয়সা পেয়ে যাও, কিন্তু এ কি ঈমানের মূল্য হতে পারে? পারে না। ইউরোপে যত মুসলমান আছে, তারা পেট ভরে খেতে পারে। আর মানুষের যখন ভরপেট থাকে, তখন সে পাপের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

আমেরিকান মুসলমানদের উদাসীনতা

একবার আমাকে আমেরিকার এক মসজিদে দরসে কুরআনের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। গিয়ে দেখি, বেশ বড় মসজিদ। প্রশস্ত আঙিনা। কিন্তু উপস্থিত মুসল্লীর সংখ্যা সর্বোচ্চ সত্তর-পঁচাত্তরজন হবে। এরা মসজিদের দেওয়ালের সাথে টেক লাগিয়ে বসে আছে। পাগুলো লম্বা করে মেলে আছে। অবশিষ্ট মসজিদ পুরোটাই খালি। তারা বলছিল, জনাব! আপনি বয়ান চালিয়ে যান, আমার কানে আওয়াজ তো আসছেই। সেখানকার অবস্থা নাকি এমনই। আমি যখন তাদের এই উত্তর শুনলাম, তখন মিম্বরের হক আদায়ের স্বার্থে তাদের উদ্দেশ্যে দু-চারটি কথা বললাম, যার দ্বারা তাদের মগজ খুলে গেল। আমি বললাম, শুনুন ভাইয়েরা। প্রতিটি মাহফিলের কিছু আদব ও শিষ্টাচার থাকে। আপনাদের জন্য আমার খুব দুঃখ হয় যে, আপনারা আজ

পর্যন্ত জানেন না, আল্লাহর কুরআন শোনার জন্য কোনো মাহফিলে এলে সেখানে কেমন করে বসতে হয়। তারপর তাদের উদ্দেশে বললাম এবং একেবারে স্পষ্ট করেই বললাম, আপনারা জীবনভর স্মরণ রাখবেন, আপনারা নিজেদের জন্মভূমি ছেড়েছেন, নিজ এলাকা ছেড়েছেন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়েছেন। অত্যন্ত পরিতাপ নিয়ে বলতে হচ্ছে, এখানে এসে আপনারা নিজের দীনও ছেড়ে দিচ্ছেন! কী এমন পেয়ে গেলেন যে, কয়েকটা পয়সার বিনিময়ে আপনি এত বড় সওদা করলেন?

কথাগুলো শুনে তাদের মগজ খুলে গেল, চোখ ভিজে এল। অধম বললাম, তোমরা কি মনে করছ, আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছু নেওয়ার জন্য এসেছি? বিশ্বাস করো, এখানে আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছু নিতে আসিনি, বরং কিছু দিতে এসেছি। এবার তাদের অনুভূতি হলো এবং সোজা হয়ে বসল। এসব আসলে ভরা পেটের কুপরিণতি। মানুষ যখন নির্বিঘ্নে পেট ভরে খেতে পায়, তখন দীনকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে ফেলে।

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

এই নাজুক অবস্থায় দীনের হেফাযত কে করবে? এটি ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। যদি এ কাজ রাজনীতিবিদ, অফিসার কিংবা জনসাধারণের হাতে হতো, তাহলে তারা এই দীনকে নিয়ে এমনভাবে কৌতুকে মেতে উঠত, যেমনভাবে ছোট শিশুরা খেলনা নিয়ে হাসি-তামাশায় মেতে ওঠে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা এ দীনের হেফাযতের দায়িত্ব এমন এক জামাতের হাতে সোর্পদ করেছেন, যাদের ব্যাপারে তিনি ইরশাদ করেছেন,

وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ

'আল্লাহওয়ালা নেক বান্দাগণ, ইল্‌ম ও প্রজ্ঞাবান লোকেরা।'[১]

بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

'যাদের দায়িত্ব হলো এ দীনের হেফাযত করা এবং এরাই এ দায়িত্ব অর্পণের ওপর সাক্ষী।'[২]

আল্লাহ তা'আলা এক-একটি আয়াতে বারবারই বলেছেন, এই দীনের মধ্যে কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না আসে।

---

১. সূরা মায়েদা : ৪৪

২. সূরা মায়েদা : ৪৪

উম্মতের পূর্বসূরী মণীষীগণের ত্যাগ

প্রত্যেক যুগেই দীনের জন্য ওলামায়ে কেরাম কুরবানি পেশ করেছেন। পিছনের ইতিহাস ঘেটে দেখুন, আপনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কুরবানি দেখতে পাবেন। তিনি এমন চাবুকাঘাত নীরবে সহ্য করেছেন, যা হাতিকেও যদি মারা হতো, তাহলে সে ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠত। এমন নির্মম চাবুকাঘাত তার কোমল দেহে মারা হয়েছিল। কিন্তু তিনি পাহাড়ের মতো অবিচল থেকে নীরবে সেই আঘাত সহ্য করেছেন। একটু তাদের জীবনী ঘেটে দেখুন। দেখবেন, ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর লাশ বন্দীশালা থেকে বের হচ্ছে। এত সব কিসের জন্য? কারণ, তারা দীনের জন্য কুবরানি পেশ করতেন। কারণ, তারা জানতেন জীবন বিলিয়ে হলেও দীনের হেফাযতের দায়িত্ব আমাদেরই!

বয়ান ও লেখার বরকত

এই দীনের পক্ষে বয়ান-বক্তৃতা দ্বারাও কাজ হয়েছে। মুহাদ্দিছীনে কেরাম দরস দিয়েছেন; মুফাসসিরীনে কেরাম দরস দিয়েছেন, মাশায়েখগণও দরস দিয়েছেন এবং নিজ-নিজ যুগে মানুষের দেহ-মন উত্তপ্ত করেছেন। এটিও অনেক বড় একটি কাজ ছিল। কিন্তু লেখালেখি ও গ্রন্থরচনার কাজ তার চেয়ে অনেক উঁচু, যা হাজারো বছর ধরে চলে আসছে। এজন্য বলা যায়, লেখনির উপকারিতা বয়ানের উপকারিতার চেয়ে অনেক বেশি হয়।

'হেদায়া' গ্রন্থের ফয়েজ

লক্ষ্য করুন! 'হেদায়া' ফিক্হ শাস্ত্রের একটি কালজয়ী গ্রন্থ। এর লেখক দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। অনেকে তো সঠিকভাবে তার নামও বলতে পারবেন না। কিন্তু শত-শত বছর পার হওয়ার পর আজও সেই কিতাব সর্বজনগৃহীত। কোনো আলেম এই কিতাব না পড়ে নিজেকে আলেম বলতে পারবে না।

'ফাতাওয়া শামী' গ্রন্থের বরকত

খুব বেশি দিন হয়নি আল্লামা শামী (রহ.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু এমনভাবে মাসায়েল ও ফাতাওয়ার বিশাল ভাণ্ডার তিনি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন যে, আজ কোনো মুফতী সাহেবকে ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করলে উত্তর খোঁজার জন্য সর্বপ্রথম যে কিতাবটি তার হাতে উঠে আসে,

তাহলো 'ফাতাওয়ায়ে শামী'। এই কিতাবের রেফারেন্স উল্লেখ করেই সবাই ফাতাওয়া প্রদান করে থাকেন। তো বোঝা গেল, তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু হাজার বছর পার হওয়ার পর আজও তাঁদের স্মৃতি অম্লান। আজও তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ উম্মতকে ফয়েজ-বরকত দিয়ে যাচ্ছে!

উম্মতের একটি গুরুদায়িত্ব

এই উম্মতের একটি গুরুদায়িত্ব এও যে, নিজেদের সকল প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও আদর্শ যা কিছুই সে অর্জন করেছে, তা পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। কারণ, এসব হলো উম্মতে মুসলিমার ঐতিহ্যবাহী সম্পদ, যেন পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারে, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম কিভাবে ইল্‌ম অর্জন করেছেন। এ পথে তাদের জীবনে কী ধরনের বাধা-বিপত্তি এসেছে, সেই বাধা তাঁরা কিভাবে অতিক্রম করেছেন এবং শত বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে তাঁরা কিভাবে দীনের হেফাযতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনেক বড়-বড় আলেম ফুকাহা ও আইম্মাহ রয়েছেন, যাঁরা অনেক মূল্যবান দরস দান করেন; কিন্তু তাঁদের দ্বারা লেখালেখি বা গ্রন্থরচনার কাজ হয়ে ওঠে না। ফলে তাদের উলূম ও মাআরেফ সংরক্ষিত থাকে না। এটা আমাদের এ যুগের অনেক বড় ত্রুটি। ইউরোপে প্রতি বছর ইসলামের বিরুদ্ধে এত বেশি বই-পুস্তক রচনা করা হচ্ছে যে, হয়তো গড়ে প্রতিদিন একটা করে গ্রন্থ সঙ্কলিত হচ্ছে শুধু ইসলামের বিপক্ষে। আমাদেরও ইসলামের পক্ষে বহু কিতাব রচনা করা উচিত, যেন ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া যায়।

কুরআনে কারীমের প্রথম প্রকাশনা

আমি একবার রাশিয়ার 'কাযান' নগরীতে গেলাম। এটি সেই শহর, যেখান থেকে কুরআন মাজীদ সর্বপ্রথম প্রিন্টিং মেশিনে প্রিন্ট করে প্রকাশ করা হয়েছিল। এটিই পৃথিবীতে কুরআনের প্রথম প্রিন্টকপি। দ্বিতীয়টি ছিল জার্মানের হামবুর্গে প্রকাশিত কপি। মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) তাঁর তাফসীরের শুরুতেই লিখেছেন, 'কাযান' শহরের অধিবাসী হামযা নামক এক অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি কুরআন মাজীদের সর্বপ্রথম কপি প্রিন্ট করেছিল। তখন এটি রাশিয়ার কেন্দ্রীয় শহর ছিল। ওই দুই স্থানের পর আজ ক্রমান্বয়ে সব কিছুতেই উন্নতি সাধিত হয়েছে, ন্যায্য ফলাফল হচ্ছে, আজ বহু দীনি পুস্তক ছাপাখানায় ছাপা হচ্ছে।

'কাযানে' ইসলামী গ্রন্থাদি রচনা

এই 'কাযান' শহরের অপর নাম 'আলেমদের শহর'। আমি এর ইতিহাস পড়েছিলাম। সেখানে লেখা আছে, যখন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা সর্বব্যাপী ছিল, তখন সেই শহরে এত ওলামায়ে কেরাম ছিলেন যে, প্রতি বছর সেখান থেকে ইসলামী বিষয়ের ওপর প্রায় ছয় হাজার নতুন কিতাব প্রকাশিত হতো। এবার বলুন, তাদের মধ্যে ইল্‌মী যোগ্যতা কী পরিমাণ ছিল এবং তারা ইসলামের কী পরিমাণ খেদমত করেছেন। আজ আমরা যারা ইল্‌মের চাকায় ভর করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এসব তাদেরই ইল্‌মী কৃতিত্ব।

এই মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব

আজ যদি আমরা কাজ না করি, তাহলে এ ইল্‌মী ঘাটতি আমাদের অনুভূত নাও হতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অবশ্যই এ ঘাটতি অনুভব করবে এবং কিয়ামতের দিন আমাদের জামার কলার ধরে অভিযোগ করবে, এরা তো তাদের বড়দের রেখেযাওয়া আমানতের ওয়ারিস হয়েছেন এবং জীবন পার করে দিয়েছেন; কিন্তু দীনের উল্লেখযোগ্য কোনো খেদমত আঞ্জাম দেননি। ফলে যখন আমাদের নিকট দীন পৌঁছেছে, তখন তাতে অনেক ঘাটতি ও শূন্যতা দৃষ্টিগোচর হলো। বলুন, এই শূন্যতার জন্য দায়ী কে? উম্মতের ওলামায়ে কেরাম। তাই কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে আমাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ হবে। তখন নিজের ভুল স্বীকার এবং আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার দুটি বিশেষ গুণ

উম্মতে মুসলিমার বহু গুণের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ তাওরাত ও ইনযীলে লেখা আছে। তা হলো এ উম্মতে ওলামায়ে কেরাম দীনি বিষয়ে প্রচুর কিতাবাদি রচনা ও সঙ্কলন করবে যে, এর পূর্বে কোনো উম্মত স্বীয় দীন ও ধর্মের ওপর এত কিতাব রচনা করেনি। দ্বিতীয় গুণটি হলো, এই উম্মত আল্লাহ তা'আলার স্মরণে তাঁর নামের যিকিরের উদ্দেশ্যে একসাথে বসবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করবে। তো এই দুটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে এই উম্মতের মধ্যে পাওয়া যাবে।

পূর্বসূরী আলেমদের মধ্যে গ্রন্থরচনা ও লেখালেখির আগ্রহ

বিশ্বের ইতিহাসের পাতায় যদি চোখ রাখি, তাহলে স্পষ্ট দেখা যায়, এ উম্মতের মধ্যে ওলামায়ে কেরামই অধিক কিতাব রচনা করেছেন। যেমন-

ইমাম রাযী (রহ.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'আমি এই আঙুলগুলো দিয়ে ছয়শ' কিতাব রচনা করেছি।

কেউ বলেন, আমি পাঁচশ খণ্ড লিখেছি। কেউ বলেছেন, আমার লিখিত কিতাবগুলো বহন করতে দুটি উট ব্যবহার করতে হতো।

এক মুহাদ্দিছ ইন্তেকাল করলেন। তিনি এত কিতাব রচনা করেছেন যে, যখন তাঁর সারা জীবনে যতগুলো দিন অতিবাহিত হয়েছে, সেই দিনের সংখ্যা এবং তার লিখিত কিতাবসমূহের পৃষ্ঠার সংখ্যায় ভাগ দেওয়া হয়, তখন দেখা যায়, তিনি গড়ে দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা লিখেছেন। এবার চিন্তা করুন, দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা লিখে যাওয়া কার সাধ্যে আছে? কিন্তু এ ছিল তাঁদের কাজের বরকত। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁদের কাজের মধ্যে এত বরকত দিয়েছিলেন যে, তাঁরা সামান্য সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করতে পারতেন, যা আমাদের জন্য মাসেও সম্ভব নয়। এমনই আগ্রহ ছিল তাঁদের লেখালেখির প্রতি। মহান আল্লাহ তাঁদের সাহায্যও করেছেন, কবুলও করেছেন।

'রেসালায়ে শাতিবিয়্যাহ'র বরকত

আল্লামা শাতিবী (রহ.) যখন 'রেসালায়ে শাতিবিয়্যাহ' রচনা করেন, তখন হারাম শরীফে গিয়ে প্রায় বারোশবার তাওয়াফ করলেন। প্রত্যেক নামাযের পর আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এই কিতাবখানিকে আপনি ব্যাপক মকবুলিয়্যাত দান করুন। আল্লাহ তার দু'আ এমনভাবে কবুল করলেন যে, আজ যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ 'রেসালায়ে শাতিবিয়্যাহ' না পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কারী হতে পারবে না। বোঝা গেল, তারা শুধু লিখতেনই না; দু'আও করতেন। কারো কাজের বরকত ব্যাপক হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আর তার পিছনে থাকে মানুষের তাকওয়া।

বুখারী শরীফের বরকত

বুখারী শরীফ হাদীছের জগতে এমন একটি কিতাব, যাকে আল্লাহর কালাম কুরআনে মাজীদের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। অথচ বিশুদ্ধতা ও শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে মুসলিম শরীফ আরও অনেক উঁচু মর্যাদা রাখে। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর তাকওয়া ও খোদাভীতির কারণে তাঁর সংকলিত কিতাব এত মকবুলিয়াত অর্জন করেছে। আজ দুনিয়ায় যখনই হাদীছের প্রসঙ্গ আসে, তখনই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নামটি চলে আসে।

মেশকাত শরীফের বরকত

মেশকাত শরীফও হাদীসের একটি কিতাব। আপনি খোঁজ করলে এই কিতাবের সমমানের কিংবা এর চেয়ে ভালো মানের আরও হাদীছের কিতাব পেয়ে যাবেন। কিন্তু সেই কিতাবগুলোর ভাগ্যে ওই গ্রহণযোগ্যতা নসিব হয়নি, যা মেশকাত শরীফের ভাগ্যে জুটেছে। সুতরাং দীনের বিভিন্ন শাখায় যেমন ওলামায়ে কেরাম অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে অবদান রেখেছেন, তেমনি এই রচনা-সঙ্কলনের জগতেও তাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে।

পাঠদানে আমেরিকান পদ্ধতি

এত কথা বলার প্রয়োজন কেন পড়ল? একটি ঘটনা শুনুন। আমেরিকায় ছোট শিশুদের সন্ধ্যাবেলায় পাঠদান করা হয়। তাদের দীনি শিক্ষার এটাই পদ্ধতি। যখন তাদেরকে দীনি বিষয়ে শিখানো হয়, তখন আর অন্য কোনো কিতাব সেখানে রাখা হয় না। যেমন- আপনি ইতিহাস বিষয়ে কিছু বলতে চাচ্ছেন, তো ছাত্ররা আপনাকে আগে-পরের এমন সব প্রশ্ন করবে যে, আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সুতরাং এ বিষয়ে আপনাকে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েই ক্লাসে যেতে হবে। যেমন- ধরুন, একজন শিক্ষক হযরত নূহ (আ.)-এর গল্প শুরু করল। এবার শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকবে। তিনি কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন? কী করতেন? দেখতে কেমন ছিলেন? যদি আপনি বলেন, একস্থানে ছিলেন। তাহলে আমেরিকান পাঠদান অনুযায়ী তারা আপনার এ উত্তরে সন্তুষ্ট হবে না। বরং তারা বলবে, উস্তাদজিই যদি না জানেন, হযরত নূহ (আ.) কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, তাহলে তিনি আমাদের কি করে তার জীবনী শোনাবেন? ফলে তারা আপনার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। কারণ, তারা যখন দিনের বেলায় স্কুলে যায়, তখন তাদের সাইন্স পড়ানো হয়, সেখানে বলা হয়, আমরা সত্য ও বাস্তব বিষয়ে কথা বলি। অপর দিকে সন্ধ্যার সময় সেই ধারণা পাচ্ছে মাত্র। উভয় রকম বিষয়ের মধ্যে তারা সমন্বয় সাধন করতে পারে না। ফলে এগুলোকে তারা রূপকথার গল্প হিসেবেই শোনে। এগুলোকে তেমন একটা বিশ্বাস করে না।

হযরত আদম (আ.)-এর নাম এল। তারা প্রশ্ন করতে থাকবে, হযরত আদম (আ.)ই কেন প্রথম নবী হয়ে এলেন? তাঁর পূর্বে কোন নবী ছিলেন? দুনিয়ায় আসবেনই যদি, তাহলে তাঁকে জান্নাতে পাঠালেন কেন? ইত্যাকার আরও কত প্রশ্ন! তখন প্রয়োজন দেখা দেবে এমন একটি লেকচার বা পুস্তক রচনার, যাতে এ শিশু বাচ্চাদের সকল প্রশ্নের উত্তর সন্নিবেশিত থাকবে।

এক 'টাই আলেমের' গ্রন্থরচনা

ঐ দেশে যেহেতু ওলামায়ে কেরাম সংখ্যায় অনেক কম, তাই এ কাজ সেখানকার টাই আলেমগণই করে থাকেন। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, এক ব্যক্তি ভ্রমণ করছিল। তার বেশভূষা এমন যে, উভয় রান উন্মুক্ত, মাথা খোলা, পেট নাভী পর্যন্ত দৃশ্যমান আর পায়ে পরেছিলেন কেড্‌স্‌ জুতা। সে দৌড়াতে-দৌড়াতে এই অধমের কাছে এসে বলল, হযরত! দু'আ করবেন। আমি বললাম, কেন? কী হয়েছে? বলল, আমি কুরআনভিত্তিক একটি গ্রন্থ সঙ্কলন করছি। চিন্তা করুন, এই বই সেখানকার পাঠকদের কী নূর ও রূহানিয়্যাত দান করবে?

'টাই আলেমে'র স্ত্রীর অবস্থা আরও করুণ!

কয়েকদিন পর সেই ব্যক্তি কোট-প্যান্ট পরিধান করে এসে বলল, হযরত! অনুমতি হলে আমি আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে আসি। আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিল। আমি বললাম, নারীদের তো আমি এভাবে কামরায় আসতে দেই না। তার জন্য বরং পর্দার সাথে আলাদা ব্যবস্থা আছে। সেখানে বসিয়ে দিন; পর্দার আড়ালে থেকে সে প্রশ্ন করুক। সে বলল, এতে সমস্যাইবা কী? সে তো কয়েকটি প্রশ্নই করবে শুধু।

এবার চিন্তা করুন, যে ব্যক্তি তাফসীরুল কুরআনের কিতাব লিখছে তার এ কথাই বুঝে আসছে না যে, বেগানা নারী এসে দেখা করলে কী সমস্যা। আমি একটি ছোট ছেলেকে বললাম, ভদ্র মহিলাকে পর্দার আড়ালে বসেই প্রশ্ন করতে বলো। ছেলেটি তাকে পর্দার আড়ালে বসিয়ে এসে বলল, হযরত মহিলা শাড়ি পরে এসেছে। মাথায় কাপড় নেই, বুক, গলা, পেট, পিঠ সব খোলা। বলা চলে অর্ধ-উলঙ্গ। পরিতাপের বিষয়, যার পর্দা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই, সে কিনা তার স্বামীর সঙ্গে মিলে তাফসীর লিখছে!

আমি সাধারণ লোকদের কথা বলছি না, বরং এরা এমন লোক, যারা এ পর্যন্ত এক ডজনের বেশি কিতাব লিখে ফেলেছেন এবং গোটা আমেরিকায় তাদের কিতাবগুলো ইসলামী সেন্টারসমূহে পাওয়া যাচ্ছে।

উল্লিখিত কিতাবসমূহের বিন্যাস পদ্ধতি

ঐ সময় প্রয়োজন বোধ হয়েছিল, এ কাজ তো আমাদের ওলামায়ে কেরারেই করা উচিত। তাদের বলে দেওয়া উচিত, সেখানকার ছোট-ছোট শিশুরা এ বিন্যাসের কিতাব চাচ্ছে, যেন তারা নিজেদের লাইব্রেরীতে বসেই

বিষয়গুলো পড়তে ও জানতে পারে। যেমন- হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা-ই নিন। এর পুরো ঘটনাকে ছোট-ছোট প্রশ্ন আকারে বিন্যাস করে উত্তরও লিখে দিন। এতে একটি শিশু ধরুন একশত প্রশ্ন ও উত্তর পড়তে থাকল এবং ঘটনার বিবরণ তার সামনে আসতে থাকল। কারণ, সেখানকার শিশুদের জন্য পাঠদানে ভিন্ন ধরনের বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। ছেলে ও মেয়েদের মাসায়েল ভিন্ন-ভিন্ন হয়। তাই কিছু লেকচার ও পাঠসূচি সেই আঙ্গিকেই ঢেলে সাজাতে হবে, যেন সেগুলোকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে সেদেশে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এভাবে গ্রহণযোগ্য ওলামায়ে কেরামের হাত ঘুরে কিছু কিতাব সেখানে পৌঁছে যাবে। এতে অন্তত এতটুকু লাভ তো অবশ্যই হবে যে, যেকোনো 'টাই আলেম' কিংবা 'উলঙ্গ মাথাওয়ালী' দাঁড়িয়ে এ কথা বলবে না, 'আমি তো কুরআন পাকের তাফসীর লিখছি'।

এই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই অন্তরে জেগে উঠছে, যদি আমরা আমাদের ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে এখানেও একটি ইল্‌মী ও দীনি পরিবেশ কায়েম করার চেষ্টা করি, যেন পরস্পরে বসে নির্ধারণ করতে পারি, আমাদের কী-কী বিষয় প্রয়োজন এবং কী ধরনের পাঠ্যসূচি কোন বিন্যাসে প্রয়োজন। তারপর ওলামায়ে কেরামকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হোক। তারা বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে কিংবা নিজেদের কাছে যে কিতাবাদি রয়েছে, সেখান থেকে মিলিয়ে একটি পাঠ্যসূচি তৈরি করবে। এতে এমন কিতাবও সঙ্কলিত হতে পারে, যা সেখানে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। মনে রাখবেন, আপনার সুবিন্যস্ত কিতাব যতক্ষণ তাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এর ছাওয়াব পেতে থাকবেন।

মোদ্দাকথা হলো, বয়ান ও পাঠদানের মাধ্যমে আমরা যেমন ইল্‌মী কার্যক্রম অন্যদের পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারি, তদ্রূপ রচনা-সঙ্কলনের মাধ্যমেও ইল্‌মের প্রচার-প্রসারের কাজ করা জরুরি।

কানাডায় ওলামায়ে কেরামের মেহনতের ফল

আমার জানামতে কানাডায় প্রায় চৌদ্দজন মুফতী আছেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ইফতায় তাখাস্‌সুস করেছেন। সেখানে তারা এ ধরনেরই একটি 'ইল্‌মী মজলিস' বানিয়েছেন। তাদের লক্ষ্য হলো, গোটা কানাডায় তো সবাই ইংরেজী শিক্ষিত। তাদেরকে যদি আমরা কুরআন পড়াতে চাই, তাহলে কিভাবে পড়াব? এ তো সম্ভব নয় যে, তারা সবাই বড়-বড় আলেম হয়ে যাবে। কিন্তু এতটুকু চেষ্টা তো করা যায় যে, কুরআনের ব্যাপারে মূর্খতা

দূর হয়ে যাক এবং জাহেলদের সংখ্যা দিন-দিন হ্রাস পাক। নামাযে ইমাম সাহেব যখন কুরআন তেলওয়াত করবে, তখন তারা যেন অন্তত এতটুকু বুঝতে পারে যে, কুরআন আমাকে কী বলছে? এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁরা মেহনত শুরু করেছে।

এই মেহনতের ফলাফল এ হলো যে, তারা ইদানিং একটি কিতাব রচনা করছেন, যার নির্দেশনা অনুযায়ী সেখানে কোর্সও চালু হয়েছে। আমরাও সেই কোর্সে অশংগ্রহণ করেছি। আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন তাদের গবেষণা দেখে। কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা হলো প্রায় আশি হাজার (৮০,০০০) কিন্তু এ পরিসংখ্যানে কুরআনের ঐসব শব্দমালাও গণনায় এসেছে, যেগুলো একাধিকবার উল্লেখিত আছে। যদি একাধিকবার উল্লেখিত হওয়া শব্দগুলোকে এক শব্দই ধরে নিয়ে গণনা করা হয়, তাহলে পুরো কুরআনের শব্দসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় দুই হাজারে (২,০০০)। আবার সেই দুই হাজারের মধ্যে পাঁচশ (৫০০) শব্দ এমন আছে, যেগুলো আমাদের উর্দূ ভাষাভাষীরা ব্যবহার করে এবং প্রত্যেক পড়া-লেখা জানা ব্যক্তি সেগুলোর অর্থ বোঝেন। সুতরাং অবশিষ্ট থাকছে মাত্র পনেরশ (১,৫০০) শব্দ। অতএব এ পনেরশ (১,৫০০) শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা যদি তাদের ভালোভাবে পড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের মধ্যে এমন যোগ্যতা তৈরি হবে যে, যখনই কেউ তাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করবে, তারা তা মোটামুটি বুঝতে পারবে। এ পদ্ধতিতে তারা যখন মেহনত শুরু করলেন, তখন যে এলাকাই তারা কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার এ ক্লাস চালু হচ্ছে, সেখানেই শত-শত কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৌশলী ও ডাক্তাররা দৌড়ে এসে অংশগ্রহণ করেন। আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, বাস্তবেই তরজমা ও ব্যাখ্যা পড়ার পর তাদের অন্তরে নেক আমলের আগ্রহ ও জযবা বেড়েই চলছে। আমার দেখামতে এ ক্লাস কয়েকজন ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের জীবন আমূল বদলে দিয়েছে।

সারকথা হলো, সেখানকার ওলামায়ে কেরাম স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা বুঝে কিছু মেহনত করে একটি কাজ দাড় করিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ উম্মত আজ তা থেকে উপকৃত হচ্ছে।

হযরত থানবী (রহ.)-এর তাসনীফী বরকত

যখন ওলামায়ে কেরাম মেহনত করেন, তখন তারা এর ফয়েজ ও বরকত পেয়ে থাকেন। আমি কিছুদিন পূর্বে বাদশাহী মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা (আ.) কাদির আযাদ এর একটি প্রবন্ধ পড়িছিলাম। প্রবন্ধটির নাম

ছিল, 'হযরত থানবী (রহ.) এবং তাঁর পুরো জীবনী'। এ প্রবন্ধের শেষে তিনি হযরতের নামে যত কিতাব প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর তালিকা উল্লেখ করেছেন, যার সংখ্যা ছিল সাতশত (৭০০)। সুবহানাল্লাহ!

এই অধম হযরত আল্লামা খালেদ মাহমূদ সাহেবকে ম্যানচেষ্টারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হযরত! আপনার পুরো জীবনটাই অধ্যয়ন ও পড়াশোনায় কেটেছে। আপনার দৃষ্টিতে প্রচুর কিতাব রচনাকারী ওলামায়ে কেরাম কী পরিমাণ অতিবাহিত হয়েছেন? কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে তিনি উত্তর দিলেন, ৫০০শ ও ৬০০ হবে এবং বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, এক মুসান্নিফের ব্যাপারে পড়েছি তার তাসনীফাত ১১০০ (এগারোশত) ছিল।

হ্যাঁ, নিকট অতীত বুযুর্গানে দীনের মধ্যে আমাদের হযরত থানবী (রহ.)কে আল্লাহ তা'আলা এই নেয়ামত দান করেছেন। তিনি কিছু কাজ তো নিজেই করেছেন এবং কিছু কাজের দিকনির্দেশনা দিয়ে করিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে নিজের খলীফা ও ছাত্রদের ব্যবহার করেছেন। এভাবে ছাত্র-শিষ্যরা তাদের শায়খ থানবী (রহ.)-এর নামে যেসব কিতাব সঙ্কলন করেছেন, তার সংখ্যা দু-হাজার সাতশত (২,৭০০)।

ভেবে দেখুন, হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) যখন কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াবেন, তখন তার মর্যাদা কোন উচুতে থাকবে!

খতীব দু'ধরনের

আমি মনে করি, প্রত্যেক মানুষের জীবনে এতটুকু সময় অবশ্যই থাকে, যাতে সে দীনের ব্যাপারে নিজস্ব ধ্যান-ধারণার কিছু-না-কিছু কলমবন্দী করতে পারে। আসলে আমাদের অবস্থা হলো, যখন ওলামায়ে কেরাম কিছু পড়েন, তখন শুধু এ নিয়তে পড়েন যে, আমাকে জুমায় বয়ান করতে হবে। আমি নিজেদের মধ্যে আত্মসমালোচনা হিসেবে বলছি। আজকাল খতীবদের দুটি প্রকার রয়েছে।

যদি বে-আদবী হয়ে যায়, তাহলে ফকীর ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। কিছু হযরত রয়েছেন এমন, যাদের বয়ান হয় সংবাদপত্রকেন্দ্রিক। বিভিন্ন ধরনের দু-চারটি সংবাদপত্র পাঠ করে নেন আর সে সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করেই তার বয়ান হয়। আর কিছু হযরত আছেন এমন, যারা বিভিন্ন মাদরাসা থেকে কয়েকটি মাসিক পত্রিকা জমা করেন। সেই মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ হুবহু মুখস্থ করে তাকেই বয়ান হিসেবে চালিয়ে দেন। কিতাবাদি

অধ্যয়ন করার অভ্যাস ও জযবা আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যারা দরস-তাদরীসের কাজে লেগে আছেন; বরং বলছি সেসব ওলামায়ে কেরামের কথা, যারা মাদরাসা শিক্ষা শেষ করার পর কোনো দরস-তাদরীসের কাজে না লেগে কোথাও খতীব বা ইমাম হয়েছেন অথবা অন্য কোথাও কাজে যোগ দিয়েছেন এসব ওলামায়ে কেরামের জীবনে অধ্যয়নের কাজ মারাত্মকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

সদ্যফারেগ এক আলেমের কথা

আমি কিছুদিন পূর্বে ফারেগ হয়েছেন এমন এক আলেমের ব্যাপারে শুনেছি, কেউ একজন তাকে প্রশ্ন করেছিল, হযরত! যাকাত কী পরিমাণ দিতে হবে? সেই আলেম উত্তর দিলেন, বাস প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা হিসাব করে যাকাত দিতে থাকো। আচ্ছা, আপনিই বলুন, এমন উত্তর আপনি কখনও শুনেছেন? তোমার নিকট যদি চল্লিশ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে সেখান থেকে এক টাকা যাকাত দাও! যাকাতের নেসাব কী, যাকাত কার ওপর ওয়াজিব, কাকে দেওয়া যাবে, কাকে নয় এসব মাসআলা তাহলে কী জন্য? সহজ কথা, কিতাব অধ্যয়ন যখন মস্তিষ্কের জন্য বোঝা হয়ে যায়, তখনই এমন উল্টা-পাল্টা জবাব এসে যায়। তাই একজন আলেমের জন্য কিতাবের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা খুবই জরুরি।

আমাদের বড়দের অধ্যয়নের আগ্রহ

আমাদের বড়দের মহব্বত ভালোবাসা তো কেবল কিতাবের সঙ্গেই হতো। তাঁরা সারাক্ষণ কিতাব মুতালা'আয় ডুবে থাকতেন। হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, যে কিতাবটি আমি একবার দেখে নিতাম, তা বিশ বছর পর্যন্ত আমার মনে থাকত। শায়খুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) বলতেন, একটি কিতাব দেখার পর পনেরো দিন পর্যন্ত তো আমিই ভুলতাম না। তারা দীনের এত খেদমত করেন; তারপরও কিতাবের মধ্যে ডুবে থাকতে-থাকতেই তাদের জীবন শেষ হয়ে গেল, যার ফলাফল আজ আমরা ভোগ করছি।

ইমাম রাযি (রহ.) বলেন, আমার ওই সময়গুলোর জন্য খুব দুঃখ হয়, যেগুলো পানাহারের মধ্যে কেটে যায়। আমি সেই সময়টুকু মুতালা'আ করতে পারি না।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)- এর ব্যাপারে তার এক সহপাঠী বলেন, আমি প্রায়ই দেখতাম, তিনি রাতে বাতি জ্বালাতেন। তারপর মুতালা'আ করতেন। কিছুক্ষণ পর বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। কিছু সময় পার হওয়ার পর পুনরায় আবার উঠে বসতেন এবং বাতি জ্বালিয়ে মুতালা'আ শুরু করতেন। সেই সহপাঠী বলছিলেন, একবার আমি তার এই অবস্থা গণনা করে দেখলাম, এক রাতে প্রায় সত্তরবার তিনি বাতি নিভিয়েছেন আবার জ্বালিয়েছেন। এবার ভেবে দেখুন, যে ব্যক্তি এক রাতে সত্তরবার বাতি জ্বালায় আবার নিভায় এরই মাঝে আবার মুতালা'আও করেন, তিনি কি রাতে ঘুমাতেন? তারা রাতে ঘুমাতেন না; বরং শুতেন। তাদের শোওয়াও হতো গভীর চিন্তা-ভাবনার সাথে। এ কারণে অনেকবার তাঁকে দেখা গেছে, তিনি বিছানায় শুয়েছেন আবার বিছানা ছেড়ে সোজা ফজরের নামাযে শরিক হয়েছেন। বোঝা গেল, তিনি ঘুমাননি।

আমি দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী আযীযুর রহমান সাহেবের জীবনী পড়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল, যখন তার জীবন-আয়ু ফুরিয়ে এল, তখনও তার বুকের ওপর ফতোয়ার একটি কাগজ পড়েছিল। হযরত ইমাম আবুইউসুফ (রহ.)-এর যখন শেষ সময় এসে উপস্থিত হলো, তখনও কোনো ছাত্র তাকে মিরাসসংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন করছিল আর তিনি তার উত্তর দিচ্ছিলেন। কোন সময়? ওই সময়, যখন তার জান কবজ করা হচ্ছিল। সুবহানাল্লাহ! জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাঁরা ইল্‌মচর্চা থেকে বিরত থাকেনি।

বর্তমান যুগে ওলামায়ে কেরামের খেদমত

আপনি ভালোভাবে দেখুন, গোটা পাকিস্তানে হাতেগোনা কয়েকজনই এমন পাওয়া যাবে, যারা বাস্তবেই মজবুত ভিত্তির ওপর দীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এবং দীনের কোনো-না-কোনো বিষয়ে কিছু-না-কিছু লিখে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে হযরত মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম, মাওলামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধায়ানবী রহ., মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ সাহেব মাদ্দাযিল্লুহু প্রমুখের ইল্‌মী খেদমতকে শতবার সাধুবাদ জানাই।

একটু ভেবে দেখুন, যদি এসব বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরাম কাজের ময়দানে বলিষ্ঠ ভূমিকা অব্যাহত রাখেন, তাহলে কি ওইসব কোট-টাই পরিধানকারী কুরআনের তাফসীর লেখার সাহস করতে পারে? আজ একটি প্রশ্ন সবখানেই যে, জনাব, ইংরেজী শিক্ষিতরা ওলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন করে না। আমি

বলব, আপনি আগে সত্যিকার মুহাক্কিক আলেমে দীন হোন, তারপর দেখবেন, তারা আপনার জুতা হাতে নিয়ে ফিরবে। কিন্তু তাদের সম্মুখে এমন ইল্‌মী ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ তো হতে হবে! আসলে তিক্ত হলেও সত্য যে, তারা যখন দেখে, একজন আলেমে দীন আট-দশ বছর দীনি শিক্ষা অর্জন করার পরও সাধারণ মানুষের মতোই চলে। ইল্‌ম অনুযায়ী আমল থাকে না, তখন তারা উক্ত আলেম আর নিজেদের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। ফলে তারাও গর্জে উঠে বলে, মিয়া! আমরাও জানি কুরআন-হাদীছের কোথায় কী আছে? এই মাওলানা এমন আর কি-ই বা জানে? অথচ বাস্তবতা এমন হওয়ার কথা ছিল না।

কথা হলো, মুতালাআ ও অধ্যয়ন ছেড়ে দিয়ে আমরা আমাদের সেই যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি, যা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছিল। আজও যদি কেউ আসলাফ ও আকাবিরীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে যায়, তাহলে আমাদেরও ভাগ্য চমকে উঠবে।

অনুভূতি জাগ্রত করুন

বিশ্বাস করুন, ঐসব ওলামায়ে কেরাম যাদের মাসিক জ্বালানী তেলের খরচ তার খাওয়া খরচের চেয়ে বেশি হতো, আজ তাদের সন্তানেরা কিতাব অধ্যয়ন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যাদের পূর্বপুরুষরা চাটাইয়ে বসে মুতালা'আ করতে-করতে পুরো রাত পার করে দিয়েছেন, আজ তাদের সন্তানরা নরম বিছানায় গা এলিয়ে বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যে সকল বুযুর্গানে দীন কুরআনে পাকের তেলাওয়াত দিয়ে নিজেদের দিবস শুরু করেছেন, আজ তাদের উত্তরসূরী সন্তানরা দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠ দ্বারা দিনের সূচনা করছে। আসলে নির্মম সত্য হলো, পূর্বের সেই ইল্‌মী যওক শেষ হয়ে গেছে।

সত্য স্বীকার করতে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত হবে না যে, আমাদের মধ্যে সেই যোগ্যতার অনেক ঘাটতি রয়েছে। তবে দুর্বলতার অনুভূতি আছে। এও এক প্রকার নেয়ামত। সুতরাং এই অনুভূতির সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকলে আশা করা যায় এতে দয়াময়ের রহমতের দরিয়ায় জোশ এসে যাবে। তারপর তিনি আমাদের মতো অযোগ্য ও অকর্মাদের দ্বারাও অনেক বড়-বড় কাজ সম্পাদন করাবেন, যার ফয়েয ও বরকত আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত প্রবহমান থাকবে।

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী (রহ.)-এর তাসনীফী ফয়েয

'মালাবুদ্দামিনহু' হযরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী (রহ.) রচনা করেছেন। আজ যারা আলেম হন, তার হাতে এই কিতাবটি ধরিয়ে দিয়ে বলা হয়, 'এটাও তোমাকে এটি পড়তে হবে।' মাশাআল্লাহ হাজারো আলেম এই কিতাব পড়ে ওলামায়ে কেরাম হচ্ছেন। তারপর জীবনভর তারা যত ইল্‌মী কাজ করবেন, তিনিও তার ছাওয়াবের একটি অংশ পাবেন। বরং যে-যে আলেমের কিতাব দরসে নেযামীতে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত, তারা এই ইল্‌মী কার্যক্রমের বিপুল পরিমাণ ছাওয়াবের সমান-সমান অংশীদার।

দীনি মাসিক পত্রিকাগুলো কেন বিলুপ্তির পথে?

আজ প্রয়োজন হলো, নিজেদের দীনি চাহিদা ও তাকাযাগুলো অনুধাবন করে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং দীনের হেফাযতের সকল অঙ্গনে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া। প্রশ্ন হতে পারে, হযরত! মুরশিদ ধরার প্রয়োজন কী? আজকের এ যুগে লম্বা জুব্বা, টুপি পাগড়ির প্রয়োজন কী?

আমি বলব, ভাই! আমরা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই জিনিসগুলোই পেয়েছি। আর এই আমানত পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আমরা বাধ্য। এটা আমাদের কর্তব্য। এজন্য কিতাবাদির মুতালা'আ ও অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতে হবে। যুগের শিরা-উপশিরায় হাত রেখে তার দীনি তাকাযা ও প্রয়োজনগুলো অনুধাবন করতে হবে। নিজের বুদ্ধি-বিচার অনুযায়ী কিছু-না-কিছু লিখে মুরব্বীদের দেখাবেন, যেন এটি তাদের দৃষ্টি ছুঁয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় আপনি রচনা-প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে কোনো মাসিক পত্রিকার অফিসে পাঠিয়ে দিন। কী বলব, দুঃখের কথা, আজ মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরা বড়ই পেরেশানীতে আছেন। মানসম্মত লেখা-ই পাওয়া যায় না। লেখার এই আকালের কারণে কত মাসিক পত্রিকা শুরু হয়ে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, এমনটা কেন হচ্ছে? তারা উত্তর দেন, জনাব লেখকই পাওয়া যায় না, আমরা কী করব।

যাহোক, এ ব্যাপারে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। এটা তো অসম্ভব কিছু নয় যে, যদি আল্লাহ চান, তাহলে এই চিন্তাকে আরও প্রসারিত করে বেরিয়ে আসবেন কিছু তাজাপ্রাণ কলমসৈনিক, যাদের ইল্‌মী কীর্তি লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়ে যাবে এবং লেখক-পাঠক সবার জন্য পরকালে নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে।

ইল্‌মী সম্পদ থেকে বঞ্চনা

এই অধমের মনে পড়ে, যখন স্কুলে লেখা-পড়া করতাম, তখন ধজি রোডে 'ওয়াকফে ইয়াসীনী' নামে একটি লাইব্রেরী ছিল। সেখানে প্রচুর কিতাব সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেই ইল্‌মী ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণকারী কেউ না থাকাতে সেটি এ শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সেটি একটি ইল্‌মী খাযানা ছিল। অধম স্বচক্ষে হাজার-হাজার কিতাব তাতে দেখেছিলাম। এই বিশাল ইল্‌মী খাযানা যখন এখান থেকে চলে গেল, তখন এ শহর সৌভাগ্যবঞ্চিত হয়ে গেল। লাইব্রেরীটি যদি আজ এখানে থাকত, তাহলে অবশ্যই আমরা তা থেকে উপকৃত হতে পারতাম।

এই সামান্য কিছু কথা মনে পড়ল, যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত কবুল করুন। আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

আল্লাহর ভয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ. أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

খাশিয়্যাত কাকে বলে?

'খুশু' অন্তরের এমন অবস্থা ও ভাবকে বলে, যার দ্বারা অন্তরে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও আযমত বসে যায় এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে জায়গা করে নেয়। আল্লাহর এমন মহব্বত অন্তরে বাসা বাঁধে যে, মানুষ তাঁর অসন্তুষ্টির কল্পনা করতেই কেঁপে ওঠে, তাঁর ভালোবাসায় মানুষ উদাস হয়ে যায়। এমন খাশিয়্যাত বা খোদাভীতি যাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়, তারা কখনও পাপের দিকে পা বাড়ায় না।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খোদাভীতির প্রভাব

মুফরাদাতুল কুরআনে লেখা আছে,

اَلْخُشُوْعُ الضَّرَاعَةُ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيْمَا يُوْجَدُ عَلَى الْجَوَارِحِ.

খাশিয়্যত তথা খোদাভীতি মূলত কান্নাকাটি করাকে বলে। আর এই প্রভাব মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গের ওপর প্রকাশ পায়।'

এই খোদাভীতি থাকে মানুষের অন্তরে; কিন্তু প্রকাশ পায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়চড় ও সঞ্চলনের মাধ্যমে। যেমন- কোথাও আগুন জ্বললে সেখানে বাতোসে ধোঁয়াও ভাসতে থাকে। ফলের গাছ লাগালে তা থেকে

ফলও বেরিয়ে আসে। এমনিভাবে যে অন্তরে খাশিয়্যাত বা খোদাভীতি থাকবে, তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা প্রকাশও পাবে।

کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو * ممکن نہیں کہ آگ جلے اور دھواں نہ ہو

'এটা কী করে সম্ভব যে, অন্তরে তো আগুন লাগল; অথচ তার ধোঁয়াও কেউ দেখল না।'

آہیں بھی نکلتی ہیں گر دل میں لگی ہو * ہو آگ تو موقوف دھواں نہیں ہوتا.

'ভালবাসার ছোঁয়া যদি লাগে হৃদয়ে, তা হলে আহ শব্দও বের হয়। আগুনের জন্য ধোঁয়ার প্রয়োজন হয় না।'

জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহতা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

'যে আল্লাহর ভয়ে কেঁদে ফেলল, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।'

জাহান্নামের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের মতো ভাববেন না। জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে সত্তর গুণ বেশি গরম। জাহান্নামের আগুনে এত ভয়ঙ্কর তাপ রয়েছে যে, যদি এর একটা বিন্দু সূর্যের উদয় স্থলে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে তার অস্ত যাওয়ার স্থানে কোনো মানব থাকে, সেও এ অগ্নিতাপে দগ্ধ হয়ে ছাইয়ে রূপান্তিরিত হয়ে যাবে। জাহান্নামীদের ঘামের ফোঁটাও এত উত্তপ্ত হবে, যদি তা উহুদ পর্বতের ওপর ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে ওই পর্বতও গলে যাবে।

এ কারণেই হাদীছে এসেছে,

نَارُكُمْ هٰذِهٖ أَحَدٌ وَّسَبْعُوْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ.

'তোমাদের দুনিয়ার এ আগুন জাহান্নামের আগুনের একাত্তর ভাগের এক ভাগ।'

দুনিয়ার আগুন আর জাহান্নামের আগুন

দুনিয়ার আগুন আর জাহান্নামের আগুনে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য আছে।

এক. দুনিয়ার আগুন সাধারণ আসবাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নেককারকেও জ্বালিয়ে দেয় এবং বদকারকেও জ্বালিয়ে দেয়। আল্লাহর এক পয়গম্বর হযরত জারজিস (আ.)কে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দুনিয়ার আগুন হযরত মূসা (আ.)-এর জিহ্বাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এমনিভাবে কোনো পুণ্যবতী নেককার মহিলা খাবার রান্না করছে। হঠাৎ অসর্তকতাবশত যদি তার হাত আগুনে পড়ে যায়, তাহলে আগুন তাকেও জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু জাহান্নামের আগুন ভিন্ন প্রকৃতির। সে শুধু গুনাহগারদের জ্বালাবে। নেককারদের একটি পশমও জ্বালাবে না।

দুই. দুনিয়ার আগুন পানি দিয়ে নিভে যায়, কিন্তু জাহান্নামের আগুন পাপী বান্দাদের চক্ষুনির্গত অশ্রু দিয়ে নিভানো হবে।

তিন. দুনিয়ার আগুন বাতাস পেলে কখনও দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে আবার কখনও প্রচণ্ড বাতাসে নিভেও যায়। তো মুমিন বান্দা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করবে, তখন জাহান্নাম বলবে,

أَسْرِعْ يَا مُؤْمِنُ فَإِنَّ نُوْرَكَ أَطْفَأَ نَارِيْ

'হে মুমিন! দ্রুত পার হও। কারণ, তোমার নূর আমার আগুনকে নিভিয়ে দিচ্ছে।'

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর সাতবার أَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ পাঠ করার অভ্যাস বানিয়ে নেবে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

প্রকৃত মুমিনের পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

'ঈমানদার লোকদের অন্তরগুলো আল্লাহ ও তাঁর সতর্কবাণীর ভয়ে কি কখনও কেঁপে উঠার সময় হয়নি?'[১]

সুবহানাল্লাহ!

---

১. সূরা হাদীদ : ১৬

আল্লাহ তা'আলা কী বিস্ময়কর ভঙ্গিমায় কথা বলেছেন যে, তাদের ভয় করার সময় কি এখনও আসেনি? অর্থাৎ– এ কাজ তো আরও আগেই হয়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু এখনও কেন হয়নি? সময় তো অনেক গড়িয়ে গেল।

ইমাম রাযী (রহ.) এই আয়াতের অধীনে তাফসীরে কাবীরে লিখেছেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَكُوْنُ مُؤْمِنًا فِي الْحَقِيْقَةِ إِلَّا مَعَ خُشُوْعِ الْقَلْبِ.

'মুমিন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি না হবে।'

খাশিয়্যাতের কয়েকটি প্রকার

ইমাম গায্‌যালী (রহ.) খাশিয়্যাতের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করেছেন।

নামাযে খাশিয়্যাত : নামাযে খাশিয়্যাতের প্রকৃত অর্থ ইতমিনান ও স্থিরতা। অর্থাৎ মানুষ নামায এমন সুন্দরভাবে পড়বে, যেন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ধীরতা প্রকাশ পায় এবং প্রত্যেকটি ওঠা-বসায় তা'দীলে আরকানের খেয়াল রাখবে। একেই বলে একাগ্রচিত্তে নামায পড়া, সাজিয়ে-গুছিয়ে নামায পড়া। এর প্রমাণ হলো নবীজির একটি হাদীছ। এক ব্যক্তি নামাযের নিয়ত বাঁধল। তারপর স্বীয় দাড়িতে আঙুল ঢুকিয়ে আঁচড়াতে লাগল। নবীজি দেখে ইরশাদ করলেন

لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هٰذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُه

'যদি আল্লাহর এ বান্দার অন্তরে খাশিয়্যাত থাকত, তাহলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও আল্লাহকে ভয় করত। দাড়ি নিয়ে এভাবে খেলা করত না।'

আল্লাহর জিকিরে খাশিয়্যাত : মানুষ যখন আল্লাহর যিকির, ও মুরাকাবায় থাকে, তখনও তার অন্তরে খুশু-খুজু থাকে। এর ধরন অনেকটা এমন যে, কখনও আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা কারো-কারো মুখ থেকে উ-হ্-আ-হ্ শব্দে বের হয়। কখনও কেউ কোমল শীতল দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে। কারো আবার চোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রু ঝরে। কখনও তার শরীর শিউরে উঠে পশম দাঁড়িয়ে যায়। কখনও পুরো দেহ ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। আবার কখনও পরিস্থিতি এতই নাজুক হয়ে যায় যে, কাঁদতে-কাঁদতে অচেতন হয়ে যায়। এই ছটফট করা, বড়-বড় গরম নিশ্বাস ফেলা, আহ-উহ করা, অচেতন হয়ে যাওয়া, এগুলো খাশিয়্যাত তথা খোদাভীতিরই অংশবিশেষ।

আল্লাহর ভালোবাসায় উহ্-আহ্ করা, বিলাপ করা

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মাজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

'নিশ্চয়ই ইবরাহীম আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসায় উহ্-আহ্ করত, বিলাপ করত।'[১]

কারো সঙ্গে মহব্বত থাকলে তার মুখ থেকে নিজে-নিজেই এমন শব্দ বের হয়ে যায়, যা দ্বারা অন্য ব্যক্তি বুঝতে পারে, এ লোকের অন্তরে কোনো বেদনা জমে আছে।

'আহ্-উহ্'র পরিচয়

তাফসীরে রুহুর মাআনীতে লেখা আছে, اَلْأَوَّاهُ অর্থ اَلْخَاشِعُ - اَلْمُتَضَرِّعُ।

অর্থাৎ اَلْخَاشِعُ তথা খোদাভীরু ব্যক্তি তাকে বলে, যার মধ্যে অস্থিরতা, কান্নাকাটি ও অজানা উদ্বেগ থাকবে আর আহ্-উহ্গুলো একটু উঁচু আওয়াজের হয়ে থাকে। 'আহ্' কখনও নিঃশব্দে হয় না। ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের একটি কবিতায় কিছু অংশ উল্লেখ করেন,

إِذَا مَا كُنْتُ أَرْحِلُهَا بِلَيْلٍ * تَأَوَّهُ آهة رجل الْحَزِيْن

'যখন আমি গভীর রাতে জেগে উঠি আমার উটের রশি বেঁধে দিব বলে, তখন সে কোনো বেদনাহত ব্যক্তির মতো বিলাপ করতে থাকে। উট কখনও এমন শব্দ বের করে, যা শুনে মনে হবে, যেন কোনো চিন্তাগ্রস্ত বেদনাহত ব্যক্তি উহ্-আহ্ করছে, বিলাপ করছে।'

خاموش رہ کے دل کا نکلتا نہیں غبار * اے عندلیب! بول دہائی خدا کی ہے.

تڑپنا تلملانا ہجر میں رو رو کے مر جانا * ہے شیوۂ عاشقی میں یہ مریضان محبت.

'চুপচাপ থাকলে অন্তরের কুয়াশা কাটে না। হে প্রেমিক! কথা-কাজে তাওফীক তো আল্লাহর কাছে ছটফট করা, কান্নাকাটি করা, উৎকণ্ঠিত হওয়া, বিচ্ছেদে কেঁদে-কেঁদে একাকার হওয়া। এরা সবাই প্রেমের জগতের ভালবাসার রোগী।'

---

১. সূরা তাওবা : ১১৪

উত্তম সাধকের পরিচয়

আল্লাহর যিকিরের সময় তো কম-বেশি উহ্-আহ শব্দ বের হয়ই। তবে উত্তম সাধক সেই ব্যক্তি, যে এই শব্দকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। পাত্র যদি বড় হয়, তাহলে খুব ছোট জিনিসও তাতে এঁটে যায়। আর যদি পাত্র ছোট হয়, তাহলে উতলিয়ে সব বাইরে পড়ে যায়। আমরা নকশবন্দী। সেই খাশিয়্যাতের অবস্থা ও কাইফিয়্যাত অন্তরে ঢেলে তার ওপর বিবেকের ঢাকনা রেখে দিন এবং সেই তরকারি ভালোভাবে সিদ্ধ হতে দিন। সাধারণত তরকারি দেরিতে সিদ্ধ হয়; কিন্তু ঢাকনা দেওয়ার কারণে সেটি দ্রুত সিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং নিজের অন্তরের অবস্থার ওপর গোপনীয়তার ঢাকনা দিয়ে তা সিদ্ধ হতে দাও।

وصل کا لطف یہی ہے کہ رہیں ہوش بجا * دل بھی قبضے میں رہے پہلو میں دلدار بھی ہو.

'মিলনের প্রকৃত স্বাদ তো এই যে, হুঁশ যথাস্থানে থাকবে, অন্তরও থাকবে নিয়ন্ত্রণে আর কাঙ্ক্ষিত মানুষটিও থাকবে আলিঙ্গনে।'

এ কারণেই আমাদের নকশবন্দী হযরতগণ নিজেদের যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন।

প্রিয়তমের মায়ার দৃষ্টি

তথাপি কখনও-কখনও প্রিয়তমের দৃষ্টিবাণ এতই তীক্ষ্ণ হয়, যা বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলে। তারপর আর মানুষ নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এমন বান্দা যদি কখনও কেঁদে ওঠে, তখন আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের দরবারে এর বড়ই কদর হয়, বড়ই মূল্যায়ন হয়।

সুখে-দুখে আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়

প্রিয় সুধী! আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সেই সত্তা, যাকে পৃথিবীর মাখলুক সব চেয়ে বেশি ভালোবেসেছে। যে পরিমাণ ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন, অন্য কেউ তেমন পায়নি। যে পরিমাণ প্রশংসা আল্লাহর করা হয়েছে, এমন প্রশংসা অন্য কারো ভাগে জোটেনি। তার দরবারে মজলুমের যে পডিরমাণ ফরিয়াদ পৌঁছেছে, অন্য কারো দরবারে এত পৌঁছেনি। তাঁর ঘরের দরজা ধরে যে পরিমাণ কান্নাকাটি করা হয়েছে, অন্য কোনো দানশীলের দরজায় তা হয়নি। নিজের দুঃখ-দুর্দশায় যে পরিমাণ তাঁর নামের উচ্চারণ হয়, এমন অন্য কারো বেলায় হয়নি।

সর্বহারা সহায়হীন যখন তার শেষ অবলম্বনটুকুও হারিয়ে ফেলে, তখন তার কাতর দৃষ্টি যার আশ্রয়ের দিকে বারবার তাকায়, তিনি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। আশার প্রদীপগুলো সব যখন নিভে যায়, তখন শুধু এক টুকরো আলোই বাকি থাকে, তা হলো মহান আল্লাহর অস্তিত্ব। পৃথিবীবাসীর স্বার্থপরতায় যখন মানুষ নিরাশ হয়ে যায়, তখন কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী দয়াময় আল্লাহর সত্তায়ই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। যখন কোনো উপকারী বন্ধু না থাকে, তখন আল্লাহই হন তার একমাত্র বন্ধু, পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। এভাবে আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের দয়া ও অনুগ্রহ, বড়ত্ব ও মর্যাদা যখন মানুষের অন্তরে গেঁথে যায়, তখন তার কাতর দৃষ্টি সদা আল্লাহর আরশের দিকে পড়ে থাকে। ফলে তার মধ্যে পাপ করার সাহসও হয় না। কারণ, সে জানে, যদি আমি আমার প্রভুর সঙ্গে নাফারমানি করি, তাহলে তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

সাধারণ মানুষের অন্তরে খোদাভীতি

সাধারণ মানুষের খোদাভীতির ধরন অনেকটা এমন হয় যে, সে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পায়, ফেরেশতাগণ মারধর করবেন তাও ভয় পায়। জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ড উত্তপ্ত হবে, শরীরের চামড়া ঝলসে যাবে এর ভয়ও আছে তার মধ্যে। সে ভয় পায় কিয়ামতের দিন চরম লাঞ্ছিত হতে হবে। তার ভয় হয় কবরের মধ্যে না আবার সাপ-বিচ্ছু প্রবেশ করিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। ফেরশতারা না আবার বিশাল লৌহনির্মিত গুর্জ দিয়ে আযাব দেয়। এসব চিন্তার কারণে সে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে।

আল্লাহওয়ালাদের অন্তরে খোদাভীতি

আল্লাহওয়ালাদের অন্তরেও প্রচণ্ড রকমের খোদাভীতি কাজ করে। তবে একটু ভিন্ন ধরনের। তারা বিভিন্ন দুঃখ কষ্টকে হালকা দৃষ্টিতেই দেখেন। তবে একটি বিষয়ে তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং কখনও-কখনও মারাত্মভাবে ভেঙে পড়েন। তা হলো, যদি আমি গুনাহ করি, তাহলে আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।'

যার প্রতি তার রব্বে কারীম মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তার তো আর কিছুই বাঁচল না। দুনিয়া-আখেরাত তার সবই শেষ হয়ে গেল। আল্লাহওয়ালারা আল্লাহ তা'আলার এই অসন্তুষ্টিকে বড়ই ভয় করেন। কখনও যদি বাড়িয়ে-সাজিয়ে কোনো ইবাদাত-বন্দেগীও করেন, তারপরও তাঁদের এই উৎকণ্ঠা থেকেই যায় যে, আমার অমুখাপেক্ষী আল্লাহ অতি নগণ্য এই ইবাদাতকে অপছন্দ করে আবার না আমার মুখে নিক্ষেপ করে বসেন!

হাদীছে পাকে এসেছে, রিয়াকারী (লোকদেখানো) ইবাদাতকারীদের আমলগুলো পুরাতন দুর্গন্ধময় কাপড়ে মুড়িয়ে তাদের মুখে নিক্ষেপ করা হয়। এমন অনেক তাহাজ্জুদগুজার আছেন, যারা গভীর রাতের অন্ধকারে নামায পড়েছিল; কিন্তু সেই নামায লোকদেখানো ছিল বলে কিয়ামতের দিন উক্ত আমলগুলো ওই অন্ধকারেই মুছে দেবেন। কতক লোক এমন আছে, যারা দুনিয়ায় কালেমা পাঠ করে ঠিকই; কিন্তু আমল-আখলাক কালেমার দাবির বিপরীত। এর কারণে মৃত্যুর পর কবরে তাদের কেবলামুখী মুখকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অনেক লোক এমন আছেন, যারা কবরে পৌঁছার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের বলা হবে,

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ

'ঘুমাও যেভাবে নবদুলহা ঘুমায়!'

আর কতজন এমনও হবেন, যাদের কবরে রাখার সঙ্গে-সঙ্গে বলা হবে,

نَمْ كَنَوْمَةِ الْمَنْحُوْسِ

'ঘুমাও যেভাবে দুর্ভাগারা ঘুমায়!'

এদের জন্য দুর্বিষহ শাস্তি রাখা হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।

আল্লাহওলারা যখন ইবাদাত করেন, তখন তাদের অন্তরে এই অনুভূতি থাকে যে, আল্লাহ কত বড় মর্যাদাবান, পরাক্রমশালী! তাঁর শান কত উঁচু ও সুমহান! আর আমি কত নগণ্য বান্দা; পাপের বোঝায় চাপা পড়া এক দুর্বল দাস! আমার ইবাদাত কত ক্রটিপূর্ণ! এমন মহান আল্লাহর দরবারে এমন ক্রটিযুক্ত বন্দেগী নিয়ে কিভাবে উপস্থিত হব? তিনি যদি আমার ইবাদাতের দিকে মুখ তুলেও না তাকান, তাহলে আমার কী উপায় হবে? আমার ইবাদাতের জন্য যদি আসমানের দরজাসমূহ খোলা না হয়, তাহলে কী উপায় হবে? এ কারণেই যারা বেশি-বেশি ইবাদাত করে, রাতের-পর-রাত বিনিদ্র থেকে সিজদায় পড়ে থাকে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশার ওযু দ্বারা ফযরের নামায আদায় করে, যখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামায আদায় করার পর দু'আর জন্য হাত তোলে, তখন বলে, হে আল্লাহ!

وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ.

'আমরা আপনার ইবাদাতের হক আদায় করে ইবাদাত করতে পারিনি। আপনার মারেফাত যেভাবে অর্জন করা দরকার ছিল সেভাবে অর্জন করতে পারিনি। দয়া করে আমাদের ক্ষমা করে দিন।'

এ হলো ঐসব নেক বান্দাদের মুনাজাত, যাদের জীবন ফুলের মতো পবিত্র। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত কামেল বান্দারা এত ইবাদাত-বন্দেগী করেও তাঁর দরবারে আঁচল মেলে দু'আ করতেন, হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি কবুল কর, তবে তা হবে তোমার করুণা ও দয়া। আর যদি সব প্রত্যাখান কর, তবে তা হবে তোমার ইনসাফ। দুনিয়ায় শিক্ষামূলক অনেক ঘটনা ও দৃষ্টান্ত তাদের সামনে ভাসতে থাকে, যা থেকে তারা জীবনের পাথেয় খুঁজে পায়।

বাল'আম বাউর নামে বনী ইসরাঈলের এক আবেদ পাঁচশত বছর ইবাদাত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার শানে বে-আদবীর কারণে আল্লাহর শানে বেনিয়াযীর (অমুখাপেক্ষিতার) গুণে আঘাত লেগেছিল। তিনি তার পাঁচশত বছরের সকল ইবাদাতকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে কুকুরের স্তরে নিয়ে নামিয়ে ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তার ব্যাপারে বলেন,

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

'তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মতো।'[১]

হে প্রভু দয়াময়! তুমি চাইলে পাঁচশত বছর ইবাদাতের পরও কুকুরের সাথে হাশর করে দিতে পার। এটা তোমার ইনসাফ হবে। আর যদি তোমার রহমতের দরিয়ায় জোশ আসে, ফুযাইল ইবনে ইয়াযের মতো কুখ্যাত ডাকাতসর্দারকে উঠিয়ে এনে অলীগণের সর্দার বানাতে পারেন। যখন মানুষের নফস আত্মশুদ্ধির জ্বলন্ত কয়লার ভাট্টিতে জ্বলে-পুড়ে নরম হয়ে যায়, তখন সে গুনাহ করতে ভয় পায়। বাদশার কোনো ভৃত্য যেমন এজন্য অপরাধ করে না যে, বাদশা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, ঠিক তদ্রূপ বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহর খাশিয়্যাত ও ভয় সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন সেও ভয় পায়, হায়! পাছে আমার আল্লাহ না অসন্তুষ্ট হয়ে যান। একেই 'খাশিয়্যাত' বলা হয়।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝুন। ইমাম গয্যালী (রহ.) বলেন, সিংহের কাছে যদি কাউকে বসা দেখ, তাহলে লক্ষ করে দেখো, লোকটি তার ভয়ে আতঙ্কিত থাকবে। অথচ সিংহ তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, কোনো ক্ষতিও করছে না। কিন্তু তারপরও মানুষ সিংহের আল্লাহ্প্রদত্ত প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আতঙ্কিত থাকে। সে জানে, যদি সিংহ তার দিকে মনোযোগ দেয়, তাহলে তাকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে টুকরা-টুকরা করে ফেলবে। এমনিভাবে

---

১. সূরা আরাফ : ১৭৭

যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার বিষয়ে আল্লাহওয়ালারা ভালো জানেন, তাঁর অমুখাপেক্ষিতা ও ক্ষমতার কথা জানেন, তাই তাঁরা সর্বদা আতঙ্কিত থাকেন। তাঁরা বোঝেন, যদি আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার গুণে কোনো কারণে হালকা বাতাসও লাগে, তাহলে আর রক্ষা নেই। আমাদের সকল ইবাদাত বন্দেগী উড়ন্ত ধুলাবালির মতো শূন্যে ভাসতে থাকবে।

ঈমানের প্রমাণ

আল্লাহওলাদের অন্তরে সর্বদা এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করে। তারা ইবাদাত করে; কিন্তু পরিতৃপ্তি আসে না, মন প্রশান্ত হয় না। এক ধরনের অশান্তি সর্বদা তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আসলে যার স্বীয় পরিণতি সম্পর্কে জানা নেই সে কী অবস্থায় মারা যাবে, সে কিভাবে প্রশান্তিতে থাকতে পারে! তার মনে তো সব সময় এই আতঙ্ক থাকে যে, হায়! আমার কবর জান্নাতের টুকরো হবে, না জাহান্নামের গর্ত। সে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতাকে ভয় করে। কে জানে, আমার হাশর জান্নাতীদের সঙ্গে হবে, না জাহান্নামীদের সঙ্গে হবে।

চক্ষুকে উর্দূ ভাষায় چشم (চশম) বলে। চশম তথা চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরে। আরেকটি چشم (চশম)ও আছে, যা মূলত জমিনের চোখ। সেখান থেকেও পানি ঝরে ঝরনা হয়ে। আরবি ভাষায় উভয়টাকে বলা হয় عَيْن। (আইন) অর্থ চক্ষু। মানুষের চক্ষু থেকেও পানি ঝরে, জমিনের চক্ষু থেকেও পানি ঝরে। উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু মিলও রয়েছে। যেমন-

ঝরনার পানি দিয়ে উৎপাদিত ফসল ধ্বংসশীল; কিন্তু চোখের পানিতে উৎপাদিত ফসল আখেরাত চিরস্থায়ী ও লয়হীন।

ঝরনার পানি মানুষের বাহ্যিক ময়লা দূর করে আর চোখের পানি তাদের অভ্যন্তরীণ তথা অন্তরের ময়লা দূর করে।

ঝরনার পানি এতটা মর্যাদার অধিকারী নয় যে, তাকে মিযানের পাল্লায় ওজন করা হবে। কিন্তু চোখের পানি আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের কাছে এতই মূল্যবান যে, হাদীছে এসেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আল্লাহর স্মরণে কিংবা অতীতের পাপ স্মরণ করে ক্রন্দনকারী বান্দার চোখের পানিকেও তার আমলনামার সঙ্গে মিযানের পাল্লায় ওজন করবেন। সেদিন এক-এক ফোঁটা চোখের পানির ওজন আসমান-জমিনের চেয়ে বেশি ভারী হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ!

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন,

تَضَرَّعُوْا وَابْكُوْا

'তোমরা খুব অনুনয়-বিনয় করো এবং খুব কান্নাকাটি করো।'

কারণ, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি সবাই আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করে। অথচ আজ আমাদের অবস্থা কী? আমরা হাসাহাসির স্বাদ নিয়েছি; কিন্তু কান্নাকাটির স্বাদ নেইনি।

কান্নার স্বাদ

আপনারা মৃত ছাগল-বকরি দেখেছেন অবশ্যই। মৃত্যুর পর তার দাঁতগুলো সব বিভৎসভাবে বেরিয়ে থাকে। আমাদের হাসিগুলোও এমনই বিভৎস দেখা যায়। হে মৃত ছাগলের মতো দাঁত দেখিয়ে হাসাহাসিতে লিপ্ত ব্যক্তি! তুমি কান্নার স্বাদ পাবে কী করে? কখনও তো কাঁদার সুযোগই তুমি পাওনি। জ্বলন্ত মোমবাতির মতো অশ্রু ঝরাও; দেখবে, তোমার অন্তরের অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়ে গেছে।

কান্নার প্রকার

আমাদের কান্নাকাটির অনেকগুলো প্রকার আছে। যেমন-

এক. বিপদে কান্না করা : এটি একটি স্বভাবজাত বিষয়। ছোট হোক বা বড়, যার ওপরই বিপদ আসে, তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। একজন মুমিন বান্দার জীবনে ছোট-বড় যত বিপদই আসুক এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি বাতাসের ঝাপটায় জ্বলন্ত প্রদীপও যদি নিভে যায়, এর বিনিময়েও আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ছাওয়াব দান করেন। এমনিভাবে কোনো বান্দা যদি জামায় দুটি পকেট লাগায়। তারপর এক পকেটে টাকা-পয়সা রাখে, কিছুক্ষণ পর অপর পকেটে হাত দিয়ে দেখে, টাকা নেই, এতে সে পেরেশান হয়। এর কয়েক সেকেণ্ড পর সে অন্য পকেটে হাত দিয়ে দেখে, টাকা তো ঠিক মতো পকেটেই আছে। তো তার এই ভুলবশত পেরেশানির বিনিময়েও আল্লাহ তা'আলা তাকে ছাওয়াব দান করেন।

দুই. কারো বিচ্ছেদে কাঁদা : আরেক ধরনের কান্না হলো বিরহ কিংবা বিচ্ছেদের কান্না। যেমন- ইয়াকুব (আ.) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-এর

বিচ্ছেদযন্ত্রণায় কান্নাকাটি করতেন। এত বেশি কাঁদতেন যে, কুরআন বলে, কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর চোখদুটি সাদা হয়ে গিয়েছিল।

নবীজির অশ্রু : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাযি.) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন নবীজি তাঁর দাফন-কাফন নিজহাতে সম্পন্ন করেন। তখন নবীজির চক্ষু থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরছিল। এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কাঁদছেন? তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,

اَلْقَلْبُ يَحْزَنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَاِنَّا بِرَاثَاثِ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ

'অন্তর ব্যথিত হয়, চোখ অশ্রু ঝরায় আর আমরা হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে শোকাহত।'

হযরত বিলাল (রাযি.)-এর আযানের সময় সাহাবাদের কান্না : হযরত বেলাল (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর সিরিয়ায় হিজরত করে চলে যান। বহুদিন পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। একবার স্বপ্নযোগে নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। নবীজি তাঁকে ইরশাদ করলেন, বেলাল! তুমি তো এখন আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসই না। উদ্দেশ্য তুমি মদীনা থেকে বহুদূর বসবাস করছ। এই স্বপ্ন দেখার পর তাঁর মনটা বড় উদাস হয়ে গেল। কিছুই ভালো লাগছে না তাঁর। তাই কদিন পরেই সফর করে মদীনায় চলে এলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) হযরত বিলালকে দেখে তাদের পুরোনো স্মৃতিগুলো তাজা হয়ে গেল। সবাই একত্রিত হয়ে তাকে আবেদন করল, 'আমরা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের আযান শুনতে চাই।' হযরত বিলাল বললেন, ভাই! সেই স্মৃতি মনে পড়লে আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। সবাই পীড়াপীড়ি করছেন আর তিনি অস্বীকার করছেন। অবশেষে হযরত হাসান-হুসাইন (রাযি.) এসে আবেদন করলেন, আমাদেরকে নানাজানের যুগের আযান শোনান। তাঁদের আদেশ কোনো মামুলি আদেশ ছিল না। তারপর হযরত বিলাল সেই স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নবীজির যুগে আযান দিতেন।

'আল্লাহু আকবার' বলে আযান শুরু হয়ে গেল। আযানের আওয়াজ ছিল হযরত বিলালের; কিন্তু স্মৃতিতে ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এক দিকে আযান হচ্ছিল, অপর দিকে মদীনার যুবক-বৃদ্ধ এমনকি ঘরের নারীদের মধ্যেও হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। বহুদিন পর মদীনার

বাতাসে রাসূলের মুয়ায্যিন হযরত বিলালের আযান গুঞ্জরিত হলো। আবেগাপ্লুত হয়ে কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। মদীনায় কান্নার রোল পড়ে গেল। কেউ-কেউ তো আত্মহারা হয়ে বিলাপ করতে লাগল।

এদিকে হযরত বিলালের অবস্থা আরও করুণ হয়ে পড়ল। তিনি যখন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। নবীজির প্রেম ও বিচ্ছেদবেদনায় বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সে এক করুণ দৃশ্য। পৃথিবীর কেউ ভালোবাসার এমন অনুপম দৃষ্টান্ত দেখেছে কি কখনও?

তিন. তেলাওয়াতের সময় কান্না করা : কান্নার তৃতীয় প্রকার হলো, কুরআন কারীম তেলাওয়াত করার সময় কাঁদা। হাদীছে এসেছে, কুরআন তেলাওয়াতের সময় যে ব্যক্তির চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে দেন। এ কারণেই হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বলতেন, কুরআন তেলাওয়াতের সময় জাহান্নাম ও শাস্তির আয়াত যখন আসবে, তখন কান্নার চেষ্টা করো। যদি কান্না না আসে, তাহলে কান্নার ভান হলেও করো। আল্লাহ তা'আলা তোমার এই অভিনয়কে কবুল করে নেবেন।

তেলাওয়াতের সময় সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

ইমাম গায্যালী (রহ.) লিখেছেন, তেলাওয়াতের সময় সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা থাকত বিস্ময়কর ধরনের। তাদের অনেকে দুলতে থাকতেন, কেউ অঝোরে কাঁদতেন, কেউ বেহুঁশ হয়ে যেতেন, কেউ তো এমনও ছিলেন যে, কুরআন শুনে বেহুঁশ হয়ে গেছেন আর সে অবস্থায়ই ইন্তেকাল করে গেছেন। তো বোঝা গেল, কুরআন পড়া ও শোনার সময় কান্নাকাটি করা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত ছিল।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর অন্তরে খোদাভীতি : যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার কারণে মসজিদে যেতে না পেরে হযরত আবুবকর (রাযি.)কে নামাযের মুসল্লায় দাঁড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন, তখন হযরত আয়েশা (রাযি.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবুবকর যদি আপনার মুসল্লায় দাঁড়ান, তাহলে নামাযে

তেলাওয়াতের সময় কান্নার কারণে কেউ তাঁর তেলাওয়াত বুঝতে পারবে না। আমি তাঁর মেজাজ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানি। কারণ, আমি তার কন্যা।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয় : হযরত ওমর (রাযি.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি ফজরের নামাযের ইমামত করতেন। সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করার সময় এত কাঁদতেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি নামাযের শেষ কাতারে ছিলাম। তিনি إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ এ আয়াত পড়ে এমনভাবে কেঁদেছেন যে, আমি শেষ কাতার থেকে তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর বেহুশ হয়ে যাওয়া : একবার হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ

'এ হচ্ছে সেই দিন, যেদিন কেউ কোনো কথা বলবে না, কাউকে ওজর পেশ করার সুযোগও দেওয়া হবে না।'[১]

এ আয়াতটি শুনে কেঁপে উঠলেন এবং এক পর্যায়ে মাটিতে পড়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

আলী বিন ফুযাইল বিন ইয়াযের (রহ.) খোদাভীতি : হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায (রহ.)- এর পুত্র আলীকেও আল্লাহ তা'আলা খোদাভীতি দান করেছিলেন। তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন কিংবা শুনতেন, তখন আযাব ও শাস্তির আয়াতগুলোর স্থানে তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন। কখনও পুরো কুরআন একসাথে শুনতে পারতেন না। এজন্য তিনি দু'আও করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে পুরো কুরআন একসাথে শোনার তাওফীক দান করুন। একবার কারী সাহেব তাঁর সামনে তেলাওয়াত করলেন,

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

'কেয়ামতের দিন মানুষকে তার প্রভুর সম্মুখে (হিসাবের জন্য) দাঁড় করানো হবে।'[২]

আয়াতটি শুনতেই তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহু আকবার!

---

১. সূরা মুরসালাত : ৩৫, ৩৬

২. সূরা মুতাফফিফীন : ৬

হযরত শিবলী (রহ.)-এর অন্তরে খোদাভীতি : একবার হযরত শিবলী (রহ.) এ আয়াত শুনলেন,

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ.

'আমি চাইলে তোমার উপর য অহী অবতীর্ণ করেছি, তা প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম।'[১]

ইমাম সাহেব এ আয়াতটি তারাবীহর নামাযে তেলাওয়াত করলেন। হযরত শিবলী (রহ.) তা শুনে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কুরআন শোনার পর আশেকদের অন্তরে কেমন ঝড় বয়ে যায়, তা আমরা কী করে জানব!

نازہے گل کو نزاکت کا چمن میں اے ذوق * اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے.

'হে যওক! পুষ্পোদ্যানে ফুলের আত্মগরিমা একটু বেশিই থাকে। সে তো কখনো গৌরব-গরিমাশীল ব্যক্তিদের দেখেনি।'

আমাদের করুণ অবস্থা

আজ এখানেও কুরআন পড়া হয়; কিন্তু আমাদের মধ্যে পূর্ববর্তীদের মতো ভাব সৃষ্টি হয় না। কারণ, আমরা অধিকাংশই কুরআনের অর্থ বুঝি না। কারী সাহেব তেলাওয়াত করছেন اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ আর শ্রোতারা তার কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে বলছেন, সুবহানাল্লাহ। অথচ এখানে এক ভয়াবহ হুমকির বিষয় আলোচনা এসেছে। আয়াতের অর্থ হলো 'নিশ্চয়ই অপরাধীদের থেকে আমি নিজেই প্রতিশোধ নেব।'

চিন্তা করে দেখুন, কেমন মারাত্মক ব্যাপার এটা? অথচ বেখবর শ্রোতৃমণ্ডলি শুনে সুবহানাল্লাহ বলছে! বোঝা গেল, কারী সাহেবের আওয়াজই শুধু আমার কানে পৌঁছয়। তাঁর তেলাওয়াত আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না। হলে যেমন ভয়, খাশিয়্যাত ও কাইফিয়্যাত সৃষ্টি হওয়ার কথা, তা হয় না।

আপনারা হয়তো প্রায়ই দেখেছেন, কারো-কারো সামনে যখন কোনো বেদনার কবিতা আবৃতি করা হয় কিংবা বিরহের গান গাওয়া হয়, তখন তাদের চোখে পানি আসে; কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত শুনে চোখে পানি আসে না। এই মহামারিতে যেমন সাধারণ মানুষ আক্রান্ত, তেমনি কিছু ওলামায়ে কেরামও আক্রান্ত। এখন অন্তরে প্রশ্ন জাগে, এমনটা কেন হয়?

---

১. বানী ইসরাইল : ৮৬

তো শুনুন! কবিতা-ছন্দ এগুলো মানুষের কালাম আর কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম। মানুষের অন্তরে যখন মাখলুকের মহব্বত থাকে, তখন কবিতা-ছন্দ শুনে তার চোখ ভিজে যায়। আর যখন অন্তরে কেবল আল্লাহর মহব্বত ছাড়া অন্য কারো মহব্বত না থাকে, তখন কুরআন শুনে তারও চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। এটা আমাদের অন্তরের অবস্থা জানার একটি উপায়। যদি কুরআন শুনেও কান্না না আসে, তাহলে বুঝতে হবে, মহব্বতের যে স্তর অর্জিত হওয়া উচিত ছিল, তা এখনও অর্জিত হয়নি। মাখলুকের মহব্বত থেকে নফস এখনও মুক্তি পায়নি। এখনও স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সেই সম্পর্ক, সেই অন্তরঙ্গতা ও সেই বন্ধন তৈরি হয়নি। অন্তরকে গাইরুল্লাহ থেকে এখনও পরিপূর্ণ মুক্ত করা যায়নি। আর অবশ্যই এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয়।

আহলে ইল্‌মের পরিচয়

এবার আমি আপনাদের সম্মুখে দুটি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করব। মাহফিল শেষে আপনারা দুটি সিজদা করে নেবেন। (প্রিয় পাঠকও যদি এ আয়াত পাঠ করেন, তাহলে সিজদা করে নেবেন।)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

'নিশ্চয়ই যাদের ইতিপূর্ব কিতাব দেওয়া হয়েছে, যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পড়া হয়, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে, সকল পবিত্রতা আমাদের রবের নামে, নিশ্চয়ই আমাদেরর রবের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবেই।'[১]

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

'তারা কুরআন শোনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং অঝোরে কাঁদত। এতে তাদের অন্তরে খুশু-খুজু ও খোদাভীতি বৃদ্ধি পেত।'[২]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আহলে ইল্‌মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তারা কুরআন শোনে এবং কান্নাকাটি করে।

আমার ধারণামতে এই মাহফিলে অন্তত একশত ওলামায়ে কেরাম উপবিষ্ট আছেন। আপনাদের মধ্যে কি একজনও এমন আছেন, যিনি দাঁড়িয়ে

১. সূরা বানী ইসরাইল : ১০৮
২. সূরা বানী ইসরাইল : ১০৯

বলতে পারবেন, আমি কুরআন শুনে কেঁদেছি এবং কাঁদতে-কাঁদতে বেহুঁশও হয়েছি? আছেন কেউ এমন? নেই। বোঝা গেল, আমাদের ইল্‌ম হলো শব্দের ইল্‌ম, অক্ষরের ইল্‌ম। এ থেকে এক পা এগিয়ে যেতে হবে। রুহানিয়্যাত ও কাইফিয়্যাত অর্জন করতে হবে। আমাদের আসলাফ ও পূর্বসূরীদের মধ্যে ইল্‌ম আক্ষরিকভাবেও ছিল, আবার আমল ও রুহানিয়্যাতসমৃদ্ধও ছিল।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইল্‌মের নিশানা

সাধারণ লোকদের কথা বাদই দিলাম। আমরা আহ্‌লে ইল্‌মদের কথাই আলোচনা করি। যারা দশ-পনেরো বছর যাবৎ নিজে ইল্‌ম শিখেছেন, অন্যকে শিখিয়েছেন, যাদের টাখনু-হাঁটু ও নিতম্বে বসতে-বসতে মেছতা পড়ে গেছে। কোমল চামড়ায় কালো-কালো দাগ পড়ে গেছে, তাদের বলছি, এবার এক পা আগে বাড়ুন। ইল্‌ম অনুয়ায়ী আমলে কোনো প্রকার ত্রুটি যেন না থাকে। মেছতা পড়ে যাওয়া এ সবে মাহাত্মের তেমন কিছু নেই। দাগ তো চতুষ্পদ জন্তুর দেহেও পড়ে। গাধা-ঘোড়াকে কি কখনও নিবীড়ভাবে দেখেছেন? বসতে-বসতে তাদের হাঁটু-পাঁজরেও দাগ পড়ে যায়। তো দাগ পড়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব হলো আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে। সুতরাং আমাদের আরও এক পা আগে বাড়তে হবে। কুরআনের প্রতিটি শব্দের আমলে জযবা তৈরি করতে হবে।

আর কবে হবে কান্নার তাওফীক?

আমি আরেকটি আয়াত আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করছি। আমরা সবাই চিন্তা করে দেখব, সারা জীবনে এ আয়াতের ওপর কখনও কি আমল করতে পেরেছি, নাকি পারিনি? যদি এখনও আমল করা না হয়ে থাকে, তাহলে আর কবে হবে? আয়াতটি হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا

'ওই সব লোক, যাদের আমি হিদায়াত প্রদান করেছি এবং আমার জন্য নির্বাচন করেছি।'

এখানে ঐ মুমিন বান্দাদের আলোচনা হচ্ছে, যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত হেদায়াত দান করে নিজের দীনের কাজের জন্য কবুল করেছেন। যাদের জীবন মেহরাব ও মিম্বরের জন্য ওয়াক্‌ফ্ হয়েছে, যাদেরকে নবীগণের প্রতিনিধি ও ওয়ারিস বলা হয়, তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.

'যখন তাদের সম্মুখে রহমানের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।'[১]

এবার দেখুন, জীবনভর তারাবীহর নামাযে এ আয়াতটি বহুবার শুনেছেন। প্রত্যেকবারই পুরো মসজিদের সকল মুসল্লী মিলে আয়াতটির خَرُّوا (লুটিয়ে পড়া) শব্দটির ওপর আমলও করেছেন। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, এর পরবর্তী শব্দ بُكِيًّا (কান্না করা)-এর ওপর আমলকারী কজন আছেন? পুরো মসজিদে এমন একজনও পাওয়া বড় কষ্টকর হয়ে যাবে। তাহলে বলুন, সেই সময়টি কবে আসবে, যেদিন আমরা এক পা সামনে এগিয়ে যাব এবং অন্তরগুলোর কাইফিয়্যাত এমন হবে, যখন কুরআনের তেলাওয়াত শুনব কিংবা নিজেরা তেলাওয়াত করব, তখন চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরবে। আমাদের সালফে সালেহীন এ আয়াতটি তারাবীহর নামাযে শুনে সেজদায় গিয়ে খুব কাঁদতেন। আচ্ছা! আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, আমার চোখে পানি আসে না কেন? সারা জীবন কুরআন-হাদীছের দরস দিয়েও بُكِيًّا শব্দটির ওপর আমল করা ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করব? কান্নার তাওফীক কবে হবে আমাদের?

মনে রাখবেন, কান্নার তাওফীক তারা পায়, যারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। এই তাওফীক ভরা পেটে মিলে না – ক্ষুধিত পেটে মিলে। এটি সংবাদপত্র পড়ার দ্বারা মিলে না; বরং কুরআন তিলওয়াতের দ্বারা মিলে। পরের ত্রুটি অন্বেষণের দ্বারা এ তাওফীক ভাগ্যে জোটে না; বরং সুন্নাতের ওপর আমল করার দ্বারা জোটে। এজন্য আমরা নিজেদের অন্তরের অবস্থার পর্যালোচনা করি। কী বিস্ময়ের কথা! মসজিদভর্তি মানুষ; অথচ কান্না কারো ভাগ্যেই জোটে না। দু'আ করি, আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদার তাওফীক দান করুন। এখন থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা সেজদার সাথে-সাথে কাঁদারও চেষ্টা করব, যেন কুরআনের ওপর আমল হয়ে যায়।

আমাদের উদাসীনতা

আমাদের এই উদাসীনতার কথা স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল ইয্যতও বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

---

১. সূরা মারয়াম : ৫৮

وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ. وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ

'তোমরা হাসছ; কিন্তু কাঁদছ না। কারণ তোমরা গাফলতে স্থবির গেছ।'[১]

বোঝা গেল, মানুষের মধ্য থেকে যখন গাফলত ও উদাসীনতা কেটে যায়, তখন তাদের হাসি-ঠাট্টাওহ্রাস পায় আর কান্নাককাটি বেড়ে যায়।

এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের কাছে সাক্ষ্য চান। আল্লাহ্ বলেন,

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلًا

'আল্লাহর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কে আছে?'[২]

কেউ নেই। কুরআনের চেয়ে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? কেউ নয়। সেই কুরআন সাহাবায়ে কেরামের অবস্থার বিবরণ এভাবে তুলে ধরছে–

وَإِذَا سَمِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِيْنَ.

'তারা যখন রাসূলের উপর অবতীর্ণ আয়াতগুলো শোনে তখন সত্য চেনার কারণে তুমি তাদের অনেকের চোখকে অশ্রুবিগলিত দেখতে পাবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি; তুমি আমাদের শাহেদ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত বিষয়ের উপর আমরা কেন ঈমান আনব না? আমরা তো এই প্রত্যাশা রাখি যে, আমাদের রব আমাদেরকে সালেহ্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন।'[৩]

যখন এভাবে অনুনয়-বিনয় করে তারা প্রার্থনা করল, তখন আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্ও তাঁদের অঢেল দান করতেন এবং ওয়াদা পূরণ করতেন।

সবচেয়ে বড় বিপদ!

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'তে আছে,

يَسْتَحِبُّ الْبُكَى مَعَ الْقِرَاءَةِ

'মানুষ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে, তখন একটু ক্রন্দন করা মুস্তাহাব।'

---

১. সূরা নাজম : ৬০, ৬১
২. সূরা নিসা : ১২২
৩. সূরা মায়েদা : ৮৩, ৮৪

আর তা অর্জন করার পদ্ধতি হলো, সে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও আযমত বসাবে। তারপরও যদি কান্না না আসে, তাহলে বুঝতে হবে, তার ওপর আপতিত সকল বিপদের মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক বিপদ।

চার. পাপকে স্মরণ করে কাঁদা : কান্নার চতুর্থ প্রকার হলো নিজের পাপকে স্মরণ করে কাঁদা। মানুষ যখন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে কান্নাকাটি করে, তখন এই কান্না আল্লাহ তা'আলার দরবারে খুবই মূল্যায়িত হয়। তাই এটিও একটি পৃথক ইবাদাত। হাদীছে এসেছে,

مَنْ تَذَكَّرَ خَطَايَاهُ فَبَكَى عَيْنَاهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ

'যেলোক তার পাপ ও অপরাধগুলো স্মরণ করে এবং তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যখন কেউ পাপকে স্মরণ করে কান্নকাটি করে, তখন তার শরীরে যত পশম আছে, তাওবাকারীর আমলনামায় সেই পরিমাণ নেকী আল্লাহ তা'আলা তার আমলনামা লিখে দেন। সুবহানাল্লাহ!

আম্বিয়াগণের কান্না : হযরত আদম (আ.) স্বীয় ভুল-ত্রুটির জন্য তিনশ বছর পর্যন্ত কেঁদেছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) চল্লিশ বছর কেঁদেছিলেন। আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, এ তো নবীগণের কথা! তাহলে আমাদের আকাবিরীনে দীনের গল্পও শুনুন।

হযরত হাসান বসরীর (রহ.)-এর কান্না : হযরত হাসান বসরী (রহ.) এত কাঁদতেন যে, তাঁর চোখের পানি মাটির ওপর পর্যন্ত টপকে পড়ত। এই কান্না আল্লাহর ভয়ের কারণে ছিল। নিজেদের এত ভালো ও উৎকৃষ্ট আমল থাকা সত্ত্বেও তারা কাঁদতেন।

হযরত রাবেয়া বসরীর (রহ.) কান্না : হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) কাঁদতেন আর চোখের পানি মাটিতে ছিটাতেন। তার চোখের পানি এত বেশি পড়ত যে, সেখানে ঘাস উৎপন্ন হতো।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর কান্না : হযরত ওমর (রাযি.) এত বেশি কাঁদতেন যে, চোখ থেকে অতিমাত্রায় অশ্রু ঝরার কারণে তাঁর মুখে পানি পড়ার দাগ পড়ে গিয়েছিল; একেবারে লাইন-লাইন দাগ হয়ে গিয়েছিল।

পরকালের অনুতাপ

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের পাপ নিয়ে অনুতপ্ত হবে না, তাকে স্বীয় পাপের জন্য আখেরাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে। কিয়ামতের দিন পাপী

বান্দাকে যখন দাঁড় করানো হবে, তখন লজ্জার কারণে তার দৃষ্টি অবনত থাকবে। কুরআন তাদের সেই অবস্থা এভাবে তুলে ধরছে–

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ.

'স্মরণ করো সেই দিনকে, যখন অপরাধীরা তার প্রভুর সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, লজ্জার কারণে তাদের দৃষ্টি মাটির দিকে ঝুঁকে থাকবে – উপরে উঠবে না। তারা তাদের কলঙ্কিত চেহারা আল্লাহর সামনে উপরে উঠাতে পারবে না।'[১]

সুতরাং হয়তো দুনিয়াতেই স্বীয় পাপের জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিন। এটি অতি সহজ কাজ। অন্যথায় কিয়ামতের দিন অবশ্যই লজ্জিত হতে হবে। তারপরও দয়াময় আল্লাহ বড়ই করুণাশীল। যখনই কোনো বান্দা স্বীয় পাপকে স্মরণ করে কেঁদে ফেলে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে দেন। আজ হয়তো বান্দার সামনে কাঁদতে পারছেন না, লজ্জা করছে। কিন্তু কাল তো আল্লাহর সামনে কাঁদতে হবে, নবীজির সামনে লজ্জিত হয়ে অনুশোচনা করতে হবে। দয়ার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যখন পাপেভরা আমলনামা প্রকাশ করা হবে, তখন এই কলঙ্কিত মুখ কিভাবে দেখাবেন ভেবে দেখছেন? নবীজি কী বলবেন জানেন? বলবেন, আমার এই উম্মতী আমার তাহাজ্জুদের চোখের পানির মর্যাদা রক্ষা করেনি। আমি তাদের মাগফিরাতের জন্য বিনিদ্র রজনীতে কেঁদে-কেঁদে দু'আ করতাম। এরা পাপও করে আবার লজ্জিতও হয় না। এরা আমার কেমন অনুসারী? কেমন উম্মতী? আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমাদেরকে কিয়ামতের দিন লজ্জিত হওয়া থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

কান্নার ফযীলত

ইবনে মাজাহ শরীফে একটি হাদীছ আছে,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، ثُمَّ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

'যখন কোনো মানুষ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং তার চোখ থেকে মাছির ডানাপরিমাণ সামান্য পানিও বের হয়ে আসে, আল্লাহ সেই অশ্রুর কারণে জাহান্নামের আগুন তার ওপর হারাম করে দেন।'

---

১. সূরা সাজদাহ : ১২

দুটি ফোঁটা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়

তিরমিযী শরীফে বর্ণনা আছে,

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ،

'আল্লাহ তা'আলার নিকট দুটি ফোঁটার চেয়ে বেশি প্রিয় অন্য কিছু নেই। এক হলো অশ্রুর ফোঁটা, যা আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে পড়ে। অপরটি রক্তের ফোঁটা, যা আল্লাহর পথে মুজাহিদের দেহ থেকে ঝরে।'

হে রব্বে কারীম! আপনি তো দয়াময়! অনুতপ্ত পাপীর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে আর আপনি শহীদের রক্তের ফোঁটার সঙ্গে তার তুলনা করে সমান মর্যাদা দান করেছেন!

হে আল্লাহ! আপনি পাপী বান্দাদের কত সম্মান দিয়েছেন! আপনি কত করুণাময়! কত প্রশস্ত আপনার করুণা! আপনার দয়া ও ক্ষমাশীলতার ওপর আমার জীবন উৎসর্গ হোক। আপনি যদি রাজী থাকেন, তাহলে সামান্য বাহানায় জীবনের সকল পঙ্কিলতাকে নেকিতে রূপান্তরিত করে দেন। আর যদি আপনি অমুখাপেক্ষিতার শানে এসে যান, তাহলে তো সকল মাখলুকের কেউ আপনার শান মোতাবেক ইবাদাত করতে পারেনি। আপনি অনেক মহান। আমরা আপনার শান মোতাবেক ইবাদাত করতে পারিনি।

হে দয়াময় আল্লাহ! এসব নেকি নামায, যিকির ও মোরাকাবার মালা আপনার সামনে রেখে দিলাম। আপনি যদি এই ক্ষুদ্র উপহার কবুল করে নেন, তাহলে তা হবে আপনার অসীম করুণা। আর যদি না করেন, তবে তা হবে আপনার সুবিচার। তবে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা চাই। আপনি আমাদের দয়া করুন।

চোখের পলকের সাক্ষ্য

কেয়ামতের দিন একব্যক্তি নিজের গুনাহের ওপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত থাকবে; কিন্তু তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। তারপর হঠাৎ তার চোখের একটি পলক তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। হাদীছে এসেছে,

هٰذَا عَتِيْقُ اللهِ تَعَالَى بِشَعْرِهِ فَتَشْهَدُ تِلْكَ الشَّعْرُ إِنَّه قَدْ بَكَى فِي الدُّنْيَا مِنْ خَوْفِ رَبِّه فَيُغْفَرُ لَه وَيُنَادَى مُنَادٍ

'পলক তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, হে আল্লাহ! এই বান্দা দুনিয়াতে আপনার ভয়ে কেঁদেছিল। তারপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তারপর

একজন ঘোষক ফেরেশতা ঘোষণা দেবে, হে লোক সকল! এই লোক হলো এমন, যার চোখের পলকের সাক্ষ্যের কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!'

পাঁচ. আল্লাহর প্রেমে কাঁদা : পঞ্চম প্রকারের কান্না হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রেমে কাঁদা। বড়ই সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যার ভাগ্যে এই কান্না জুটেছে। বর্ণনায় আছে,

مَنْ بَكَى فِيْ اِشْتِيَاقِ الْمَوْلٰى فَلَهُ الْجَنَّةُ الْمَاْوٰى

'যেব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসায় কাঁদে, আল্লাহ তাকে জান্নাতুল মা'ওয়া দান করেন।'

আল্লাহর ভালোবাসায় কেউ কাঁদুক এটি তিনি খুব পছন্দ করেন।

হযরত শুয়াইব (আ.)-এর আল্লাহর প্রেমে কাঁদা

বর্ণনায় এসেছে, একবার হযরত শুয়াইব (আ.) কাঁদছিলেন, আল্লাহ বললেন, হে শুয়াইব! এই কান্না কিসের জন্য? জান্নাতের আশায়, না-কি জাহান্নামের ভয়ে? তিনি বললেন, না আল্লাহ! এমন কিছু নয়। অর্থাৎ জান্নাতের আশায়ও কাঁদছি না, জাহান্নামের ভয়েও না; আপনার সান্নিধ্যের ব্যাকুলতায় কাঁদছি। তখন আল্লাহ ওহী নাযিল করলেন, হে শুয়াইব! অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে এই কান্নার জন্য। এর কারণে অবশ্যই আপনি আমার দিদার লাভ করবেন। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহর প্রেমে নবীজির কান্না

উম্মতের মা হযরত হাফসা (রাযি.) বর্ণনা করেন, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং আরাম করতে লাগলেন। আমার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) আঙিনায় বসে কুরআনে মাজীদ তেলাওয়াত করছিলেন। আমিও নবীজির সঙ্গে আরাম করছিলাম। হঠাৎ আব্দুল্লাহ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করল,

كَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ

'অপরাধী লোকেরা কিয়ামতের দিন এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তাদের ও তাদের প্রভুর মাঝে পর্দার আড়াল থাকবে।'[১]

---

১. সূরা তাতফীফ : ১৫

এই আয়াত শুনতেই নবীজির চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ল।'

আম্মাজান হযরত হাফসা (রাযি.) বললেন, আমি অনুভব করলাম, নবীজির তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে আমার গাল স্পর্শ করেছে। আমি সীমাহীন আশ্চর্য হলাম। আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হে প্রিয় রাসূল! আপনার কি কষ্ট হচ্ছে? তিনি উত্তর দিলেন, না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, হে প্রিয় রাসূল! তবে কি জান্নাতের তামান্নায় কাঁদছেন? তিনি উত্তর দিলেন, না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কাঁদছেন কেন? তখন তিনি উত্তরে দিলেন,

أَنَا مُشْتَاق، وَبِيْ اِشْتِيَاقٌ

'আমি তো প্রেমিক। আমি আল্লাহর আশেক। আমি তাঁর প্রেম ও ভালোবাসাই কাঁদছি।'

তিনি দুবার এই শব্দগুলো উচ্চারণ করেছেন। আজ আমরা সুন্নাতের অনুসরণের কথা বলি; কিন্তু কতই-না তৃপ্তি লাগত যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নাতের ওপর আমরা আমল করতে পারতাম।

ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے* آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں ہے.

ছয়. কৃতজ্ঞতা ও শোকরের কান্না : ষষ্ট ও শেষ প্রকারের কান্না হলো, কৃতজ্ঞতা ও শোকরের কারণে কান্না। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়, তখন তাঁর দয়া ও অনুগ্রহগুলো স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে নিজের অজান্তে যে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তাকে কৃতজ্ঞতার কান্না বলে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নবীজির কান্না

আমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেও কাঁদতেন। হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর কামরায় তাহাজ্জুদের নামায পড়লেন। তারপর তিনি খুব কাঁদলেন। এত কাঁদলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর বুক ভেসে গেল। পুনরায় রুকু করলেন এবং খুব কাঁদলেন। তারপর সিজদায় গিয়ে খুব কাঁদলেন, তারপর সিজদা থেকে উঠে বসলেন এবং খুব কাঁদলেন। এভাবে পুরো নামায কেঁদে-কেঁদে বুক ভাসিয়ে আদায় করলেন। আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর

সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন; তারপরও আপনি এত কাঁদছেন কেন? উত্তরে নবীজি ইরশাদ করলেন, আয়েশা! আমার প্রভু যদি আমার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে ইহসান করে থাকেন তবে কি আমি আমার প্রভুর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

ইমাম গায্‌যালী (রহ.) এই হাদীছের ব্যখ্যায় বলেন, এতে প্রমাণিত হয়, প্রকৃত বান্দার কান্না কখনও বন্ধ হতে পারে না। সে তো সব সময়ই কাঁদবে। নেয়ামত যখন পাবে না, তখন নেয়ামত পাওয়ার জন্য কাঁদবে। যখন নেয়ামতপ্রাপ্ত হবে, তখন কৃতজ্ঞতা আদায়ে কাঁদবে। যেমন- তিনি 'ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

لَا تَزَالُ قَسْوَةٌ إِلَّا بِالْبُكٰى فِيْ حَالِ الْخَوْفِ وَالشُّكْرِ جَمِيْعًا قَلْبُ الْعَبْدِ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

'বান্দার অন্তর পাথরের মতো অথবা তার চেয়েও বেশি শক্ত। ভয়ের অবস্থা হোক আর কৃতজ্ঞতার অবস্থা হোক উভয় অবস্থাতেই যতক্ষণ-না কাঁদবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের কঠোরতা দূর হবে না।'

মানুষের অন্তরের দৃষ্টান্ত মাটির মতো। যে মাটিকে চাষাবাদ ব্যতীত পরিত্যাক্ত করে রাখা হয় এবং তাতে পরিশ্রম করা হয় না, কিছুদিন পর সেই ক্ষেত বা মাটি শক্ত হয়ে যায়, চাষাবাদের উপযুক্ত থাকে না। এমনিভাবে যখন কোনো মানুষ তার অন্তরের ওপর মেহনত না করবে, লম্বা সময় এমনি ফেলে রাখবে, তখন সেই অন্তরও শক্ত হয়ে যাবে, অনূর্বর হয়ে যাবে। সেখানে নেকির ফুলের গাছ গজাবে না, ফুলও ফুটবে না। পবিত্র কুরআন থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে বলেছেন, .

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ

'তাদের ওপর গাফলতের একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। ফলে তাদের অন্তরগুলো কঠোর ও শক্ত হয়ে গেছে।'[১]

অন্তরের কঠোরতা দূর করার উপায়

আপনাদের অনেকেই এসে অভিযোগ করেন, হযরত! আমার অন্তর শক্ত হয়ে গেছে। তো এর মৌলিক কারণ হলো, আমরা নির্জনে বসে কান্নাকাটি করি না। যদি আল্লাহর প্রেমে আমাদের কান্না আসে, কুরআন শুনে কান্না

---

১. সূরা হাদীদ : ১৬

আসে, নিজেদের অপরাধগুলো স্মরণ করে কান্না আসে, তাহলে সেই কান্নার কারণে আল্লাহ তা'আলা অন্তরের কঠোরতা দূর করে দেবেন। মনে রাখবেন, পাথর যতই শক্ত হোক, যখন তার ওপর বিন্দু-বিন্দু পানির ফোঁটা অনবরত পড়তে থাকে, তখন পাথরও ক্ষয় হয়ে যায়। ঠিক তেমনি মুমিন যখন নিজের গুনাহকে স্মরণ করে কাঁদতে থাকে, তখন তার চোখের পানি তার অন্তরের পাথরকেও ক্ষয় করে দেয়।

এসব শেখার জন্যই তো খানকায় আসতে হয়। আল্লাহওয়ালাদের মাহফিলে আসতে হয়। এ অন্তর ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে থাকলে নরম হবে না। ঘরে বসে থাকলে নরম হবে না। পছন্দসই মজাদার খানা খেলে নরম হবে না। নরম বিছানায় আরামে ঘুমানোর দ্বারা নরম হবে না। বরং এই অন্তর কেবল খাশিয়্যাতে এলাহী ও আল্লাহ তা'আলার ভয় দ্বারাই নরম হবে।

একটা পাথরের কান্না

এক বুযুর্গ কোনো পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, রাস্তায় পড়ে থাকা একটা পাথর কাঁদছে। তিনি ক্রন্দনরত পাথরটাকে জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছ কেন? পাথর বলল, আমি এক কারী সাহেবকে পড়তে শুনেছি,

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর।'[১]

যখনই এ কথাটি আমি শুনেছি, তখন থেকেই কাঁদছি। জাহান্নামের ইন্ধন হিসেবে আমিও ব্যবহৃত হতে পারি। আমাকেও জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হতে পারে। কথাগুলো শুনে বুযুর্গের অন্তরে পাথরের জন্য মায়া হলো। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এ পাথরকে জাহান্নামের ইন্ধন বানিয়ো না। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করলেন। তারপর বুযুর্গ সামনে এগিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর সেই পথে আবার ফেরার সময় দেখলেন, সেই পাথরটা এখনও কাঁদছে। বুযুর্গ দাঁড়িয়ে গেলেন। পাথরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখনও কাঁদছ কেন? পাথর যা উত্তর দিল, তা হলো শিক্ষণীয় বিষয়। পাথর বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি যখন প্রথমে এসেছিলেন, তখনকার কান্না ছিল ভয়ের কান্না। আর এখনকার কান্না আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার। আমার আল্লাহ যে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আমি সেই খুশিতে এবং দয়াময়ের শুকরিয়া জ্ঞাপনে কাঁদছি।

---

১. সূরা বাকারা : ২৪

তো যেভাবে শিশু শিক্ষার্থীদের ফলাফল ভালো হলে তারা আনন্দে কেঁদে ফেলে, অদ্রূপ আল্লাহর নেক বান্দারা যখন তার মারেফাত অর্জন করে, অন্তরে নূর আসে, সাকিনা নাযিল হয় এবং দয়াময় আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হয়, তখন তাঁরা শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে কাঁদেন।

আশেকের জীবনে কান্নার ফযীলত

এ কারণেই সাধকের জীবনে কান্না কখনও থামে না। শুরু হোক আর শেষ হোক সর্বাবস্থায় তাকে কেঁদে যেতেই হয়। আত্মশুদ্ধির অর্থই এটা যে, মানুষ ইবাদাত করতে পেরেও কাঁদবে আবার গুনাহ করলেও কাঁদবে। এক কবি বলেন,

عاشق دا کم رونا ھونا تے بن رون رنیل منظوری
دل رووے چاہے اکھیاں رووں تے وچ عشق دے رون ضروری
کئی رووں دیدی خاطر تے کئی روندے وچ حضوری
اعظم عشق وچ رونا پینڈا چاہے وصل ہوئے چاہے دوری

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরও এমন মহব্বত দান করুন এবং এমন ইশ্‌ক দান করুন, যা আমাদের অন্তরগুলোকে মোম করে দেবে। আমীন।

আজই কেঁদে নাও; অন্যথায়...

এ আবার কেমন চোখ, যা থেকে আল্লাহর ভালোবাসায়, দয়াময়ের মহব্বতে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রেমে এবং নিজের পাপ-পঙ্কিলতার কারণে অশ্রু ঝরায় না? এমন চোখ দিয়ে লাভইবা কী? আজ এ চক্ষু হতে অশ্রু ঝরিয়ে নিন। এক-একটি ফোঁটা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। অন্যথায় জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, রেওয়াতে এসেছে, তখন এক হাজার বছর পর্যন্ত তারা শুধু কাঁদতেই থাকবে। এমনকি তাদের চোখের পানি ঝরনার মত অবিরত বইতেই থাকবে। কিন্তু তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এক বিন্দু দয়াও করবেন না। আখেরাতের সেই ভয়াবহ মুহূর্তে এত কান্নাও আল্লাহকে দয়াদ্র করতে পারবে না। অথচ আমরা দুনিয়ায় যদি মাছির ডানাপরিমাণ চোখের পানি ঝরাই, তাহলে তা আমাদের সকল গুনাহ ও অপরাধগুলো মুছে দিতে পারে। এ মজমায় আছে কি এমন কেউ, যে বুকে

হাত রেখে বলতে পারবে, আমার কোনো গুনাহ নেই? আমরা সবাই গুনাহগার, অপরাধী। কখনও এই গুনাহ করেছি, কখনও ওই গুনাহ করছি। আমরা যখন পাপী, তখন দয়াময় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে দেরি কেন করব?

মাহফিলের সকল গুনাহগারের ক্ষমা

বাইহাকী শরীফে একটি বর্ণনা এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নসীহত পেশ করলেন, নবীজির নসীহত শুনে এক সাহাবী কাঁদতে লাগলেন। তার কান্নার শব্দ উঁচু হয়ে গেল। নবীজি তার কান্নার শব্দ শুনে ইরশাদ করলেন, এই গুনাহগারের কান্না আল্লাহ তা'আলা এত পছন্দ করেছেন যে, আজ এই মাহফিলে যত লোক উপস্থিত হয়েছে, সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

গুনাহ আজই মাফ করিয়ে নিন

আজ এই মজলিসেই গুনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নিন। তাহলে আল্লাহর আদালতে হিসাব সহজ হয়ে যাবে। ক্ষমা চান, আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণ করুন। তাঁর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ুন। জীবনের কোনো ভরসা নেই। আজ আছি; হয়তো কাল থাকব না। আজকের সূর্যাস্ত দেখছি, আগামী কালের সূর্যোদয় দেখব কি-না! নিজের ইবাদাতের ওপর ভরসা করার কোনো যুক্তি নেই। নিজের যিকির-মুরাকাবা এ সবের ওপর ভরসা করা মোটেও উচিত নয়। যারা আমল করে আর যারা করে না, সবাই মিলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তাঁর সামনে অঝোরে কেঁদে-কেঁদে মিনতি করুন, হে প্রভু দয়াময়! আমরা আপনার বান্দা, যারা স্বীয় অপরাধের কারণে জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার উপযুক্ত হয়ে আছি। কিন্তু আপনি যে বড়ই দয়াময়, অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। এভাবে বলুন,

كَيْفَ أَدْعُوْكَ وَأَنَا اٰثِمٌ * وَكَيْفَ لَا أَدْعُوْكَ وَأَنْتَ كَرِيْمٌ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কোন মুখে ভিক্ষা চাইব। কারণ, আমি যে বড় পাপী ও গুনাহগার! আবার আপনার কাছে কেনইবা ভিক্ষা চাইব না; আপনি তো অসীম দয়াবান।'

বাস্তবেই যখন নিজের কৃতকর্মের দিকে তাকাই, তখন অন্তর বলে উঠে, হে আল্লাহ! কিভাবে তোমার কাছে কিছু চাইব, আমি যে পাপী; আমার কি

সেই মুখ আছে? কিন্তু যখন আল্লাহর রহমতের দিকে দৃষ্টি পড়ে, তখন অন্তর বলে ওঠে, আল্লাহ! কেন আমি ক্ষমা চাইব না? আপনি তো বড়ই দয়াবান। দয়াবান তো সব অপরাধ ক্ষমা করে দেন। আমার বুকে বড় আশা জাগে।

অপরাধ স্বীকার

হে দয়াময় প্রভু! আমাদের ক্রটিপূর্ণ ইবাদাতের দিকে তাকাবেন না। দয়া করে আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের সঙ্গে করুণা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

عدل کریں تے کنبدے جاون اچیاں شاناں والے

فضل کریں تے بخشے جاون میں جئے وی منہ کالے.

'হে আল্লাহ! আপনি যদি ইনসাফের ফয়সালা করেন, তাহলে আমরা সবাই ডুবে মরব। আমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে যাব। তখন কাউকে মুখ দেখানোর অবস্থাও বাকি থাকবে না। হে আল্লাহ! আমরা শুধু আপনার করুণাই ভিক্ষা চাই। আমাদের ওপর দয়া করুন হে দয়াময়!

আল্লাহর দয়া আকর্ষণকারী দু'আ

বন্ধুরা আমার! আমরা নেককার যদিও হতে পারিনি, কিন্তু নেককার আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে তো থাকতে পারি। এজন্য সব সময় নেককার আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও সান্নিধ্যের জন্য আল্লাহর নিকট বেশি-বেশি দু'আ করবেন। নিজেকে নেককার বানানোর এটাও একটা উপায়। যেমন-কবি বলেন,

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ * لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا.

অর্থ : আমি নেককার লোকদের ভালবাসি যদিও আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই এই আশায় যে, হয়ত আমাকেও আল্লাহ নেককার হওয়ার তাওফীক দান করবেন।'

এভাবে দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! আমি নেককার হতে হয়তো পারিনি; কিন্তু নেককারদের সঙ্গও ছাড়িনি; দয়া করে এর উসিলায় আপনি আমাকে নেককার বানিয়ে দিন। আমাকে সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। হতে পারে, আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল করবেন। আমাদের চোখের পানির উসিলায় সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় যদি জোশ এসে যায়, হতে পারে তা আমাদের সকল পাপ-পঙ্কিলতাকে ধুয়ে-মুছে

পরিষ্কার করে দেবে। পাপগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেবেন। হে আল্লাহ! একজন বদকার মহিলা যদি কুকুরকে পানি পান করিয়ে সকল গুনাহ ধুয়ে নিতে পারে, তাহলে আমাদেরও সেই রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন না। দয়া করে আমাদের ক্ষমা করে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

শবে বরাতের ফযীলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِيْ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

কুদরতে এলাহীর দৃশ্যাবলি

মানুষ আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের সৃষ্টির উৎকৃষ্ট নমুনা। তিনি ইরশাদ করেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

'অবশ্যই আমি মানুষকে উত্তয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।'[১]

এই আয়াতটিই মানবজাতির শ্রেষ্টত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। এমনিভাবে মানুষ সকল মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীতও।

আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ

'অবশ্যই আমি বনী আদমকে সবচেয়ে সম্মানীত করেছি।'[২]

তারই জন্য আমি আসমান-জমিনের অগণিত নেয়ামত সৃষ্টি করেছি। মাটি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ

'আল্লাহ জমিনকে বিছানা হিসেবে বানিয়েছেন।'[৩]

---

১. সূরা তীন : ৪
২. সূরা বানী ইসরাইল : ৭০
৩. সূরা যারিয়াত : ৪৮

আসমান সম্পর্কে তিনি বলেন,

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا

'আমি আসমানকে বানিয়েছি নিরাপদ ছাদ হিসেবে।'[১]

তারপর সেই ছাদগুলোকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য তারকা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ

'আমি আসমানকে তারকারাজি দিয়ে সুসজ্জিত করেছি।'[২]

তিনি আরও ইরশাদ করেন, এই সুবিশাল আসমান আমি সৃষ্টি করেছি, কোনো খুঁটি ছাড়া। তোমরা ভালো করে দেখো, খুঁটিবিহীন এই আসমান কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেখো তো কোনো ত্রুটি চোখে ধরা পরে কি-না?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ.

'বান্দা! তুমি আরেকবার একটু ভালো করে দেখো; তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। তোমার স্রষ্টার সৃষ্টির মাঝে কোনো প্রকার ত্রুটিই সে ধরতে পারবে না।'[৩]

তারপর জমিনে মানুষের জন্য খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য তিনি বিভিন্ন রকমের ফল-মূল, খাদ্য-শষ্য ও ফসলাদি সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ করেন,

أَفَلَمْ يَنْظُرُوْا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ. تَبْصِرَةً وَّذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ.

'তারা কি আকাশের দিকে তাকায়নি, আমি তা কীভাবে বানিয়েছি, কী সাজে সাজিয়েছি, যাতে কোনো ক্ষুদ্রতম ফাটলও নেই? আর আমি জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছি এবং তাতে মজবুত পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছি এবং তাতে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। প্রত্যেক আনুগত্যশীল বান্দার জন্য দৃষ্টি খুলে দেওয়ার উপকরণস্বরূপ।'[৪]

উক্ত আয়াতগুলোয় ওই সকল বান্দার জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে, যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে চায়। শয়নে-স্বপনে যারা আল্লাহকে স্মরণ

---

১. সূরা আম্বিয়া : ৩২
২. সূরা মুলক : ৫
৩. সূরা মুলক : ৪
৪. সূরা কাফ : ৬-৮

করে। তারপর মানুষের প্রয়োজনেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র-সূর্য যেগুলো নিজ-নিজ কক্ষপথে নিয়মতান্ত্রিক চলতে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

'সূর্য তার নির্ধারিত কক্ষপথে চলছে। এটি সর্বজ্ঞ ও মহাপরাক্রমশীল আল্লাহর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা।'[১]

তিনি চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন যাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা তা সঠিকভাবে পালন করেই যাচ্ছে, মুহূর্তের জন্যও তাতে ব্যত্যয় ঘটেনি। ইরশাদ হচ্ছে

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

'সূর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে নাগালে পাওয়ার, রাতেরও ক্ষমতা নেই দিনকে ডিঙিয়ে যাওয়ার।'[২]

কেউ কারো আগে যেতে পারে না। এ সব সৃষ্টি করে যেন রব্বুল ইয্যত মানবজাতিকে বলেছেন, একটু চোখ খুলে আমার ওই বিশাল নিপুণ ব্যবস্থাপনা দেখো। বিভিন্নভাবে তিনি বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কোথাও বলেছেন, اَلَمْ تَرَ আবার কোথাও বলেছেন, اَلَمْ تَرَوْا সূরা গাশিয়ায় আল্লাহ ইরশাদ করেন,

أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.

'তারা কি উটের দিকে চেয়ে দেখে না, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশের দিকে কি তাকায় না, কীভাবে তাকে সমুন্নত করা হয়েছে? পাহাড়গুলোকে কি দেখে না, কীভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে? এবং জমিনের দিকে কি তাকায় না, কীভাবে তা সমতল করে বিছানো হয়েছে?'[৩]

বান্দা আমার! এসব কুদরত কি চোখে পড়ে না। এগুলো দিয়ে কি আমার পরিচয় পাওয়া যায় না?

আবার কোথাও বলেছেন,

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ. وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ. وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ.

'আমি কি তাদের দুটি চোখ, দুটি ঠোঁট, জিহ্বা দান করিনি?'[৪]

---

১. সূরা ইয়াসীন : ৩৮
২. সূরা ইয়াসীন : ৪০
৩. সূরা গাশিয়া : ১৭-২০
৪. সূরা বালাদ : ৭-১০

আবার অনত্র ইরশাদ করেছেন,

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا.

‘আমি কি জমিনকে বিছানা করে সৃষ্টি করিনি? পাহাড়সমূহকে পেরেক করে প্রতিস্থাপন করিনি? এবং জোড়ায়-জোড়ায় কি তোমাদের সৃষ্টি করিনি?’[১]

যেন মহামহিম মানুষকে তার কুদরতের দিকে চোখ খুলে তাকানোর জন্য আহ্বান করেছেন। দেখো বান্দা! দেখো। যাকে ভুলে আছ, তাঁর কুদরতের কারিশমা দেখো। এতে চিন্তা করো। আমি আল্লাহর সন্ধান খুব সহজেই পেয়ে যাবে।

মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত উপরোক্ত আয়াতে স্বীয় বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, বান্দা! আমি কি তোমার জন্য এটি সৃষ্টি করিনি? উদ্দেশ্য, যেন মানুষ এসব দেখে চিন্তা-ভাবনা করে তার প্রকৃত স্রষ্টার পরিচয় পেয়ে তার শুকরিয়া আদায় করে। এসব কথা বলার পর অবশেষে বলে দিয়েছেন,

إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ

‘দুনিয়ার সকল নায-নেয়ামত তো তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আখেরাতের জন্য।

دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں * بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں.

‘মুমিন বান্দা দুনিয়ায়ই থাকে কিন্তু দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষাকারী হয় না। একে তো দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি বরং দুনিয়াকে তার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।’

کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے * چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے.

بحر و بر شمس و قمر ماو شما کے واسطے * یہ جہاں تیرے لئے ہے تو خدا کے واسطے.

এসব কিছু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করার জন্য। যেমন- তিনি কুরআনে মাজীদে ইরশাদ করেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

‘জিন ও ইনসানকে আমি আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।’[১]

---

১. সূরা নাবা : ৬-৮

বোঝা গেল, আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব করা।

বন্দেগী কাকে বলে?

বন্দেগী কাকে বলে? বন্দেগী হলো, মানুষ তার প্রভুর আদেশ অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করা এবং মাওলার ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বানিয়ে নেওয়া।

আপনারা সকলেই দেখেছেন, যখন কুরবানির ঈদ আসে, তখন কেউ-কেউ কয়েক মাস পূর্বে দুম্বা অথবা ছাগল ইত্যাদি প্রাণী সংগ্রহ করে লালন-পালন করে। তার খুব যত্ন-আত্তি করে। খুব খাওয়ায়, পান করায়। এতে দুম্বা বা ছাগলটি মালিকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট হয়ে যায়। এমনকি মালিক যখন তার রশি ছেড়ে দিয়ে সামনে এগুতে থাকে, তখন সেও মালিকের সাথে-সাথে হাঁটতে থাকে। মালিক থেমে গেলে সেও থেমে যায়। তো যেভাবে সেই ছাগল বা দুম্বাটি মালিকের অনুসরণ করে চলে, তদ্রূপ এ উম্মাতীকে তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ করে চলতে হবে। একেবারে কদমে-কদমে অনুকরণ করে জীবন যাপন করতে হবে। খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা সব বিষয়ে নবীজির পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে পূর্ণতা আসে।

জাগ্রত অবস্থায় নবীজির জিয়ারতের আমল

আজ সারা দুনিয়াই বলে, হযরত! এমন ওযীফা বা দু'আ বলে দিন, যার কারণে স্বপ্নযোগে নবীজির সাক্ষাৎ লাভ হবে। আমার বন্ধুরা! আমি কি আপনাকে সেই ওযীফা বলে দেব না, যা দ্বারা আপনি স্বপ্ন কেন, জাগ্রত অবস্থায়ই নবীজির সাক্ষাৎ লাভ করবেন?

শায়েখগণ বলেন, যে ব্যক্তি চলনে-বলনে, ওঠা-বসায়, রাতে-দিনে সর্বাবস্থায় নিজের প্রতিটি কাজে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নকশে কদমে চলার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করবে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাকে জাগ্রত অবস্থাই প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেয়ারত নসিব করিয়ে দেবেন। স্বপ্নে দেখতে চাচ্ছ; জাগ্রত অবস্থায় দেখার উৎসাহ হয় না?

---

১. সূরা যারিয়াত : ৫৬

প্রয়োজন তীব্র আকাঙ্ক্ষার

কিন্তু এর জন্য কিছু করতে হবে। নিজেকে বদলে ফেলতে হবে। আমরা তো চাই পরিবর্তন ছাড়া সব কিছু পেয়ে যাই। যেমন আছি তেমনই থাকব, আল্লাহ যখন দিতে চাচ্ছেন, তো দিয়ে দিন! এ জাতীয় অবজ্ঞা সরাসরি অকৃতজ্ঞতার শামিল। 'বে-তলবী' এবং 'খোদা তলবী' দুটি ভিন্ন জিনিস। মনে-প্রাণে আগ্রহ-অন্বেষণ নেই, অথচ মুখে-মুখে তলব দেখালেই কি খোদাতলব বান্দা হয়ে যাওয়া যায়? কখনও নয়। প্রকৃত আল্লাহপ্রেমী হতে হলে দেহ-মন দিয়ে সর্বস্ব উৎসর্গ করে তাকে তলব করতে হবে।

এক টাকার ভিখারীকে দেখুন

যে ভিক্ষুক আপনার নিকট এক টাকা ভিক্ষা চায়, কখনও কি তার ভাব-ভঙ্গি দেখেছেন? হাত প্রসারিত করে রাখে। চেহারাটাও মিসকিনের মতো বানিয়ে নেয়। অদ্ভুত বিনয়ী ও অসহায় ভঙ্গিমায় বড় কাতর চাহনি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন স্বরে কথা বলে যে, অন্তর গলে যায়। তার হাত, মুখ, চাহনি, কণ্ঠ ও বলা সবকিছুকেই ভিক্ষুক বানিয়ে দাঁড়ায়। তারপর আপনার কাছে একটা টাকা ভিক্ষা চায়।

দু'আর সময় আমাদের অবস্থা

আমরা আজ দু'আ করি, মহান আল্লাহর দরবারে ভিক্ষা চাই। কিন্তু আমাদের ভাব ভঙ্গিমায় কোনো পরিবর্তন আসে না। আমাদের এমন দু'আ কী করে কবুল হবে? এক টাকার ভিক্ষারীরা কেমন নমনীয়তার সাথে ভিক্ষা চায় আর আমরা দু'আ করার সময় মাথায় অন্য চিন্তা ঘোরে। কোনো-কোনো বন্ধু এসে বলে, হযরত! আমি মুনাজাতে অমুক দু'আ পড়েছি। দেখুন, দু'আ করা আর দু'আ পড়া এক জিনিস কিভাবে হবে? উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। আজকাল আমরা তো দু'আ পড়ি।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً-رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا

'হে আমাদের রব! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দান করুন। হে আমাদের রব! আমরা আমাদের অবিচার করেছি।'[১]

এ হলো দু'আ পাঠ করা, পড়া। যত দিন দু'আ পড়তে থাকবেন, ফলাফল প্রকাশ পাবে না। যখন দু'আ করবেন, চাইবেন তখন তার উত্তম ফলাফল প্রকাশ পাবে।

---

১. সূরা বাকারা : ২০১, সূরা আরাফ : ২৩

দু'আ করার নিয়ম

'দু'আ করা' কাকে বলে? তা হলো, দু'আ করার সময় প্রত্যেক ব্যক্তি মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভিক্ষুক বানিয়ে নেবে। ফলে তার দেহ-মনে এক ধরনের বিশেষ ভাব তৈরি হবে। একে- অনুনয় বিনয় বলে, কাকুতি-মিনতি বলে। এই অবস্থায় তার সারা দেহ শিহরিত হয়ে ওঠে। তারপর আল্লাহর বড়ত্ব, মর্যদা ও শক্তিমত্তার কথা চিন্তা করে দু'আ করতে থাকে, তখন আল্লাহ তার দু'আ কবুল করে নেন।

দু'আ নেওয়ার নিয়ম

আজকালের যুবকদের দু'আ করানোর খুব আগ্রহ থাকে। কিন্তু দু'আ নেওয়ার আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা যায় না। দু'আ করানো ভিন্ন জিনিস আর দু'আ নেওয়া আরেক জিনিস। দু'আ করানোর অর্থ হচ্ছে, হযরতজী! দু'আ করবেন। আব্বু! দু'আ করবেন। আম্মু! দু'আ করবেন। আর অপর বিষয় হচ্ছে দু'আ নেওয়া। যেমন- কোনো সালেক (মুরীদ) ওযীফা ও যিকির-আযকারে সুন্নাতের পাবন্দি করে, তাহলে শায়খের অন্তর তা দেখে বাগবাগ করতে থাকে এবং অনিচ্ছায় অন্তর থেকে দু'আ বের হতে থাকে। এমনিভাবে সন্তান যদি বাবার খেদমত করে, বাবা যখন সন্তানের দিকে তাকায়, তখন অন্তর থেকে দু'আ বের হতে থাকে। মায়ের সেবা যে সন্তান করবে, তার দিকে মাযের দৃষ্টি পড়তেই অন্তর থেকে দু'আ বের হয়ে আসে। মুখে উচ্চারিত হয় কল্যাণকামী বাক্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দু'আ নেওয়ার মতো লোক হওয়ার তাওফীক দান করুন। দু'আ চাওয়ার চেয়ে দু'আ নেওয়ার মাহাত্ম্য বেশি। কথাটি বুঝতে হবে।

যুবকদের অন্তরে মা-বাবার মর্যাদা

আজকালের যুবকরা মা-বাবার কোনো মর্যাদাই দেয় না। মাকে তো তারা আল্লাহপ্রদত্ত গাভী মনে করে। বিনে পয়সায় কাজের লোক। আমার অবস্থা যেমনই হোক, মাকে তো কাজকর্ম করতেই হবে। আমার ভালোবাসায় তিনি চিরদিন বন্দিনী। আমাকে তো তিনি ভালোবাসবেই। আমার যা ইচ্ছে হয় বলব, তাকে তো শুনতে হবেই। আর পিতার ব্যাপারটা হলো, ছেলে একটু শেয়ানা হয়ে উঠলে বাবাকে দেখলে তার এমনই ঘৃণা লাগে, যেমন লাগে ময়লা-আবর্জনাকে। যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মনে করো তোমার হাতে একটা লাঠি দেওয়া হলো, তুমি সর্ব প্রথম তা দিয়ে কার মাথায় আঘাত

করবে? সে বলবে, আমার বাবার মাথায়? যুবকরা! তোমাদের যদি এই হয় অবস্থা, তাহলে বলো, কিভাবে তোমরা সফলতা লাভ করবে।

সন্তানদের নামাযী হওয়ার জন্য দু'আ

চিন্তা করুন। আজ যদি একটি ছয়-সাত বছরের ছোট্ট শিশু নামায পড়া শিখে নেয়, তাহলে সে, আত্তাহিয়্যাতুর পর কী পড়বে? পড়বে

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ

'হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার সন্তানদের নামাযের পাবন্দ বানিয়ে দিন।'[১]

দেখুন, ছয় বছরের শিশুটির তো কোনো সন্তানাদি থাকে না। কিন্তু তার দু'আ ছয় বছর বয়স হতেই চলছে। কেন? কারণ, আল্লাহর জানা আছে, শিশুটি যখন বড় হবে, বিবাহ-শাদি করবে, তখন তার সন্তানাদি হবে। তো এ শিশুটিই ছয় বছর বয়স থেকে দাড়ি-চুল সাদা হওয়া পর্যন্ত এভাবে দু'আ করলে কেন কবুল হবে না? কিন্তু আমরা কি তা করি? আজকালের সন্তানদের যা অবস্থা, তা কিয়ামতের আলামত ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিয়ামতের আগে ছেলে-সন্তানেরা বন্ধু-বান্ধবকে পছন্দ করবে, তাদের ওপর আস্থা রাখবে; কিন্তু মা-বাবাকে ঘৃণা করবে।

মা-বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের ফযীলত

মা-বাবাকে আল্লাহ তা'আলা কত বড় উঁচু মর্যদা দান করেছেন! সুবহানাল্লাহ! যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় যে, আমি আমার মা-বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতি কদমে একটি করে নেকী দান করেন, একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। মা অথবা বাবার চেহারার দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকালে একটি হজ অথবা একটি ওমরার ছাওয়াব দান করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে বারবার দেখে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতবার দেখবে, ততবারই তার আমলনামায় হজ ও ওমরাহর ছাওয়াব লিখে দেওয়া হবে।

মা-বাবার দু'আর মূল্য

মা-বাবার দু'আকে কী মনে কর? মনে রাখবে, মায়ের দু'আ আল্লাহর আরশ পর্যন্ত বিনা বাধায় পৌঁছে যায়। আসমানের দরজাসমূহ খুলতে থাকে। আল্লাহর মাঝে আর তার দু'আর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

---

১. সূরা ইবরাহীম : ৪০

মায়ের অস্তিত্বও অনেক বড় রহমত

এক বুযুর্গের মা মারা গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইলহাম করে বললেন, প্রিয় বান্দা আমার! তার অশ্রুশিক্ত দু'আগুলো তোমার হেফাযত করত, সে এখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন থেকে একটু সর্তক হয়ে চলো। বোঝা গেল, মায়ের অস্তিত্বও রহমতের কারণ। না পীর ও ওস্তাদের দু'আ নিলাম, না মা-বাবার দু'আ নিলাম; অথচ আশা করছ, আল্লাহ! আমি এটা পেয়ে যাই ওটা পেয়ে যাই। এ কখনও সম্ভব নয়।

রজব, শা'বান ও রমযানের ফযীলত

আজকের রাত হলো দু'আ করার রাত। তিনটি মাস রজব, শা'বান ও রমযান আগে-পরে আগমন করে। হাদীছের ভাণ্ডারে এ তিনটি মাসের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রজব মাসকে বছরের অন্যান্য মাসের ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। যেভাবে কুরআন মাজীদকে অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহের ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

তিনি আরও ইরশাদ করেন, শা'বান মাসকে অবশিষ্ট মাসগুলোর মধ্যে বেশি মর্যাদাবান করা হয়েছে, যেভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল নবীর মাঝে বেশি মর্যাদাবান করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রমযান মাস অবশিষ্ট মাসগুলোর থেকে বেশি মর্যাদার অধিকারী যেভাবে আল্লাহ সকল মাখলুকের ওপর মর্যাদার অধিকারী।

শা'বান শব্দের ব্যাখ্যা

কোনো-কোনো ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, شعبان শব্দটি شعبة শব্দ থেকে উদ্‌গত। শব্দটি আমাদের ভাষায়ও ব্যবহার হয়। কাজের কোনো অংশকে شعبه (বিভাগ) বলা হয়। شعبان শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছে এজন্য যে, এ মাসে আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত রহমত ও অনুগ্রহের বিভাগকেন্দ্রিক কাজ শুরু করে দেন। উদাহরণস্বরূপ যখন দেশে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়, তখন বিভিন্ন বিভাগকেন্দ্রিক এমনসব কার্যক্রম শুরু করা হয়, যা অন্য সময় করা হয় না। এমনিভাবে রহমত ও অনুগ্রহের কাজ তো সর্বদাই চলতে থাকে। কিন্তু রজব, শা'বান ও রমযান মাসে বিভাগকেন্দ্রিক সেই কার্যক্রমকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

অক্ষর হিসেবে শা'বানের ফযীলত

কোনো শায়েখ বলেছেন, মাসকে এজন্য শা'বান বলা হয়েছে যে, এতে অক্ষর রয়েছে পাঁচটি। ش - ع - ب - ا - ن এ অক্ষরগুলোর মধ্যে ش নেওয়া হয়েছে شرافت (মর্যাদা-সম্মান) থেকে। ع নেওয়া হয়েছে علوم تبم (উচ্চ মর্যাদা) থেকে- ب নেয়া হয়েছে بِرّ (পুণ্য) থেকে। নেওয়া হয়েছে الفت (খোদাপ্রেম) থেকে এবং ن নেওয়া হয়েছে نور (আলো) থেকে। এ পাঁচটি শব্দের প্রথম অক্ষরগুলোকে একত্রিত করে একটি শব্দে পরিণত করা হয়েছে। যেন বান্দারা বোঝে, যারা এ মাসে ইবাদাত করবে, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই পাঁচটি নেয়ামত দান করা হবে।

রিযিক বন্টনের রাত

এক রেওয়াতে আছে, ১৫ই শা'বানের রাত রিযিক বন্টনের রাত। রিযিক একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে পরিজন ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, টাকা-পয়সা সবই অন্তর্ভুক্ত। আর আজ রাত হলো আগামী বছরের সকল বিষয় বাজেটের রাত। কর্মতালিকা তো আজ রাতেই তৈরি হয়। আর রমযানুল মোবারক মাসের লাইলাতুল কদরে ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

১৫ই শা'বানের রোযা

এ কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এ রাতেই মানুষের আগামী বছর জীবন-মরণের সিদ্ধান্ত হয়। আমি চাই যখন সেই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়, তখন আমি রোযা অবস্থায় থাকি। আইয়ামে বীজে (প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫) তো এমনিতেই রোযা রাখা উচিত। তদুপরি ১৫ই শা'বানের রোযা রাখা মুস্তাহাব।

সকল ভাণ্ডারের মালিক কে?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

'জমিনে বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর।'[১]

তবে বন্টন তাঁর নিজের হাতে।

১. সূরা হূদ : ৬

তিনি ইরশাদ করেন,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ

'আমিই তাদের মধ্যে জীবনোপকরণ বন্টন করে দিয়েছি।'[১]

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ

'সকল বস্তুর ভাণ্ডার কেবল আমারই কাছে।'[২]

وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

'কিন্তু আমি তো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে অবতীর্ণ করি।'[৩]

আনন্দের ভাণ্ডারও তাঁর কাছে, দুঃখের ভাণ্ডারও তাঁর কাছে। সম্মানের ভাণ্ডারও তাঁর কাছে, অপমানের ভাণ্ডারও তাঁর কাছে। সুস্থতার ভাণ্ডারও তাঁর কাছে, অসুস্থতার ভাণ্ডারও তাঁর কাছে। সকল ভাণ্ডারের মালিক তিনি।

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'জমিন ও আসমানের ভাণ্ডারের চাবিগুলো তাঁরই হাতে।'[৪]

তাহলে আজ মনে-প্রাণে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে পিছিয়ে কেন থাকব? আসুন, আমরা দু'আ করি, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য কল্যাণের ফয়সালা করে দিন। আমাদের জন্য দয়া ও অনুগ্রহের ফয়সালা করে দিন।

আল্লাহর যিকির থেকে মুখ ফিরানোর পরিণতি

আমাদের উদাসীনতা ও গাফলতের কারণেই আল্লাহ তা'আলা রিযিকের মধ্যে সংকীর্ণতা তৈরি করে দেন।

তিনি ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمٰى

'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমার কুরআন থেকে বিমুখ হয়, আমি তার জীবনকে সঙ্কীর্ণ করে দিই।'[৫]

---

১. সূরা যুখরুফ : ৩২

২. সূরা হিজ্‌র : ২১

৩. সূরা হিজ্‌র : ২১

৪. সূরা শুরা : ১২

৫. সূরা তাহা : ১২৪

অর্থাৎ দুনিয়ার নগদ শাস্তি হলো জীবন সঙ্কীর্ণ করে দেওয়া আর কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধকরে উঠাব। এরা দুনিয়াতে আমার বিধিনিষেধ মান্য করার ক্ষেত্রে অন্ধ হওয়ার ভান ধরেছিল, আমি কিয়ামতের মাঠে তাদের বাস্তবিকই অন্ধ বানিয়ে উত্থিত করব।

অশান্তির মূল কারণ

বন্ধুরা আমার! আমাদের অশান্তিগুলো, বিপদাপদগুলো মূলত আমাদেরই হাতের কামাই। আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

'যেসব আপদ-বিপদ তোমাদের ওপর আপতিত হয়, তা তোমাদেরই হাতের কামাই।'[১]

যদি আমরা আমাদের জীবন নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, কারো সংসারে অশান্তির কারণ হলো অর্থসঙ্কট, অভাব-অনটন। সে চর্তুদিকে ছুটে বেড়ায় শুধু অর্থের জন্য। ব্যস, এই পরিমাণ টাকা পয়সা হলে আমাদের জীবনে শান্তি এসে যাবে। কারো অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা সবই আছে; কিন্তু সন্তানাদি নেই। সে মনে করে, আমার ঘরে যদি একটি ফুটফুটে শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহলে শান্তির জোয়ার এসে যাবে; এক বিন্দু অশান্তি থাকবে না। আবার কারো কাছে সন্তান তো আছে বটে; কিন্তু তারা সুস্থ নয়। সে মনে করে, আমাদের সন্তান সুস্থ হয়ে গেলে ঘরে শান্তি ফিরে আসবে। আসলে এ সব বিপদাপদ ও অশান্তির মূল কারণ আমাদের গুনাহ্ ও বদ-আমল। গুনাহের কারণেই আজ আমরা শান্তিবঞ্চিত। যদি আমরা সকল পাপাচার ও গুনাহের কাজ পরিহার করে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারি, তাহলে অবশ্যই তিনি নিজের অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে আমাদের রিযিক দান করবেন।

আল্লাহর ওলীগণ কোথা থেকে খান?

স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অলীদের ওই ভাণ্ডার থেকেই রিযিক দান করেন, যেখান থেকে অতীতে তিনি নবীদের রিযিক দান করেছেন। বলুন তো, নবীগণ কি দুনিয়ায় চাকরি করেছেন? না; তারা তো দীনের কাজ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সেই দীনি কাজের উসিলায় তাদের রিযিক

---

১. সূরা শুরা : ৩০

দান করতেন। আমরাও যদি আম্বিয়া (আ.), আউলিয়া (রহ.) ও পুণ্যবান লোকদের পথ ধরে দীনের কাজে নিয়োজিত থাকি, তাহলে দুনিয়া আমাদের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়বে।

ভালো আলেম তিনি, যাঁর অন্তরে ইস্তিগনা (অমুখাপেক্ষিতা) আছে। আমি ওলামায়ে কেরাম ও তালেবানে ইল্‌মের খেদমতে আরজ করছি, আপনারা আল্লাহ তা'আলার খাযানার ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করুন। কারো পকেটের দিকে নজর দেবেন না। ঐ দুনিয়াদার গাফেল লোকদের ইস্তিগনার ছুরি দিয়ে যবাই করে দিন। ইল্‌মের মর্যাদাবোধ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন। তারপর দেখুন সম্মান কিভাবে আপনার হাতে ধরা দেয়। সকল বান্দাকে আল্লাহ তা'আলাই রিযিক দান করেন এবং রিযিকের মধ্যে তিনিই বরকত দান করেন।

নিশ্ছিদ্র পাথরের মধ্যে রিযিক

আমাদের এক বন্ধু M.B.B.S ডাক্তার ছিলেন। তিনি একবার ফ্যামিলি নিয়ে সুয়াত অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি সুন্দর পাথরের উপর তার নজর পড়ল। তার স্ত্রী বলল, এই পাথরটার রং আমাদের ড্রয়িং রুমের দেওয়ালের রংয়ের সাথে মিলে যাচ্ছে। এটি আমি নিয়ে নিচ্ছি; সেখানে সাজিয়ে রাখব। স্বামী বলল, ঠিক আছে নিয়ে নাও। তারা পাথরটা এনে ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে রাখল। দু'বছর পর্যন্ত পাথরটা সেখানেই পড়ে ছিল। একদিন ডাক্তার সাহেব পাথরটা হাতে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। হঠাৎ তার হাত ফসকে সেটা মাটিতে পড়ে দু-টুকরা হয়ে গেল। তিনি দেখলেন, পাথরটার ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত। আর সেই গর্ত থেকে বেরিয়ে এল একটা পোকা। মাটিতে পড়েই সেটা হাঁটতে লাগল। কিন্তু বলুন তো, নিছিদ্র পাথরের মধ্যে এ পোকাটাকে কে রিযিক পৌঁছাচ্ছিলেন? সুবহানাল্লাহ!

একটি ইলহামী উপদেশ

হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন। তিনি ইমাম আবুহানিফা (রহ.)-এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি গোলাম হলেও হৃদয়টা ছিল রাজকীয়। তিনি প্রায়ই ইলহামী বাণী পেশ করতেন। একবার বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, 'হে আতা! আমার কাছে খুব কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করো; আমি তোমাকে রিযিক দেব। এটা কি করে সম্ভব যে, তুমি আমার কাছে কেঁদে-কেঁদে রিযিক চাইবে আর আমি রিযিক না দিয়ে চুপ করে বসে থাকব?'

রিযিক থেকে বরকত উঠে যাওয়ার কারণ

মুহতারাম বন্ধুরা! আল্লাহ তা'আলাতো আমাদেরকে রিযিক দান করেন। কিন্তু আমরা তার সঠিক ব্যবহার করতে পারি না। ফলে সেই রিযিক থেকে বরকত উঠে যায়। যখন বরকত উঠে যাবে, তখন যতই উপার্জন করবেন, প্রয়োজন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। শান্তি আসবে না। এমনকি কারো-কারো শত-শত মিল-ফ্যাক্টরী থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে কাঁদতে থাকে, ভাই! ঋণে জর্জরিত হয়ে আছি!

রিযিকে বরকতের গল্প

হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে একব্যক্তি ছিল খুব গরিব ও দুঃখী। নুন আনতে পানতা ফুরানো অবস্থা। সে হযরত মূসা (আ.)-এর খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি তো তুর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। পুনরায় সেখানে গেলে আমার একটি ফরিয়াদ আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন। বলবেন, তিনি যেন আমার বাকি জীবনের রিযিক একত্রে দিয়ে দেন। উদ্দেশ্য, অন্তত কিছুদিন পেটভরে আহার করা যাবে। হযরত মূসা (আ.) তুর পাহাড়ে গিয়ে এই ফরিয়াদ আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। তারপর সেই লোককে তার বাকি জীবনের রিযিক একত্রে দিয়ে দেওয়া হলো।

দু-চার বছর পর হঠাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর তার কথা স্মরণ করে তাকে দেখতে গেলেন। তিনি ভাবলেন, সারা জীবনের রিযিক হয়তো একসাথে পেয়ে সে অল্প কয়েক দিনেই মারা গেছে। কিন্তু কৌতূহল দমনের জন্য সেখানে পৌঁছে তিনি যা দেখলেন, তা অবাক করার মতো। দেখলেন, সেখানে বিশাল অট্টলিকা। লোকটি বাড়ির আঙিনায় আলিশান আসনে বসা। লম্বা দস্তরখান বিছানো আছে। গরিব-দুঃখীরা এসে খুব তৃপ্তিভরে খেয়ে যাচ্ছে। সেও বহু বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে। তিনি আশ্চর্য হয়ে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ এই ব্যক্তিকে যে সারা জীবনের রিযিক একসাথে দিয়েছিলেন, সে তো খুব সামান্য ছিল। কিন্তু এখন তো দেখছি তার কাছে অনেক সম্পদ। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। দয়াময় আল্লাহ তখন উত্তর দিলেন, হে আমার নবী! তার রিযিক বাস্তবেই কম ছিল। তা যদি সে শুধু নিজের পিছনেই খরচ করত, তাহলে তাই হতো, যা আপনি ভেবেছেন। কিন্তু সে তো সামান্য রিযিক দিয়ে দারুণ ব্যবসা করেছে। নিজেও খেয়েছে, ফকরি-মিসকীনকেও খাইয়েছেন। আর যে ব্যক্তি আমার

পথে খরচ করে, আমি তো তাকে কমপক্ষে দশ গুণ বাড়িয়ে প্রতিদান দেই। সে ওই ব্যবসায় দারুণভাবে সফল হয়েছে। দেখুন, এখন সে কত বড় ধনী!

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর আল্লাহর পথে ব্যয়

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) মাসে তিন টাকা বেতন পেতেন। দুই টাকা দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মিটাতেন আর অবশিষ্ট এক টাকা আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। ওলামা ও তালাবারা এ কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আজ আমরা হাজার-হাজার টাকার বেতন পেয়েও এক পয়সা খরচ করতে পারি না। আমরা মনে করি, নিজের প্রয়োজনই মিটাতে পারি না, দান করব কী? মনে রাখবেন, এতে বড় বেবরকতি হবে। যদি আমরা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার ওপর ভরসা করে খরচ করতে থাকি, তো আল্লাহ অবশ্যই সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে তা ফিরিয়ে দেবেন।

দুনিয়াদারদের জন্য চ্যালেঞ্জ

আমি একবার করাচিতে বয়ান করছিলাম। অনেক বড় মজমা ছিল। ব্যবসায়ীদের মজমা। আমি বললাম, আপনারা তো ব্যবসায়ী লোক! দুনিয়া সম্পর্কে ভালোই জানেন। বলুন তো, কখনও কোনো আমলদার আলেম কিংবা আমলদার হাফেযে কুরআনকে অভাব-অনটনে না খেয়ে মরতে দেখেছেন? পুরো মাহফিল নীরব ছিল। কেউ কোনো দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারল না। অথচ আমি একজন এম. এ. এইচ. সি পাশ করা লোক হয়ে বলছি, বহু লোক এমন আছে, তারা উচ্চ ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে মৃত্যুবরণ করছে। তার মুখে দুই লোকমা খাবার তুলে দেওয়ার মতো, একটু সহানুভূতি জানাবার মতো পৃথিবীতে কেউ ছিল না। এবার আপনিই বলুন, রিযিক কি ডিগ্রির হাতে, না আল্লাহর হাতে?

সন্তানের তারবিয়াতের প্রথম ইট

আজ আমরা নিজেদের সন্তানদের দৌড়ে-দৌড়ে ইংরেজী পড়াচ্ছি। ঠিক আছে; ইংরেজী পড়ান। কিন্তু সন্তানকে প্রথমে মুসলমান তো বানাতে হবে। ইসলামী শিক্ষাও তো দিতে হবে। বড় আশ্চর্য লাগে, বাচ্চারা যখন একটু-আধটু কথা বলতে শুরু করে, তখন পড়ানো হয়

TwinKle, TwinKle, Litte, star
How I Wander What you are.

সাহাবায়ে কেরাম নিজেদর সন্তানদের কালেমা শিক্ষা দিতেন, কুরআনের আয়াত মুখস্থ করাতেন, আল্লাহর ৯৯ নাম মুখস্থ করাতেন। আজকের মায়েরা তাদের সন্তানদের ডেডী, মম শিখান। জীবনের প্রথম ইটই যখন বাঁকা করে বিছানো হলো, তো এই দেওয়াল যতই উঁচু হতে থাকবে, বক্রতা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এজন্য শিশুদের সর্বপ্রথম দীন শিক্ষা দিন। এতে তার জীবন সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠবে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর দারিদ্র্য

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) সমকালের একজন ন্যায়পরায়ণ খলীফা ছিলেন। একবার তিনি নিজকক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। মেয়েকে ডাক দিয়ে বললেন, বেটি! আমার জন্য একটু পানি আনো! বেশ কিছুক্ষণ পার হয়ে গেল; কিন্তু কেউ এল না। তিনি একটু কঠোরভাবে পুনরায় ডাকলেন। তাঁর স্ত্রী এসে বলল, কী হয়েছে? তিনি বললেন, তোমার মেয়েকে একটু পানি দিতে বলেছিলাম; কই কতক্ষণ হয়ে গেল সে তো এল না। স্ত্রী ফাতেমা উত্তর দিলেন, আপনার কন্যা অবাধ্য নয়। তার জামা ছিড়ে গেছে। সেটি সেলাই করার জন্য খুলে এখন সেলাই করছে। জামা তো তার একটাই। সেটা সেলাই করে পারিধান না করে কিভাবে আপনার সামনে আসবে?

চিন্তা করুন, একজন খলীফার কন্যা; অথচ তার মাত্র একটি জামা! এ হলো ঐসব মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের স্মৃতিগাথা, যারা প্রকৃত অর্থেই আমানতদার ছিলেন। তাদের কাছে সম্পদভাণ্ডারের চাবি ছিল ঠিকই; কিন্তু তার অপব্যবহার তারা কখনও করেননি। রাজত্ব পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা দরিদ্রতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর এগারটির সন্তান ছিল। যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, কেউ তাকে বলল, আপনি আপনার সন্তানদের সঙ্গে ইনসাফ করেননি। কারণ, সবাই তার সন্তানদের জন্য বিষয়-সম্পদ কিছু-না-কিছু রেখে দুনিয়া ছাড়ে। আর আপনি তাদের রিক্তহস্ত রেখেই চলে যাচ্ছেন। এ কথা শুনে তিনি খুব ক্রোধান্বিত হলেন। বললেন, আমাকে সোজা করে বসিয়ে দাও। ধরে তাকে বসানো হলে তিনি হেলান দিয়ে বললেন, আমি আমার সন্তানদের উত্তম চরিত্র শিখিয়েছি। আমার আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ

'সচ্চরিত্রবানদের তত্ত্বাবধান স্বংয় আল্লাহই করে থাকেন।'[১]

---

১. সূরা আরাফ : ১৯৬

আমি তাদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছি। আর যদি তারা সচ্চরিত্রের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে আমার কোনো পরোয়া নেই।

তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেছে, অন্যান্য গভর্নর ও শাসকদের সন্তানরা যাদের জন্য তাদের পূর্বপুরুষরা সম্পদের ভাণ্ডার রেখে গিয়েছিল, তারা একদিন অভাবে-অনটনে শহরের জামে মসজিদের প্রাঙ্গণে বসে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। আর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর সন্তানদের দেখা গেছে, তারা সবাই কোনো-না-কোনো এলাকার গভর্নর বা শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কারণ, তাদের চেয়ে ভালো, সচ্চরিত্রবান ও আমানতদার অন্য কাউকে পাওয়াই যেত না।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এক শহরে একব্যক্তি বাস করত। তার কাছে অনেক সম্পদ ছিল। জায়গা-জমিও প্রচুর ছিল। সে বলত, আমার কাছে এত সম্পদ আছে যে, কয়েক প্রজন্ম খেয়েও তা শেষ করতে পারবে না। তার মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র সকল ধন-সম্পত্তির ওয়ারিস হলো। বয়স ছিল যৌবন। সম্পদ ছিল অঢেল। সে যৌবনের বিলাসিতায় পড়ে গেল। প্রতিদিন নতুন-নতুন বন্ধু আসতে লাগল। এরই মধ্যে সে দেশের বিভিন্ন স্থানে সফরও করে ফেলেছে। দেশীয় বিনোদনে যখন মন ভরে গেল, তখন বন্ধুরা বলল, চলো, বিদেশী বিনোদনের স্বাদ নেওয়া যাক। অবশেষে খারাপ বন্ধুদের খপ্পরে পড়ে বিদেশ গেল। আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা-বিনোদনের পিছনে খরচ হতে-হতে একসময় তার সকল সম্পদ শেষ হয়ে ভিটা-বাড়িটাও বিক্রি করে দিল। যে আমাকে এ ঘটনা শুনিয়েছেন তিনি বললেন, আমি স্বচক্ষে চৌরাস্তার মোড়ে তাকে ভিক্ষা করতে দেখেছি।

মেহমানের রিযিক

এই শহরেই হাকীম আনসারী নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। আমরা স্কুলে যাওয়ার সময় তার দোকানের পাশ দিয়ে যেতাম। তিনি সিলসিলায়ে নকশবন্দীর খাদেম ছিলেন। তিনি আমাদের একটি ঘটনা শোনালেন। বললেন, আমি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সেই শহরের নিকটেই এক গ্রামে এক লোকের সঙ্গে তার স্ত্রীর ঝগড়া হয়ে যায়। এখনও ঝগড়া শেষ হয়নি, এরই মধ্যে তার একজন ঘনিষ্ঠ মেহমান এল। স্বামী মেহমানকে বৈঠকখানায় বসিয়ে স্ত্রীকে বলল, আমার আত্মীয় এসেছে; তার জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা

করো। স্ত্রী রাগান্বিত ছিল। বলল, তোমার জন্যও খানা নেই, তোমার মেহমানের জন্যও খানা নেই। স্বামী বেচারা খুব বিপাকে পড়লেন। ঝগড়া তো আমাদের মধ্যে হয়েছে। এসব বিষয়ে আত্মীয়-স্বজন কিছু জানতে পারা অশোভনীয়। তাই তিনি কথা না বাড়িয়ে মেহমানের কাছে এসে আলাপে রত হলেন। কিন্তু তার মাথায় দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ মাথায় চিন্তা এল, পাশের ঘরের প্রতিবেশি খুব ভালো মানুষ; তাকে গিয়ে বললে হয়তো তারা খানা পাকিয়ে দেবে। স্বামী গিয়ে তাদের বলতেই তারা স্বানন্দে রাজি হয়ে গেল। স্বামী কিছুটা প্রশান্ত হলেন যে, যাক বাঁচা গেল। কমপক্ষে মেহমানের আপ্যায়নের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এবারের মতো ইজ্জত বেঁচে গেল।

কিছুক্ষণ পর মেহমান বলল, ভাই! একটু ঠাণ্ডা পানি দেওয়া যাবে? গৃহস্বামী অবশ্যই বলে পানির জন্য ভিতরে গেলেন। ভিতরে গিয়ে দেখে স্ত্রী বসে-বসে অঝোরে কাঁদছে। স্বামী খুব আশ্চর্য হলেন, এ কী কাণ্ড! বাঘিনীর চোখে অশ্রু! জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? সে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি কাঁদতে লাগল। বলল, আমাকে ক্ষমা করে দিন। স্বামী বুঝতে পারল, কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। মনে-মনে এই ভেবে পুলকিত হলো, যাক আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে যাচ্ছে। বললেন, শান্ত হও! বলো কী হয়েছে?

সে বলল, আগে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি বললেন, দেখো; যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। যাও; ক্ষমা করে দিলাম। এবার স্ত্রী বলতে শুরু করল সেই বিস্ময়কর ঘটনা। বলল, আপনি যখন এসে বললেন, মেহমানের জন্য রান্না করো আর আমি তা অস্বীকার করলাম; আপনি কিছু না বলে চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ ভাবলাম ঝগড়াঝাটি তো হয়েছে আমাদের মধ্যে; এতে মেহমানের অপরাধ কী? তাই রান্নাবান্না করার জন্য উঠে গেলাম। রান্না ঘরে গিয়ে দেখি, একলোক আমাদের আটার বস্তা থেকে কিছু আটা বের করছেন। এ অদ্ভুদ দৃশ্য দেখে আমার সারা শরীর হিম হয়ে যায়। মুখে কোনো কথা ফোটে না। বৃদ্ধ আমাকে বলছিল, হে বোন! তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। যা নিচ্ছি তা তোমাদের মেহমানের অংশ। এটা তোমাদের বস্তায় পড়ে ছিল। মেহমানের খাবার যেহেতু প্রতিবেশীর ঘরে রান্না হচ্ছে, তাই এগুলো সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি। সুবহানাল্লাহ!

হ্যাঁ, মেহমান আসে পরে; আল্লাহ তা'আলা তার রিযিক মেজবানের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন আগে।

বন্ধুরা আমার! মানুষ আল্লাহর পথে যে পরিমাণ খরচ করবে, আল্লাহ তা'আলা সেই পরিমাণ দান করবেন। সেই রিযিকের ফয়সালা হওয়ার রাত

হলো আজ। এ সময়গুলোকে মূল্যবান মনে করুন। কে জানে, আগামী বছর শা'বান-রমযান মাস আমরা পাব কি-না? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই দু'আ করতেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

'হে আল্লাহ! রজব ও শা'বান মাসে আমাদের বরকত দান করুন আর আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন।'

দু'আ করার কৌশল

দু'আয় একটি কৌশল অবলম্বন করবেন। যখনই দু'আ করবেন, সর্বপ্রথম বলবেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে নেক ও ভালো বানিয়ে দিন। এ দু'আটির সর্বনিম্ন ফায়দা হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, এ বান্দা! তুমি নেককার হলে না কেন? তখন বান্দা উত্তর দেবে, হে আমার প্রভু! আমি আপনার কাছে সব সময় ভালো হওয়ার জন্য দু'আ করতাম। কিন্তু কী করব হয়ে ওঠেনি। আপনি দয়া করুন, ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তার আমলনামা তালাশ করে যখন সত্যিকার দু'আ পাবেন, তখন সেই দু'আর উসিলা করে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এ কারণে সর্বপ্রথম দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! আমাকে নেক ও ভালো বানিয়ে দিন!

আল্লাহর কাছে আল্লাহর ইশ্ক প্রার্থনা করা

আজ আল্লাহ তা'আলা থেকে সম্পদ প্রার্থনাকারী, সুন্দরী স্ত্রী প্রার্থনাকারী, সুস্থতা-সুখ্যাতি প্রার্থনাকারী তো অনেক আছে; কিন্তু আল্লাহকে প্রার্থনাকারীর সংখ্যা নিতান্তই কম। এমন কোনো চেহারা কি নজরে পড়ে, যা আল্লাহর স্মরণে উদাস হয়ে থাকে? এমন যুবক কি আছে এখানে, যে রাতের শেষ প্রহরে নির্জনে বসে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর যিকির করে?

তাই বলছি, আল্লাহর কাছে তাঁর ইশ্ক ও মহব্বত প্রার্থনা করতে হবে এবং মুখের ভাষায় তা প্রকাশ করতে হবে।

تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں* میرے سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں.

সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম

আজ রাতে আপনারা সালাতুতাসবীহ পড়ুন। এই নামায চার রাকাত পড়তে হয়। প্রত্যেক রাকাতে ৭৫ বার নিম্নোক্ত তাসবীহটি পড়তে হয়,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

প্রত্যেক রাকাতে ৭৫ বার করে পড়ার পদ্ধতি হলো, তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়েই তাসবীহটি ১৫ বার পড়তে হবে। তারপর সূরা ফাতেহা ও সূরা মিলানোর পর রুকু করার পূর্বে ১০ বার। রুকুতে গিয়ে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ পড়ার পর ১০ বার। রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ১০ বার। তারপর প্রথম সিজদায় গিয়ে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى এর পর ১০ বার পড়বে। প্রথম সিজদা হতে উঠে বসে ১০ বার। তারপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى পড়ার পর ১০ বার পড়বে। এভাবে এক রাকাতে ৭৫ বার করে চার রাকাতে মোট ৩০০ বার তাসবীহটি পাঠ করবে। যদি কোনো রোকনে পড়তে ভুলে যায়, তাহলে পরবর্তী কোনো রোকনে তা পড়ে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর গণনা করার পদ্ধতি হলো, নামাযের মধ্যে হাতের আঙুল দিয়ে যখন যেখানে থাকবে, সেখানেই হালকা চাপ দিয়ে গণনা করবে।

সালাতুত তাসবীহের ফযীলত

সালাতুত্তাসবীহর ফযীলত আলোচনা করতে গিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই নামাযে এত বেশি বরকত আছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন প্রতিদিন এ নামায অন্তত একবার পড়ে। প্রতিদিন পড়তে না পারলে প্রত্যেক জুমায় সপ্তাহে একবার করে পড়ুক। যদি সপ্তাহে সম্ভব না হয়, তাহলে মাসে একবার করে পড়ুক। মাসে সম্ভব না হলে বছরে একবার করে পড়ুক। যদি বছরেও একবার সম্ভব না হয় তাহলে জীবনে অন্তত একবার হলেও অবশ্যই এই নামায পড়ুক। কারণ, এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

দু'আ কবুল হওয়ার রহস্য

বন্ধুরা আমার! দু'আ অন্তরের আমল। মুখ দ্বারা তো শুধু প্রকাশ করা হয়। তাই অন্তরকে কাঁদিয়ে যদি দু'আ করতে পারি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সেই দু'আ কবুল করবেন। এক বুযুর্গ যখন মজলিসে দু'আ করতেন, তখন বলতেন, আমাদের দু'আ কবুল হয়ে গেছে। কেউ প্রশ্ন করল, কিভাবে বুঝলেন, আমাদের দু'আ কবুল হয়েছে? বুযুর্গ উত্তর দেন, এত বড় মজমা, এতগুলো মানুষ কোনো দানশীল ব্যক্তির দরজায় গিয়ে যদি এক টাকার ভিক্ষা চায়, তাহলে বলো তো, সেই ব্যক্তি কি এদের সবাইকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন? নাকি একটা টাকা দিয়ে তবেই বিদায় করবেন? সে বলল, ওই ব্যক্তি

অবশ্যই এক টাকা দিয়ে সবাইকে বিদায় দেবেন। কারণ, টাকা খুবই সামান্য জিনিস। বুযুর্গ বললেন, আমি বিশ্বাস করি, সেই দানশীল ব্যক্তির পক্ষে এক টাকা দেওয়া কঠিন হতে পারে; কিন্তু এই মজলিসে উপস্থিত সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া আমার আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। সুবহানাল্লাহ!

ক্ষমার আশ্চর্য বাহানা

এবার একটা সূক্ষ্ম বিষয় বুঝুন। প্রত্যেক বান্দার হেফাযতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ. كِرَامًا كَاتِبِيْنَ. يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

'তোমাদের জন্য আমলনামা লেখার জন্য মুহাফিয ফেরেশতা নিয়োজিত করা আছে। তারা তোমাদের কর্মকাণ্ডগুলো লিখে রাখে।'[১]

এক বুযুর্গ এক বিস্ময়কর কথা উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দার ব্যাপারে ক্ষমার ফয়সালা করে ফেলেন, তখন তার গুনাহ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাকে পরিবর্তন করেন না; শুধু নেকী লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের অদল-বদল করতে থাকেন। অর্থাৎ গুনাহ লিখছেন একজন ফেরেশতা আর নেকী লিখছেন অনেক ফেরেশতা। কিয়ামতের দিন যখন আমলনামা আল্লাহর আদালতে উপস্থাপিত হবে, তখন ওই বান্দার ব্যাপারে সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতা হবেন দু'প্রকারের। এক প্রকার বান্দার গুনাহের সাক্ষ্য দেবে। অপর প্রকার তার নেকীর সাক্ষ্য দেবে। গুনার সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতা হবেন একজন আর নেকীর সাক্ষদানকারী ফেরেশতা হবেন এক দল। আর আল্লাহ এ বিষযটিকেই বাহানা বানিয়ে নেবেন। বলবেন, আমি কি একজনের সাক্ষ্যকে প্রধান্য দেব, না একটি জামাতের সাক্ষ্যকে প্রধান্য দেব? তারপর জামাতের সাক্ষ্যকে প্রধান্য দিয়ে তিনি বান্দাকে ক্ষমা করে দেবেন।

প্রতিদান দিবসের মালিক

আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেননি যে, আমি কিয়ামত দিবসের মালিক। বরং তিনি বলেছেন,

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

'আমি প্রতিদান দিবসের মালিক।'[১]

---

১. সূরা তাতফীফ : ৯-১২

এতে হেকমত হলো, বিচারক নিজেও আইনের পাবন্দ থাকতে বাধ্য থাকেন। কারও প্রতি সহানুভূতি থাকা তার জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু কেউ যখন মালিক হয়ে যায়, তখন আর তার ওপর কোনো আইন থাকে না। তিনি যাকে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করে দিতে পারেন। এমনকি গুনাহকে নেকিতে পরিবর্তন করার ক্ষমতাও তাঁর থাকে। তো আমাদের হিসাব-নিকাশ যেহেতু 'প্রতিদান দিবসের মালিক'-এর সাথে, তাই আসুন, আজই আমরা তাকে মানিয়ে ফেলি। আজ তার দরবারে ক্ষমা চেয়ে জীবনের সকল গুনাহ্-খাতাকে ক্ষমা করিয়ে নেই। যত কান্নাকাটি করা সম্ভব, যত কাকুতি-মিনতি করা সম্ভব, সবটুকু ঢেলে দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি। তাই আজকের রাত দু'আর রাত। আজকের রাত কান্নার রাত। আজকের রাত গুনাহ্-খাতা মাফ করানোর রাত। আসুন সেই চেষ্টায় লেগে যাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

১. সূরা ফাতেহা : ৩

মানুষের চারটা বড় ভুল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

গন্তব্যে পৌঁছার জন্য দুটি পূর্বশর্ত

وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا.

'যে ব্যক্তি ঈমান রেখে আখিরাতের ইচ্ছা করে এবং এর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে যায়, আল্লাহ তা'আলা তাদের চেষ্টাগুলোকে কবুল করে নেন।'[১]

أَنِّيْ لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى

'নারী হোক, পুরুষ হোক আমি তাদের কারো কৃত নেক আমলকে নষ্ট করব না।'[২]

যেখানে আল্লাহ এ মূল্যায়ন করতে প্রস্তুত, সেখানে মানুষ কেন পিছিয়ে থাকবে? তাকেও সঠিক পথ ধরে সত্যের দিকে, কল্যাণের দিকে এগিয়ে আসার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। কারণ, যেকোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই দুটি বিষয় অপরিহার্য। যদি গন্তব্যে পৌঁছার পথ সঠিক না হয়, তাহলে কখনও গন্তব্যে পৌঁছা যাবে না। তেমনিভাবে পথ সঠিক হলেও যদি মানুষ দৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে না যায়, তাহলেও গন্তব্যে পৌঁছা যাবে না।

মানুষ ও পরীক্ষা

মানবতার ইতিহাস ঘেটে দেখুন; দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে, মানবতাকে কয়েক ধাপে নানান ফেতনা ও অগ্নিপরীক্ষার দেওয়াল টপকাতে

---

১. সূরা বানী ইসরাইল : ১৯

২. সূরা আলে ইমরান : ১৯৫

হয়েছে। বিভিন্ন সময় মানবজাতিকে বিভিন্ন ধরনের ফেতনার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। আজ যেযুগে আমরা জীবন যাপন করছি, এতে মানুষ সাধারণত চার ধরনের বড়-বড় ভুলের মধ্যে অবস্থান করছে। ফলে সবাইকে পেরেশান ও অস্থির হয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

প্রথম ভুল : প্রথম ভুলটা হলো, মানুষ আখেরাতকে ভুলে গিয়ে দুনিয়াকেই নিজের শ্রম-সাধনার অঙ্গন বানিয়ে নিয়েছে। তার দৃষ্টি এখন আখেরাত থেকে সরে গিয়ে দুনিয়ার ওপর নিবদ্ধ। অথচ দুনিয়া একটি ক্ষণস্থায়ী মেলা। এখানকার হাসি-কান্নাও ক্ষণস্থায়ী। আমরা দুনিয়ায় আখেরাতের প্রস্তুতির জন্যই প্রেরিত হয়েছি। তাই আখেরাতের প্রস্তুতিই আমাদের একমাত্র কর্ম হওয়া উচিত। কেননা, দুনিয়ার জীবন একভাবে-না-একভাবে কেটেই যাবে।

اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات * ہنس کر گذار دے یا کہ رو کر گذار دے.

'হে প্রদীপ! তোমার আয়ু হলো মাত্র এক রাত। হেসে-খেলে কাটাও, নয় কেঁদে-কেঁদে কাটাও।'

আনন্দে কাটলেও কেটে গেল, কষ্টে কাটলেও কেটে গেল। পোলাও-কোর্মা খেয়ে দিন গেলেও কেটে গেল, শুকনা রুটি আর পান্তা খেয়ে দিন পার করলেও কেটে গেল। জীবন কেটেই যাবে – আটকে থাকবে না। দেখার বিষয় হলো, আখেরাতের কিছু পুঁজি সঞ্চিত হলো কি-না?'

یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے * وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے.

'এখানে এভাবে থাকুক কিংবা সেভাবে থাকুক আসল দেখার বিষয় হলো, সেখানে কীভাবে থাকে।'

এ কথা তো বুঝে আসে যে, লোকটি হতদরিদ্র, যার ঘরে আহার করার কিছুই নেই। চরম ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছে, সে তো চরম অপারগতার মুহূর্ত পার করছে। তাই সে দুনিয়ার পিছনে ছুটছে। কিন্তু একজন স্বচ্ছল ও ধনবান ব্যক্তি কেন দুনিয়ার পিছনে ঘুরবে? তার তো রিযিকের জন্য কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু দেখা যায়, সেও দুনিয়ার ধান্দায় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় পায় না।

একবার এক ভদ্রলোক রাত তিনটায় আমাকে ফোন করে বলল, হযরত! আমি এ মুহূর্তে খুব পেরেশানিতে আছি। রাতে ঘুমাতে পারিনি। ভাবলাম আপনার তাহাজ্জুদের সময় যেহেতু হয়ে গেছে এজন্য দু'আর উদ্দেশ্যে ফোন

করলাম। আমি বললাম, ভাই! আপনার দুশ্চিন্তার কারণ কী? সে বলল, হযরত! আমার আগের ৩০টা ফ্যাক্টরি আছে। আগামী কাল আরেকটা ফ্যাক্টরির শেয়ার ছাড়ছি। দু'আ করবেন, যেন সহজেই শেয়ারগুলো বিক্রি হয়ে যায়।

এবার চিন্তা করুন, ৩৫টা ফ্যাক্টরি থাকা সত্ত্বেও ৩৬তম ফ্যাক্টরির জন্য তার এত ভাবনা যে, রাতে ঘুমাতেই পারছে না। কী কারণে? একমাত্র কারণ হলো, আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকেই আমরা আমাদের শ্রম-সাধনার ময়দান বানিয়ে নিয়েছি। ফলে আমাদের এখন আর প্রশান্তি নেই।

মানুষের লালসার শেষ কোথায়

আমরা যতই দুনিয়া অর্জন করি না কেন, আমাদের অন্তর কখনও প্রশান্ত হবে না। হাদীছে এসেছে, যদি কোনো আদম সন্তানকে একটা উপত্যকা পরিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রা দেওয়া হয়, তাহলে সে আরেকটা উপত্যকার আকাঙ্ক্ষা করবে। এমনকি যদি পুরো দুনিয়া স্বর্ণ-রূপায় ভরে দেওয়া হয়, তারপরও সে আরেকটা দুনিয়ার তামান্না করবে। সোনা-রুপার এই ক্ষমতা নেই যে, সে মানুষের পেট ভরাবে। স্মরণ রাখবেন, মানুষের পেট দুনিয়াতে কখনও ভরতে পারবে না। তার পেট তো কেবল কবরের মাটি দিয়েই ভরা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় ভুল : দ্বিতীয় ভুলটা হচ্ছে, মানুষ রূহানিয়্যাতের পরিবর্তে বস্তুকে নিজের শ্রম-সাধনার কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছে। মানুষের নজর গায়বী খাজানা থেকে সরে এখন বস্তুজগত ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে। পশ্চিমা দুনিয়ায় আজ জড় পদার্থের ওপর এত বেশি মেহনত হচ্ছে যে, মানুষ তাদের গল্প শুনে হয়রান হয়ে যায়।

আমেরিকায় প্রযুক্তিনির্ভরতা

যখন আমরা ইউনিভার্সিটিতে লেখা-পড়া করতাম, তখন সেখানে তিন হাজার ছাত্র হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমেরিকান একটি ইউনিভার্সিটিতে ৭৫,০০০ (পচাত্তর হাজার) ছাত্র-ছাত্রী একসাথে লেখা-পড়া করে। যদি কোনো ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র সংখ্যা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) এর নিচে হয়ে যায়, তখন তাকে বড় ইউনিভার্সিটি মনে করা হয় না। এবার মনে করুন, একটি ইউনিভার্সিটিতে ৭৫,০০০ (পচাত্তর হাজার) করে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করলে কত ছাত্র-ছাত্রী পড়া লেখা করছে? এরা সবাই বস্তু ও প্রযুক্তির ওপর মেহনত করছে – কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা লাভ করছে না।

শূন্যে শাক-সবজি উৎপাদন

সেখানে বস্তু ও প্রযুক্তিগত ব্যাপকতা লাভ করছে। ওয়াশিংটনে একটি মিউজিয়ামে (জাদুঘরে) নতুন এটা প্রজেক্টর হাতে নেওয়া হয়েছে। তাহলো ভবিষ্যতে শাক-সবজি মাটির পরিবর্তে শূন্যে উৎপাদন করা হবে। তারা বলে, মাটিকে আরও কিছু উত্তম কাজে ব্যবহার করা হবে। সেই শাক-সবজিগুলো এই অধম স্বচক্ষে দেখেছি। তারা ছাদখোলা কামরায় শাক-সবজির চাষ করছে এবং সেখানে তা উৎপাদিতও হয়েছে। এর জন্য তারা মাটি একদম ব্যবহার করেনি। বস্তু ও প্রযুক্তির ওপর মেহনত করে তারা মাটির পরিবর্তে শুধু পানির ওপর শাক-সবজির চাষ করে সফল হয়েছে। এখন থেকে সবুজ শাক-সবজি শূন্যে উৎপাদিত হয়ে মাটিতে আসবে এবং তা ভক্ষণ করবে।

তরমুজ, টমেটো ও ক্ষিরার ওপর মেহনত

আপনারা লাল রঙের তরমুজ দেখেছেন নিশ্চয়ই। এখন তারা হলুদ রঙের তরমুজ উৎপাদনে সফলতা দেখিয়েছে। তরমুজে বীচি দেখছেন এতদিন। এখন তারা বিচিহীন তরমুজ বানিয়ে ফেলছে। আমি প্রথমবার বীচিহীন তরমুজ খেয়ে আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারলাম না। পুরো তরমুজে আপনি বাজি ধরেও একটা বীচি দেখাতে পারবেন না। কাঁচাতেও না, পাকাতেও না। আর মিষ্টি এমন হবে, যেমন আপনি পছন্দ করেন। তারা টমেটো বানিয়েছে একেকটা এক কেজি হবে। ক্ষিরার সাইজও ইচ্ছামতো ছোট-বড় করা যায়।

ঘাসের সারি

আমরা ঘাস লাগাই। তাতে আমাদের কয়েক দিন ব্যয় হয়। কিন্তু সেখানে ঘাসের সফ পাওয়া যায়। যেভাবে আপনারা মসজিদের সফগুলো ভাঁজ করে রেখে দেন, তেমনী তারা ঘাসের তৈরী সফ বানিয়ে প্রস্তুত রেখেছে। যতটুকু স্থানে ঘাস লাগাতে চাইবেন, আপনি প্রথমে সেই ঘাসের সফ বিছিয়ে যেতে থাকুন আর পিছন থেকে পানি ঢালতে থাকুন, ঘাস উৎপন্ন হতে থাকবে। এভাবে এক দিনে যে পরিমাণ জায়গায় চাইবেন ঘাস লাগাতে পারবেন।

আমেরিকায় একটা বাগানের দৃশ্য

আমেরিকায় একটা বাগান পরিদর্শন করার সুযোগ হয়েছিল। তাদের দাবি, পৃথিবীর যত রং ও প্রকারের ফুল আছে, তার সবকটা প্রকার তাদের বাগানে উৎপাদন করা হয়েছে। কথাটা শুনে প্রথমে আমার বিশ্বাস হতে

চায়নি। কারণ, পৃথিবীতে একেক মাটি ও আবহাওয়ার একেক রকমের বৈশিষ্ট্য থাকে। কোথাও বরফ গলে সীমাহীন আবার কোথাও রোদ ঝরে অগ্নিঝরা। সুতরাং গরম এলাকার ফুল আর ঠাণ্ডা এলাকার ফুল একস্থানে একই মৌসুমে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম বিস্ময়কর দৃশ্য। কাঁচ দিয়ে নির্মিত কামরাগুলোর কোনোটায় এসি ফিট করে কৃত্রিম শীত সৃষ্টি করে সেখানে ঠাণ্ডা দেশের ফুলগাছ লাগানো আছে। কোনো কামরায় হিটার ফিট করে গরম মৌসুমের ফুলগাছ লাগানো আছে।

মহাকাশযানে ভ্রমণের প্রস্তুতি

এখন চেষ্টা চলছে, উড়োজাহাজে চড়ে সফর করার পরিবর্তে মহাকাশযানে চড়ে সফর করার। তারা বলে, উড়োজাহাজে চড়ে সফর করতে অনেক সময় লেগে যায়। দেরির ব্যাখ্যা হচ্ছে এমন, যদি এখানে মাটিতে এত গভীর ছিদ্র করা হয় যে, ছিদ্রটা যেতে-যেতে জমিনের অপর দিকে বেরিয়ে যায়, তাহলে যেস্থানে ছিদ্রটা আত্মপ্রকাশ করবে, তার নাম ক্যালিফোর্নিয়া। ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকার একটি অঙ্গরাজ্য। আমরা ক্যালিফোর্নিয়ার ঠিক বিপরীত দিকে জমিনের অপর প্রান্তে আছি। আমাদের এখানে যখন দিনের ১২টা, তখন তাদের সেখানে রাতের ১২টা। একজন লোক যদি উড়োজাহাজে এখান থেকে সফর করে, তাহলে ২২ ঘন্টা পর সে ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছবে। অর্থাৎ প্রায় অর্ধ দুনিয়া আজকাল মানুষ মাত্র ২২ ঘন্টায় সফর করছে।

এখন তারা বলে, এভাবে অনেক সময় ব্যয় হয়। ওই সফর এর চেয়ে আরও অল্প সময়ে করা যায়। সেটা এভাবে, উড়োজাহাজ তো বাতাসে ওড়ে। বাতাসে ওড়া অবস্থায় এর গতি ঘন্টায় ৫০০ মাইলের চেয়ে বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়। এর চেয়ে বেশি গতিতে গেলে উড়োজাহাজের বডির টেম্পারেচার বেড়ে যায়, যা বিপজ্জনক। তাই এর গতি বাড়ানো সম্ভব নয়। অতএব এখন মহাশূন্যে জাহাজ চালানোর চিন্তা-ভাবনা চলছে। এখান থেকে মহাশূন্যে পৌঁছে সেখান থেকে দুই মিনিটের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা পৌঁছে যাবে। সেখানে পৌঁছে নিচের দিকে যেতে থাকবে। এভাবে পৃথিবীর একেকটি দেশ অপর দেশের মহল্লায় পরিণত হবে যে, মাত্র দু'মিনিটে এক দেশ থেকে অপর দেশে যাওয়া যাবে। এ কারণেই আজকাল পৃথিবীকে Global village (আন্তর্জাতিক পল্লী) লেখা শুরু হয়েছে।

তৃতীয় ভুল : তৃতীয় ভুলটা হলো, আজ মানুষ তাদের 'মন' ছেড়ে 'তন'কে (দেহকে) শ্রম-সাধনার ময়দান বানিয়ে নিয়েছে। আজ যে-পরিমাণ

দেহের পরিচর্যা করা হচ্ছে, তার চেয়ে বহু গুণ বেশি পরিচর্যা অন্তরের করা দরকার ছিল। আমাদের চেহারায় সামান্য দাগ বা চিহ্ন লাগা থাকলে আমরা মানুষের সামনে যাওয়া পছন্দ করি না; কিন্তু অন্তরের মধ্যে কত ধরনের ময়লা জমে থাকে, আমরা সেগুলো নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হই। আমরা একটু পরোয়াও করি না যে, সকল বাদশার বাদশা মহান আল্লাহ আমার এই অবস্থা কিভাবে দেখবেন? যে চেহারা দুনিয়াবাসী দেখবে, তা সাজানোর জন্য কতবার যে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তার হিসাব নেই। অথচ যে অন্তরকে মহান আল্লাহ দেখবেন, তাকে সাজানোর জন্য একটিবারও পরিশুদ্ধির আয়নার সামনে আনা হয় না।

منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں * جی ایسا لگا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے

'মুখমণ্ডল তো আয়নায় দেখে নিল; কিন্তু অন্তরের কালিমা চোখে পড়ল না। বাঁচার মধ্যে এমনই বিভোর হলো যে, মৃত্যুর কথা ভুলে গেল।'

আমাদের অন্তরের আয়নাকে আলোকিত করতে হবে।

এক হাদীছে এসেছে,

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ ও চেহারার দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।'

আমরা কি কখনও আমাদের অন্তরের চেহারাটা আয়নার সামনে নিয়ে দেখেছি, তা কি আদৌ মানুষের অন্তর বলে মনে হচ্ছে, নাকি জানোয়ারের অন্তর বলে মনে হচ্ছে?

মানুষরূপী কুকুর, বিড়াল ও শূকর

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহ.) একবার বাজার হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন এক বুযুর্গ সে পথে যাচ্ছেন। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি একজন বড় মাপের বুযুর্গ। তিনি বললেন, আমি বুযুর্গরে কাছে গিয়ে সালাম করলাম। তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেললেন। বললেন, আহমাদ আলী! মানুষের বসতি কোথায়? আমি বললাম, হযরত! এই যে দেখছেন, এরা সবাই মানুষই তো! তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকালেন। তারপর দুঃখভরাক্রান্ত হয়ে বললেন, এরা সবাই মানুষ! তাঁর কথায় এই প্রভাব ছিল যে, কথাটি শুনে আমার অন্তরের অবস্থা বদলে গেল। আমি কিছুক্ষণের জন্য বাজারে দৃষ্টি দৌড়ালাম।

তখন দেখলাম, বাজারভর্তি কুকুর, বিড়াল আর শূকর। আমার এই কাইফিয়্যাত যখন শেষ হলো, তখন দেখলাম, বুযুর্গ নেই। আর দ্বিতীয়বার তাকে পেলামই না; কোথায় যে তিনি হারিয়ে গেলেন!

হযরত (রহ.) এ ঘটনা দরসে কুরআনে নিজেই শোনাতেন এবং বলতেন,

لوگو مالک توسب کاایک مگر مالک کا کوئی ایک.

اور واقعی لاکھو میں نہ ملیگا و کروڑوں میں تو دیکھ

'লোকসকল! মালিক তো সবার জন্য আছেন; কিন্তু মালিকের জন্য একজনও কি আছে? লক্ষ-কোটির মাঝে অনুসন্ধান কর; সত্যিই একজনও পাবে না।'

দুনিয়া আজ প্রযুক্তি ও গবেষণায় ডুবে আছে, কিন্তু তার নিজের ভিতরের গবেষণার কোনো খবর নেই। এ কারণেই সকালে ঘুম থেকে উঠেই যতটা সংবাদপত্রের দিকে ঝোঁক থাকে, ততটা মুরাকাবা, যিকির-আযকারের দিকে থাকে না। পৃথিবীর সংবাদ জানার আগ্রহ থাকে অনেক; কিন্তু নিজের অন্তরজগতের খোঁজ কিছুই রাখে না। এজন্যই সমগ্র পৃথিবীকে আলোদানকারী মুসলমান আজ নিজের মনে অন্ধকার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কবি কত সুন্দর বলেন,

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا* اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا.

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کا* زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا.

অন্য কবি বলেন,

جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی* زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی.

کائنات ماہ وانجم دیکھنے کے شوق میں* اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی.

'চন্দ্র-সূর্যের রহস্য উদঘাটন যে পরিমাণ বেড়ে চলেছে, জীবনের আঁধার দিন-দিন ততটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জগত চন্দ্র ও তারকা দেখার নেশায় মেতে আছে। জগদ্বাসী আপন জগতের কথা ভুলে যাচ্ছে।'

চতুর্থ ভুল : চতুর্থ ভুলটা হচ্ছে, মানুষ তাদের অন্তর ছেড়ে আকল ও বিবেককে মেহনতের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নিয়েছে। সাইন্স, টেকনোলজি, কম্পিউটার ও অন্যান্য শিক্ষা যেগুলো মানবমেধার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব শিক্ষার

প্রাণকেন্দ্র হলো আকল তথা বিবেক-মেধা। আজকের দুনিয়ায় এদেরই জয়জয়কার চারদিকে। এতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, একচ্ছত্রভাবে আকলের ওপর মেহনত হচ্ছে। কিন্তু আকলের ওপর নির্ভরশীল বুনিয়াদ খুবই দুর্বল।

ইকবাল বলেন,

عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے* عشق بے چارہ نہ واعظ ہے نہ زاہد نہ خطیب.

'বিবেক তো বড় অভিমানী। হাজারো ঢং ধারণ করে ইশক বেচারা না বক্তা হতে পারল, না যাহেদ, না খতীব।'

অন্তরের ওপর মেহনত করা আবশ্যক

মানুষের আকল তথা বিবেকের ওপর মেহনত করার পরিবর্তে অন্তরের ওপর মেহনত করা উচিত। কারণ, আকল অন্তরের অনুসরণ করে। ইচ্ছাও অন্তরে উদিত হয়, কামনা বাসনাও অন্তরেই জাগে। আর আকল সেই কামনা-বাসনাগুলো পূরণ করার পদ্ধতি বলে দেয়। সকল নবী (আ.) মানুষের বিবেক নয়, বরং অন্তরকে মেহনতের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন।

চিন্তা করে দেখুন, ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা কোথায় জেগে উঠে? অন্তরে। ঘৃণার কোথায় উদ্রেক হয়? অন্তরে। প্রতিশোধের আগুন কোথায় জ্বলে? অন্তরে। অর্থাৎ সকল কামনা-বাসনার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে অন্তর। অন্তরে আবেগ-অনুভূতি যেমন হবে, মানুষের মস্তিষ্কের কাইফিয়্যাতও তেমনই হবে। অন্তরে যদি কারো ব্যাপারে ঘৃণা থাকে, তাহলে অন্তর তার ব্যাপারে ভুল চিন্তা শুরু করে। আর যখন অন্তরে ভালোবাসা থাকে, তখন চোখে এমন পর্দা পড়ে যায় যে, নিজের বন্ধুর কোনো ত্রুটিই তার দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং বোঝা গেল, মানুষের অন্তরের ওপর মেহনত করা খুবই জরুরি।

পবিত্র কুরআন এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে,

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَعْقِلُوْنَ بِهَا أَوْ اٰذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا

যদি তাদের এমন অন্তর থাকত, যা তাদের আকল শেখাত, তাদের যদি এমন কান হতো, যা দ্বারা তারা হেদায়াতের কথা শুনত!'[১]

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ

'নিশ্চয়ই চোখ অন্ধ হয় না, বরং বুকের ভিতর অন্তর অন্ধ হয়ে যায়।'[১]

---

১. সূরা আরাফ : ১৭৯

আমেরিকার একটি অঙ্গরাজ্য হলো ক্যালিফোর্নিয়া। এর আয়তন ও জনসংখ্যা সাউদী আরবের সমান। তাদের জীবনমানও প্রায় সউদীদের সমপর্যায়ের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, ক্যালিফোর্নিয়ায় শুধু চুরি বন্ধ করার জন্য এ পরিমাণ বার্ষিক বাজেট নির্ধারণ করা হয়, যা পাকিস্তানের দশ বছরের বাজেটের সমপরিমাণ হবে। বলুন, এমন জাতিকে কি শিক্ষিত ও সভ্য জাতি বলা যেতে পারে? কখনওই নয়। কারণ, তাদেরকে আল্লাহর ভয় চুরি থেকে বিরত রাখে না, বরং ভি.ডি.ও ক্যামেরা দ্বারা তাদের পাহারা দেওয়া হয়। তারা জানে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ক্যামেরা দিয়ে তার সকল গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছে। একবার কয়েক মিনিটের জন্য সেখানে বিদ্যুৎ বন্ধ থাকল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সেই শিক্ষিত জাতিটা কয়েক কোটি ডলার চুরি করে ফেলে। বোঝা গেল, তাদের অন্তর বদলায়নি। শুধু ডাণ্ডার জোরে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে রাখা হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য

কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে জীবনাদর্শ দিয়ে গেছেন, তা ছিল ভিন্ন কিছু। সেই জীবনাদর্শ মানুষের অন্তরকে এমনভাবে বদলে দিয়েছিল যে, জনসমক্ষে হোক কিংবা সঙ্গোপনে অন্যের সম্পদ বা জিনিসের দিকে তাঁরা চোখ তুলেও তাকাতেন না। এমনকি যদি পথে কোনো কম্বল বা কোনো বস্তু পড়ে যেত, তাহলে তা পড়ে-পড়ে নষ্ট হয়ে যেত, তবু কোনো মুসলমান তা স্পর্শও করত না। কারণ, তারা বিশ্বাস করত, এই মুহূর্তে যদিও দুনিয়ার কেউ দেখছে না, কিন্তু আমার পরোয়ারদেগার মহান আল্লাহ আরশে মুআল্লা থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ইসলামী শিক্ষার মাহাত্ম ও সৌন্দর্য এখানেই।

বন্ধুরা আমার!

আপনি এমন মানুষ অনেক কমই দেখবেন, যারা শুধু এজন্য ব্যথিত যে, হায়! আমার অন্তরের অবস্থা খুবই খারাপ। আমার অন্তরে খারাপ চিন্তা-ভাবনা কেন সৃষ্টি হয়? পাপের প্রতি কেন এত আকর্ষণ অনুভব হয়। প্রকৃত ঈমানের যে স্বাদ অন্যরা পায়, তা থেকে আমি কেন বঞ্চিত? অতএব, নিজের চিন্তার লক্ষ্য পরিবর্তন করতে হবে। ওই দিন যখন আসবে, যে দিন আমরা

---

১. সূরা হজ্জ : আয়াত : ৪৬

দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতের জন্য মেহনত করতে থাকব, বস্তু ছেড়ে রুহানিয়্যাতের ওপর মুজাহাদা করব, দেহের পরিবর্তে মনের ওপর শ্রম-সাধনা শুরু করব এবং আকলের পরিবর্তে অন্তরের ওপর মেহনত-মুজাহাদা শুরু করব, তখন আমাদের চিন্তা-ভাবনা সঠিক পথে ধাবিত হবে এবং যে-কদমই উঠবে, তাতে আমরা গন্তব্যের খুব কাছে পৌঁছে যাব।

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমাদেরকে আখেরাতের ফিকির নসিব করুন। দুনিয়া থেকে যখন বিদায় হব, তখন যেন উর্ধ্ব গগণ থেকে আহ্বান আসে–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي.امين ثم امين

'হে প্রশস্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্টচিত্তে ও প্রিয়ভাজন হয়ে। তারপর তুমি আমার বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।'[১]

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

---

১. সূরা ফাজর : ২৭-৩০